গ্রন্থাবলী সিরিজ

মনোমোহন গ্রন্থাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীমনোমোহন রায় প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

গ্রন্থাবলী সিরিজ

মনোমোহন গ্রন্থাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীমনোমোহন রায় প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

কার্ত্তিক, ১৩২৮ মূল্য ১৲ টাকা।

(পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)

শ্রীমনোমোহন রায়

নিবেদন

প্রবল-পরাক্রান্ত বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক ত্রিদিব-বিজয় ও পরিশেষে বৃত্র-নিধন সেই পৌরাণিক যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত নানা ছন্দোবন্ধে গীত হইয়া আসিতেছে। পৌরাণিক ইতিবৃত্তকে মূলভিত্তি করিয়া পূর্ব্ব-সূরিগণ সকলেই আপন আপন কল্পনা-সাহায্যে সেই অমর-কাহিনী নানা সুবর্ণ-বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে স্বর্গীয় কবি হেমচন্দ্রই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বৃত্রাসুর-বধ কাব্য হেমচন্দ্রকে অমর করিয়াছে। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও অসীমশক্তিশালিনী সঞ্জীবনী কল্পনা বঙ্গকাব্য-নিকুঞ্জে যে ইন্দ্র-প্রসূন প্রস্ফুটিত করিয়াছে, সে ফুল্ল কুসুম চিরদিনই কুঞ্জবনে হাসিবে আর বঙ্গীয় পাঠক-হৃদয়ে অমরত্ব লাভ করিবে। স্বর্গগত হেমচন্দ্রের পরবর্ত্তী বঙ্গীয় লেখকদিগের হৃদয়েও তাঁহার ঐন্দ্রিলা বা বৃত্র বা ইন্দুবালার আধিপত্য বড় কম নহে। লীলাময়ী তরঙ্গিণী চিরদিনই অনন্তবিস্তারী সাগরের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। মহোর্ম্মি তরঙ্গ-সঙ্কুল, জলোচ্ছ্বাস-চঞ্চল, লীলাময়; আবার তরঙ্গিণীও আবেগপূর্ণা, বীচি-বিক্ষোভ-চঞ্চলা, তরঙ্গময়ী। তাই বলিয়া কি উভয়েই এক?

রিজিয়া দিল্লীশ্বরী, ঐন্দ্রিলা ত্রিদিবেশ্বরী। রিজিয়া আপন শক্তি ও প্রভুত্বের উচ্চ শৈল-শৃঙ্গে বসিয়া আপন গৌরবে আপনি গর্ব্বিতা, আর ঐন্দ্রিলা তাহার স্বামীর অসাধারণ বীর্য্য ও বিক্রমের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া অহঙ্কৃতা ও অভিমান-দৃপ্তা! আত্মশক্তির পরিচয়-প্রদান বাসনা এক অবস্থায় রিজিয়ার যেমন, অবস্থান্তরে ঐন্দ্রিলারও তেমন। তাই রিজিয়া ও ঐন্দ্রিলা এতদুভয় চরিত্রান্তরে একটা বাঁধা সুরের দূর-শ্রুত ক্ষীণ ঝঙ্কার পাঠকের কর্ণগোচর হওয়া অসম্ভব নহে।

অধুনা রঙ্গমঞ্চের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে রঙ্গমঞ্চের জন্য নাটকাদি প্রণয়ন যে কতদূর আয়াস-সাধ্য ও বিপজ্জনক, তাহা ভুক্তভোগিমাত্রেই অবগত আছেন; যাহা হউক, ঐন্দ্রিলা প্রধানতঃ বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের জন্য লিখিত হইলেও যাহাতে কাব্য-সৌন্দর্য্যের কোন হানি না হয়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছি—তবে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না।

শ্রীমনোমোহন রায়।

অশেষ-গুণালঙ্কৃত ভারতী ও কমলার শ্রেষ্ঠতম পুত্র,
বিদ্বজ্জন-চিরসুহৃদ্, কাব্যকলাবিশারদ ময়মনসিংহাধিপতি মহারাজা

শ্রীল শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের

শ্রীচরণ-কমলে

গ্রন্থকারের ভক্তি ও অনুরাগের প্রতিভূস্বরূপ এই কাব্যগ্রন্থখানি
উৎসৃষ্ট হইল।

রাজন্

স্বরগের সুশোভন নন্দন-কাননে,
ফুটেছিল শুভ্র শুচি মন্দার-কলিকা;
কল্পনা-সোনালি-সূত্রে গাঁথিয়া মালিকা
অর্পিলাম উপহার রাজীব-চরণে।

শ্রীমনোমোহন রায়।

নাটকের প্রযোক্তৃগণ

পুরুষ

ইন্দ্র	দেবরাজ
বৃত্র	দৈত্যরাজ
কার্ত্তিকেয়	দেবসেনাপতি
সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, যম	দেবগণ
বৃহস্পতি	দেবগুরু
জয়ন্ত	ইন্দ্রপুত্র
রুদ্রপীড়	বৃত্র-পুত্র

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, নারদ, মদন, দধীচি, মুনিগণ, স্বপ্ন, ঋষিকুমারদ্বয়, প্রমথগণ, বিষ্ণুদূতগণ, দৈত্য-রাজমন্ত্রী, বসন্তক, সভাসদ্‌গণ, দূষণ, গোকর্ণ, তৃণগতি, বহ্লিক, দৈত্যসেনাগণ, দৈত্যচর ও নগররক্ষকগণ।

স্ত্রী

শচী	দেবরাজ-পত্নী
ঐন্দ্রিলা	দৈত্যরাজ-পত্নী
সুরলক্ষ্মী	
দৈত্যরাজলক্ষ্মী	
ইন্দুবালা	রুদ্রপীড়ের স্ত্রী

গৌরী, জয়া, নিয়তি, রতি, মায়া, দেববালাগণ, অদৃষ্টবালাগণ, ঐন্দ্রিলার সখীগণ, ইন্দুবালার সখীগণ, কুহকরমণীগণ, মুনিপত্নীগণ, ডাকিনীগণ ও পরিচারিকা।

ঐন্দ্রিলা

প্রথম অঙ্ক

—:০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—পাতালপুরী

কার্ত্তিকেয়, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, বরুণ ও যম।

কার্ত্তিকেয়। সূচিভেদ্য অন্ধতমসার মসীময়
আবরণে ঢাকি' কলঙ্ক-কালিমা-ব্যাপ্ত
বিশুষ্ক বদন, পাতালের অন্ধতম
দেশে বসি' কি ভাবিছ দেবগণ? সত্য
বটে দৈত্যরাজ কঠিন শৃঙ্খল দিয়া
ভাগ্যলক্ষ্মী রেখেছে বাঁধিয়া সিংহাসন-
পাদমূলে তা'র, সত্য বটে দৈববল
দুর্ভেদ্য কবচে সুরক্ষিত বক্ষঃস্থল
তা'র; কিন্তু, হে অমরবৃন্দ! জেন স্থির
দৈবশক্তি নহে কভু চিরন্তন;
জয়-পরাজয় আর উত্থান-পতন—
নিয়তির অদ্ভুত শাসনে, দেব দৈত্য
নর আর গন্ধর্ব্ব কিন্নর বদ্ধ সবে
সমভাবে।

সূর্য্য। কি কহিব ষড়ানন!
দুঃসহ দুঃখের ভারে শত খণ্ডে চূর্ণ
আজি মার্ত্তণ্ড-হৃদয়, ইচ্ছা হয় এই
দণ্ডে প্রকাশিয়া প্রচণ্ড প্রলয়-মূর্ত্তি
দ্বাদশার্ক-রূপে, জ্বালি' ঘোর কালানল
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে, ধ্বংস করি তিন
লোক, যেই ভীষণ দহনে পতঙ্গের
প্রায় দগ্ধ হয় অরাতিনিকর; বুঝে
দুষ্ট দিতিসুতগণ দেবের প্রতাপ।
কিন্তু হায়! হবে তাহে একের দুষ্কৃতি
হেতু অসংখ্য জীবের নাশ, বিরিঞ্চির
বহু যত্নে মানস-প্রসূত।

দেবগণ!
নাহি আর উপেক্ষার প্রয়োজন। বহু
অনর্থের মূল অনর্থক কালব্যাজ;
হেন নিশ্চেষ্টতা ভীরুতার নিদর্শন।
শক্তি ধর শক্তিধর! অস্ত্রে শস্ত্রে
সুসজ্জিত হও সবে ত্রিদশ মণ্ডল;
বিভাসিত করি' দিক্ স্বর্গীয় বিভায়
অরাতিরে ভেট গিয়া সম্মুখ-সংগ্রামে।
কহ প্রভঞ্জন! কহ মত কিবা তব?

বায়ু। সুর-সেনাপতি! সমবেত দেবগণ!
মম মতে মতামত লইবার নাহি
অবসর; অচিরে সমর-সাজে হয়ে
সুসজ্জিত দৈত্যাধম বৃত্রাসুরে কর
আক্রমণ; পরামর্শ পশ্চাতে হইবে।

অগ্নি। বীর প্রভঞ্জন! সত্য যা' কহিলে। কার্য্য
বিনা মন্ত্রে নাহি হয় কোন ফলোদয়।
অপিচ তাহাতে সুকর দুষ্কর নানা-
বিধ উপায়-পন্থার করিয়া উদ্ভব
ভ্রম সৃষ্টি করে। অসংখ্য উপায়-স্রোতে
পড়ি' জীব, ভেসে যায়—বহু বহু দূরে
কর্ত্তব্য হইতে।

হের, হে অমরবৃন্দ;
হবিঃপুষ্ট লেলিহান্ শিখারাজি মম
অযুত রসনা বিস্তারিয়া মাগিতেছে
নিরন্তর দৈত্যরাজ-হৃদয়-শোণিত।

বরুণ। দেবগণ! এই সুরমণ্ডলীর মাঝে
হেন কাপুরুষ আছে কেবা, ধমনীতে
যা'র নাহি ছুটে [illegible]প্রবাহ তীব্র
তেজে যবে কল্পনা[illegible] উপলব্ধি
করে অচিন্ত্য এ অ[illegible]গুলীলা,

যবে ভাবে মনে—দিব্যজ্যোতি পরমাণু-
সমষ্টিতে গঠিত দেবের দেহ, তা'র
পরিণতি—স্পর্শেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এই ঘোর
অন্ধকার-মাঝে ক্ষীণপ্রাণ দেউটির
মত পূর্ব্ব-মহত্ত্বের ছায়াকায়াখানি
মাত্র লয়ে, দুই পদে স্মৃতিরে দলিতে
শুধু! কিন্তু দৈত্যরাজসনে রণ নহে
বীর! শিশুদের ধূলাখেলা। রুদ্রতেজে
তেজীয়ান্ দৈত্যকুলপতি—শঙ্করের
সংহার-ত্রিশূল করে রণে যবে হবে
আগুয়ান্, সমগ্র এ সুর শক্তি-সমষ্টি
করিলে ফুৎকারে উড়িয়া যাবে ভীম
ঝটিকা-উৎক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড সম।
বিশ্বাস আমার—যত দিন বৃত্র-দেহে
রুদ্রতেজ রবে, আপনি শঙ্কর হবে
পরাভব আহবে তাহার সনে। বৃথা
চেষ্টা আমাদের।

সূর্য্য। হে প্রচেতঃ! নিশ্চয়
তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে বৃত্রের
ত্রিশূলাঘাতে। স্থির জেন—পুরুষকার
দৈব হ'তে কার্য্যকরী শক্তি বহুগুণে।
এই মহাশক্তি-বলে যদি দৈবশক্তি
শতধা বিখণ্ড করি' নাহি পারি সেই
দৈত্যাধমে পাঠাইতে শমন-সদনে,
কিবা ফল দেব নামে, অমরত্বে ফল
কিবা?

বরুণ। দিবাকর! ভাবিয়া দেখহ মনে
প্রতিজ্ঞায় আর প্রতিজ্ঞা-পালনে আছে
প্রভেদ বিস্তর। পুরুষের শক্তি যদি
কার্য্যকরী দৈবশক্তি হ'তে, তা' হ'লে এ
বহুকালব্যাপী অসুর-সংগ্রাম অন্ত
হ'ত দুই দিনে। তা' হ'লে কি আখণ্ডল—
ত্রিদিব-ঈশ্বর অযোনি-সম্ভব,—যা'র
প্রতি পরমাণু জাগ্রত চৈতন্যময়—
অসুরের শূলাঘাতে পড়ে রণস্থলে
অচেতন? তা' হ'লে কি হে সুরবৃন্দ!
আজ হয় অমরের এই দশা? তাই
বলি দৈবশক্তি বলীয়সী—তাই আজি
শতমখ শত কর্ত্তব্যের শিরে করি
পদাঘাত নিরত আছেন একা দূর
সুমেরু-শিখরে নিয়তি-পূজায়। মোর
মতে যত দিন সহস্রলোচন ধ্যান
সাঙ্গ করি' নাহি আসে ফিরি'—তত দিন
স্থগিত থাকুক রণ। অনর্থক বল-
ক্ষয়ে নাহি প্রয়োজন।

সূর্য্য। দেবগণ! যেই
জন যুক্তিহীন, তা'র সনে তর্ক কভু
মীমাংসা না হয়, বরঞ্চ তাহাতে হয়
কলহ উদ্ভব। স্থির নাহি কত দিনে
ফিরিবে বাসব, যুগ—শত যুগ লক্ষ
কি অযুত যুগ—তত দিন থাক বসি'
সুরগণ! এই তিমির-সমুদ্রমাঝে
আশাহীন লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যবিহীন—
বাসবের আগমন প্রতীক্ষিয়া, কিংবা
কল্পনার বলে আঁকি' ভবিষ্যৎ ছবি
নয়নরঞ্জন, তিক্ত দাসত্বের আর'
তিক্ততা বাড়াও।

যম। যুদ্ধ শ্রেয়ঃ মোর মতে—
ফলাফল না করি' বিচার। কার্য্য-পূর্ব্বে
ফলের বিচার অমরে না শোভা পায়।
আর ফলাফল কিবা? নিয়তির হস্ত
ক্ষিপ্ত অক্ষচিহ্ন গণি' জয়-পরাজয়
না হয় বিচার। সত্য বটে দৈত্যাধম
অধিষ্ঠিত এবে স্বর্গ-সিংহাসনে—সত্য
বটে বিজিত অমরবৃন্দ—বিতাড়িত—,
পদানত—কিন্তু দেবগণ! আজ' নহে
তারা আশাহীন উদ্যমবিহীন। তাই
বলি যুদ্ধ ভাল নিশ্চেষ্টতা হ'তে। আর'
দেখ—জয়দৃপ্ত দুর্বৃত্ত দানব এবে
অস্ত্র ত্যজি' করিতেছে সদা আলস্যের
আরাধনা, আলস্যে শক্তির ক্ষয়—যদি
এই অবসরে সমগ্র এ' দেবশক্তি
পুঞ্জীভূত করি ঝঞ্ঝাবায়ু-সম মহা
বেগে অরাতিরে করি আক্রমণ, বোধ
হয় ব্যর্থ নাহি হবে তাহা। শিখিধ্বজ!
তূণ পূর্ণ করি লও শাণিত বিশিখে,
হে মার্ত্তণ্ড! করে লও উলঙ্গ কৃপাণ
নক্ত-রক্তে করহ রঞ্জিত। হে প্রচেতঃ!
পাশবদ্ধ কর দুষ্ট দিতিসুতগণে,

পবনের গদাঘাতে চূর্ণ হ'ক দৈত্যকুল ;
দণ্ডহাতে দণ্ডধর যাচিছে আদেশ।

স্বরলক্ষ্মী। (নেপথ্যে গীত)
কেন আর কাঁদ কি হবে কাঁদিয়ে
কেন আর ভাব কি হবে ভাবিয়ে
কেন আর ইন্দু অমরা স্মরিয়ে
অমরার বল কি আছে আর ?

সূর্য্য। কার এই অরুন্তুদ করুণ-সঙ্গীত ?
জীর্ণা শীর্ণা কাঙ্গালিনী বেশে সুরলক্ষ্মী।
(সুরলক্ষ্মীর প্রবেশ ও দেবতাগণেব প্রণাম)

(গীত)

যেথা মন্দার-কুসুমে ফুটিত সুষমা
যতনে ধরিত বুকে ইন্দ্র-রামা
সেথা গাছে গাছে আর ফুটে না মন্দার
সেথা পূর্ণিমার চাঁদ উঠে নাক' আর
সেথা প'ড়ে আছে দেহ চ'লে গেছে প্রাণ
ভেঙে গেছে বীণা ছিঁড়ে গেছে তার
কাঁদিলে কি হবে কেহ না শুনিবে
সুধু উথলি উঠিবে দুখপারাবার।

সুরলক্ষ্মী। জাগ্রত কি অমর-মণ্ডলী—কিংবা মগ্ন
ঘোর মোহ-নিদ্রাবশে ? ভাঙ্গিল সুষুপ্তি
কি হে ? তবে কেন নিস্পন্দ নির্ব্বাক্ হেন
চিত্রার্পিত পুতুলেব প্রায় ?—দৈত্যাধম-
করস্পর্শে আবিল অমরা, সুরবৃন্দ
নিদ্রামগ্ন হেথা ! শোভাহীন বৈজয়ন্ত
পাপ-দিতি-সুত-পঙ্কিল-পরশে—হেথা
মন্ত্রণায় ব্যস্ত দেবগণ ! নীচাশয়
দৈত্যগণ মর্ম্মপীড়া দেয় সদা সুর
ললনারে, প্রেতলীলা করে সদা
কত মত, ঘোর অত্যাচারে তাহাদের
নারীর হৃদয়ে ছুটে জিঘাংসার স্রোত
লহরে লহরে,—হেথা দেবগণ দিব্য
বর্ম্মে আচ্ছাদিত দেহ পৃষ্ঠে শোভে
নিষঙ্গ সুন্দর বিবিধ আয়ুধ-পূর্ণ,
কিন্তু বল নাহি উপাড়িতে অরাতির
হৃৎপিণ্ড ! ধিক্ শত ধিক্ সুরবৃন্দ !
নিদ্রা ত্যজি উঠ বীরগণ, জ্বাল স্বর্গে
অযুত বরষ-ব্যাপী সমর-অনল,
ঘৃতাহুতি দাও তাহে দনুজ-শোণিত।
উঠ উঠ দেববৃন্দ ! বজ্রমুষ্টি ধর
সবে অক্ষয় কার্ম্মুক। সমর-প্রাঙ্গণে
হবে কর্ত্তব্য বিচার। আমি অমরার
বিজয়-কমলা, কনক-কেতন ধরি'
রণমুখে হব আগুয়ান, দেখি ঘোর
রণে কেমনে দনুজপতি পায় ত্রাণ।

কার্ত্তিকেয়। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা প্রতিজ্ঞা
সবার।

যম। জ্বালিব স্বর্গেতে মোরা রণ দুর্নিবার।

সূর্য্য। দৈত্যপতি-রক্তে সিক্ত করিব কৃপাণ।

অগ্নি। সমগ্র অমরশক্তি হও আগুয়ান।
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য— স্বর্গ, নন্দনবনের এক অংশ।

গোকর্ণ ও তৃণগতি।

গোকর্ণ। আরে বটে ?—বটে ?—তবে ত তোমার ভারি জোর কপাল ! খোস-খবরের খুঁটোও ভাল, আর ভাল জিনিসের হাওয়াও ভাল। তার পর হ'ল কি ?

তৃণগতি। তার পর তো সেই গোলাপ-ফুলের মত মেয়েমানুষের দল সরোবরের মধ্যে নেমে ফোটা ফোটা পদ্ম-ফুল তুলতে লাগলো। যখন সেই টুকটুকে মুখগুলি জলের উপর ভাসছিল, তখন আমার বোধ হ'ল যেন, সেগুলি রক্তমাংসে গড়ান কতকগুলো পদ্ম ভাসছে।

গোকর্ণ। তোমার বরাত দাদা ! চিরকালই ভাল। তাই তোমার ভাগ্যে এ সব দেখা ঘটে। আমরা যে স্বর্গ-জয়ের দিন থেকে ঘুরছি, ফিরছি, তা' আমাদের চোখে কৈ কিছুই ত পড়ে না। যা' হ'ক, তার পর হ'ল কি ?

তৃণগতি। আমার তো তাদের দেখেই বুক দশ হাত হ'ল। ভাবলুম যে, এদের মধ্যে যদি একটিকে পাই, তবে এ চাকরীর মাথায় লাথি মেরে এই বনের এক কোণে একটা কুটীর

বেঁধে সংসার-ধর্ম্ম করি,—এ সব ছেড়ে ছুড়ে দি।

গোকর্ণ। না সোনারচাঁদ! তুমি বনবাসী হ'লে আমাদের এমন টোপ দেখিয়ে চোদ্দভুবন ঘোরাবে কে? এখন শীকার হ'তে আসে নি, তাই এত বৈরাগ্য। এমন বনবাস ক'দফা হয়েছে? শ' পূরলো না কি?

তৃণগতি। না ভাই, যা হবার হয়ে গেছে। ও রাস্তা ভাল না।

গোকর্ণ। কেন বাবা, মান্ধাতার আমল থেকে ঐ রাস্তা চ'লে আস্‌ছে, আর তুমি কি সোনার-চাঁদ! রাতারাতি শুক্রদেবের পুষ্যিপুত্তুর হয়ে পড়লে যে, বল্‌ছ, ও রাস্তাই ভাল নয়। যাক্—সে কি করা না করা—তখন ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে।" আমার চরণদ্বয় তো উদরের ভার বহন কর্ত্তে একান্ত অশক্ত।

তৃণগতি। আর বেশী দূর নয় দাদা। আর দু' কদম গেলেই সেখানে পৌছুব।

গোকর্ণ। তোমার শরীরটা হ'ল সোলার মত হাল্কা, তুমি হাওয়ার আগে ছুট্‌তে পার। আর ঐ রলাকাঠের মত পাযে দু'ধাপ এগুলেই দু'যোজনের ধাক্কা—আমি যে দাদা ভাঁটার মত, আমার এগোনো পেছনো বোঝবারই যো নেই। বলি জায়গাটা কোথায়, একটু ভেঙ্গেই বল না।

তৃণগতি। আর বেশী দূর নয় ভাই—ঐ যে একটা শ্বেত পাথরের পাহাড় দেখা যাচ্ছে—যার গা দিয়ে ঐ গলা রূপোর স্রোতের মত একটি ছোট পাহাড়ে নদী বয়ে যাচ্ছে—ঐ যে দেখতে পাচ্ছ—যে নদীর দুধারে কেমন সবুজ রঙের মাঠ, ঠিক যেন দুখানা সবুজ কিংখাপের গালিচা প'ড়ে রয়েছে—ঠিক দেখতে পাচ্ছ ত?

গোকর্ণ। হাঁ হাঁ—তুমি ব'লে চল না—দেখতে পেলেও পাচ্ছি, না পেলেও পাচ্ছি। তুমি ও বোলের তোড় ভেঙ্গ না।. খেই হারিয়ে গেলে আমি আবার ধরিয়ে দিতে পারবো না।

তৃণগতি। তুমি মনে কর্‌ছ বুঝি যে, আমি তোমায় ঠাট্টা কর্‌ছি?

গোকর্ণ। না, তা' মনে কর্‌ছি না—এ আর ঠাট্টা নয়!—তাহা সত্যি—হপ্তা-খানেক তো পায়ের ফুলোও কম্‌বে না, কামড়ানিও মর্‌বে না।

তৃণগতি। যদি বেশী কষ্ট হয় তো এস গাছতলায় ব'সে খানিক জিরিয়ে নিয়ে তার পর যাব।

গোকর্ণ। আর জিরিয়ে কাজ নেই, এই প্রথম ধাক্কায় যত দূর চলে। পড়া গেছে যখন তোমার পাল্লায়, পালা সহজে শেষ হচ্ছে না—চল—

তৃণগতি। চল দাদা! আসা গেছে যখন এতটা কষ্ট স্বীকার ক'রে, তখন আর কাছাকাছি এসে ফিরে যাওয়াটা ভাল দেখায় না—আর যদি কপালক্রমে তাদের দেখাটা পাওয়া যায়, তা হ'লে গায়ের ব্যথা জল হয়ে যাবে এখন।

গোকর্ণ। তাদের দেখে গায়ের ব্যথা যত জল হ'ক আর না হ'ক, তোমার কথা শুনে ত' আমার প্রাণ জল হয়ে যাচ্ছে চল—দাদা! চল।—

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য— নন্দনবনের এক অংশ, সরোবর-তীর।

দেববালাগণ।

দেববালাগণ। (গীত)

সরসী-উরসে কমল হাসে
দামিনী হাসিছে আকাশে,
হাসির সাগরে প্রকৃতি ভাসিছে
হাসি আসে নাক শুধু মোদের পাশে,
তবে যাও চ'লে হাসি স্বরগ ছাড়িয়ে
আমরা চাই না তোমারে দেখিতে।
বিষাদ-ঘোমটা বদনে ঝাঁপিব
ঢাকিব কায় বিষাদ-বাসে।

প্রথম দেববালা। সখি! অমরার সর্ব্বস্থান কলঙ্কিত দনুজের পঙ্কিল পরশে। নেহার লো! নন্দনকাননে পারিজাত ফুটে নাক' আর, মন্দাকিনী ঢালে না পীযুষধারা, নিরানন্দ যে দিকে তাকাই। শুধু এই বিজন কাননে আজ' পশেনি দানব।

দ্বিতীয় দেববালা।
সহচরি! নাহি জানি কত কাল আর
এই ভাবে যাবে? শুষ্ক পত্রে মর-মর
শব্দ হলে শুকায় শোণিত!—মনে হয়,
ওই বুঝি আসিল দানব।

তৃতীয় দেববালা। সঙ্গিনি লো!
বোধ হয় বেশী দিন আর এই ভাবে
হবে না রহিতে। কাল সুরলক্ষ্মী-সনে
মম হয়েছিল দেখা, আসিলেন তিনি
পাতাল হইতে। উত্তেজনা-বলে তাঁর,
বদ্ধ-পরিকর অমর-সেনানীগণ।
অতি শীঘ্র স্বর্গরাজ্য হইবে উদ্ধার,
দেখিব স্বজনি! অমরার সিংহাসনে
বাসবের বামপাশে শচী পুলোমজা।

(গোকর্ণ ও তৃণগতির প্রবেশ)

তৃণগতি। সাবধান গোকর্ণ ভায়া, ঝাঁকে ঝাঁক পাক্‌ড়াও করা চাই। যেন একটাও না পালায়—খুব হুঁসিয়ার—

(দেববালাগণের সরোবর-জলে ঝাঁপ দেওন ও অদৃশ্য হওন)

গোকর্ণ। তৃণগতি ভায়া!—ব্যাপার সহজ নয়। তোমার কথায় দেখ্‌ছি, এ হানা বনের মধ্যে এসে পড়া গেছে। ঐ যে পরীর ঝাঁক্‌টি জলে ডুব মারলেন, ওঁদেরি হাতে হাত বাড়িয়ে প্রাণটি তুলে দিতে হ'ল। তোমার পায়েরও জোর আছে—দেহেরও তত ভার নেই। আমারই মস্তকটি নিয়ে টান পাড়াপাড়ি।

তৃণগতি। আরে ভায়া! তুমি কি খেপ্‌লে নাকি? দেখতে পাচ্ছ না, ওরা দেবতা।

গোকর্ণ। হ্যাঁ, দেবতা বটে!—কিন্তু উপসর্গযুক্ত—শুধু দেবতা নন দাদা! ওঁরা অপদেবতা।

তৃণগতি। অ্যাঁ, বল কি!

গোকর্ণ। বলি আর কি? যা দেখ্‌ছি—

তৃণগতি। অপদেবতা! পেত্‌নী! সত্যি নাকি? বাপ্‌রে বাপ্‌!

[তৃণগতির প্রস্থান।

গোকর্ণ। বেশ দাদা! এই বুঝি বন্ধুর কাজ? আমাকে পেত্‌নীর হাতে সমর্পণ ক'রে তুমি লম্বা হ'লে। [প্রস্থান।

(সুরলক্ষ্মী ও বৃহস্পতির প্রবেশ)

সুরলক্ষ্মী। পিতঃ! তব আজ্ঞাক্রমে যাইনু পাতালে;
দেখিলাম তথা, দেবের দুর্দ্দশা ঘোর।
হায় দেবগুরো! কেমনে বর্ণিব আমি
কি দুস্তর বিপত্তি-পাথারে মগ্ন আজি
দেবগণ।

বৃহস্পতি। নন্দিনি লো! কেন বিশ্বধাতা
দেবতা সৃজিলা, অমরত্ব কেন দিলা
তাহাদের? সুরলক্ষ্মী— কনকপ্রতিমা
তুই সর্ব্ব-অঙ্গে তোর কালিমা ঢালিয়ে,
দেছে, জীর্ণা শীর্ণা বিবসনা কাঙালিনী।
দেবগণ বিতাড়িত অমরা হইতে!
পিশাচের অধিকৃত সুরসিংহাসন।
এই দৃশ্য দেখিবার আগে, ছিল ভাল—
ছিল ভাল—অনন্ত সুষুপ্তি মৃত্যু-অঙ্কে।

সুরলক্ষ্মী। হা পিতঃ! দেবের দেবত্ব গেছে—শুধু
ছায়ামাত্র আছে প'ড়ে, জাগাইতে হৃদে
পূর্ব্ব-মহত্ত্বের স্মৃতি, তীব্র—অতি তীব্র
বৃশ্চিকদংশন। পুরুষ-শক্তির তরে
উপাস্য আছিল যারা, হইয়াছে এবে
তারা ঘোর অদৃষ্ট-পোষক বীর্য্যহীন
নিশ্চেষ্ট জড়তাময়।

বৃহস্পতি। কর্ত্তব্যের পথ
দেখা'য়ে তো দিয়েছি অকৃতী সন্তানে?
ভেঙ্গেছে তো তাহাদের স্বপনের ঘোর?
কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছে তো তারা?

সুরলক্ষ্মী। তব পূত পদরজ-পরসাদে দেব!
দাসী সমর্থ হয়েছে আদেশ-পালনে।
সমাগত স্বর্গদ্বারে অমরমণ্ডলী
রণ-সাজে হয়ে সুসজ্জিত।

বৃহস্পতি। আদ্যাশক্তি!
দনুজদলনি! শক্তি দাও ভগ্ন হৃদে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

—*—

দৃশ্য—সুমেরু-শিখর, অদূরে অমরপুরী।

কার্ত্তিকেয়, সূর্য্য, অগ্নি, যম ও বরুণ।

কার্ত্তিকেয়। হের দেবযোধগণ! অদূরে শোভিছে
কনক-অমরপুরী, প্রতি গৃহ-চূড়ে
যার নিরন্তর উড়িত হে অমরের
বিজয়-কেতন, সুবর্ণ-খচিত, নাচিত
উল্লাসে দেববালা-অধর-চুম্বিত
মাঙ্গলিক শঙ্খের নিনাদ শুনি; কিন্তু
হায়! ভাগ্যদোষে আমাদের, দেবভোগ্যা
অমরা ভুঞ্জিছে পাপ দিতিসুতগণ।
এই দুঃখ হবে দূর—বিধিলিপি খণ্ড
খণ্ড করি যেই দিন, বৃত্রের শোণিতে
রঞ্জিত করিব মম সুতীক্ষ্ণ সায়ক।

সূর্য্য। অন্তরীক্ষচারী শুন ত্রিদশমণ্ডল!
শুন যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর কিংবা
মর্ত্ত্যজীবি! মার্ত্তণ্ডের প্রতিজ্ঞা ভীষণ—
সত্য সাক্ষী করি, এই উলঙ্গিনু আজি
করাল কৃপাণ; যতদিন দৈত্যরক্ত
না হবে নিঃশেষ, ততদিন কোষবদ্ধ
না করিব তারে।

কার্ত্তিকেয়। মহাতেজা অংশুমালী!
অগণিত সৌর-সেনা লয়ে তব রহ
পূর্ব্ব-দ্বারে।
শূরশ্রেষ্ঠ পরেত-অধিপ!
প্রেতসৈন্য লয়ে তব রক্ষহ কুশলে
অমরার দক্ষিণ দুয়ার।
হুতাশন!
জয়ন্তের সনে তব সৈন্য করিয়া
মিলিত, রহ তুমি পূর্ব্বেতর দ্বারে।
আমি বরুণ-সহায় রহিনু উত্তরে।
দেবগণ! করহ স্মরণ 'অসুর-মর্দ্দন'
এই আখ্যা দেবতার প্রথিত ত্রিলোকে।
জরা-মৃত্যু-ভয় নাহি দেবতার, তবে
কেন রণে হবে ভঙ্গীয়ান্? বীরদাপে
হও সবে আগুয়ান, কাঁপায়ে ত্রিলোক।
কোদণ্ড-টঙ্কারে উঠুক কাঁপিয়া নীচ
দৈত্যগণ—রথের ঘর্ঘরে পূর্ণ হ'ক্
ব্যোম্—লক্ লক্ লোলজিহ্বা বিস্তারিয়া
জ্বলুক অমরা-ব্যাপী সমর-অনল।
নিজ নিজ স্থানে সবে হও নিয়োজিত।

দেবগণ। শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব দেব-সেনাপতি!

[প্রস্থান।

(দুইজন দৈত্য নগর-রক্ষকের প্রবেশ)

প্র, ন-র। আর এক কথা শুনেছিস্? দেবতারা না কি আবার যুদ্ধ করতে আস্‌বে?

দ্বি, ন-র। হ্যাঃ!—এক ত্রিশূলের ঘায়ে পাতালে গেছে—এবার আর এক ঘা খেলেই আর চিহ্ন অবধি পাওয়া যাবে না। আর যুদ্ধ করতে আস্‌বে কি? সে ইন্দ্রটা তো বিরাগী হয়ে গ্যাছে। "খোঁটার জোরে মেড়া লড়ে।"—সেটা না থাক্‌লে অন্য দেবতাগুলোকে তো কচু-কাটা ক'রে কাট্‌ব।

প্র, ন-র। হ্যাঁ!—ওই কচুটা কলাটা পর্য্যন্তই তোর দৌড়!

দ্বি, ন-র। বটে! আমার দৌড় দেখিস্‌নি, তাই ব'লছিস্। সে এমন তেমন দৌড় নয়! একেবারে ভোঁ দৌড়। কথাটা উঠতে মনে হ'ল—সে ভারি মজা হয়েছিল—গেল যুদ্ধে, আমাদের দল তো গিয়ে পড়েছে দেবতার দলের ওপর। দু দলে খুব কাটাকাটি মারামারি লেগে গেছে—এমন সময় সেই যে তেচোখো দুষমন চেহারা মড়ার দেবতা—কি ছাই ওটার নাম—যম না কি? সেটা তো একটা লাঠি ঘুরোতে ঘুরোতে এসে উপস্থিত—ব্যাটার চেহারা দেখেই আক্কেল গুড়ুম্—তা আর যুদ্ধ ক'র্‌ব কি? একটু এধার ওধার তাকিয়ে দেখি যে, পেছুন বেশ সাফ্—আর একেবারে চোঁচা দৌড়। তার পরে, ছ' মাসের মধ্যে ও মারামারি কাটাকাটির কাছ দিয়েও যাই নি। এ পাহারা দেওয়া চাকরী মন্দ নয়। সর্দ্দার ব্যাটা খাটিয়া নিলেই আমাদেরও পোয়াবার, সমস্ত রাত্তির নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুম; দিনের বেলায় তো কসুরই নেই।

প্র, ন-র। সময়টা এইরকম থাক্‌লে হয়। কিন্তু গাঁচে যা মালুম হচ্ছে—তাতে আর বেশী দিন

নয়—যে দেবতার জোরে এত, তারই জাত-ভায়ের ওপর এত অত্যাচার! এ বেশী দিন সইবে না।

দ্বি, ন-র। আরে! সে ভোলা মহেশ্বর কি আর দুনিয়ার খবর রাখে? রাত-দিন নেশায়ই ভোর। তার পরে, যদি একবার আধবার চ'টে ওঠে, তা হ'য়ে দুটো বিল্বিপত্তর ছুড়ে মারলেই রাগ জল। তা না হ'লে কি দৈত্য-পতি স্বর্গ জয় করতে পারতো? ওরে ছাখ—ছাখ! হঠাৎ পূর্ব্বদিক্‌টাতে কেমন আলো হয়ে উঠল! এই সবে রাত্তির দুকুর—এরি মধ্যে ফর্সা হবার মত দেখছি!

প্র, ন-র। তাই তো রে! এ তো গতিক ভাল নয়—দেবতাদের শরীর থেকে ঐ রকম আলো বেরোয়। দেবতা ব্যাটারা আবার সেজে গুজে এলো না কি?

দ্বি, ন-র। আরে না—না—ক্ষেপেছিস? তারা আর গায় চিহ্ন থাকতে এ-মুখো হচ্ছে না। ও একটা ধূমকেতু ফুমকেতু হবে। এ কি তুই তোর পৃথিবী পেলি—যে, অমাবস্যের দিন সমস্ত রাত্তিরই ঘুট-ঘুটে অন্ধকার থাকবে? এ স্বর্গ—এখানকার রকম-সকমই আলাদা।

(নেপথ্যে "জয় অমরের জয়।"
"জয় দেবতার জয়" "জয় বাসবের জয়"।)

।, ন-র। ওহে ভায়া! গ—গ—গতিক ভাল নয়—এ দেবতা ব্যাটাদেরই খোসখৎ আওয়াজ—সর্দ্দার মহাশয়কে খবর দেওয়া যাক গে।

।, ন-র। তা' ঠিক—এ (উপরের দিকে চাহিয়া) জায়গাটাও ওপর খোলা,এখানে থাকা ঠিক না, কে জানে, যদি এক আধটা বাণ-ফাণ হাত ফস্‌কে এধারে এসে পড়ে, তা হ'লেই তো মুস্কিল।

।, ন-র। যা বলেছিস্ দাদা! আমাদের শুক্রদেব বলেছেন—"রথেষু বামনং দৃষ্টা যঃ পলায়তি স জীবতি" পেছন বাগে না দেখে নিশ্বেস বন্ধ ক'রে—একটি দৌড়ে পগার পার হওয়াই যুক্তি।

।, ন-র। তাই তো, আবার সেই তেচোখো দুষমন চেহারা দেবতার হাতে পড়তে হ'ল।

প্র, ন-র। কি করবে ভাই! আমরা ঢেঁকির জাত—আমাদের কাছে স্বর্গও যা—মর্ত্ত্যও তাই—বেশী কিছু তফাৎ নেই।

দ্বি, ন-র। থাক্, আর দেরী ক'রে কাজ নেই। ঋক্ষভ মশায়কে ঘুম থেকে জাগিয়ে সুখবরটা দেওয়া যাক্ গে।

প্র, ন-র। হ্যাঁ, বলা যাক্ গে যে, আপাততঃ আসুন, দু এক দিনের মধ্যেই মহানিদ্রার আশ্রয় নিতে হবে; তখন আর কেউ জাগ্‌বে না।

দ্বি, ন-র। চ'—দাদা—চ'।

[প্রস্থান।

(সুরলক্ষ্মী ও জয়ন্তের প্রবেশ)

সুরলক্ষ্মী। আয় রে! আয় রে! বাসবের হৃদয়ের
মণিহার! আয় কোলে আয় কনক-পুতলি!
তোরে পাঠাইতে দুর্ম্মদ দনুজ-রণে,
কোন্ অভাগিনী মাতা নাহি তিতে বল
নয়ন-আসারে?

জয়ন্ত। জননি গো! তব সমা
বীর্য্যবতী মাতা যার, পুত্র তার যদি
নাহি হয় অনুরূপ, কলঙ্ক ঘোষিবে
মা গো! ত্রিজগত-বাসী। তব পদরজ
ধরি শিরে শঙ্করের সনে রণে নাহি
ডরি, কি ছার সে শঙ্করের দাস বৃত্র
দৈত্যাধম। ত্রিদশ-জননি! আশীর্ব্বাদ
তব—ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের বক্ষ-শোভি
অক্ষয় কবচ—তব নাম ইষ্টমন্ত্র
মোর—স্মরি তায় হেলায় দলিব আমি
দনুজ-বাহিনী, দলে যথা করিবর
গুরুপদ-ভারে বিকচ নলিনীদল।

সুরলক্ষ্মী। আশীর্ব্বাদ করি, সমরে অজেয় হও;
দৈত্য-অস্ত্র যেন নাহি স্পর্শ করে দেহ
তব। হের, আনিয়াছি আশিস-কুসুম
মহাশক্তিরূপা চণ্ডিকার পাদপদ্ম
হ'তে, দৈত্যশক্তিলোপকারী শিরস্ত্রাণ—
ধর শিরে সযতনে। দিলাম ললাটে
মোহন সিন্দুর-টিপ, গোধূলি-ললাটে
অরুন্ধতী সম—দৈত্যমায়া স্পর্শিবে না
শরীর তোমার। [illegible]ী হও
বীর! সুরলক্ষ্মী করি[illegible]শীর্ব্বাদ।

জয়ন্ত। মাতঃ! শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণিপাত।
[জয়ন্তের প্রস্থান।

সুরলক্ষ্মী। ছিল দেবগণ নিরাশার অতি ঘোর
তিমির-মাঝারে। মম উত্তেজনা-বাণী
ভেঙ্গে দেছে মোহনিদ্রা তাহাদের। ইন্দ্র
রহিয়াছে দূর কুমেরু-শিখরে; এবে
নায়ক-বিহীন দেবগণ; ক্ষণে ক্ষণে
আশা-ভঙ্গে অধৈর্য্য হইবে তারা। মম
কার্য্য—বিপত্তির কালে উত্তেজনা-বাক্যে
সংবর্দ্ধিত করিবারে সাহস তাদের।
[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

—০—

দৃশ্য—নন্দনকাননের প্রমোদবাটিকা।

ঐন্দ্রিলা।

ঐন্দ্রিলা। উচ্চে—আর উচ্চে—অনন্ত অসীম ওই
গগন ভেদিয়া, অন্তহীন শূন্য করি
অতিক্রম উঠ আশা! অবিরাম-গতি।
চিত্ররথগন্ধর্ব্বতনয়া—জন্ম তার
নগণ্য মরতে—দৈত্যরাজ-অঙ্কলক্ষ্মী
আশার কুহক-মন্ত্রে; এবে অধিষ্ঠিতা
অমরার স্বর্ণ-সিংহাসনে! মূর্খ লোকে
ভাবে হইয়াছে সিদ্ধ মনস্কাম—কিংবা
ভাবে হইয়াছে আশাতীত ফললাভ!
সঙ্কীর্ণতা! সঙ্কীর্ণতা! আশার অতীত!
সীমা আছে যার তারি হয় অতিক্রম;
অনন্ত-বিস্তৃত আশা-অম্বুধির অন্ত
কোথা?
বৃত্রজায়া দানবী ঐন্দ্রিলা আজি
অমরার রাণী! ইঙ্গিতে তাহার লক্ষ
দাসী সেবিবে চরণ; ক'রে দিবে অঙ্গ-
রাগ বিলাস-বিভ্রম যার শক্তি যত-
টুকু; কিংবা আজ্ঞা পেলে তার লক্ষ লক্ষ
তরবারি উঠিবে আস্ফালি' শোণিতের
স্পৃহা তার নিবৃত্ত করিতে। কিন্তু সে কি
ক্ষমতার পরিচয়? প্রভুত্বের কোন
নিদর্শন? আত্মরক্ষা-অসমর্থ যূপ-
বদ্ধ পশুর বিনাশ! তবে ক্ষমতার
কথঞ্চিৎ পরিচয়—বাসব-প্রিয়ারে
যদি পারি রাখিবারে দাসীরূপে
মম গৃহে। তাম্বুল-করঙ্ক আদি আজ্ঞা-
মত করিবে বহন; অলক্তকে ক'রে
দিবে মম চরণ রঞ্জিত, সুকোমল
করে ধরি চন্দন-চর্চ্চিত তালবৃন্ত
ব্যজন করিবে মোরে, তবে হবে কিছু
প্রভুশক্তির বিকাশ। তা' না হ'লে বৃথা
রাজ্য, বৃথা ধন, বৃথা স্বর্গ-সিংহাসন।

(সখীগণের প্রবেশ)

(গীত)

সখীগণ

আয় আয় সখি! আয় ছুটে আয়
দেখি চোর চুরি ক'রে
কোথায় পালায়?
সুষুপ্তির মাঝে স্বপন-পারা
এই আছে এই নাই
নিমেষে হই লো হারা,
আর ঘুমাব না জেগে র'ব ব'সে
বেঁধে রেখে দিব দৃঢ় ফুল-পাশে
দেখি কুহকিনী সে বাঁধন ছিঁড়ে
আমাদের ছেড়ে কোথায় যায়।

সখী। কি চিন্তায় মগ্ন সদা ত্রিদিব-ইন্দ্রাণী?
ইন্দ্রজয়ী ত্রিদিব-ঈশ্বর দৈত্যেশ্বর, যার
অমল-কমল-নিন্দি চরণযুগল
বুকে ধরি নিরন্তর করেন বন্দনা,
তার হৃদে জাগে কোন্ অতৃপ্ত বাসনা?

ঐন্দ্রিলা। ক্ষুদ্র যার অভিলাষ, ক্ষুদ্র সাধ যার,
গোষ্পদ সমান—বারিদের হস্ত-ক্ষিপ্ত
দুই ফোঁটা বারি মাত্রে পূর্ণ হয় তাহা।
কিন্তু আশা যার দুস্তর বারিধি সম
কূলহীন অন্তহীন কেবল বিস্তৃতি,
পূর্ণতার পূর্ণমাত্রা আছে যেই করি
অধিকার, এক বিন্দু তার আয়তন
কেমনে বাড়াবে?

সখি। প্রকৃতির শোভা
দেখিতে দেখিতে আনমনে বহুদূর
পড়েছি আসিয়া। সখি! প্রাণেশ্বর কেন
বিলম্বেন আজি, আগতা যামিনী—কেন
দৈত্যরাজ এখন না আসিলেন পুরে?

সখী। রাজেন্দ্রাণি! বহুক্ষণ দৈত্যকুলেশ্বর
এসেছেন পুরে। শূন্য হেরি সহচরি!
প্রমোদ-আগার; অতি ত্রস্তে প্রেরিলেন
আমাদের, অন্বেষণে তব। আনিয়াছি
অনঙ্গ-রঙ্গিণী-চিত মন্দার-কুসুম-হার
বাঁধিতে তোমারে।

ঐন্দ্রিলা। সহচরি! দৈত্যরাজ
অপেক্ষিছে মোর তরে! চল— চল সখি!
ত্বরিত-গমনে।

সখী। দৈত্যকুল-রাজলক্ষ্মি!
তোমারে হবে না যেতে। হের সখি! ওই
দনুজ-ঈশ্বর নিজে উপস্থিত হেথা
করিবারে তব অন্বেষণ—লৌহ কি গো
পারে এড়াইতে চুম্বকের আকর্ষণ?

(গীত)

সখীগণ।

প্র-সখী। এস দিতি-সুতা-মানস-সরসী-শোভন
বিকশিত পঙ্কজ হে!

দ্বি-সখী। এস দনুজ-কমলা কম্বু গল-লম্বিত
উজর মণিহার হে!

তৃ-সখী। এস ঐন্দ্রিলা-মুখ-কমল-মকরন্দ-লোভী
মত্ত মধুকর হে!

সকলে। প্রেমময়! তুমি আসিবে বলিয়া
সখী হৃদয়-আসন রেখেছে পাতিয়া
হৃদয়ে এস হে হৃদয়রাজ!
নয়ন ভরিয়া দেখিব আমরা
তোমারি মোহন সাজ।

বৃত্র। যাদুকরি! বুঝিতে না পারি কি মাধুরী
ক্ষরে ওই মদির-নয়নে তোর! মম
চিত্ত-মধুকর আবেশে বিভোর চাহে
শুধু সে মাধুরী করিবারে পান।

ঐন্দ্রিলা। নাথ!
যত কহ সবি অনুগ্রহ তব। তুমি
ত্রিদিব-ঈশ্বর—আমি সামান্যা দানবী!
দেবতা-দুর্লভ তব কান্তি মনোহর—
মরত-সম্ভবা আমি! তুমি বীরাগ্রণী—
আমি নহি দাসী-যোগ্যা তব! তুমি কত
উচ্চ—স্বতন্ত্র—উন্নত—আমার উচ্চতা
শুধু তব পদাশ্রিতা ব'লে!

বৃত্র। আদরিণি!
তুমি যে গো দৈত্যরাজ-হৃদয়ের শক্তি-
স্বরূপিণী, এই যে দক্ষিণ কর মম
অপ্রমেয় শক্তির ভাণ্ডার, যে শক্তির
কণামাত্র হইয়া বিকাশ প্রেরিয়াছে
বাসবেরে কুমেরু-শিখরে, দেবগণে
পাঠায়েছে পাতালের অন্ধতম পুরে।
এই যে দক্ষিণ কর মম, যার বলে
দৈত্যরাজ-অমরা অধিপ, শুধু প্রিয়ে!
তব মহাশক্তি-বলে আছে বলীয়ান্! তুমি
মম শান্তি-বিধায়িনী তুমি দনুজের
বিজয়-দায়িনী!

ঐন্দ্রিলা। নাথ! দাসী আমি তব।
অযোগ্যা হ'লেও নিজগুণে দেছ স্থান
চরণ-সরোজে তব—সৌভাগ্যের তব
অংশভাক্ করিয়াছ মোরে—তোমার
গৌরবে বৃদ্ধি হয় গৌরব আমার,
আমার প্রভুত্ব তব প্রভুত্বের ক্ষুদ্র
নিদর্শনমাত্র শুধু; শশধর যথা
মার্ত্তণ্ডের গৌরবের ছায়ামাত্র লয়ে
দীপ্তিমান্ করে আপনারে। তাই সখা!
দ্বিধা নাহি করি প্রকাশিতে তব পাশে
হৃদে মম যেই সাধ জাগে যেইক্ষণ।
হৃদয়-রঞ্জন! তুমিও তুষিতে মোরে
প্রাণপণে সাধ মম করহ পূরণ।

বৃত্র। অয়ি দৈতরাজ-ভাগ্যলক্ষ্মি! যার আজ্ঞা-
পালনের তরে সুরেন্দ্র-বিজয়ী বৃত্র
নত-শিরে অপেক্ষিছে নিরন্তর, যার
কটাক্ষ-ঈক্ষণে অকালে প্রলয় পারে
সংসাধিতে দৈত্যপতি, তার সাধ—তার
আশা—রহিবে অপূর্ণ!

ঐন্দ্রিলা। সত্য প্রাণেশ্বর!
ঐন্দ্রিলার কোন সাধ নাহিক অপূর্ণ
দৈত্যরাজ-করে। কিন্তু জীবের প্রকৃতি—
যবে তৃপ্ত হয় আশা, নাহি হয় সেই

ক্ষণে নির্ব্বাণ তাহার, বরং দ্বিগুণ তেজে
জ্ব'লে উঠে আশা-হুতাশন পরিতৃপ্ত
ঘৃত-সেকে।

বৃত্র। হৃদয়-ঈশ্বরি! সাধ তব
হ'ক নাক' যত অসম্ভব—দৈত্যরাজ
কভু নাহি অপূর্ণ রাখিবে তাহা। শুন
রাজরাজ্যেশ্বরি! অন্যজনে অতিমাত্র
দুষ্কর যে কাজ, বৃত্রের নিকটে তাহা
নিতান্ত সহজ। অন্যজনে দূর হ'তে
ত্যাগ করে যাহা অসম্ভব বলি, বৃত্র
তাহা অনায়াসে করিবে সাধন। কহ
দেবি! অকপটে হৃদয় তোমার।

ঐন্দ্রিলা। দেব!
শঙ্কা হয় প্রাণে, তুমি পাছে ভাব মনে
দাম্ভিকা ঐন্দ্রিলা, কিন্তু নাথ! উচ্চ আশা
হৃদে যদি করি হে পোষণ; থাকে যদি
ঐন্দ্রিলার হৃদে অসম্ভব সাধ কিছু;
সে ত' জীবিত- বল্লভ শুধু তোমা লাগি।
দানবী ঐন্দ্রিলা নহে কিছু প্রিয়তম!
সামান্যা রমণী—বাসব-বিজয় বৃত্র,
অমরা-ঈশ্বর,—তাহার হৃদয়-মণি।

বৃত্র। প্রিয়তমে! ঐন্দ্রিলার বুকে যদি নাহি
রবে উচ্চ আশা, তবে কা'র হৃদে রবে?
চিত্ররথ-গন্ধর্ব্ব-তনয়া—দৈত্যরাজ-
জায়া—ছায়া তার করিবে লঙ্ঘন, সাধ্য
আছে কার ত্রিজগতে?

ঐন্দ্রিলা। হৃদয়-ঈশ্বর!
এত দিন সেই ধারণাতে ছিনু উচ্চ-
শির—গর্ব্বভরে ফেলিতাম পদযুগ
মেদিনীর বুকে—আজি সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়ে
গেছে! গল্পচ্ছলে সুধিনু রতিরে
আজি, বাসব-জায়ার কথা—কেমন যে,
সৌন্দর্য্য তাহার, আচার-ব্যভার কোন্-
মত?—শুনি সেই কথা, হাসিতে হাসিতে
কহে অনঙ্গরঙ্গিণী—কি কব লো দেবি!
শচীর রূপের কথা তোমার সকাশে।
যদি কোটি মুখ থাকিত আমার, কোটি
যুগ ধরি যদি পারিতাম বাখানিতে,
সাধ্য নাহি ছিল বর্ণিতে লো! পুলোমজা-
রূপের কাহিনী। আর গুণরাজি তার
অতিক্রমে রূপের গরিমা। প্রাণেশ্বর!
শুনি রতির কাহিনী, দামিনী খেলিয়া
গেল হৃদয়ে আমার, ভাবিলাম—বৃথা
মম রূপগর্ব্ব, বৃথা ঐশ্বর্য্যগরিমা,
বৃথা দৈত্যরাজ-জায়া আমি, যদি দাসী-
রূপে শচী আসি নাহি করে সেবা এই
চরণ-যুগল মম।

বৃত্র। ঐন্দ্রিলে! ঐন্দ্রিলে!
দৈত্যরাজ-হৃদয়-সর্ব্বস্বে! এই সাধ
উপযুক্ত তব।
ভাল! ইচ্ছা তব অতি
শীঘ্র করিব পূরণ। প্রতিজ্ঞা আমার—
কালি দিনমণি না হইতে অবসান,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে অথবা পাতালে, ভূধরের
নিভৃত গুহায়, কিংবা বারিধির অম্বু-
রাশিতলে, ইন্দ্রাণী রহিবে যথা—তথা
হ'তে আনিব বাঁধিয়া তারে, উপহার
দিব তব পদে। কি ছার অমরবৃন্দ!
পতঙ্গের দল!—আপনি পুরারি যদি
শূল হাতে হন আগুয়ান, পরিত্রাণ
নাহি তাঁর। অলঙ্ঘ্য অটুট বৃত্র-আজ্ঞা।
দৈত্যরাণি! পরিতৃপ্তা এবে?

ঐন্দ্রিলা। প্রাণেশ্বর!
মম সমা ভাগ্যবতী কেবা এ জগতে?

(গীত)

ঐন্দ্রিলা

আমার সাধনা কামনা
আশার ছলনা
নাথ হে! সকলি তুমি।
তুমি সখা!
মম পূর্ণ জাগরণ,
তুমি হে,
আমার আধ-বিস্মরণ,
তুমি পরিতৃপ্তি,
তুমি হে সুষুপ্তি,
আশার মাঝারে আধ-মুকুলিত
আশার অঙ্কুর তুমি।

তোমার ছায়াটি
কল্পনার বলে,
হৃদয়ের পটে, যখন হে আঁকি—
সে মূরতি দেখি,
অযুত বাসনা হৃদয়ে উঠে হে ফুটি
শুন হে দাসীর করুণ মিনতি
জীবনে মরণে, রাখিও চরণে হৃদয়-সর্ব্বস্ব তুমি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—ঃ০ঃ—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

—০—

দৃশ্য—রাজসভা।

বৃত্র, মন্ত্রী, বসন্তক ও সভাসদ্গণ।

বৃত্র। মন্ত্রিবর! এতদিনে সিদ্ধ মনস্কাম
মোর। অরাতি বিজিত—লুক্কায়িত কোন্
দেশে সিংহ-বিতাড়িত ফেরুপাল সম,
নির্ণয় নাহিক তার—দৈত্যরাজ বৃত্র
অধিষ্ঠিত অমরার রাজ-সিংহাসনে।

মন্ত্রী। দৈত্যরাজ! সাধনায় সিদ্ধি, প্রকৃতির
দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম! অদ্ভুত সাধনা তব,
পরাক্রম অপ্রমেয়, তাই ভাগ্যলক্ষ্মী
বিতরেন স্থিরকৃপা তোমার উপরে।

বৃত্র। কিন্তু মন্ত্রী! জয়ের যে কি মাদকতা!—
কি মোহিনী শক্তি!—পরিতৃপ্তি নাহি তার।
সিন্ধু যথা লভিয়া জনম পর্ব্বতের অতি
নিভৃত প্রদেশে, ক্ষুদ্র প্রস্রবণ হ'তে,
তর তর ধায় ক্ষুদ্র গিরিনদীরূপে,
ক্ষীণকণ্ঠে গাহিতে গাহিতে হৃদয়ের
ক্ষুদ্র গান; কে জানে তাহার বক্ষোদেশে
রয়েছে নিহিত মহাশক্তি এক—এক
অনন্ত প্রসার! সেইরূপ জেন মন্ত্রী
হীনজন্মা হ'লেও বাসনা হৃদয়ের
মাঝে থাকে লুক্কায়িত বিশ্বব্যাপী
কার্য্যরূপা মূলশক্তি।
ভাল কথা মন্ত্রী!
জান কি সন্ধান—পলায়িত দেবগণ
কোন্ জন কোথা করে বাস? শুনিয়াছি
ইন্দ্র আছে কুমেরু-শিখরে তপস্যায়
মগ্ন। ইন্দ্রাণী কোথায় এবে?

মন্ত্রী। শুনিয়াছি
চর-মুখে দেব! মর্ত্ত্যে আছে তপোবন
এক অতি মনোহর, নৈমিষ-কানন
নাম, সেথায় বাসব-বাঞ্ছা না কি একা
যাপিছেন কাল।

বৃত্র। শুন মন্ত্রী! এই দণ্ডে
পাঠাও দূষণে, পঞ্চশত দৈত্য-যোধ
সহ, কহ রাজ-আজ্ঞা—আজি নিশানাথ
না হ'তে উদয় ইন্দ্র-ললনারে বাঁধি
লয়ে আসে যেন আমার সকাশে।

মন্ত্রী। দেব!
শূরত্বের তুমি যথা অতুল্য বিকাশ,
জ্ঞান তব অনুরূপ তার, দৈত্যগুরু
শুক্র তব পরামর্শদাতা—হে রাজন্!
ক্ষমা কর বৃদ্ধত্বের প্রগল্ভতা—হেন
অযৌক্তিক কার্য্য তোমারে সাজে না কভু।
প্রথমতঃ, যদিও সহস্র দোষে দোষী
হয় নারী, পুরুষের কার্য্য নহে তার
প্রতি শাস্তির বিধান, তুমি লোকপাল—
দুর্ব্বলের বল তুমি—তোমারে কি সাজে
বীর! এই তস্করের কাজ—এই অত্যাচার
আশ্রয়-বিহীনা দীনা ললনার প'রে?
আরো দেখ—দেববলে বলী তুমি, তব
আরাধ্য দেবতা অনাদি স্বয়ম্ভু শম্ভু
শক্তিধ্যানে রয়েছেন নিমগন—হেন
প্রকৃতিরে যদি দর্প-অন্ধ হয়ে তুমি
কর অপমান, রুষিবেন শিব। তিনি
রুষ্ট হ'লে অনিষ্ট তোমার পদে পদে।

বৃত্র। হে মন্ত্রিন্! বাতুল হয়েছ তুমি। সত্য
বটে দৈববলে বলীয়ান্ আমি, কিন্তু
জেন—দৈবশক্তি উন্নতি-মার্গের পন্থা
মাত্র শুধু। সাধনা হইলে সিদ্ধ, যাক্
পন্থা ধ্বংস হয়ে, বর্ত্তমান অতীতের
মাঝখানে রাখি ব্যবধান কোটি কোটি
যোজন বিস্তৃত, ক্ষতি তাহে কিবা বল?

উঠিয়াছি উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে ;
এবে বাম-পদাঘাতে নিক্ষেপিতে পারি
দূরে অনায়াসে অতি তুচ্ছ অতি জীর্ণ
নিমিত্ত-স্বরূপ এই নগণ্য সোপান।

মন্ত্রী। দৈত্যরাজ! জড় মোরা পুত্তলিকা প্রায়
হস্তধৃত রজ্জুখণ্ড ধরি, যেই মত
বলিবে চলিতে, রয়েছি প্রস্তুত সদা।
কিন্তু বীর! এই পক্ককেশরাশি মম
অনেক যুগের অতীত স্মৃতির ক্ষুদ্র
পরিচয়রূপে রহিয়াছে শিরে—তাই
দৈত্যকুলদিনকর! অন্তর কাঁপিছে
এই কল্পনার পরিণাম ভাবি মনে।
আর এক বিষম ভাবনা—শুনিলাম
নগর-রক্ষক-মুখে, কালি নিশাকালে
প্রহরী সকলে দেখিয়াছে অমরার
চারিধারে, অলৌকিক এক প্রতিভার
পরকাশ। আমার ধারণা—দেবগণ
নববলে হয়ে বলীয়ান্, পুনরায়
আসিয়াছে স্বর্গরাজ্য উদ্ধারের তরে।

বৃত্র। মন্ত্রী! এই কথা দৈত্যরাজ নিজ চক্ষে
দেখিলেও করে না বিশ্বাস। যত দিন
দেব-দেহে রহিবে ত্রিশূল-অঙ্ক, তত
দিন তারা কভু নাহি ফিরিবে ত্রিদিবে।
বোধ হয় প্রহরী সকল অতিরিক্ত
সুরাপান করি, লুপ্তসংজ্ঞ হয়ে, কিংবা
তন্দ্রাবেশে হেরি নভে কোন জ্যোতিষ্কের
আবির্ভাব, ভাবিয়াছে বুঝি বা আসিল
ফিরে ত্রিদশ-সকল।

অসম্ভব মন্ত্রী!
নিতান্তই অসম্ভব—প্রলাপ-বচন!
পরাজিত দেবগণ শক্তিহীন এবে—
ছিন্নহস্ত ছিন্নপদ কেহ—শূলাঘাতে
কাহারো বা হইয়াছে চেতনা বিলোপ।
বিশেষতঃ, পুরন্দর রয়েছে লুকায়ে
কুমেরু-পর্ব্বতে, দেবগণ কি সাহসে
হবে অগ্রসর স্বর্গরাজ্য উদ্ধারিতে?
আর সত্য যদি হয় এ কাহিনী মন্ত্রী!
ভয় কিবা তাতে? সে ত' আনন্দের কথা।
রণাঙ্গন বিলাস-কানন মম—যুদ্ধ
তৃপ্তি—যুদ্ধ জাগরণ।

মন্ত্রী! নাহি আর
কার্য্য-বিচারণা—নাহি কাজ কল্পনার
বলে আঁকি সহস্র বিপদ-ছবি ভিত্তি-
শূন্য শঙ্কার উদ্রেক—কিংবা অনর্থক
মস্তিষ্ক-পীড়ন। আজ্ঞা মম অবিলম্বে
করহ পালন। সভাসদ্‌গণ! সখে
বসন্তক! সভা ভঙ্গ আজিকার মত
নিজ নিজ স্থানে সবে করহ গমন।

[বসন্তক ও মন্ত্রী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বসন্তক। কি মন্ত্রী মশায়! আপনি যে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন?

মন্ত্রী। না—আমি আর এ রাজ্যের মঙ্গল দেখছি না। স্ত্রীলোকের প্রতি এত অত্যাচার। তাতে আবার ইন্দ্র-পত্নী।

বসন্তক। আপনি তো শণের নুড়ী-ভরা মাথা চাল্‌তে চাল্‌তে, চাণক্য চার্ব্বাক্ প্রভৃতি কত মহা মহা নীতিশাস্ত্রকারের অনেক শোলোক-টোলোক আওড়ালেন, তাতে ত' কোনই ফল হ'ল না।

মন্ত্রী। শাস্ত্রকারেরাই ব'লে গেছেন—"আয়ুহীন ব্যক্তি বন্ধুবাক্য গ্রহণ করে না।"

বসন্তক। আপনার ও অনুস্বর-বিসর্গের টঙ্কারে কিছু হচ্ছে না। ঝুলিতে যদি এক আধটা ব্রহ্ম-শির পাশুপত থাকে, তাই ঝেড়ে ঝুড়ে দেখুন। এ যে ডাইনী ভর করেছে, তা'তে ধূলো পড়া সর্ষে পড়ার কর্ম্ম নয়।

মন্ত্রী। আপনি কা'র কথা বল্‌ছেন? রাণী-মার কথা বুঝি?

বসন্তক। তাই হবে বুঝি! যা হ'ক, বুদ্ধিকে বলিহারি যাই! আপনারাই না রাজ্যের উন্নতি-স্থিতি-বিস্তার সম্বন্ধে পুথি লিখে গাদা গাদা ভূর্জ্জপত্রের শ্রাদ্ধ করেন? এই সাদা কথাটা বুঝতে এত দেরী লাগে! এ সব—রাণী-ঠাক্‌রুণের সখ—তা হবেই ত'—সময় হয়ে এসেছে!

মন্ত্রী। ঐ রাণীপিশাচীই রাজ্যটাকে ছারেখারে দেবে। যাক্—ভেবে আর কি করি—যত দিন বেঁচে আছি, হুকুম তামিল করি—আপনি

একটু দেখবেন ; যদি রাজার মতটা ঘোরাতে পারেন।

বসন্তক। হুঁ !—"বড় বড় হাতী গেলেন তল, এখন গাধা বলবেন কত জল" -ও মত ফেরবার নয় —ও মরদ্‌কা বাৎ।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

বসন্তক। ভেবেছিলুম যে মারামারি কাটাকাটির হাঙ্গামাটা চুকে গেল ; এখন দিনকয়েক পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে আয়েস করা যাবে। তার সুদে আসলে উস্থল হবার যোগাড় ! সে ডাইনী বেটী যখন মতলব করেছে, তখন রাজার মাথা কাটা গেলেও মত ফিরছে না—আমাদের ভাবনা মিছে—এখন যা করেন বিধাতা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

—০—

দৃশ্য—কুমেরু-শিখর।

শিরোপরি আসীনা নিয়তি ও অদৃষ্টবালাগণ, পর্ব্বতের পাদমূলে ইন্দ্র।

(গীত)

অদৃষ্ট-বালাগণ।

নিয়তি-সঙ্গিনী মোরা লো রঙ্গিণি !
নিয়তি-আদেশে ফিরি।
নিয়তি-আদেশে মরুভূ-প্রদেশে
ছুটাই শান্তির বারি।

ইন্দ্র। পাষাণ-হৃদয়া মাতঃ! করুণার লেশ-
মাত্র নাহি কি গো হৃদয়ে তোমার ? কত
দিন, কত মাস, কত সুদীর্ঘ বরষ,
কত যুগ-যুগান্তর, অবহেলে দিনু,
কাটাইয়া অনাহারে অনিদ্রায়—এই
ক্ষুদ্র হৃদয়-মাঝারে, ভক্তি প্রেম যাহা
কিছু ছিল পুষ্পাঞ্জলি দিনু তব পদে—
তবু দয়া হ'ল না তোমার !

অদৃষ্ট-বালাগণ। (গীত)

ওই যে শোভিছে সুধা-সরোবর
ফুটিয়াছে যাহে কমল-নিকর,
শুন মর্ত্ত্যজীব ! শুন হে অমর !
"অতীতের" সর উহার নাম।

ইন্দ্র। দেখ মাতঃ !
বাসবের এর চেয়ে কি দুর্দ্দশা হবে ?
ইন্দ্র-পত্নী তস্কর-রমণী সম আছে
লুকাইয়া নৈমিষ-কাননে, প্রাণাধিক
জয়ন্ত কুমার শচীর হৃদয়ানন্দ,
নিরানন্দ করে বাস পাতাল-পুরীতে।
দেবরাজ ইন্দ্র নহে শুধু সিংহাসন-
চ্যুত !—বিতাড়িত অমরা হইতে। কেন
মাতা ! দেবতা সৃজিলে, অমরত্ব তীক্ষ্ণ
কালকূট কেন না অর্পিলে তাহাদের ?

অদৃষ্টবালাগণ। (গীত)

তারি পাশে দেখ শোভন আরাম'
নয়ন-রঞ্জন "বর্ত্তমান" নাম
সেথা কল্পনার গাছে ফুটিয়ে রয়েছে
অযুত অতৃপ্ত বাসনা-কুসুম।

ইন্দ্র। মা গো ! আজ দিবা হ'ল অবসান ; ওই
দেখ সন্ধ্যা-রাণী হেম-বাসে আবরিয়া
তনু, শোভন সীমন্তে পরি সিন্দূরের
টিপ, উপনীতা পশ্চিম আশার দ্বারে।
হের ওই পশ্চাতে তাহার অন্তহীন
অন্ধকার আসিতেছে বাহু পসারিয়া
আলিঙ্গন করিতে তাহারে ; অরুণিমা
উঠেছে ফুটিয়া সাঁজের রক্তিম গণ্ডে,
সলাজ সকম্প দৃষ্টি, আলুথালু বেশ,
বেপমান অধরের নীরব কম্পন,
ওই দেখ অন্ধকারে ছাইল গগন !
কত কাল আর সহিব জননি ! এই
দুর্ব্বিষহ দাসত্বের জ্বালা ? যত দিন
তুষ্ট নাহি হও তুমি তপস্যায় দেবি !
তত দিন ত্যজিব না কুমেরু-শিখর।
প্রায়োপবেশনে মাতঃ ! কিংবা অনিদ্রায়
অবিনাশী দেব-দেহ করিব বিলয়।

অদৃষ্ট-বালাগণ। (গীত)
চারিধারে তার সোনালি মেঘের
সোনালি ঝালর দোলে ঝলমল,
আড়ালে তাহার স্বপনের দেশ
"ভবিষ্যৎ" নাম রয়েছে ঘিরি।
[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

—০—

দৃশ্য—নৈমিষ-কাননের প্রান্তদেশ।
দুই জন দৈত্য।

প্র-দৈ। পৃথিবীতে যতগুলো বন ছিল, সব তো উলট্‌পালট্ ক'রে খোঁজা গেল। কই, শচীর তো কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না!

দ্বি-দৈ। আরে, তুইও যেমন! তাকে কি আর পৃথিবীতে রেখেছে? দেবতাব্যাটারা সিন্দুকের ভেতরে পুরে পাতালের কোন অন্ধকূপের ভেতর লুকিয়ে রেখেছে।

প্র-দৈ। আর আমাদের রাজা ব্যাটারই বা কি বেয়াড়া সখ; মেনকা, রম্ভা, উর্ব্বশী প্রভৃতি চাঁদ-পানা মেয়েমানুষ থাক্‌তে আন শচীকে।

দ্বি-দৈ। চল্—আর ঘুর্‌তে পারা যায় না। ফিরে গিয়ে সেনাপতি ব্যাটাকে বলা যাক্ যে, তন্ন তন্ন ক'রে আমরা সমস্ত বন খুঁজেছি, কিন্তু তার কিছুই সন্ধান করতে পারলুম না।

প্র-দৈ। আরে, তা বল্লে কি আর নিস্তার আছে? রাজার হুকুম—"যে, আজ সন্ধ্যের আগে তাকে খুঁজে বের কর্ত্তেই হবে"—তা না হ'লে, সেনা-পতি মশায়ের তো জান্ বাচ্ছা এক খাদে গাড়বেই—আর আমাদেরও যে বড় রেহাই দেবে,তা সম্ভব নয়।

দ্বি-দৈ। এ যে বিষম মুস্কিল!—'জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ।" আর ঘুরতে ঘুরতে ক্রমে বেলাও ত' বেড়ে উঠলো।

প্র-দৈ। চল দাদা! কি করা যায়—ভগবান্ পা দিয়েছেন, তার সদ্ব্যবহার তো চাই।

দ্বি-দৈ। এখন যাওয়া যায় কোন্ দিকে?

প্র-দৈ। যে দিকে দু' চক্ষু যায়।

দ্বি-দৈ। চল দাদা!—তাই চল।
[প্রস্থান।

(ঋষিকুমারদ্বয়ের প্রবেশ)
(দ্বৈতগীত)

প্রথম ঋ-কু। দেখি দেখি দেখি শেফালিবালা!
আজ ফুলের বসনে সেজেছ ভাল।

দ্বিতীয় ঋ-কু। ফুলের বালায়, ফুলের মালায়,
ফুল-মেখলায় আজ হয়েছে আলো।

উভয়ে। ফোটা ফোটা ফুল দাও উপহার,
প্রকৃতি দিবে গো পূজা-উপচার।

প্রথম ঋ-কু। শ্যাম দূর্ব্বাদলে,
জাহ্নবীর জলে,

উভয়ে। ইন্দ্র-রামা আজি পূজিবে শঙ্কর।

প্র। আজ দেখেছিস্ ভাই, প্রকৃতি-দেবী যেন মুক্ত-হস্ত। গাছে গাছে কত ফুল—ফুলের ভারে ডাল নুয়ে পড়েছে।

দ্বি। কেন হবে না ভাই? শচীদেবী শিবপূজা কর-বেন; শঙ্কর তুষ্ট হ'লে, স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার হবে—এতে কার না আনন্দ হয়?

প্র। হ্যাঁ ভাই! বামদেব দেবতাদের প্রতি এত বাম কেন?

দ্বি। তিনি যে ভাই! ভোলানাথ; তাঁর আত্মপর বিচার নাই। তাঁকে তপস্যায় তুষ্ট কর্‌লে, তিনি শত্রুকেও স্পর্দ্ধিত করতে পরাঙ্মুখ হন না।

প্র। তুই ভাই অনেক ফুল তুলেছিস্। আমি অত তুল্‌তে পারি নি।

দ্বি। তুই যে ভাই তেমনি আমার দুনো বিল্বিপত্তর তুলেছিস্।

(নেপথ্যে "হর হর শঙ্কর"
"জয় দৈত্যরাজের জয়।")

প্র। ওরে ভাই, এ তো দেখছি দৈত্যদের জয়-ধ্বনি। শচীদেবী আমাদের আশ্রমে আছেন—দুরাচার দৈত্যরাজ বোধ হয় তাঁর সন্ধান পেয়ে, তাঁকে ধরবার জন্যে দৈত্যসেনা পাঠিয়েছে।

দ্বি। আমরাও ফুল তুলতে তুলতে আশ্রম থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি। চল ভাই, এক ছুটে গিয়ে আশ্রমে খবর দি। [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—নৈমিষকাননের তপোবনস্থ কুটীরসম্মুখ।

শচী ও চপলা।

চপলা। সুরেশ্বরি! কতদিন আর অনাহারে
অনিদ্রায় কাটাবে লো কাল? নবনীত-
সুকোমল দেহে তব উছলিত সখি!
লাবণ্যের রাশি, যার কণামাত্র ল'য়ে,
আমি ক্ষণপ্রভা প্রতিভার উজ্জ্বল
ছটায় চমৎকৃত করিতাম মর্ত্ত্যবাসী
জীবগণে—এবে জীর্ণা শীর্ণা পাংশুজালে
আচ্ছাদিত বহ্নিসম হয়েছি মলিনা।

শচী। সখি! নিতান্তই অভাগিনী আমি, নহে
হ'য়ে অমরার অধীশ্বরী, এ দুর্দ্দশা মোর!
পতি মম শতমখ—কোদণ্ড-টঙ্কারে
যাঁর কাঁপে ত্রিভুবন, এবে দৈত্যভয়ে
লুক্কায়িত সুমেরু-শিখরে। সহচরি!
স্মরিলে পূর্ব্বের কথা বুক ফেটে যায়।
প্রাণ হ'তে প্রিয়তম জয়ন্তকুমার—
ফুল্ল-অরবিন্দ সম বদনমণ্ডল
তার, এবে হইয়াছে শরকিণাঙ্কিত।
অকলঙ্ক পূর্ণিমার শশধর হায়!
বিষাদ-কালিমা ঢাকা—মার প্রাণে আর
কত সবে বল?

চপলা। বাসব-বাসনা! ধৈর্য্য
বল বিপদের কালে। নহ দেবি! তুমি
সামান্যা রমণী—পুরন্দর-অঙ্কলক্ষ্মী—
তুমি যদি একেবারে হও লো বিহ্বলা,
কি করিবে দেববালাগণ? তারা শুধু
নিরখিয়া তোমারি মুখের পানে, শুধু
তোমারি সাহসে, আশায় বাঁধিয়া বুক,
যাপিতেছে কাল।

শচী। হা অদৃষ্ট!—ভাগ্যহীনা
আমিই স্বজনি! দেববালাগণ, দেহ
তাহাদের শিরীষ-কুসুম সম, তারা
কি সহিতে পারে এত ক্লেশ সহচরি?
তারা আমারি অদৃষ্টদোষে ভুঞ্জিতেছে
ক্লেশ। স্মরিলে তাদের বিষণ্ণ বদন,
সহস্র বৃশ্চিকে দংশে হৃদয় আমার।

চপলা। রাজেন্দ্রাণি! মূর্ত্তিমতী করুণারূপিণী
তুমি। ভাগ্যহীনা তুমি!—তিন লোকমধ্যে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবলোক, জরা-মৃত্যু-ভয়
যথা নাহি পায় স্থান, যথা প্রতি গৃহ
পূর্ণ থাকে নিরন্তর মন্দার-সৌরভে,
যথা কলকণ্ঠী অপ্সরার বিমোহন
গীতি, সাহানার মুগ্ধ তানে, জাগাইয়ে
দেয় শত আশা ত্রিদশ-হৃদয়ে, হেন
অমরার অধীশ্বরী তুমি।

শচী। হায় সখি!
দুর্ব্বৃত্ত দানব ভেঙ্গে দেছে জনমের
মত সেই খেলাধূলা। এতে অতীতের
স্মৃতি, কোটি ফণা বিস্তারিয়া, জর্জ্জরিত
করিতেছে ভীষণ দংশনে।

চপলা। ভাবিও না
নৃপবালা! এ দুর্দ্দিন কভু নাহি রবে
চিরকাল। শঙ্করের বরদৃপ্ত দুষ্ট
দৈত্য অমরের করিয়াছে অপমান;
ভোলানাথ হইলে বিমুখ বুদ্বুদের
প্রায় মিশে যাবে দুর্বৃত্ত দানব, অনন্ত
প্রলয়-গর্ভে। পুনরায় অমরের
আসিবে সুদিন। পুরন্দর করিছেন
কঠোর তপস্যা, সুমেরু-শিখরে। সখি!
আশুতোষ অবশ্য হইবে তুষ্ট তাঁর
তপস্যায়; দেবের দুর্দ্দশা অবশ্যই
ঘুচাবেন দেবদেব।
হের দেবি! ওই
আসিছে অনঙ্গ—বোধ হয়, আছে কিছু
সুসংবাদ।

(মদনের প্রবেশ)

মদন। নমি পদে ত্রিদিব-ঈশ্বরি!
চপলে! আছ ত' ভাল?

চপলা। হে মীন-কেতন!
দৈত্যের দাসত্ব করিয়াছে বুদ্ধিলোপ
নিশ্চয় তোমার। তা' না হ'লে কোন্ মুখে
জিজ্ঞাসিছ মার! মোদের কুশল-বার্ত্তা?
অমরা-ঈশ্বরী—বিতাড়িত স্বর্গরাজ্য
হ'তে! দেববালাগণ—আছে লুকাইয়ে
পর্ব্বতের গভীর গুহায় কেহ, কেহ
বিজন বিপিনে বহুদূরে লোকালয়

হ'তে, সদা বিকম্পিত হৃদয় তরাসে,
ওই বুঝি এল পাপ দৈত্যরাজ-চর!
প্রদ্যুম্ন! তুমি ত' রয়েছ সুখে দৈত্যরাজ-
আজ্ঞাবহ হ'য়ে? ভাল আছে কামপ্রিয়া
অনঙ্গ-মোহিনী? দৈত্যজায়া সন্তুষ্ট ত'
অঙ্গরাগে তার? সুচিকণ মন্দারের
হার গাঁথি সযতনে সাজায়ে দিতেছে
রতি ঐন্দ্রিলার কম্বুগ্রীবা?

শচী। ক্ষণপ্রভা!
কেন মিথ্যা লজ্জা দাও মদনেরে? দোষ
কিবা তার—মন্মথের মরমে মরমে
বিজড়িত নন্দনের স্মৃতি, সহজে কি
পারে তারে উপাড়িতে? যেখানে নন্দন—
সেই স্বর্গ প্রদ্যুম্নের কাছে
বিস্মরণ হও চপলার কথা; কহ,
কি কারণে স্বর্গ ত্যজি আসিলে ধরায়;
কোথা এবে দেবতা-মণ্ডলী; দেবরাজ
কোথা; কোথা আছে জয়ন্ত কুমার?

মদন। দেবি!
দেব-অনীকিনী ঘিরিয়াছে স্বর্গরাজ্য,
উদ্ধারিতে দৈত্যরাজ-কর হ'তে; আছে
তথা জয়ন্ত কুমার, দেবরাজ রয়েছেন
কুমেরু-শিখরে মগ্ন সুকঠোর তপে।
দেবি! আমি আসিয়াছি মনোরথ-গতি
এক অতি ভীষণ সংবাদ ল'য়ে।

শচী। কহ
মার! ত্বরা করি, অভাগিনী কত আর,
কত আর সহিবে যন্ত্রণা? এখন' কি
পূর্ণ হয় নাই বিপদের ভার?
ভাল রহিয়াছি পাষাণে বাঁধিয়া বুক।
কহ পঞ্চশর! কি নব বিপদ পুনঃ?

মদন। সুরেশ্বরি! গত নিশাকালে পাপীয়সী
দানবী ঐন্দ্রিলা মদিরা-উন্মত্ত দৈত্য-
পশু-কর্ণে ঢালিল যে কত কালকূট,
বহুযত্নে হৃদয়ে সে যতনে পুষিত
যাহা, বিলোল কটাক্ষে বিঘূর্ণিত করি
দুরাচার দৈত্যের মস্তক ধীরে ধীরে
কহিল সম্ভাষি তারে—"দৈত্যরাজ! তুমি
বাসব-বিজয়ী, আমি অঙ্কলক্ষ্মী তব;
পরাজিত ইন্দ্রজায়া যদি না করিল
পদসেবা মোর, তবে কিবা ফল বল
লভি অমরার সিংহাসন?"—শুনি সেই
পিশাচীর কথা দৈত্যপশু হুঙ্কারিয়া
উঠিল অমনি। করিল প্রতিজ্ঞা আজি
সূর্য্যাস্তের আগে আপনারে ল'য়ে যাবে
স্বর্গপুরে ঐন্দ্রিলা-সেবার তরে। রতি
আসি অতি ত্রস্তে জানাইল মোরে এই
দুর্ব্বিসহ কথা। আমি আসিলাম মাগো!
জানাতে বারতা ওই রাজীব-চরণে।

শচী। পঞ্চশর! জানিতাম শায়ক তোমার
কুসুম-কোমল; অভাগিনী শচী-ভাগ্যে
হইল তা' কঠোর কলিশ সম।
সখি!
হ'য়ে অমরা-ঈশ্বরী, দৈত্য-অঙ্গনার
দাসী-বৃত্তি কেমনে করিব? কেমনে বা
ঐন্দ্রিলার পদযুগ করিব রঞ্জিত
বল অলক্তক-রাগে? কেমনে বিনায়ে
দিব কুন্তল তাহার? কণ্ঠে দোলাইয়ে
দিব পারিজাত-মালা? পরাইয়ে দিব
হাতে কনক-কেয়ূর, নিতম্বে রতন-
কাঞ্চী?

মদন। দেবি! চিন্তা নাহি কর। অমরের
ধমনীতে বিন্দুমাত্র শোণিত থাকিতে কভু
নাহি দৈত্য-পশু পারিবে স্পর্শিতে ছায়া
মাত্র তব। সুরেশ্বরি! রহ সাবধানে.
আমি অবিলম্বে উপস্থিত হ'য়ে স্বর্গে,
দেবগণ-পাশে নিবেদিব সকল বারতা।
এবে প্রণাম চরণে!

শচী। হে প্রদ্যুম্ন! যাও
তুমি সত্বর-গমনে জয়ন্ত-সকাশে। কহ
তারে প্রকাশিয়া সমস্ত ঘটনা। ব'ল
তারে—এখনি যেন সে আয়ুধ-দ্বিতীয় সহ
দেখা করে মোর সনে।

মদন। যথা আজ্ঞা দেবি!

[মদনের প্রস্থান।

(ঋষি-কুমারদ্বয়ের প্রবেশ)

প্র ঋ—কু। সুরেশ্বরি! আমরা আপনার পূজার জন্য ফুল তুল্‌তে তুল্‌তে অন্য-মনে আশ্রম থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছিলুম।

দ্বি ঋ—কু। সেখানে ফুল যে মা ফুটেছে! যেন প্রকৃতি-রাণী, কি উৎসবের জন্য, ভাল ভাল ফুলের গহনা প'রে সেজে গুজে ব'সে আছেন।

প্র ঋ—কু। আমি একটি ডাল নুইয়ে, ফুল তুলে সাজি ভ'রৃছি, এমন সময় কিছু দূরে একটা কোলাহল শুন্‌তে পেলুম।

দ্বি ঋ—কু। ক্রমে সেই ধ্বনি কাছে আস্‌তে লাগল। তার পরে যখন খুব কাছে এল, স্পষ্ট শুন্‌তে পেলুম যে, সে দৈত্য-সৈন্যদিগের জয়ধ্বনি।

প্র ঋ—কু। মা! পাষণ্ড দৈত্যরাজ বোধ হয় সংবাদ পেয়েছে যে, আপনি আমাদের আশ্রমে আছেন। আপনাকে দেখ্‌তে পেলেই ত' মা! ধ'রে নিয়ে যাবে।

দ্বি ঋ—কু। আজ মা! তোমাকে একলা এ কুটীরে থাকৃতে দেব না। তুমি আমাদের কুটীরে চল, আমাদের কুটীর খুব বনের মাঝে; সেখানে থাক্‌লে আর দৈত্যসেনাগণ তোমার সন্ধান পাবে না।

প্র ঋ—কু। না মা! তুমি ওর কথা শুন' না। দৈত্যেরা যে দুরাচার, তারা সমস্ত বন তন্নতন্ন করে খুঁজে তোমায় বা'র করবে। তার চেয়ে আমরা সব ঋষি-বালকগণ একসঙ্গে গিয়ে গল-লগ্ন-বাসে দৈত্যরাজের কাছ থেকে আপনাকে ভিক্ষা নেব। আমাদের কাতরতা দেখ্‌লে দৈত্যরাজের পাষাণ হৃদয় নিশ্চয়ই দ্রব হবে। আমরা মা! তোমাকে কিছুতেই নিয়ে যেতে দিব না।

শচী। (স্বগত) আহা, মূর্ত্তিমান্ সরলতা! এরা ভাবছে যে, এদের কাতর ক্রন্দনে দুষ্ট দৈত্যরাজ তা'র সঙ্কল্প পরিত্যাগ করবে; কখনই নয়। আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়। বিপদ সম্মুখে—উপায় স্থির করা বিশেষ প্রয়োজন। অগ্রে ঋষিকুমারদিগকে নিজ নিজ কুটীরে পাঠাই। (প্রকাশ্যে) বৎসগণ! তোমাদের কোন ভয় নাই। দৈত্যগণ আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে আসে নি। তারা জয়োল্লাসে মত্ত হ'য়ে পৃথিবীতে বিচরণ করছে, তাই তাদের জয়ধ্বনি শুন্‌তে পেয়েছ। তোমরা ফুল টুল রেখে নিজ নিজ কুটীরে যাও; বেলা অনেক হয়েছে। তোমাদের জননীগণ তোমাদের বিলম্ব দেখে ব্যস্ত হয়েছেন!

প্র ঋ—কু। তোমার কথায় যাচ্ছি। কিন্তু দেখ মা! আমাদের ছেড়ে যেও না।

দ্বি ঋ—কু। তা' হলে কিন্তু মা! আমরা বড় কাঁদব।

শচী। না বাছা! তোমাদের ছেড়ে যাব না।

[ঋষি-কুমারদ্বয়ের প্রস্থান।

শচী। চপলা লো! কি হবে উপায়? একাকিনী
অসহায়া নারী, কেমনে উদ্ধার পাব
দুরাচার দৈত্যরাজ করে আজি? আর'
দেখ গুরুতর ভাবনার কথা—এই
তপোবন শান্তির আগার; নির্ব্বিবাদী
ঋষিগণ; অভাগিনী আমারে আশ্রয়
করি দান, ভুঞ্জিবে আশ্রম-পীড়া।

চপলা। দেবি!
এবে ভাবনার নাহি অবসর। দুষ্ট
দৈত্য-সৈন্যগণ মত্ত বিজয়-উল্লাসে,
এখনি পশিবে আসি আশ্রম-মাঝারে।
মম মতে যতক্ষণ নাহি আসে হেথা
জয়ন্ত কুমার, যোগবলে আহ্বানিয়া
মায়ারে সকাশে তব, করহ আদেশ
আশ্রমের চতুষ্পার্শ্বে করিতে সৃজন,
নানা-হিংস্র-জীব-শ্বাপদ-সঙ্কুল এক
প্রকাণ্ড অটবী। তুমি সাবধানে রহ,
আমি রব অরণ্যের কুটীর মাঝারে।
উপকণ্ঠে কুমারের প্রতীক্ষায়। আর
প্রয়োজন হ'লে, ধরি ভুবন-ভুলান
মোহিনী-মূরতী মোর ছলিব পাষণ্ড
দৈত্যে।

শচী। কর সখি! যে হয় বিহিত। আমি
যাই—বসি গিয়া শঙ্করে পূজিতে। আজি
বুক চিরি হৃদয়-শোণিত ঢালিব লো!
স্থাণুর চরণে। দেখি বিরূপাক্ষ আর
কতদিন থাকেন বিরূপ?

যাও সখি!
মায়া-সনে পরামর্শ করি, কর গিয়া
যে উপায়ে রক্ষা হয় অমরের মান।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

—•—

দৃশ্য—নৈমিষারণ্যের প্রান্তদেশ।

দূষণ ও দৈত্যগণ।

দূষণ। অগ্রসর হও সবে দৈত্য-সৈন্যগণ।
উড়াও গগনে অমরার অধীশ্বর
দৈত্যরাজ বিজয়-কেতন শঙ্করের
ত্রিশূল-অঙ্কিত। বীরদাপে কাঁপাইয়া
ধরিত্রীর বুক, গাও সবে তারস্বরে
দৈত্যের বিজয়-গীত।

দৈত্যগণ।
('হর হর শঙ্কর" জয় দৈত্যরাজের জয়")

দূষণ। হের শোভে ওই
নৈমিষ-কানন সুশোভিত মনোহর
তরুগুল্মে, চিত্রকর তুলিকা-প্রসূত
আলেখ্যের মত। শাণিত কৃপাণ করে,
খণ্ড খণ্ড কর তরুরাজি। লতাগুল্ম
ছিন্ন ভিন্ন করি, বিদলিয়া পদতলে,
নবরক্তে বনভূমি করহ রঞ্জিত।
বল সবে উচ্চৈঃস্বরে
"জয় দানবরাজের জয়"

দৈত্যবীরগণ।
বীরদর্পে পশ গিয়া তপোবন মাঝে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

—•—

দৃশ্য-মায়া-কানন।

চপলা ও মায়া।

চপলা। মায়া! অদ্ভুত নৈপুণ্য তব। মুহূর্ত্তেকে
কেমনে সৃজিলা এই ভীষণ অটবী?
বট বিল্ব নিম্ব আদি বিবিধ পাদপ,
অভ্রভেদী শির উত্তোলিয়া গর্ব্বভরে
অনন্ত অযুত বাহু আছে পসারিয়া।
নিবিড়-নিবিষ্ট বৃক্ষপত্রচয় উর্দ্ধে
চন্দ্রাতপসম রোধিতেছে মার্ত্তণ্ডের
কর। ভয়াল ভল্লুক সিংহ ব্যাঘ্র আদি
ফিরিতেছে ইতস্ততঃ খাদ্য-অন্বেষণে।
একা তোমা হ'তে রক্ষা হ'ল আজি মায়া।
দেবতার মান।

মায়া। আজ্ঞাধীনা দাসী আমি
সুরেশ্বরী বাসব-প্রিয়ার। মুহূর্ত্তের
তরে, নিজ ক্ষুদ্র শক্তি সাধিল যে ক্ষুদ্র
কাজ, শচীর প্রীতির তরে—এই স্মৃতি,
বহুমূল্য পুরস্কার মোর। ওই দেখ
সৌদামিনি। আসিতেছে ভীমতেজে মদ-
মত্ত দৈত্য-সেনাগণ। এস সৌদামিনি।
মায়া-আবরণে ঢাকি দেহ আমাদের,
অলক্ষ্যে বসিয়া মোরা দেখিব কৌতুক।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দুইজন দৈত্যের প্রবেশ)

প্র দৈ। বাপ রে—বাপ্!—এরি নাম তপোবন?

দ্বি দৈ। আরে! অত হাঁপাস্ নি—ঠাণ্ডা হ', হ'য়ে খুলে বল্ দেখি ব্যাপারখানা কি?

প্র দৈ। ঠাণ্ডা আর বেশী হব কি চাঁদ? হাত দিয়ে দেখ দেহ পাথর হয়ে গেছে। বাপ রে! এত বড় লম্বা!

দ্বি দৈ। আরে খুলে বল্ না ব্যাপারটা কি? লম্বার মধ্যে তো দেখ্‌ছি তোর লম্বা লম্বা নিশ্বেস; আর লম্বা লম্বা ছুট্।

প্র দৈ। তুইও যদি দেখ্‌তিস, তা' হলে এতক্ষণ আর তোর ও লম্বা লম্বা কথা থাকত না।

দ্বি দৈ। আরে খুলে বল্ না ব্যাপারটা কি?

প্র দৈ। ব্যাপার আবার কি? আমার হাতে মাপা সাড়ে বার হাত!—এক বিঘত ছ' আঙ্গুল—ন্যাজ শুদ্ধ্।

দ্বি দৈ। ও—ব্যাপার তা হ'লে বৃহৎ।

প্র দৈ। দাঁত কটি ত' নয়।—যেন দুটি সার বর ধরে সাদা মূলো!

দ্বি দৈ। দ্যাখ! তুই নেহাত আটাসে—তুই দুপাটী দাঁতওয়ালা একটা ন্যাজ দেখে একেবারে ভয়ে দাঁত-কপাটী লেগে গেলি!

প্র দৈ। হ্যাঁ!—তার সারাগায়ে টিকে-পোড়া ছাপ দেখ্‌লে, তোকেও বাপ বাপ ব'লে সেখান থেকে পালাতে হ'ত।

দ্বি দৈ। ও!—তুই বুঝি জঙ্গলের ভেতরে একটা বাঘের ছানা দেখে ভয়ে আঁৎকে উঠেছিস্ ?

প্র দৈ। ছানা বড় নয়—সোনারচাঁদ! আসল ধাড়ী।

দ্বি দৈ। তলওয়ার হাতে থাক্‌তে মানুষের এত ভয়!

প্র দৈ। আরে তলওয়ার কি হাতে ছিল? সে কাঁপুনির চোটে কোথায় প'ড়ে গিয়েছিল, তার ঠিক কি?

(একজন দৈত্যের প্রবেশ)

তৃ দৈ। এ্যা—এ্যা—আ—আ—আস্তিকস্থ—মুনে র্মাতা—ভগিনী—বা—বা—বা—সুকি। আস্তিক—গড়ুর– গড়ুর।

প্র দৈ। আরে কি রে? তোর আবার কি হ'ল?

তৃ দৈ। আ—আ—কি হ'ল! তাই ত' কি হ'ল? কি হ'ল? আ—আস্তিক্ গড়ুর—আস্তিক্ গড়ুর! দোহাই বাবা মনসা। আমি তোমার কাছে কোন অপরাধ করি নি বাবা?

প্র দৈ। আরে হ'ল কি রে? খুলে বল্ না শুনি।

তৃ দৈ। হয় নি এমন কিছু। তালগাছের মত একটি অজগর সাপ মাথায় কুলোপানা একখানি ফণা মেলে, পেছন পেছন তাড়া। আস্তিক্ গড়ুর—গড়ুর!

দ্বি দৈ। ও বাপ রে। ঐ ঝোঁপের ভেতর থেকে গোঁ গোঁ কর্‌তে কর্‌তে বেরুচ্ছে একটা কত বড় বাঘ!

প্র দৈ। এ্যা—এ্যা—এ্যা—বা—বা—বাঘ!

তৃ দৈ। বলিস্ কি রে। সাপের হাতে বেঁচে—এবার আবার বা—বা—বাঘের হাতে!

[প্রস্থান।

(চপলা ও মায়ার প্রবেশ)

চপলা। মায়া! মায়া! এত রঙ্গ জানিস্ রঙ্গিণি?
কাপুরুষ দৈত্য-সেনাগণ—তাহাদের
প্রভু দৈত্যাধম বৃত্র, শুধু শিব-বরে
হইয়া স্পর্দ্ধিত এত উন্নতি তাহার!

মায়া। ইন্দ্রাণী-সঙ্গিনি! বহুদিন কোথা বল
পাপের প্রশ্রয়? দুরাত্মার পাপভার
পূর্ণপ্রায় এবে; পতন তাহায় জেন
অবিলম্বে হবে সংঘটিত।
হের দেবি!
দৈত্যাধম-সেনাপতি পাষণ্ড দূষণ,
পন্থা প্রদর্শক দৈত্যচরসহ, এই
দিকে হইতেছে অগ্রসর!
আমরাও
চল—অন্তরালে থাকি, শুনিব তা'দের
কথা। পরে উপযুক্ত সময় বুঝিয়া,
ত্যজি নিজ নিজ রূপ, ধরিয়া মোহিনী
মূর্ত্তি, উপস্থিত হব তা'দের সম্মুখে।
এইরূপে কিছু কাল দৈত্য-পিশাচের
সহ করিব লো লীলা। অসংশয় তত-
ক্ষণে আসিবেন জয়ন্তকুমার। কার্য্য-
উপযুক্ত শাস্তি লভিবেক দৈত্যগণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দূষণ ও দৈত্য-চরের প্রবেশ)

দূষণ। কহ চর! স্থির জান তুমি এই সেই
নৈমিষ-কানন? জ্ঞান হয় পথভ্রম
হইয়াছে তব। তপোবন কভু নহে
ইহা, লোকালয় বহুদূর হেথা হ'তে।
সম্মুখে নেহারি এক প্রকাণ্ড অটবী
শাল-তাল-তমাল-বেষ্টিত। হের সিংহ-
ব্যাঘ্র আদি প্রাণিগণ, নিঃশঙ্ক-গমনে,
ফিরিতেছে চারিধারে। এই অরণ্যের
মাঝে কি হে অবস্থিত ঋষির আশ্রম?
সম্ভব তা' নয়।

চর। সেনাপতি! স্বপ্নসম
সকলি হ'তেছে মম মনে। নিরন্তর
করিতেছি বীরবর! এই ভূমণ্ডলে
বিচরণ; বহুবার পশিয়াছি এই
নৈমিষ-কানন-মাঝে; ত্রিভুবনে সর্ব্ব-
লোকে জানে এই স্থানে নৈমিষ-কানন;
কিন্তু আজি হেরি বিস্ময়-আকুল নেত্রে,
অদ্ভুত এ রূপান্তর!

দূষণ। চর! কতদূর
আসিলাম বনমাঝে, ক্ষুদ্র এক বন-
পথ ধরি; পথচিহ্ন মিলাইল হেথা।
সম্মুখে নেহার ওই দুর্ভেদ্য প্রাচীর

তরু-গুল্ম-কণ্টক-নির্ম্মিত। ছত্রভঙ্গ
সৈন্যগণ—পথভ্রান্ত নিবিড় অরণ্য-
মাঝে। অগ্রসর অসম্ভব!—হের পুনঃ
পশ্চিম-আকাশে দিনমণি অস্তমিতপ্রায়।

চর। সেনাপতি! চল, যাই মোরা সেই
পথ ধরি বনের বাহিরে, যেই পথে
করিনু প্রবেশ।

দূষণ। তাও অসম্ভব! বহু
দূরে না যাইতে সেই পথ ধরি, দিবা
হবে অবসান। নিবিড় তিমিরে ব্যাপ্ত
হবে বনস্থলী।

(নেপথ্যে কুহক-রমণীগণের গীত।)

(গীত)

আজি কাহার পরশে হৃদয়-বীণা
সপ্তম স্বরে উঠেছে বাজি!

দূষণ। এই বিজন অরণ্যে
কোথা হ'তে উঠে এই সঙ্গীত-লহরী!

(গীত)

বল কাহার পরশে শুষ্ক হৃদয়ে,
স্মৃতির মুকুল ফুটেছে আজি!

(কুহক-রমণীগণের প্রবেশ)

কে তুমি অচেনা অজানা অতিথি
কোন্ দেশে তুমি ছিলে হে,
বল কোন্ কাজে, এ মোহন সাজে,
এলে রমণী-হৃদয় দলিতে।

[প্রস্থান।

চর। সেনাপতি মহাশয়! ব্যাপার সহজ
নয়। জ্ঞান হয়, এ সকল দৈবী মায়া শুধু।

দূষণ। আরে মূর্খ! মায়া-বল দানবের,—
দেবগণ না জানে ছলনা। বোধ হয়
মোর—ত্রিদশ রমণীগণ স্বর্গ ত্যজি
লয়েছে আশ্রয়, এই ভীষণ অটবী-
মাঝে। ইন্দ্র-রামা অসংশয় বাস করে
এই স্থানে। চল যাই ওদের পশ্চাতে।

চর। কোথা যাবে সেনাপতি! পশ্চাতে ওদের?
হের না সম্মুখে দুর্ভেদ্য অরণ্য। পথ-
চিহ্ন নাহি হয় অনুভব। বাতাসের
ছবি ওরা—বাতাসে মিশাল। রক্তমাংস-
বিনির্ম্মিত স্থূল দেহ, কোথা যাবে বীর!
ওদের পশ্চাতে? সন্ধান পাইবে কোথা?

(জয়ন্তের প্রবেশ)

জয়ন্ত। সন্ধানের প্রয়োজন নাহি হয় ভীরু!
কাল পূর্ণ হ'লে, কাল আপনি আসিয়া
দাঁড়ায় সম্মুখে।

দূষণ। পাপিষ্ঠ! জানিস্ কি রে
কার সনে করিস আলাপ? এই দণ্ডে
মুষ্ট্যাঘাতে দন্তপাতি তোর উড়াইয়া
দিব রেণু রেণু করি গগনের গায়।

জয়ন্ত। নীচমুখে উচ্চকথা শোভা নাহি পায়।
তস্করের দাস তুই—তস্কর সমান,
অসহায়া রমণীরে নিগ্রহিতে আসি
পশেছিস্ সিংহের বিবরে। ধর্ অস্ত্র
দৈত্যাধম! তোর সনে বাক্যালাপ—বৃথা
কালক্ষয়।

দূষণ। ঘুচাব প্রলাপ তোর, আরে
আরে বাচাল বালক! কিন্তু পরিচয়
বিনা, দৈত্যসেনাপতি নাহি করে কভু
অস্ত্রের প্রয়োগ।

জয়ন্ত। আমি রে কৃতান্ত তোর
দুরন্ত দানব! দেবরাজ ইন্দ্র-সুত—
জয়ন্ত আমার নাম।

দূষণ। অপোগণ্ড শিশু!
রক্ষা কর আপনারে দূষণের ভীম
গদাঘায়।

(উভয়ের যুদ্ধ ও দূষণের পতন)

জয়ন্ত। দৈত্যাধম! তোরে মারি নাহি
কলঙ্কিব অসি মোর। যা' রে কাপুরুষ!
যা' রে তুই দূষণের ছিন্ন শির ল'য়ে—
বলিস্ প্রভুরে তোর, অমরা-ঈশ্বর৲
ইন্দ্রপুত্র পাঠায়েছে এই উপহার।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

—:০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—দৈত্যরাজ-সভা।

বৃত্র, রুদ্রপীড়, মন্ত্রী ও সভাসদ্‌গণ।

বৃত্র। সুমিত্র হে! লজ্জা নাহি দেবগণ-হৃদে।
কতবার দেবগণ রণক্ষেত্রে হ'ল
উপস্থিত বদ্ধ-পরিকর; ফেরুপাল
সম বিতাড়িত করিলাম তাহাদের।
শঙ্কর-ত্রিশূল ঘায় পাঠাইনু সবে
পাতাল-পুরীতে—অচেতন—শক্তিহীন
মোহ-নিদ্রাগত! হের পুনঃ না ভুলিতে
পূর্ব্বকথা, শরীরে ত্রিশূল-অঙ্ক নাহি
মিলাইতে, আসিয়াছে পুনঃ স্বর্গরাজ্য
উদ্ধার মানসে।

মন্ত্রী। অমরার সহ দেব!
অমর-হৃদয় বিজড়িত মন্ত্রশক্তি
বলে। তাই তারা শত অপমান সহ্য
করে অনায়াসে; তবু নারে বিসর্জ্জিতে
স্বর্গের মমতা।

বৃত্র। ভেবেছ কি মন্ত্রী! আর
তারা এ জনমে সমর্থ হইবে এই
স্বর্গরাজ্য দানবরাজের দৃঢ়মুষ্টি
হ'তে ছিনিয়া লইতে! মনে স্থান নাহি
দিও কভু। গতবারে অল্পকাল মাত্র
ছিল মোহ-নিদ্রা; এইবার শূলাঘাতে
মোহ-নিদ্রা-বশে চিরদিন তরে
হ'বে অভিভূত।—জনমের মত মিটে যাবে
দেবদেহে সমর-কণ্ডুতি।

মন্ত্রী। হৃদে মম
জাগিতেছে বিষম সংশয়। ইন্দ্রে ছাড়ি'
কার মন্ত্রণায়, কিংবা, কোন্ দুঃসাহস
বলে, দেবগণ এই গুরুতর কার্য্যে
করিলেক হস্তক্ষেপ?-

বৃত্র। সুমিত্র হে! যবে
পতঙ্গম লভি ক্ষীণ পক্ষযুগ, মনে
করে আপনারে ব্যোমচর বিহঙ্গম—
দুরাশায় উন্মত্ত হইয়া উঠে উচ্চে
শূন্যপথে; তিলেকের তরে ভাবে কি হে
মনে, প্রতিদ্বন্দ্বী যারে তারা ভাবে, ভোজ্য
ভোজী সম্বন্ধ তা'দের?

মন্ত্রী। ত্রিদিব-ঈশ্বর!
সত্য যা কহিলে—কিন্তু আমার ধারণা
দেবগণ করিয়াছে এইবার কোন
নব শক্তির সঞ্চয়। তাই দৃপ্ত হ'য়ে
উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় করিয়াছে দুঃসাহসে
পুনঃ হেন যুদ্ধে হস্তক্ষেপ। হ'ত ভাল
এ সময়ে দূষণ থাকিলে হেথা; যুদ্ধ-
ক্ষেত্রে দৈত্যরাজ রহিবে আপনি, দুর্গ-
রক্ষা ভার র'বে কার পরে?

রুদ্র। আজ্ঞা যদি
দেহ পিতঃ! কিঙ্করেরে, দাস এক ভিক্ষা
মাগে শ্রীচরণে—বহুকাল ধরি যাহা
করেছি পোষণ সযত্নে হৃদয়-মাঝে,
আশা-বারি-সেকে বহু আয়াসেতে যাহা
করেছি বর্দ্ধন।

বৃত্র। আরে রে হৃদয়ানন্দ!
দৈত্যরাজ-নয়ন-অঞ্জন! ত্রিভুবনে
কিবা আছে অদেয় তোমারে? অভিলাষ
তব অচিরাৎ করহ প্রকাশ।

রুদ্রপীড়। তাত
কহিলেন পূজ্যপাদ্ সুমিত্র সুধীর
"মর্ত্তধামে গিয়াছে দূষণ; পিতৃদেব!
যুদ্ধ-ক্ষেত্রে রহিলে আপনি, রাজ্যরক্ষা
কে করিবে?"
দেব! নহি আমি গৌরবের
প্রতিদ্বন্দ্বী তব। বাসব-বিজয়ী বৃত্র,
দৈত্যকুলেশ্বর, বীরত্বে যাঁহার কাঁপে
থরথরি ত্রিদশ-মণ্ডল, সমকক্ষ
হতে তার অন্যের বাসনা, বাতুলের
কল্পনা স্বপন—কিন্তু সেই মহাশক্তি
প্রাক্তন নিয়মে লভিয়াছে যেই জন
ভূমিষ্ঠের কাল হ'তে; যেই জন সেই
আদর্শমূরতি স্থাপি' হৃদয়-মন্দিরে,
পূজিতেছে নিরন্তর ভক্তি-উপচারে;
সেই জন করে যদি হৃদয়ে পোষণ
পিতৃবীর্য্য অনুকারী অত্যুচ্চ বাসনা

নিগ্রহিতে অরাতিরে ; অগৌরব তাহে
দেব ! পিতার হইবে কিবা ?

বৃত্র। রুদ্রপীড় !
দৈত্যরাজ বৃত্রের তনয় তুমি ; সাধ
তব উপযুক্ত তার। ভূধর ব্যতীত
ধরে কেবা ধরিত্রীর ভার ? সিন্ধু বিনা
কার বুকে উত্তাল তরঙ্গমালা উঠে
পড়ে সদা ? বৃত্রের তনয় বিনা, কার
বুকে জাগে অভিলাষ দেবগণ সনে
রণ ? বৎস রুদ্রপীড় ! অভিলাষ তব
করিব পূরণ। আজিকার রণে বীর !
সৈন্যাপত্যে বরিনু তোমারে। আজি তবে
শিবশূল করুক্ বিশ্রাম। আমি নিজে
উপস্থিত থাকি সমর-প্রাঙ্গণে শুধু
হেরিব কৌতুক।
হে সুমিত্র ! আজ্ঞা মম
করহ প্রচার, অমর-বিজয়ী দৈত্য-
সেনাগণ পাশে—আজিকার রণে হবে
তারা কুমারের আজ্ঞাবহ। আশীর্ব্বাদ
করি বৎস ! শঙ্করের শ্রীচরণ স্মরি,
রণজয়ী আসিও ফিরিয়া।

রুদ্রপীড়। পিতৃদেব !
আশীর্ব্বাদ তব—শিরে মম অক্ষয়
কিরীট ; আশীর্ব্বাদ তব—বক্ষে দুর্ভেদ্য
কবচ, হৃদয়ে অযুত হস্তীর বল।
আশীর্ব্বাদে তব, বিমুখিব দেবগণে।
ইষ্টদেব ! কোটি কোটি প্রণাম চরণে।

(দূতের প্রবেশ)

বৃত্র। এ কি দূত ! কি হেতু এ ভাব তব ? কেন
বাত্যা-বিলোড়িত কদলীপত্রের প্রায়
মুহুর্মুহু হতেছে কম্পিত ? মূক সম
নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ কেন আছ দাঁড়াইয়ে ?
দৈত্যরাজ বৃত্র—সুরাসুর-জয়ী। তুমি
দাস তার ; হেন ত্রাস তোমারে না শোভা
পায়।

দূত। দৈত্যরাজ ! আসিয়াছি মর্ত্ত্যলোক
হ'তে, অতি নিদারুণ সমাচার ল'য়ে।
সে কাহিনী কহিতে রাজন ! শত শূলে
বিদ্ধ হয় দৈত্যহৃদি। রসনা খসিয়া
পড়ে ; বাক্ নাহি হয় নিঃসরণ। শুন
দৈত্যকুলচূড়া ! ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের
খড়্গে নিহত দূষণ—রক্তসিক্ত ছিন্ন-
শির তার ধূলায় লুটায়। সৈন্যগণ
আমাদের, পথ-ভ্রান্ত কানন-মাঝারে—
কেহ শ্বাপদের হাতে জীবলীলা দেছে
বিসর্জ্জন, কেহ বা অরাতি-খড়্গে প্রাণ
দেছে বলিদান। ইন্দ্রজায়া পুলোমজা
শচী রয়েছে নির্ব্বিঘ্নে নৈমিষ-কাননে।
হতভাগ্য ভগ্নদূত আমি—হায় এই
কঠোর বারতা শুনাবার আগে, কেন
নাহি অরাতির শূল হৃৎপিণ্ড মম
চূর্ণ না করিল—হতভাগ্য ভগ্নদূত
আমি মাত্র রয়েছি জীবিত !

বৃত্র। কি কহিলি
দূত ! দূষণ নিহত !—পাপ ইন্দ্র-পুত্র
জয়ন্তের খড়্গে !
আরে আরে, দুর্ব্বিদগ্ধ
শিশু ! আরে আরে শৃগাল-শাবক ! সুপ্ত
শার্দ্দূলের নাসারন্ধ্রে তৃণ-খণ্ড দিয়া
এ কি খেলা তব ? ভাল !—দিব সমুচিত
দণ্ড চাপল্যের তোর, শিশু বলি নাহি
আর ক্ষমা।
কে আছিস্ ? আন্ শীঘ্র মোর
সংহার-ত্রিশূল।

রুদ্রপীড়। মার্জ্জনা করহ পিতঃ !
দাসের ধৃষ্টতা। দুর্ব্বিসহ এ সংবাদে,
এই দৈত্যকুল-মাঝে আছে কোন জন,
প্রতি ধমনীতে যার নাহি ছুটে তীব্র-
তেজে শোণিত-প্রবাহ ?—কিন্তু বীরবর !
ভাবি' দেখ মনে, প্রবল ঝঞ্ঝায় বটে,
হয় উন্মূলিত উচ্চ মহীরুহ, কিন্তু
ভূধর দাঁড়ায়ে থাকে অচল—অটল
শত ঝঞ্ঝা, শত ভূকম্পন, নারে তারে
টালাইতে। তুমি দেব ! বীর-কুলাগ্রণী—
তোমারে সাজে না তাত এত যুদ্ধ-সজ্জা
বিদলিতে জয়ন্ত-পতঙ্গে ; কিংবা দেব !
করিতে প্রয়োগ, সেই শঙ্কর-ত্রিশূল—
জ্বলন্ত সংহার-মূর্ত্তি—বিনাশিতে ক্ষুদ্র
শত্রু জয়ন্তেরে। আজিকার রণে, পিতঃ !

কিঙ্করেরে বরিয়াছ সেনাপতি-পদে—
বল আশে আশীর্ব্বাদ ধরিয়াছি শিরে ;
এবে আপনি পশিলে রণে, অবহেলি
দাসে, আশা মোর পূর্ণ না হইবে। সেই
খেদ মনে রবে চিরদিন।

বৃত্র। রুদ্রপীড় !
গুরু-শোকভরে ধৈর্য্যচ্যুতি হয়েছিল
মোর। তব বাক্যে অরিন্দম! পাইনু আশ্বাস,
ভাল আজিকার রণে, সেনাপতি তুমি।
আমি নাহি স্পর্শিব আয়ুধ। হে মন্ত্রিন্,
অবিলম্বে দেহ আজ্ঞা দিতিসুতগণে
সাজিতে সংগ্রামে। রুদ্রপীড়, ইচ্ছামত
বাছি লও অস্ত্র শস্ত্র, লও দিব্যরথ

রুদ্রপীড়। যথা আজ্ঞা পিতৃদেব! প্রণাম চরণে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—পুষ্পবাটিকা।

ইন্দুবালা।

ইন্দুবালা। একি আকুলতা হৃদয়-মাঝারে! একি
বিষম-অতৃপ্তি!—পূর্ণতায় শূন্যত্বের
ভাব—অনন্ত বিস্মৃতি মরুভূমি সম!
সবই ত' রয়েছে মোর! নারী-ভাগ্যে যত
কিছু ভোগ্যবস্তু আছে! সুভগা আমার
সম কেবা আছে ত্রিজগতে? কার হেন
নিরুপম পতি? কোন্ ভাগ্যবতী নারী
পারে লভিবারে হেন অমূল্য-রতন
উজলে ত্রিদিব যার গৌরব বিভায়
কণ্ঠস্বরে যার হয় অমৃত ক্ষরণ।
তবু কেন বিষাদ-কালিমা, রাখিয়াছে
ঘিরি' হৃদয়-আকাশ মম?

ইন্দুবালা। (গীত)

হৃদয়ের হার হৃদয়ে পরেছি।
আশা কেন তবু মিটে না?
অমিয়া-সাগরে ডুবিয়া রয়েছি,
পিয়াসা ত' তবু মিটে না?
অরুণ কিরণে উঠেছি জাগিয়া
তবু নিরাশা-তিমির কেন টুটে না?
বাসন্তি-সমীর বহিছে হৃদয়ে
তব মাধবিকা কেন ফুটে না?

(সখিগণের প্রবেশ)

সখিগণ। (গীত)

তোমার হৃদয়-কুঞ্জে সজনি!
আজি বাজিবে বীণা বাজিবে!
তোমার হৃদয়-কনক-কমলে
আজি রাজিবে বঁধু রাজিবে।
তোমার হৃদয়-রাস-মঞ্চে
আজি বাসিবে সখা বসিবে!
তোমার হৃদয়-রতন-মন্দিরে
আজি পশিবে চোর পশিবে!

(রুদ্রপীড়ের প্রবেশ)

রুদ্রপীড়। এ কি এ কি, আদরিণি! বিষাদিনী কেন
লো নেহারি? পূর্ণিমার শশী আজি রাহু-
গ্রস্ত কেন? ইন্দীবর-যুগল-নয়নে
কেন হেরি মুকুতার ফল? অভিমান
হ'য়েছে ভামিনি, বিলম্ব হেরিয়া মম?

ইন্দুবালা। অভিমান! তোমার নিকট!—প্রাণেশ্বর!
তুমি কত উচ্চ, কত যে মহৎ, হৃদি
তব কত যে উদার কত যে বিস্তৃত,
নির্ণয় না হয় তার! আমি কত ক্ষুদ্র
কত যে নগণ্য ক্ষুদ্র পরমাণু হতে
ক্ষুদ্রতর তোমার সকাশে। তবু নাথ!
কিঙ্করী বলিয়ে তুমি যে হৃদয়ে স্থান
দিয়েছ আমারে—বহু ভাগ্য মম!

রুদ্রপীড়। অয়ি
স্বপ্নময়ি! কি যে কুহকের স্রোত ক্ষরে
ওই অমিয় বচনে তোর—বিজড়িত
শ্রবণ-যুগল মম, রহে মন্ত্র-মুগ্ধ-
সম—রহে যথা অহিবর উত্তোলিয়া
ফণা নীরব নিথর—যাদুকর ওষ্ঠ-
লগ্ন সুমধুর বংশী-ধ্বনি শুনি'। তুমি
ক্ষুদ্র হৃদয়-রঞ্জিনি! উচ্চ কেবা তবে?

ইন্দুবালা। যাহা কহ প্রাণেশ্বর! সবি নিজগুণে
তব। আমি নিতান্তই অযোগ্যা তোমার।
তাই দেব! স্পর্শিলে চরণ তব মনে
হয় মোর—বুঝি বা পঙ্কিল স্পর্শ মম,

কলঙ্কিত করি দিল, রাকেন্দু-নিন্দিত
পদ-যুগ তব।

রুদ্রপীড়। হৃদয়-সর্ব্বস্বে! ওই
সুবিমল শশধর, গগনে প্রকাশি',
ছড়াইছে নিরন্তর প্রতিভার রাশি—
পীযূষ-নিস্যন্দ যা'র, অযুত আকাঙ্ক্ষা
হৃদে দেয় জাগাইয়া। জানে কি শশাঙ্ক,
কি অক্ষয় অমৃত-ভাণ্ডার হৃদে আছে
তার? প্রিয়তমে! ওই পূত মন্দাকিনী,
পরি' শুভ্র রজত-বসন নক্ষত্রের
চুম্‌কি-খচিত, দোলাইয়ে কম্বকণ্ঠে
রতন-প্রদীপ-মালা, দৈত্যাঙ্গনাগণ
বিজয়-উল্লাসে যাহা দেছে ভাসাইয়ে,
সুর-নিম্নগার শোভন উরসে, কভু
উঠিতেছে, কভু বা পড়িছে, তরঙ্গিণী
বীচির বিক্ষোভে—উঠে পড়ে মুক্তাসরঃ
যথা প্রণয়িনী-বুকে, যবে অতি ক্ষুদ্র
হৃদিটুকু মাঝে তার, আবেগের শত
ক্ষুব্ধ-সিন্ধু উঠে উচ্ছ্বসিয়া প্রণয়ীর
বদন নেহারি!—জানে কি লো মন্দাকিনী,
বুকের মাঝেতে তা'র কত শোভা, কত
শান্তি, কত যে মাধুর্য্য আছে? অয়ি হৃদি-
লগ্ন লতা! তুমি নিজ গৌরব-বিভায়,
আপন ইন্দ্রিয়গুলি রেখেছ আচ্ছন্ন
ক'রে। তাই পার না বুঝিতে, কত শোভা—
কত যে সুষমা—ওই হৃদয়-মাঝারে।

ইন্দুবালা। তুমি প্রাণেশ্বর! পার বলিবারে—তুমি
হৃদয়ের রাজা মোর, উজলিতে মম
হৃদয়-কুটীর, তুমি দেব! একমাত্র
কনক-প্রদীপ, তুমি জান প্রিয়তম!
কোন্ উপাদানে গড়া হৃদয় আমার।

রুদ্রপীড়। হায়! কঠোর হৃদয় মম, কুলিশের
চেয়ে—নহে লভি' হেন অমূল্য রতন,
কমলার কণ্ঠহার মাঝে, দ্যুতিমান্
মধ্যমণি সম, রাতদিন কেন নাহি
বুকে ক'রে রাখি তারে?

ইন্দুবালা। হৃদয়-সর্ব্বস্ব!
আপনার প্রতি কেন কর এই বৃথা
অনুযোগ? হেন পুণ্য করে নি কিঙ্করী,
পারে যাহে করিতে পোষণ হৃদি-মাঝে
এই উচ্চ সাধ! দাসী ব'লে চরণে যে
দেছ স্থান, তাই, ঢের—পরিপূর্ণ মম
জীবিত-কামনা! হৃদয়-মন্দিরে তুমি
নাথ! ইষ্টদেব মম;—ভক্তিপুষ্পহারে
দিবা রাতি দিতেছি সাজায়ে, ওই রাঙা
পা দু'খানি কমল-নিন্দিত—মকরন্দ
যা'র মম মানস-মধুপ—আত্মহারা—
আবেশে বিভোর—তৃষা মিটাইয়ে করে
পান। কর-যোড়ে মাগি শ্রীচরণে, সেই
সুখে কিঙ্করীরে কর না বঞ্চিত সখা!—

ইন্দুবালা। (গীত)

তোমার স্মরণ সোহাগে ছানিয়া,
গড়েছি মূরতি তব।
চাঁদ নিঙাড়িয়া লাবণ্য আনিয়া,
দিয়াছি ঢালিয়ে ধব!
হৃদয়-মন্দিরে কনক-মঞ্চে,
পেতেছি আসন রতন-খচিত,
কুসুম-পরাগ দিয়াছি ছড়ায়ে,
রাশি রাশি ফুল যতন-চিত।
কুঞ্জবন-রাণী মঞ্জুল-লতিকা,
কুসুম মঞ্জরী দেছে উপহার—
দাসী কনক থারে' থরে থরে থরে,
রেখেছে সাজায়ে শত পূজা উপচার।

ইন্দুবালা। নাথ! ক্লান্ত তুমি রণশ্রমে চল দেব!
বিশ্রাম-আগারে। দাসী নিজ-হস্তে খুলে
দিবে রণসাজ তব। কুসুম-রচিত
সুরভি ব্যজন-স্পৃষ্টে মৃদুল হিল্লোলে
শ্রান্তি তব হবে দূরীভূত!

রুদ্রপীড়। হায় দেবি!
সামান্য কণ্টক মাত্র বিদ্ধ হ'লে মোর
পদে, শেল সম বাজে তব বুকে। তুমি
মম সুখের লাগিয়ে, দিতে পার নিজ
প্রাণ। স্বার্থ তুমি দেছ বলিদান, মম
প্রীতি-সাধনের তরে। আর আমি—আমি
ভাগ্যহীন—দিনান্তে বারেক মাত্র, নাহি
পারি সংবর্দ্ধিতে তোমা হেন নারীরত্নে;—
ক্ষুদ্র আশা-মাত্র তব করিয়া পূরণ।
ক্ষণে ক্ষণে ভাবি মনে, নিক্ষেপিয়া দূরে
কর্ত্তব্যের কঠিন শৃঙ্খল চ'লে যাই

সেই দেশে, তোমারে লইয়া বুকে, যেথা
শাসনের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া মানব—
নিরন্তর উন্মজ্জন-নিমজ্জনে, কভু
উত্তোলিত আশার তাড়নে, নিরাশার
গুরুভারে কভু নিপতিত—বিসর্জ্জন
নাহি দেয় প্রাণ।

ইন্দুবালা। কেন প্রাণতম! কেন
এই আকুলতা?

রুদ্রপীড়। সরলা বালিকা তুমি।
সারাদিন আছ মোর আশাপথ চেয়ে—
হৃদয়ের আধফুট বাসনা-কুসুম
অবচয়ি, সারাদিন ধরি গাঁথিয়াছ
মালা; সাধ তব, পরাইবে মোর গলে—
নির্দ্দয়-হৃদয় আমি!—ভীমতেজে ঘূর্ণ্য
মান্ কর্ত্তব্যের শিলাযন্ত্র-নিষ্পেষণে,
শতখণ্ড করি' তারে ফেলিনু ভাঙ্গিয়া।

ইন্দুবালা। নাথ! নাহি তাহে বিন্দুমাত্র দোষ তব—
মম কর্ম্মফল কারণ তাহার: দুঃখ
ভুঞ্জি তা'রি তরে আমি দেব! হের সখা!
ত্রিযামার অতীত প্রহরদ্বয়;—এস
ক্ষণেকের তরে, লভ আসি' শান্তি সুখ
সুষুপ্তির কোলে, আমি সারারাত জাগি'
সেবিব চরণ।

রুদ্রপীড়। হায়' কনক-প্রতিমা!
রণসাজ ত্যজিবার নাহি অবসর।
ওই শুন প্রিয়তমে! সমর-উল্লাসে
মত্ত দৈত্যসেনাগণ, করিতেছে জয়-
ধ্বনি—ভীষণ নিনাদে কাঁপাইয়া দশ-
দিক—রথের ঘর্ঘরে পূর্ণ গগনের
শূন্যগর্ভ—রজনীর স্তব্ধতা ভেদিয়া
ওই শুন উঠিতেছে ঘোর কোলাহল—
দৈত্যসেনা-নিনাদিত বিজয়-ঘোষণা,
সৈন্ধব হ্রেষণ, গজের বৃংহণ-সনে,
এক সাথে মিশি'। দৈত্যসেনাগণ মহা
হর্ষে করিতেছে সমর-সাজনা।

ইন্দুবালা। নাথ!
বিজিত অমর—স্বর্গরাজ্য অধিকৃত—
দৈত্যরাজ অধিষ্ঠিত অমরার স্বর্ণ-
সিংহাসনে—বৈজয়ন্ত-প্রাসাদের প্রতি
উচ্চ চূড়ে, দৈত্যরাজ কনক কেতন
রতন-খচিত—শঙ্করের শূলাঙ্কিত—
কহিতেছে দনুজের বিজয়-বারতা।
তবে কেন এই রণোল্লাস? কেন এই
সমর-সাজনা? পদানত অরাতিরে
নাথ! কি হবে দলিয়া?

রুদ্রপীড়। হৃদি-বিলাসিনী!
দেব-অনিকিনীগণ, নব বলে হয়ে
উদ্দীপিত, স্বর্গরাজ্য করিয়াছে পুনঃ
অবরোধ। অচিরে জ্বলিবে দেবি! অতি
ভয়ঙ্কর সমর-অনল। কালি, তা'র
প্রথম আহুতি। পিতার আদেশে
বৃত আমি সেনাপতি পদে;—তাই প্রিয়ে!
আসিয়াছি তব পাশে বিদায় লইতে।

ইন্দুবালা। কতদিনে নির্ব্বাপিত হবে এই ঘোর
সমর অনল! ইচ্ছা মম—প্রত্যর্পণ
করি অমরেরে, রাজ্য তাহাদের, শান্তি
সুখে করি গিয়া বাস, নিজ রাজ্যে মোরা।
মর্ত্ত্যবাসী—কিবা কাজ স্বর্গে আমাদের?

রুদ্রপীড়। হায় প্রিয়তমে! সবার হৃদয় কি গো
তোমার সমান—কুসুম কোমল? পর-
দুঃখে কাঁদে কি সরলে! সকলের হৃদি,
তোমার যেমন?

ইন্দুবালা। নাথ! তোমরা পুরুষ!
থাক' মত্ত সমর-উল্লাসে—অবসর
থাকে না'ক মুহূর্ত্তের তরে, কল্পনায়
করিতে অঙ্কন, কি যে ঔৎসুক্যের তীক্ষ্ণ
বিষে জর্জ্জরিত করে হৃদি আমাদের।
রণস্থল হ'তে সখা! কখন আসিবে
ফিরি?

রুদ্রপীড়। অয়ি মুগ্ধে! ফিরিবার কথা, বল
নিশ্চয় কেমনে বলি? অমরের ব্যূহ
ভেদি যেতে হ'বে মর্ত্ত্যধামে—যথা শচী
ইন্দ্রপ্রিয়া করে বাস, নৈমিষ-কাননে—
আনিতে হইবে তারে বৈজয়ন্ত-ধামে।
মাতৃ-সাধ শচী আসি সেবিবে তাঁহার
পদ। পিতার আদেশ মম প্রতি সেই
সাধ করাতে পূরণ।

ইন্দুবালা। একি নিদারুণ
কথা শুনি তব মুখে প্রাণেশ্বর! শচী
পুলোমজা—অমরার অধীশ্বরী—এবে

নিয়তি ছলনে, পরাজিত পতি তার—
বিশেষ রমণী—হৃদয়ের মণি! তার
প্রতি এ নিগ্রহ উচিত না হয় কভু।

রুদ্রপীড়। সব বুঝি হৃদয়-ঈশ্বরি! কিন্তু পিতৃ-
আজ্ঞা কেমনে লঙ্ঘিব বল?

ইন্দুবালা। নাথ!
শঙ্করের বলে বলী দৈত্যকুলেশ্বর;
শ্মশানবিহারী দেবদেব আশুতোষ
করেন নিয়ত শক্তির সাধনা; শচী
সুরেশ্বরী শক্তি-স্বরূপিণী। নিগ্রহিলে
তারে, শঙ্করের রোষে দৈত্যরাজ হবে
ভস্মীভূত।

রুদ্রপীড়। হয় হ'ক যাহা থাকে সতি!
বিধির লিখন। নাহি গণি ফলাফল,
পিতৃ-আজ্ঞা করিব পালন।

ইন্দুবালা। নিতান্তই
যাবে যদি মর্ত্ত্যধামে, পালিতে পিতার
আজ্ঞা, দাসীর একটি কথা মনে রেখ
হৃদয়-বল্লভ! যেন বাসব-প্রিয়ার
প'রে নাহি হয় কোন অত্যাচার।

রুদ্রপীড়। দেবি!
প্রতিজ্ঞা করিনু তব পাশে, ইচ্ছা তব
করিতে পূরণ।

(একজন পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। যুবরাজ! প্রতিহারী
আসিয়াছে জানাতে সংবাদ—উপস্থিত
নায়কমণ্ডলী সমর-মন্ত্রণা-গৃহে।
না পোহা'তে বিভাবরী, যুদ্ধ-অভিযান
হইবে প্রেরিত—অপেক্ষিছে সবে তব
উপস্থিতি তথা।

রুদ্রপীড়। কহ দাসি! অচিরে
তাদের সনে করিব সাক্ষাৎ।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

রুদ্রপীড়। আসি
তবে হৃদয় ঈশ্বরি!

ইন্দুবালা। এস নাথ! রণ
জয় করি। দেখ, যেন সমর-উল্লাসে
ভুল' না দাসীরে; ভুল' না প্রতিজ্ঞা তব।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—রণস্থল

দেবগণ।

কার্ত্তিক। শুনিছ ত' দেবগণ! প্রাপ দানবের
পৈশাচিক হুহুঙ্কার? দৈত্য-কোলাহলে
অমরা হয়েছে পূর্ণ। দূষণ নিহত
জয়ন্তের রণে—সে সংবাদ, ঘৃতাহুতি
সম, প্রদীপ্ত করেছে প্রজ্জলিত দৈত্য-
কোপানল। তাই মহারঙ্গে হইতেছে
আজি সমর-সাজনা। কালি রণে, পিতা-
পুত্রে পশিবে সমরে।
ত্রিদশ-মণ্ডল!
করহ স্মরণ—কোন্ উপাদানে গড়া
অমর-শরীর! শত-বজ্র বিনির্ম্মিত-
বুকে অবহেলে ধর সবে শঙ্করের
শূল—অসহ্য বিক্রমে আক্রমণ কর
অরাতিরে—যাও সবে নিয়মিত স্থানে।
যবে তুরী মম নিনাদিবে, কেশবের
পাঞ্চজন্য অনুকারি, উপস্থিত হবে
আসি' সবে সাহায্যে আমার।

দেবগণ। যথা আজ্ঞা
দেব-সেনাপতি!

কার্ত্তিকেয়। উচ্চৈস্বরে বল সবে,
"জয় অমরের জয়।"

দেবগণ। "জয় অমরের জয়।" "জয় অমরের জয়!"

[প্রস্থান।

(তৃণগতি ও গোকর্ণের প্রবেশ)

গোকর্ণ। কি হে তৃণগতি ভায়া! জাব্বা জোব্বা
এঁটে—পাঁচো হাতিয়ার বেঁধে—গোঁপে চাড়া
দিয়ে সারসের মত পা ফেল্‌তে ফেল্‌তে যাওয়া
হচ্ছে কোথায়? ভারি ব্যস্ত দেখছি যে!

তৃণগতি। ব্যস্ত না হবে কেন দাদা? হাতে কাজ
কত।—তুমি তোমার হাতীর মত দেহ নিয়েই
ব্যস্ত—তা' বাইরের খবর কি রাখবে? নইলে
নয়—তাই ভাঁটাটির মত গড়াতে গড়াতে এসে
যুদ্ধ-ক্ষেত্রে হাজির হয়েছ।

গোকর্ণ। আচ্ছা! দেখা যাক্‌-তোমার ফড়িংএর

মত দেহ নিয়ে কি কাজ কর? তোমার ওপর ভার পড়েছে কিসের?

তৃণগতি। আর দাদা! সে কথা কও কেন? আমার ওপর আজ বড় বিষম কাজের ভার!—আজ দৈত্যরাজের সখ হয়েছে, তিনি নিজে যুদ্ধ করবেন না—আজি কুমার যুদ্ধ করবেন—আর তিনি শিবিরে থেকে মজা দেখবেন—আমি তাঁকে যুদ্ধের খবর সরবরাহ করব।

গোকর্ণ। যা হ'ক ভায়া! তুমি এ যাত্রার মত রক্ষে পেয়েছ। মারামারি কাটাকাটির হাত এড়িয়েছ। খবর সংগ্রহ!—তা যুদ্ধক্ষেত্রের ভেতরে না গিয়েও পারবে—আর দু'দশটা খবর বানিয়ে নিতেই বা কতক্ষণ?

তৃণগতি। তবে দাদা! এখন চল্লুম। ঐ দেখ'—ও দিক্‌টা থেকে সৈন্যদের তর্জ্জন গর্জ্জন শুনা যাচ্ছে। সেই তেচোখো দেবতাটাকে দেখলেই আমার পিলে চম্‌কে যায়।

গোকর্ণ। তা যাও!—আমিও দেখি, একটা ঝোঁপে ঝাঁপে ঢুকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করি গিয়ে—তার পরে, সময় মত বুঝে সুঝে বেরিয়ে পড়ব।

[প্রস্থান।

(বৃত্র ও রুদ্রপীড়ের প্রবেশ)

বৃত্র। হের বৎস! ওই যে দেখিছ দূরে দিব্য-
রথ—প্রতি চূড়ে যার, উড়িতেছে কত
পতাকা সুন্দর, অযুত শিখিনী যেন
উড়িছে গগনে - দেব-সেনাপতি স্কন্দ
রথী ওই রথে। হের দক্ষিণে তাহার
অগ্নিময় বিচিত্র স্যন্দন হরিদশ্ব-
সংযোজিত—রক্তিম-বসন-পরিহিত
রক্তমূর্ত্তি অরুণ সারথি উগ্রতেজে
চালিতেছে যাহা—মার্ত্তণ্ডের রথ উহা।
বৃত্রের হৃদয়-মণি! আশুবাড়ি দেহ
রণ—ভীমতেজে আক্রমণ কর ওই
মিলিত বাহিনী—আমি শিবিরের দ্বারে
দাঁড়াইয়া, দেখি তব সমর-কৌশল।

রুদ্রপীড়। পদধূলি দেহ তাত! কিঙ্করের শিরে;
ত্রিদশ-মণ্ডলে অচিরে ভেটিব রণে।

[প্রস্থান।

(তৃণগতির প্রবেশ)

তৃণগতি। আরে বাপ! বাপ! বাণে বাণে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে! দিনের বেলাতেই ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেছে! যা হক্ বলিহারি যাই কুমারকে, একলা চার পাঁচটা দেবতাকে—আর দেবতা ব'লে দেবতা, এক একটা যেন কালান্তক কাল!—কারু ছটা মুণ্ডু, ছ জোড়া চোখ, কারু চারটে হাত—এই সব তর্ বেতর' চেহারার দেবতাগুলোকে একেবারে অস্থির ক'রে তুলেছে! ওই ছ' মুখো চিমড়ে ফরসা ছোঁড়া দেবতাটাও খুব জাঁহাবাজ! বাপ রে বাপ! ওর একটা ধনুকের টঙ্কারেই আত্মা চম্‌কে যায়—সুরুতে তো লক্ষণ ভালই দেখা যাচ্ছে—এখন দেখা যাকৃগে শেষটা কি হয়।

[প্রস্থান।

(একদিক হইতে পবন, বরুণ ও যমের এবং
অপরদিক হইতে স্বর্ণ পতাকা হস্তে
সুরলক্ষ্মীর প্রবেশ)

সুরলক্ষ্মী। দেবগণ, কি আশ্চর্য্য! পলাইছ রণে
ভঙ্গ দিয়া জম্বুক সমান, ক্ষুদ্র এক
শিশুর সমরে? কি কহিবে, দেবাঙ্গনা-
গণ শুনিবে যখন দেবতার এই
কলঙ্কের কথা? স্বর্গরাজ্য হ'তে এবে
বিতাড়িত তারা - দুঃখের অর্ণবে মগ্ন,
গুরু শোক-ভারে নত সবার মস্তক—
তস্করের মত করে বাস, অমরার
উপকণ্ঠে কেহ, কেহ বা মরতে শুধু
আশায় বাঁধিয়া বুক—ভাবে মনে, হেন
দুরদিন নাহি রবে চিরদিন। দেব-
গণ - অজর-অমর! কতদিন আর
দৈত্যরাজ ভুঞ্জিবে অমরা? কি ভাবিবে
মনে মনে তারা ওহে ত্রিদশমণ্ডল!
শুনিবে যখন, ঘৃণিত এ তোমাদের
রণস্থল ত্যজি ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন-
কথা?

হের ওই দেব-সেনাপতি স্কন্দ,
মত্ত-মাতঙ্গের সম, দলিতেছে দুই
পদে দানব নিকর—শরজালে তার
আচ্ছাদিত হের গগনের আলো—হেন-

কালে উচিত কি তব সমর-প্রাঙ্গণ-ত্যাগ ?
আর পলাবে কোথায় ? স্বর্গে নাহি
পাবে স্থান। মর্ত্ত্যে গেলে নাহি রক্ষা পাবে।
কি কারণে ধর তবে শিরে, এই বৃথা
কলঙ্কের ভার ?
হের এই অমরার
বিজয়-কেতন—রঞ্জিত করহ ইহা
দৈত্যের রুধিরে! গাও দেবতার জয়—
বীরদাপে কাঁপাইয়া ত্রিভুবন, হও
অগ্রসর রণে—এস পশ্চাতে আমার।
[প্রস্থান।

(রুদ্রপীড় ও কার্ত্তিকেয়ের প্রবেশ)

রুদ্রপীড়। ষড়ানন, ক্লান্ত তুমি রণশ্রমে ; রণ
ত্যজিয়াও এবে—কর গে বিশ্রাম—পথ
মম দাও ছাড়ি।

কার্ত্তিকেয়। শক্তিধর—শক্তিহীন!
বাতুলের নিরর্থ প্রলাপ। মহাশক্তি
উদ্দীপিত অমরের দেহে রণ-ক্লান্তি!
দানব-কুমার বুদ্ধি-ভ্রংশ হইয়াছে
তব। স্বইচ্ছায় নীচাশয় দৈত্যরাজ
জালিয়াছে হুতাশন—এবে ভস্মীভূত
হবে তাহে দৈত্যকুল।

রুদ্রপীড়। আরে দর্প-অন্ধ
পার্ব্বতি-নন্দন! বুঝিলাম রুদ্রপীড়-
করে নাহিক নিষ্কৃতি তব। সমরের
সাধ এখন মিটেনি তব! ভাল, রণ
তৃষ্ণা অচিরে মিটাব।
হের মহাসেন!
এড়িলাম শর অর্দ্ধ-শশাঙ্ক-প্রতিমা—
ছিন্নগুণ শরাসন তব—ধর বীর!
অন্য অস্ত্র আছে যেবা ?

কার্ত্তিকেয়। মূর্খ রুদ্রপীড়!
কোদণ্ডের ছিলা মাত্র করিয়া কর্ত্তন
এতই উল্লাস তব! হের মহাশক্তি
ধরিলাম দানব-কুমার! জগতের
শক্তিপুঞ্জ মহামন্ত্রে প্রাণময় করি'
সৃজিলেন বিশ্বশিল্পী যাহা।

রুদ্রপীড়। আরে, আরে
ভীরু স্কন্দ! ভাবিলে কি বৃত্রের তনয়
জ্ঞানহীন শিশুমাত্র ? তাই মহাশক্তি
নাম করি দেখাইছ ভয় ?
শক্তিধর!
দৃঢ়মুষ্টি ধর তব মন্ত্রঃপূত শক্তি।
এড়িলাম হের বীর! চক্র বিমোহন—
অর্দ্ধযুগ অনাহার অনিদ্রায়, অতি
সুকঠোর সাধনার ফলে লভিলাম
কেশবে পূজিয়া যাহা—সুদর্শন চক্রের
দোসর—প্রতি পরমাণু যার প্রাণিত
বিষ্ণুর তেজে। রক্ষ দেখি আপনারে
চক্রের আঘাত হ'তে।

কার্ত্তিকেয়। ওঃ! চূর্ণ হ'ল
বক্ষঃ মম! ঘুরিছে মস্তক—বিঘূর্ণিত
হেরি চারিদিক্! আদ্যাশক্তি! মাতঃ! কোথা
তুমি ? রক্ষ আসি তনয়ে তোমার—মা গো!

রুদ্রপীড়। চক্রঘায় মূর্চ্ছাগত দেব-সেনাপতি।
যাই—পিতার চরণে জানায়ে সংবাদ,
যাই আমি মর্ত্ত্যধামে শচীর সন্ধানে।
[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—কৈলাস।

গৌরী ও জয়া।

জয়া। লীলাময়ি! লীলা তব তুমিই জান গো
ভাল। সৃষ্টিতত্ত্ব তব মুখে দেবি! লাগে
মোর বড়ই মধুর। কি কহিলে, সৃষ্টি-
পূর্ব্বে ছিলা শুধু তুমি—পরমা প্রকৃতি-
রূপে। কহ দেবি, কিবা হ'ল অতঃপর।

গৌরী। তার পর, প্রকাশিয়া আপনার ছবি
সৃজিলাম অন্ধকার। প্রকৃতির হইল
বিকৃতি—সৃজনের সূত্রপাত।

জয়া। আলোকের
সৃষ্টি দেবি, হইল কেমনে ?

গৌরী। তমোগুণে
অন্ধকার হইল সৃজন—সত্ত্বগুণে
জ্যোতির বিকাশ।

জয়া। জড় প্রকৃতি ছিল না
তখন ?

গৌরী। না—ছিল সব কারণ-সলিলে
মগ্ন। রবি-চন্দ্র-গ্রহ-আদি অস্তিত্বের
লেশমাত্র ছিল না তখন। স্থল বিনা
বসি' স্থলে, প্রসবিনু আপনারে। বিনা
গর্ভে, গুণত্রয় বিভাগেতে, হ'ল সৃষ্টি
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হর, বাসনা জাগিল হৃদে;
কহিলাম তিনবার "তপ তপ তপ"।
জয়া। বিনা মুখে শব্দ-উচ্চারণ! লীলাময়ি,
কত লীলা জান তুমি?
গৌরী। শব্দ সৃষ্টি করি,
হইল বাসনা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ
করিতে সৃজন। মায়াবলে শবরূপ
করিনু ধারণ—বিগলিত মাংসরাশি
অস্থি হ'তে পড়িতেছে খসি; অস্থিমাত্র
অবশেষ বিকট বদনে বিকাশিত দন্ত-
পাঁতি; অক্ষির কোটরে বাস করে শত
শত কৃমি-কীট ভীষণ দর্শন; পূতি-
গন্ধ ন্যক্কারজনক! ভাসিতে ভাসিতে
কারণ-সলিলে, প্রথমে যাইনু সখি!
তপোমগ্ন বিষ্ণুর সমীপে। স্পর্শমাত্রে
কেশবের বিকার জন্মিল, পলাইয়া
গেলা দূরে।
জয়া। দেবি, অচিন্ত্য তোমার লীলা!
কহ লো শঙ্করি, কিবা হ'ল অতঃপর?
গৌরী। তার পরে, ছল করি' যাইলাম সখি!
যথা কমল-আসন আছিল বসিয়া—
যোগাসনে নিমগন পরমাত্মা-ধ্যানে।
পূতিগন্ধে পিতামহ চারিধারে মুখ
ফিরাইলা; চতুর্ম্মুখ হইল তাঁহার
সেই দিন হ'তে। তার পরে গেনু যথা
যোগীশ্বর মহাযোগী মহাদেব ছিলা
প্রকৃতির ধ্যানে নিগমন— বাহ্যজ্ঞান-
বিরহিত—অচল অটল পয়োধির
বুকে, তুষার-মণ্ডিত ধবল-গিরির
মত—উপবিষ্ট পদ্মাসনে—নয়নের
তারাযুগ সম্বদ্ধ নাসার অগ্রে, যেন
নিবাত নিষ্কম্প উজর প্রদীপদ্বয়।
ধীরে ধীরে স্পর্শিনু স্বজনি, শিবদেহ।
প্রকৃতি-পরশে চেতনা জাগিল সখি!
হরের হৃদয়ে। নিরাশ্রয় ভাসমান
কারণ-সলিলে, আশ্রয় লভিলা হর।
শবরূপী মোরে সাদরে টানিয়া লয়ে,
মোর 'পরে স্থাপিয়া আসন, আরম্ভিলা
তপ পুনঃ।
জয়া। তাই তিনি দেবদেব!
গৌরী। হেরি
শঙ্করের বিকার-হীনতা বাসনার
হইল উদ্রেক, পতিরূপে লভিবারে
ত্রিপুর-অন্তকে। প্রকৃতির সনে সখি!
এইরূপে হইল মিলন—সৃজনের
মূলাধার যাহা।
জয়া। দিগম্বরি! এ রহস্য
বড়ই বিশাল! এক নারী—মাতা পত্নী
দুই রূপে।
গৌরী। জ্ঞাননেত্রে হের সহচরি!
ভাবিতেছ যাহা মহা কুহেলিকাময়
জটিল রহস্য, বিশদ হইবে তাহা
দিবালোক সম। মাতা পত্নী দুই রূপে
পৃথিবীতে দেখ যাহা, আদ্যা প্রকৃতির
মূর্ত্তিভেদ মাত্র তাহা।
এ কি সহচরি!
সহসা কেন লো বাজিল বিষম ব্যথা
বুকে মম? জ্ঞান হয় শত খণ্ডে ছিন্ন
হৃৎপিণ্ড মম!
জয়া। জগৎ-জননি! তুমি
ত্রিলোকের মাতৃ-স্বরূপিণী। ভক্ত-হৃদে
কণ্টক ফুটিলে শেল সম বিদ্ধ হয়
হৃদয়ে তোমার। জ্ঞান হয়, ভক্ত কেহ
পড়েছে বিপদে।
গৌরী। সহচরি! হের শীঘ্র
মানস-নয়নে, কোন্ ভক্তহৃদে মোর
বাজিতেছে এই বিষম বেদনা? শীঘ্র
কর নিরূপণ।
জয়া। যথা আজ্ঞা মহেশ্বরি!
খোল, খোল মানস-নয়ন—ব্রহ্মলোক
কর নিরীক্ষণ—মায়া-নিদ্রা অভিভূত
বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর; নাভি হ'তে সমুত্থিত
কোমল মৃণাল; প্রস্ফুটিত স্বর্ণপদ্ম
শোভে অগ্রভাগে তার—উপবিষ্ট হের
তদুপরি কমলজে কমল-আসনে।

হের বিষ্ণুলোক—কমলাক্ষ উপবিষ্ট
রত্ন-সিংহাসনে, কমলার সনে।
সখীগণে চামর ঢুলায়। চন্দনচর্চ্চিত
তালবৃন্ত সঞ্চালনে, লহরে লহরে
ছুটে মন্দানিল, কুঙ্কুম পরাগ বহি।
শান্তিপূর্ণ হেরি গোলোকের সর্ব্বস্থান,
অশান্তির চিহ্নমাত্র নাহি তথা। হের
দেবলোক—দেবি! রাজশ্রী ছাড়িয়ে গেছে
বৈজয়ন্ত হ'তে—অমরার সিংহাসন
দৈত্যরাজ অধিকৃত—নন্দন লুণ্ঠিত
দিতি-সুত কর্কশ পরশে—ছিন্ন ভিন্ন
পারিজাতচয়—হের, দেবগণ মত্ত
দুর্ব্বার সংগ্রামে। শঙ্কট-হারিণি!
বিষম শঙ্কটে হেরি পতিত কুমার।
দৈত্যপুত্র-রুদ্রপীড় হস্তক্ষিপ্ত চক্র-
ঘায়, ষড়ানন মূর্চ্ছিত সংগ্রামস্থলে—
দেবগণ কাঁদিতেছে আকুল পরাণে।

গৌরী। আরে আরে দুর্বৃত্ত দানব! বার বার
মোর সনে সাধিতেছ বাদ! ক্ষমিয়াছি
এতদিন, শুধু শঙ্করের অপমান
হ'বে বলি। অর্পিয়াছি সংহারের ভার
দিগম্বর-করে, তাই ব লে আরে দুষ্ট!
ভেবেছ কি তুমি, শক্তিহীনা আদ্যাশক্তি?
জয়া! জয়া! শীঘ্র দে রে উলঙ্গ কৃপাণ
করে মোর, বহুদিন তীক্ষ্ণ খড়্গ মম
দানব-রুধির করে নাই পান, আজি
তার পিপাসা মিটা'ব।

(সহসা বেশ-পরিবর্ত্তন ও কালীমূর্ত্তির আবির্ভাব)

শঙ্করের বর-
দৃপ্ত পাপ বৃত্রাসুর! দেখি আজ—দেখি
তোর শঙ্করের শূল, রক্ষা করে তোরে
কোন্ মহাশক্তি বলে, চামুণ্ডার খড়্গ
হ'তে! সাজ রণে ডাকিনী যোগিনীগণ!

(ডাকিনীগণের প্রবেশ)

(গীত)

ডাকিনীগণ!
সাজ্, সাজ্, সাজ্, রণ-সাজে সাজ্ না লো সবাই,
মা বলেছে, যুদ্ধে যেতে হবে ভাই।
সেথা মড়ার মাথা কড়্ কড়্ কড়্ পাবি চিবুতে,
ঢক্ ঢক্ ঢক্ দৈত্যরক্ত পাবি গিলিতে,
অস্থি মাংস, মেদ মজ্জা যে যা' খাবি পাবি লো তা
মা ডেকেছে—
আয় ছুটে আয়, দেরীতে আর কাজ নাই।

(নারদ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের প্রবেশ)

(গীত)

নারদ। সংহর সংহর শিবে।
ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি তব,
প্রলয়-দহনে মা গো দহিবে কি সৃষ্টি সব।
গভীর আরাবে তব,
তোয়-নিধি উছলিছে,
কোটি মুখ প্রকাশিয়া বাড়বাগ্নি উগরিছে—
মহামেঘ-প্রভা ঘোরা, মুক্তকেশী চতুর্ভুজা—
অরুণ-নয়নে জ্বলে, ধক্ ধক্ অগ্নি-শিখা
পদভারে থর থর, কাঁপে বিশ্ব চরাচর,
প্রসীদ প্রসীদ মা গো! রক্ষ ধরা দিগম্বরি!
অকালে প্রলয় নাহি কর দেবি শুভঙ্করি!

ব্রহ্মা। দেবি! স্মরিলে তোমার নাম, মুক্ত হয়
জীব বিষম সঙ্কট হ'তে। তাই দুর্গা
নাম তব, দুর্গতি-হারিণি। আদ্যাশক্তি!
তব শক্তি বলে মাতৃস্তনে হয় দেবি!
ক্ষীরের সঞ্চার। সৃষ্টি স্থিতি, সংহারের
তুমি মূলাধার! আমি, বিষ্ণু, মহেশ্বর,
আমরা ত' নিমিত্ত কেবল, মহাশক্তি
তব করিতে প্রকাশ। সৃষ্টি-লীলা তব
পালন, সংহার—সেও তোমারি অচিন্ত্য
লীলা। তুমি সৃজিয়াছ বিশ্ব, প্রতি জড়
অণু পরমাণু, করিয়াছ প্রাণময়
তোমারি চেতনা দিয়া; কোন্ দোষে মা গো।
অকালে প্রলয়গর্ভে চাহ নিক্ষেপিতে
আদরে আপন হাতে গড়িয়াছ যারে।

গৌরী। প্রজাপতি! প্রজার বিনাশ তরে, ধরি
নাই আমি এই প্রলয় মূরতি; নহে
বিশ্ব-লয় উদ্দেশ্য আমার। সৃষ্টি, স্থিতি,
সংহারের ভার আছে তোমাদের 'পরে।
আমি কেন পুনরায় সেই গুরুভার
করিব গ্রহণ? কিন্তু শুন পদ্মযোনি।
যেই দিন হ'তে নরলীলা করিয়াছি

পরকাশ, বৃত্তিচয় ধরিয়াছি বুকে ;
সেই দিন হ'তে, মাতৃস্নেহ সযতনে
পুষিতেছি হৃদে। শঙ্করের বরদৃপ্ত
দুষ্ট বৃত্রাসুর আজি হানিয়াছে তীক্ষ্ণ
শূল বক্ষে মম। কমলজ! প্রাণোপম
কুমার আমার মূর্চ্ছিত সমরস্থলে
দৈত্য-চক্র-ঘায়। মা'র প্রাণে কত বল সয় ?

ব্রহ্মা। ক্ষুদ্র পতঙ্গ দলিতে শিবে! বিশ্ব-
লোপ চাহ করিবারে? দুরাচার বৃত্র
আশুতোষে তপে তুষ্ট করি, লভিয়াছে
বর—হবে অজেয় সংগ্রামে এক ব্রহ্ম-
দিনমানব্যাপী। সেই বরে বৃত্র আজি
অমরা-ঈশ্বর! কিন্তু কত কাল আর ?
এই দিনমান হ'লে অবসান, ইন্দ্র
পুনঃ স্বর্গরাজ্য করিবে উদ্ধার,
শচী সনে স্বর্গ-সিংহাসনে বসিবে বাসব
পুনঃ।

গৌরী। যা' কহিলে সত্য কমল-সম্ভব!
আমি সংহারের ভার করিলে গ্রহণ
হবে শঙ্করের অপমান, তাই মনে
বিচারিয়া, সহিয়াছি এত দিন দৈত্য-
অত্যাচার। কিন্তু আর নহে; শূল হাতে
আপনি শঙ্কর, কিংবা চক্রধর যদি
সুদর্শন-করে পশেন সমরে—সাধ্য
নাহি রক্ষিতে দানবে চামুণ্ডার রোষে।

ব্রহ্মা। দেবি! কেন তুমি আপনারে হইতেছ
বিস্মরণ? আদ্যাশক্তি, তুমি বিনা শক্তি-
হীন বিধি বিষ্ণু হর। শক্তিদাত্রী তুমি,
প্রত্যাহার-ক্ষমতাও রয়েছে তোমার;
তবে আপনার প্রতি আপনি রুষিয়া
সৃষ্টি ধ্বংসে ফল কিবা মাতঃ? শঙ্করের
কিবা দোষ? নিজ হস্তে বিষবৃক্ষ করি
সংবর্দ্ধন, কহ দুর্গে! ছেদিতে তাহারে
কি বেদনা বাজে প্রাণে! মহাদেবি, ত্যজ
রোষ, ভোলানাথে নাহি কর অপমান।
রুষ্টা তুমি মহেশ্বরি স্মরিয়া স্কন্দের
ব্যথা! কেমনে ভুলিছ মা গো সৃজিয়াছ
দেবে স্পর্শাতীত প্রতিভার পরমাণু
দিয়া? ইন্দ্রজাল-সমুদ্ভূত ছায়াকায়া-
'পরে, দৈত্য-অস্ত্র সকলি বিফল দেবি!
দেব-দেহে, প্রতি লোমকূপে, চৈতন্যের
বিভা জাগে অনুক্ষণ; সংজ্ঞাহীন বল
মাতঃ! কেমনে সে হবে? দেব-দেহে সংজ্ঞা-
লোপ ক্ষণিক স্বপন। দেব-সেনাপতি
তেয়াগি জড়তা, পুনঃ মথিছে অরাতি-
কুল।

গৌরী। প্রজাপতি! তব বাক্যে ত্যজিলাম
রোষ। যাও সবে নিজ নিজ লোকে। যাও
ফিরি রমাপতি! বৈকুণ্ঠ-ভুবনে।

বিষ্ণু। দেবি!
কোটি কোটি প্রণিপাত চরণে তোমার।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—কুমেরু-পর্ব্বতের পাদদেশ।

ইন্দ্র।

ইন্দ্র। পাষাণী নিয়তি! একাসনে, অনশনে
কাটাইনু কত যুগ—দয়া কি হ'ল না
তবু ওই তব কঠিন হৃদয়ে। পড়ে
মনে, বসিলাম যবে তোমার ধেয়ানে
ছিল যেথা উত্তুঙ্গ গিরির শৃঙ্গ, শিরে
ধরি, চিরন্তন তুষারের শুভ্র শুচি
রজত-মুকুট, অরুণ-কিরণ-স্পর্শে
যাহে উঠিত ফুটিয়া প্রতিভার রাশি;
ছুটিত অযুত মুখে কনক-লহরী
শত ইন্দ্রধনু ফুটিত ভূধর-গায়।
এবে করি চক্ষু উন্মীলন হেরি তথা
বীচিমালা-বিক্ষোভিত দুস্তর সাগর
ফেনপুঞ্জ-আবরিত অযুত মস্তক
তুলি, গভীর নির্ঘোষে পূর্ণ করিতেছে
দশ দিক্। জননী গো! অমরের দেহ
বিশ্বধাতা করেছে সৃজন অবিনাশী
শক্তি-পুঞ্জ-সমষ্টি করিয়া, তা না হ'লে
এত দিন বাসব-শরীর, রেণু রেণু
হয়ে মিশে যেত ধূলিরাশি সহ এই
কুমেরুর পাদমূলে।

মা গো! যত দিন
নারিব তুষিতে তোরে, যত দিন নাহি
পাব শুনিতে তোমার মুখে, কোন্ গূঢ়
রহস্যের বলে স্বর্গরাজ্য-অধীশ্বর
দুর্বৃত্ত দানব—নিধন তাহার হবে
কি উপায়ে, তত দিন সহস্রাক্ষ, মুখ
তার না দেখাবে আর দেবতা-সমাজে।
পাষাণি! দেখিব তোর পাষাণ হৃদয়
কত দিনে হয় বিগলিত!

(পর্ব্বতের মধ্য হইতে ধীরে ধীরে
নিয়তির আবির্ভাব)

নিয়তি। দেবরাজ!
বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে তব দৈত্যহস্তে
হইয়া বিজিত; নহে কেন বৃথাকার্য্যে
কাটাইছ কাল—দেবশক্তি করিতেছ
ক্ষয়—মম আরাধনে। নিয়তি কখন'
তুষ্ট কিংবা রুষ্ট নহে কার প্রতি,
নিজ নিজ কর্ম্মফল ভুঞ্জে জীবকুল।
যবে মগ্ন থাকে সুখের সাগরে, ভাবে
মনে, সব তার নিজের অর্জ্জিত। কিন্তু
দুঃখ-ভারে যবে জীব হয় প্রপীড়িত,
নিয়তির স্কন্ধে ফেলে সমগ্র দোষের
ভার।
দেবেন্দ্র! আমার শকতি কিবা?
পদ্ম-যোনি-মনোভব আমি, কার্য্য মম
তাঁহার শাসন-দণ্ড করিতে চালনা,
তাঁহারি প্রণীত অলঙ্ঘ্য অটুট কূট
নিয়মের বলে।
সৃষ্টির প্রারম্ভে, যেই
পন্থা বিশ্বস্রষ্টা করেছে অঙ্কিত, সেই
পথ হ'তে জীব তিলমাত্র বিচলিত
হ'লে, হবে ব্রহ্মাণ্ডের লয়—কক্ষচ্যুত
হবে গ্রহ তারা, কিংবা কোটিখণ্ডে চূর্ণ
হয়ে পরিণত হবে কারণ-সলিল-
রূপে; অস্তিত্বের হবে লোপ।

ইন্দ্র। দেবি! নাহি
কহি তোমারে লঙ্ঘিতে সৃষ্টির নিয়ম।
নাহি মাগি তব পাশে, কর তুমি তিল-
মাত্র অতিক্রম পিতামহ-খুন্ন পন্থা।
ব্রহ্মাণ্ডের লয় ভাবি হয়ো না শঙ্কিতা
মাতঃ! ব্রহ্মাণ্ডের লয়ে বাসবের কিবা
লাভ? মাগি শুধু শ্রীচরণে এই ভিক্ষা,
কহ কিঙ্করেরে বৃত্রের অদৃষ্ট-লিপি
কত দিনে হইবে খণ্ডিত, মৃত্যু তার
কার করে, কোন্ অস্ত্রে হবে সংঘটিত।

নিয়তি। যদিও দেবেন্দ্র! আছে মানা ভবিষ্যৎ
করিবারে প্রকটিত, কিন্তু তব তরে
সে নিয়ম করিতে লঙ্ঘন করিয়াছি
সংকল্পন। সৃষ্টি—স্থিতি—দেবের স্থিতিতে।
সন্ত্রস্ত অমরগণ আশ্বাসিত নাহি
হ'লে সৃষ্টিরক্ষা হবে ভার। তাই আজি
দেবরাজ! তব পাশে করিনু প্রকাশ
বৃত্রের অদৃষ্ট-লিপি; শুন মন দিয়া,
নহে বহুদিন আর, বর্ষ-মাত্র আছে
ফুরাইতে ব্রহ্ম-দিনমান। সেই দিন,
অস্তমিত হ'লে দিনমণি, সাথে সাথে
তার সাঙ্গ হবে বৃত্রের জীবন-লীলা।
পুরন্দর! তব হস্তে বৃত্রের নিধন—
জেন সুনিশ্চয়। উপায় পন্থার কথা
কৈলাসে শঙ্কর-মুখে শুনিবে সকল।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—প্রাসাদের কক্ষ।

ঐন্দ্রিলা।

ঐন্দ্রিলা। উচ্চ আশা হৃদি-মাঝে করিতে পোষণ,
মিটাইতে উচ্চ সাধ কোমলা প্রবৃত্তি-
শিরে দানবী ঐন্দ্রিলা, অবাধে করিতে
পারে লক্ষ পদাঘাত।
যবে ঐন্দ্রিলার
হৃদে জাগে, পিপাসার ঘোর দাবানল,
কি করিবে কারুণ্যের উৎসরাজি—ক্ষুদ্র
মুখে ঢালি বিন্দু বিন্দু মাতৃস্নেহ কিংবা

পতি-প্রেম—শুধু শতগুণে সেই বহ্নি
করে সংবর্দ্ধিত।
যেই দিন মোর পাশে,
কহিল অনঙ্গ-রামা কথার প্রসঙ্গে—
শচী-অঙ্গ-লাবণ্য-প্রতিভা হেরি কোটি
কোকনদ ঈর্ষায় উঠিত ফুটি, নিজ
নিজ সুষমা-ভাণ্ডার সমগ্র প্রকাশি,
সেই দিন হ'তে আমি করিয়াছি পণ—
সখীগণ বাছি বাছি তুলিয়া আনিবে
বাপীবক্ষঃ হ'তে, সৌন্দর্য্যগরিমা-মত্ত
কুবলয়রাজি, আমি নখাঘাতে ছিন্ন
করি তাহাদের বিদলিব পদতলে!
হায় কষ্ট! শচী সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত
পীযূষ-ভাণ্ডার, আর দৈত্যরাজ-অঙ্ক-
লক্ষ্মী কিঙ্করীরও যোগ্যা নহে তার!

(বৃত্রের প্রবেশ)

বৃত্র। এ কি! এ কি! কনক-নলিনি! আজি দৈত্য-
রাজপুরে নিমগন আনন্দ-সাগরে
সবে—মহোৎসবে মত্ত দিতিসুতগণ
দনুজ-অঙ্গনা সবে হের লো ভামিনি!
শুনি কুমারের বিজয়-কাহিনী, নিজ-
হস্তে দেছে সাজাইয়া কনক-প্রদীপ-
মালা, থরে থরে হর্ম্ম্যরাজি-পথে। হের
দেবি! প্রতি গৃহ-দ্বারে রজত-কলস
শোভিতেছে মাঙ্গলিক আম্রশাখাসহ।
অমরার প্রতি শৈলচূড়ে হের দেবি!
করিতেছে বহ্ন্যুৎসব হর্ষোৎফুল্ল
দৈত্যগণ। পুরাঙ্গনাচয় উন্মোচিয়া
গবাক্ষের দ্বার, কনক-কঙ্কণ-শোভি
প্রসারি মৃণাল-বাহু, অকৃপণ করে
করিতেছে লাজ-বৃষ্টি রাজপথ'পরে।
এই আনন্দের দিনে, নিরানন্দ কেন
হেরি তোমারে ঐন্দ্রিলে,—দৈত্যরাজ-লক্ষ্মী
তুমি!

ঐন্দ্রিলা। স্বামিন্! হৃদয়-ঈশ্বর! তোমরা
পুরুষ—তনয়ের দীর্ঘ অদর্শনে, যেই
দুর্ব্বিষহ জ্বালা জ্বলে মাতার হৃদয়ে,
লক্ষাংশের একাংশও তার, নাহি পার
উপলব্ধি করিবারে তাহা। দৈত্যরাজ!
দৈত্যের বিজয়ে নহে উল্লাসিতা দৈত্য-
রাজ-অঙ্ক-লক্ষ্মী ঐন্দ্রিলা! স্বামিন্! দেব!
আনন্দ-সন্দোহাবেশে কণ্টকিত হের
কলেবর মোর, পূর্ণ প্রতি লোমকূপ।
কিন্তু নাথ, সহস্র হ'লেও নারী মোরা—
নারীর হৃদয়, মাতার হৃদয়, কি যে
উপাদানে গড়া শুধু জানেন বিধাতা।
প্রাণাধিক রুদ্রপীড় মর্ত্ত্যধামে গেছে
যুঝিবারে একা, অসংখ্য অরাতি সনে—
তাই মনে সহস্র দুশ্চিন্তা জাগে।

বৃত্র। শুধু
প্রিয়তমে! তব কল্পনা-স্বপন। সত্য
বটে রুদ্রপীড় গেছে একা, সত্য বটে
সুরগণ সংখ্যায় অধিক, কিন্তু দেবি!
অপ্রমেয় তেজোদৃপ্ত সিংহ-শিশু যবে
করে আক্রমণ মদমত্ত মাতঙ্গের
যূথে, কতক্ষণ দন্তিযূথ সহে বল
বিক্রম তাহার? পুত্র তব দৈত্যরাণি!
সংগ্রাম-কেশরী, দেবকুল ফেরুপাল।
ভেব না সরলে! তব হৃদয়-পুতলি
রণজয়ী, অচিরে আসিয়া প্রণমিবে
তব পদে; শচীরে আনিয়া দিবে ভক্তি-
উপহার মম ওই চরণকমলে।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক। দৈত্যরাজ! দ্বারদেশে বিজয়ী কুমার
সাথে প্রহরি-বেষ্টিত সুন্দর শিবিকা,
সখী সহ বন্দী ইন্দ্রজায়া!

বৃত্র। দৌবারিক!
রাজ-আজ্ঞা জানাও শিবিকা-বাহকগণে
লয়ে যেতে ইন্দ্রাণীরে রক্ষি-পরিবৃত
নন্দনকাননস্থিত রাজ-কারাগারে।
যাই, কুমারেরে সমাদরে লয়ে আসি
হেথা।

[বৃত্র ও দৌবারিকের প্রস্থান।

ঐন্দ্রিলা। দাম্ভিকা পৌলোমি, এই উপযুক্ত
পুরস্কার তোর! পাশবদ্ধা সিংহিনীরে
রাখিতে হইবে কুসুম-বিকীর্ণ অতি
মনোরম স্থানে; যেন প্রতি পুষ্পরেণু

অতীতের তীব্র স্মৃতি করিয়া বহন
শেল সম বিদ্ধ করে মর্ম্মগ্রন্থি তার।

(রুদ্রপীড়ের প্রবেশ)

রুদ্রপীড়। আশীষ জননি! কিঙ্কর নমিছে পদে।
ঐন্দ্রিলা। আয়—আয় আয় বুকে, কনক-পুতলি!
ঐন্দ্রিলার হৃদি-স্নিগ্ধকারী সুশীতল
চন্দন-প্রলেপ! স্বর্গ ছাড়া যত দিন
তুই, অমরা আছিল বৎস! অমার
আঁধারে ঘেরা। ঐন্দ্রিলার হৃদাকাশে
তুমি বৎস! পূর্ণিমার চাঁদ।
রুদ্রপীড়!
কেন বৎস, মর্ত্ত্যধামে বিলম্ব হইল
এত?
রুদ্রপীড়। জান মাতঃ! দেবের প্রতাপ! জান
গো জননি! কত যে দুষ্কর পরাভব
করিতে তাদের মুষ্টিমেয় সৈন্যবল
করিয়া সহায়।
ঐন্দ্রিলা। রণজয়ী এসেছ ত
ফিরিয়া কুমার, এনেছ ত ইন্দ্রাণীরে
বন্দিনী করিয়া?
রুদ্রপীড়। তব পূত পদরজ-
প্রসাদে জননি! বিজিত দেবতা, শচী
ইন্দ্রজায়া এসেছে বন্দিনীরূপে।
ঐন্দ্রিলা। বৎস
রুদ্রপীড়! কহিতে না পারি আমি কি যে
অমৃতের সরোবরে অবগাঢ় তনু
মম।

যাও বৎস! বিশ্রাম-আগারে রণ-
ক্লান্তি কর গিয়া দূর। আশীর্ব্বাদ করি,
হও চিরজীবী, অমর-বিজয়ী।
রুদ্রপীড়। মাতঃ!
কোটি কোটি প্রণাম চরণে। পিতৃদেব!
প্রণমে তনয়।
ঐন্দ্রিলা। সুরজয়ী হও বৎস।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—নন্দন-কাননস্থিত কারাগারের কক্ষ।

শচী ও চপলা।

শচী। সখি সৌদামিনি! কত দিনে দুর্ভাগ্যের
হবে শেষ, কত আর সহিবে লাঞ্ছনা
বল না বাসব-বাঞ্ছা।
আশুতোষ! জীবে
তব অপার করুণা, তবে শচী-ভাগ্যে
কেন বিপরীত?
চপলা। দেবরাণি! জ্ঞানবতী
তুমি। তোমারে প্রবোধ দিতে নাহি দেবি!
দাসীর শকতি। অমরার রাজলক্ষ্মী,
কত কাল বল আর নিয়তি বিমুখ
র'বে অমরের প্রতি? আশুতোষ হ'লে
তুষ্ট ঘুচিবে যন্ত্রণা, কেঁদ না স্বজনি!
শচী। সখি! মনে করি কাঁদিব না, আছিলাম
নৈমিষ-কাননে পাষাণে বাঁধিয়া বুক,
স্বর্গ হ'তে বহু দূরে; সেথা মন্দাকিনী
কল-নাদে পূর্ব্ব-মহত্বের হলাহল-
স্মৃতি ঢালিত না শ্রবণ-বিবরে মোর।
সেথা মন্দ মন্দ গন্ধবহ চুরি করি
পারিজাত-মকরন্দ, জাগাত না হৃদে
মম অতীতের অযুত স্বপন—তীব্র
বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালা।

সখি! আনিয়াছে
দৈত্যরাজ মোরে শুধু সেবিতে ঐন্দ্রিলা-
পদ, তবে কেন এই কনক-শৃঙ্খল?
বামদেব কত কাল রবে বল বাম?
সহচরি! অভাগিনী আমি, শত ক্লেশ
অবাধে সহিব—হেলায় ধরিব বুকে
গুরু দাসত্বের ভার; হৃদয়ের রক্ত
শোষি চেড়ীহস্ত-নিয়োজিত সুকঠোর
কশাঘাত অজস্র-শোণিত-বর্ষী,— পৃষ্ঠে
ল'ব বিদ্যাধরী-হস্ত-মুক্ত পুষ্পবৃষ্টি
সম, শুধু শুনি যদি রয়েছে কুশলে
প্রাণাধিক জয়ন্ত-কুমার, প্রাণেশ্বর
পুরন্দর আছেন কুশলে।

চপলা। হের দেবি!
আসিতেছে অনঙ্গ-রঙ্গিণী, কম অঙ্গ
দোলাইয়ে নানা রঙ্গে! হিম-শুভ্র
কম্বু-গ্রীবা-বিলম্বিত মন্দার-মালিকা
শোভিছে রতির বুকে, শোভে যথা চারু
পুষ্পহার মাঙ্গলিক হেম-কুম্ভ-গলে।

(রতির প্রবেশ)

শচী। এস কামপ্রিয়া! হেরিলে তোমারে জাগে
শচীর হৃদয়ে, অতীতের কোটিস্মৃতি
চিত্ত-বিমোহন। হায়, অদৃষ্টের দোষে
এবে স্বপ্ন-সম জ্ঞান হয় সব।
রতি। দেবি!
সুরেশ্বরি! কোটি প্রণিপাত তব পদ-
কোকনদে। আসিনু জননি! জানাইতে
তব পাশে সুসংবাদ এক—প্রাণাধিক
জয়ন্ত-কুমার লভিয়া চেতনা পুনঃ
মথিছেন আসি দৈত্য-অনীকিনীগণে;
হেরিয়া তাঁহারে হর্ষোৎফুল্ল দেবগণ।
শচী। রতি! রতি! যে শুভ সংবাদে সংবর্দ্ধিলা
মোরে; আজি তার প্রতিদান দিতে শক্তি
নাহি বাসব-প্রিয়ার—পরাধীনা আমি।
রতি। ভাবিও না রাজ-রাজেশ্বরি! দৈত্যরাজ-
শিরে অজস্র পাপের রাশি হয়েছে
সঞ্চিত—পূর্ণ তার পাপভার। বিনাশ
তাহার অতি শীঘ্র হবে সংঘটন। দেবি!
ভুলিও না আপনারে গুরু শোকভারে—
হ'ও না আকুলা লীলাময়ি! সুখ, দুঃখ—
প্রপঞ্চ কেবল। তুমি শক্তি-স্বরূপিণী—
নিজশক্তি প্রকটিত করি, সৃজিয়াছ
মায়া-তমসারে জীবের কল্যাণ হেতু—
তবে কেন মায়া-অন্ধ হতেছ আপনি?
ত্রিদিব-ঈশ্বরি! নিজহস্তে দৈত্যাধম
বৃত্র দুরাচার জ্বালিয়াছে ঘোর বহ্নি—
পতঙ্গের প্রায় সে অনলে ভস্মীভূত
হবে, জেন স্থির।
শচী। অনঙ্গ-রঙ্গিণি! শুনি
তব সুমধুর বাণী, আশার মুকুল
ফুটে তাপদগ্ধ হৃদয়ে আমার।

রতি। দেবি!
দাসীরে বিদায় দেহ ক্ষণেকের তরে।
দৈত্যজায়া বিকটা নাগিনী, মোরে পুরে
না হেরিলে, শতমুখে শত কুমন্ত্রণা
ঢালি দিবে পাপ দৈত্য-রাজ-শ্রুতি-
বিবরেতে; মোহ-অন্ধ দুরাচার দৈত্য
সাধ্যমত অপমান করিবে মোদের।
রাজেন্দ্রাণি! যাই তবে, অবসরমত
আসিব আবার—ঢালিব রাজীব-পদে
পূজা-উপচার।
শচী। যাও অনঙ্গ-ঘরণি!
মোর তরে কাজ নাই বৃথা কষ্ট সহি
তোমাদের। কাজ নাই অকারণে শিরে
ধরি লাঞ্ছনার ভার দৈত্যরাজ-করে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—দেবগণের সমর-সভা।

কার্ত্তিকেয়, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ ও যম।

কার্ত্তিকেয়। সুরবৃন্দ! দৈত্যমায়া প্রহেলিকা ঘোর
হের দেব-অনীকিনী ঘিরিয়া রয়েছে
অমরার চারিধার; প্রবেশ-তোরণে
সহস্র সতর্ক যোধ রয়েছে প্রহরী।
অত্যুচ্চ প্রাচীর-মালা উঠিয়াছে অভ্র
ভেদ করি। প্রাচীর-উপরে ভ্রমিতেছে
নিরন্তর দেবসেনাগণ দলে দলে।
হে ত্রিদশ-মণ্ডল! বুঝিতে না পারি
কি উপায়ে রুদ্রপীড় চতুরঙ্গ দলে
শচীরে বন্দিনী করি, আবার পশিল
ওই অমরা-ভিতরে, নির্নিমেষ দেব-
চক্ষে ধূলি-মুষ্টি করিয়া নিক্ষেপ।
বরুণ। শুন
দেব-সেনাপতি! এই হেতু সমরের
প্রারম্ভসময়ে বলেছিনু আমি তোমা
সবে, যত দিন নাহি আসে দেবরাজ,
স্থগিত থাকুক রণ। মহাশক্তিশালী

দৈত্যরাজ, দারুণ কৌশলী—তাহে দৈব
অনুকূল তার প্রতি; হেন অরাতির
সনে সংগ্রাম কেবল বৃথা শক্তি-ক্ষয়,
আর অনর্থক অপমান-ভোগ।

সূর্য্য। প্রচেতঃ!
বড় লজ্জাকর ত্রিলোক-পূজিত দেব-
মুখে এই কাপুরুষোচিত কথা—যুদ্ধে
জয়-পরাজয়, প্রকৃতির নীতি; এক
পক্ষ হইলে বিজয়ী, পরাজিত অন্য
পক্ষ অবশ্য হইবে; কিন্তু তাই ব'লে
ভাবী পরাভব-ভয়ে অধীর হইয়া
চেষ্টাহীন, আশাহীন জীবন-বহন -
শত গুণে শ্রেয়ঃ না কি মৃত্যু তার চেয়ে?
আর অপমান, সে ত দেবতার অতি
আদরের ধন—উন্নতি-মার্গের সে ত
বিস্তৃত সোপান; তাই বলি দেবগণ!
শত অপমান অবহেলে ধরি শিরে,
শত বাধা অবাধে চরণে দলি, কূট
তর্ক কূট যুক্তি সিন্ধুজলে নিক্ষেপিয়া
হও সবে অগ্রসর কর্ত্তব্যের পথে।

যম। দেবসেনাপতি স্কন্দ! সমবেত দেব-
গণ! যেই দিন হ'তে মায়াবী দৈত্যের
সাথে বাধিয়াছে রণ, সেই দিন হ'তে
ত্রিদশের আছিল উচিত, বিসর্জ্জিতে
বিস্মৃতির অতল সলিলে ত্রিদিবের
মান অপমান চিন্তা। ভাবিয়া দেখহ
মনে, এক পিতা বিশ্বধাতা দেব দৈত্য
আমাদের—শুধু মাতৃ-ভেদে আমাদের
সম্বন্ধ-বিভেদ—অদিতির গর্ভজাত
দেবগণ জন্মাবধি শত্রু দানবের।
হেন জাত-শত্রু প্রাকৃত-নিয়মে, কভু
নারে শান্তিতে করিতে বাস। যত দিন
দেব কিংবা দানবের নাহি হবে লোপ,
তত দিন শান্তি নাহি হবে স্বর্গধামে;
দেব আর দৈত্য-মাঝে চলিবে বিষম
দ্বন্দ্ব। অমরের অস্তিত্ব-বিলোপ সে ত
নিসর্গের নিয়ম-অতীত, দনুজের
লোপ নহে কল্পনার বহির্ভূত।

বরুণ। সত্য
যা কহিলে প্রেত-পতি! কিন্তু মহাশক্তি
ধরে বৃত্র; তাহে শিব-বলে বলী। হেন
শক্তিশালী শত্রুসনে সংগ্রামে উচিত
সুযোগ অপেক্ষা।

বায়ু। সুযোগ—দুর্য্যোগ পাশি!
আমার ধারণা, উদ্যোগী পুরুষ-পাশে
উভয় সমান। মানি আমি মহাবলী
বৃত্রাসুর, মানি আমি অপ্রমেয় সৈন্য-
বল তার, কিন্তু তাই ব'লে দেবতার
নিশ্চেষ্টতা নহে ত উচিত।

(এক জন দেবসেনার প্রবেশ)

দেবসেনা। সেনাপতি!
উপস্থিত দ্বারদেশে স্বপ্ন দেবরাজ-
দূত, লয়ে তাঁর কুশল-বারতা।

কার্ত্তিকেয়। শীঘ্র
তাঁরে পদোচিত সংবর্দ্ধনা করি, লয়ে
এস হেথা।

দেবসেনা। যথা আজ্ঞা দেবসেনাপতি!

(স্বপ্নের প্রবেশ)

স্বপ্ন। লহ দেববৃন্দ! দেবদূত স্বপনের
সভক্তি প্রণতি।

কার্ত্তিকেয়। স্বাগত হে মতিমান্
সুসন্দেশ-বহ! কহ ত্বরা, দেবরাজ
আছেন কেমন? কত শত কল্প ধরি,
শতমখ আছেন নিয়ত নিয়তির
আরাধনে। তুষ্টা কি পাষাণী এত দিনে
ত্রিদশ-বৃন্দের' পরে? হয়েছে কি দূত!
বাসবের বাসনা সফল? নিয়তি কি
প্রকটিত করেছেন সহস্র-লোচন-
পাশে, দৈত্যরাজ-ভাগ্যের ভারতী? কহ
দূতবর! কহ সবিস্তারে আনিয়াছ
যে সংবাদ।

স্বপ্ন। হে ত্রিদশবৃন্দ! আজি হেন'
সুসংবাদ করিয়া বহন উপস্থিত
হইয়াছি তব পাশে, বহু ভাগ্যবান্
গণি আপনারে। দেবগণ, পূর্ণ মম
ক্ষুদ্র হৃদি আনন্দ-সন্দোহে, কণ্টকিত
কলেবর মম বাখানিতে সে সংবাদ।
দেবগণ! এত দিনে কঠিনা নিয়তি
পরিতুষ্টা দেবরাজ-আরাধনে—এত

দিনে বৃত্রের নিধন-পন্থা প্রকটিত
হইয়াছে ইন্দ্রের সমীপে।

কার্ত্তিকেয়। কহ দূত!
কহ প্রকাশিয়া কত দিন আর পাপ
দৈত্যরাজ অমরা ভুঞ্জিবে, কত কাল
আর দেবগণ সহিবেক হেন হীন
নির্ব্বাসন-ক্লেশ।

স্বপ্ন। দেবসেনাপতি স্কন্দ!
নহে বহুদিন আর— বৃত্রের পাপের
ভার পূর্ণপ্রায় এবে। ব্রহ্মদিনমান
অবসানে, অসংশয় বৃত্রের নিধন,
দেবরাজ ইন্দ্র হস্তে মৃত্যু দানবের।

কার্ত্তিকেয়। দেবদূত স্বপ্ন। যে শুভ বারতা আজি
অমৃতের ধারা সম দেবতা-শ্রবণে
দিলে ঢালি, পুরস্কার তার নাহি দূত।
ত্রিজগতে—কি দিব তোমারে? স্বর্গচ্যুত
অমরের কিবা ধন আছে?

স্বপ্ন। সেনাপতি।
অন্য কোন পুরস্কারে নাহি প্রয়োজন।
আজি যে বিধাতা মোরে করিলেন এই
সুসন্দেশবহ, সেই অনুগ্রহ বহু-
মূল্য পুরস্কার মোর।

কার্ত্তিকেয়। যাও দূতবর।
বিশ্রাম-আগারে, ক্লান্ত তুমি পথশ্রমে।

[দূতের প্রস্থান।

কার্ত্তিকেয়। দেবগণ। বড় আনন্দের দিন আজ—
অবিলম্বে এ সংবাদ কর গে প্রচার
ত্রিদশ-মণ্ডলী-মাঝে। এত দিনে বুঝি
বিধি হইলা সদয় দেবতার পরে।
সুরবৃন্দ! নিজ নিজ নিয়মিত স্থানে
সবে করহ গমন। রহিও সতর্ক
যেন অতর্কিত-ভাবে, দৈত্যরাজ-চর
কেহ না পশে ত্রিদিবে, কিংবা কেহ
বাহিরিয়া নাহি আসে অমরা হইতে।

সূর্য্য। সেনাপতি! আজ্ঞা তব হইবে পালিত।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—কৈলাস-পর্ব্বত।

হর, গৌরী ও প্রমথগণ।

প্রমথগণ। (গীত)

সকলে। হেরি যুগল-মূরতি আজি
নয়ন জুড়াল রে!

পুরুষগণ। আধ বাঘছাল কটিতটে রাজে -

স্ত্রীগণ। আধ পট্ট-বসন সুন্দর সাজে,

পুরুষগণ। আধেক হৃদয়ে শোভে ফণি-মালা,

স্ত্রীগণ। আধ মণিময় হার উজালা।

পুরুষগণ। আধ শিরসি মণ্ডন জটাজুট—

স্ত্রীগণ। আধ চারু-কবরীবদ্ধ চূর্ণ কুন্তল রে।
শোভে শুভ্র বিভূতি-লেপ।

স্ত্রীগণ। আধ কনক-কমলে কিবা
কুঙ্কুম-পরাগ রে!

গৌরী। কহ আশুতোষ! সে নিগূঢ় তত্ত্ব, কহ
প্রকাশিয়া। বিধাতার সৃষ্ট জীব যদি
চলে, বিধাতা-প্রণীত নিয়মের বলে,
আত্মার দায়িত্ব তবে কিসে বল হয়
নিরূপণ? যবে বিশ্বধাতা করিলেন
গুণের সৃজন, কেন নাহি সৃজিলেন
তিনি অবিমিশ্র সুখ, কিংবা অবিমিশ্র
সৎ। সুখ দুঃখ, সদসৎ উভয়ের
সংমিশ্রণ কহ দেব! কোন্ প্রয়োজনে?

হর। লীলাময়ি! সবি ত তোমার লীলা। তুমি
আদ্যাশক্তি—পরমা প্রকৃতি তুমি। দেবি!
নাহি জানি কিবা আছে অজ্ঞাত তোমার?
তুমি লো সাবিত্রী, আগম পুরাণ বেদ-
আদি প্রসবিত্রী, তুমি তত্ত্বের অতীতা।
তবে যেই তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসিছ মোরে
তাহাও প্রপঞ্চ তব।

শুন বিশ্বেশ্বরি!
সুখ দুঃখ কিংবা সদসৎ উভয়ের
সংমিশ্রণ বিনা, অসম্ভব হ'ত দেবি!
সুখ কিংবা সতের স্থায়িত্ব-জ্ঞান। যেই
রূপ তিক্ততা ব্যতীত মিষ্টত্বের নাহি
উপলব্ধি হয় প্রকৃষ্ট আকারে, যেই
রূপ মিশ্র-সৃষ্টি শর্করার মিষ্ট স্বাদ

অনুভূতি হেতু ; সেইরূপ দুঃখ-সৃষ্টি ;
জেন শুধু সুখের সম্যক্ বিকাশ তরে।
গৌরী। বুঝিনু শঙ্কর ! কিন্তু সুখ হ'তে দুঃখ
পরিণাম কেন এত গুরুতর দেব ?
হর। মহাদেবি ! মানবের প্রবৃত্তি-নিচয়
মদমত্ত বারণ সমান, নিরন্তর
কদাচার কুপথেতে হয় ধাবমান ;
তাহাদের সংযমের তরে দুঃখ শুধু
কঠিন অঙ্কুশ।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। দেবদেব মহেশ্বর !
আদ্যাশক্তি ভগবতি ! সহস্রলোচন
প্রণমিছে রাজীব-চরণে।
গৌরী। স্বাগত হে
দেবরাজ ! ধন্য আজি কৈলাসভুবন,
চরণ-পরশে তব। কহ পুরন্দর !
কি কারণে এত কাল এস নাই তুমি
কৈলাস-ধামেতে।
হর। কি হেতু হে সহস্রাক্ষ !
কালিমা ঢালিয়া দেছে বিশুষ্ক বদনে ;
অনাহার-শীর্ণ কেন হেরি কলেবর
তব ? ইন্দ্রপ্রিয়া আছেন কুশলে ? ভাল
আছে জয়ন্ত কুমার ? অমর-মণ্ডলী
আছেন কুশলে সবে ?
ইন্দ্র। ওহে বিরূপাক্ষ !
দেবগণ চিরদিন আশ্রিত তোমার।
তবে কেন তুমি নিদারুণ দেবদেব !
এত, আশ্রিত জনের প্রতি ?
ত্রিপুরারি !
জিজ্ঞাসিছ দেবের কুশল ? অন্তর্য্যামী
তুমি দেব ! জান না কি, কি দুর্দ্দশা সহে
দেবগণ ?
হর। দেবরাজ ! সংসার-বিরাগী
ভূতনাথ শঙ্কর ভিখারী, সংসারের
কোলাহল-শূন্য এই বিজন পর্ব্বতে
বসি পরমার্থ-সুধাপানে রহিয়াছি
নিমগন, ক্ষম মোরে সহস্রলোচন !
কহ প্রকাশিয়া, দেবগণ হইয়াছে
পতিত কি নূতন সঙ্কটে কিছু ?
গৌরী। কহ
ত্বরা, কহ ত্রিদিব-ঈশ্বর ! ঔৎসুক্যে
দহিছে হৃদি।
ইন্দ্র। হায় নগেন্দ্র-নন্দিনি,
ভুলিলে কি তুমিও জননি দেবগণে,
ভুলেছেন ভোলানাথ অকৃতী সন্তানে
যথা ? হায় মাতঃ ! কি কহিব এক মুখে
আমি, যে দুর্দ্দশা করিয়াছে অমরের,
শঙ্করের বরপুষ্ট পাপ বৃত্রাসুর।
বিজিত অমরাবতী মহেশের বরে—
বিজয়ী দানব অধিরূঢ় অমরার
কনক-আসনে, স্বর্গচ্যুত দেবগণ,
নিপাতিত শশঙ্কের ত্রিশূল-আঘাতে
পাতালের অন্ধতম দেশে—শক্তিহীন,
জ্যোতির্হীন প্রতিভাবিহীন। মন্দাকিনী
আবিলা দনুজ-স্পর্শে ; নন্দন লুণ্ঠিত ;
অমরার রাজলক্ষ্মী শচী পুলোমজা,
জীর্ণা শীর্ণা কাঙ্গালিনী-বেশে করে বাস
মর্ত্ত্যধামে নৈমিষ-কাননে ; দেববালা-
গণ স্বর্গ হ'তে বিতাড়িত, নাহি জানি
কোন্ জন কোথা করে বাস। হতভাগ্য
আমি, ত্রিদিব-বিজয়াবধি আছিলাম
বহু কল্প ধরি কুমেরু-জঠরে, মগ্ন
নিয়তির আরাধনে। জানি না জননি !
বাসবের ভাগ্যে আর কত অপমান
আছে বৃত্রাসুরকরে !
গৌরী। হে সুরেন্দ্র ! শুনি
তব বিষাদ-কাহিনী, শুনি দুরাচার
দানবের অত্যাচার-কথা কণ্টকিত
হয় রোষে কলেবর মোর। ইচ্ছা হয়,
এই দণ্ডে করে ধরি করাল কৃপাণ
চামুণ্ডারূপেতে নামি সমর-প্রাঙ্গণে
দনুজের মুণ্ড লয়ে করি কন্দু-ক্রীড়া।
হর। সত্য ওহে পুরন্দর ! আছিলাম ভুলি
তোমাদের এত দিন, আছিলাম ভুলি
দেবগণে, প্রাণাধিক ষড়াননে ছিনু
ভুলি, ভবানীর সহ তত্ত্ব-আলাপনে।
এখনো কি হয় নাই বৃত্রের নিধন ?
আখণ্ডল ! এখনো কি দুষ্ট বৃত্রাসুর
দেবগণে করে নিপীড়ন ?

ইন্দ্র। দেবতার নিগ্রহের কথা, অমরের দুর্দ্দশার
কথা দেবদেব! কি আর কহিব; কোথা
পাব উপযুক্ত ভাষা? উপস্থিত ইন্দ্র
তব পদতলে তাত! তাহারে প্রত্যক্ষ
করি, বুঝে লও দেবতার দশা।

হর। জান
দেবরাজ! ভক্তজনে শঙ্কর নিয়ত
তুষ্ট। মম প্রীতি-সাধনের তরে, বৃত্র
আরম্ভিল সুদুশ্চর তপ; তপস্যায়
তুষ্ট হয়ে, ভাল মন্দ না করি বিচার,
অর্পিলাম রুদ্রশূল তারে; বিষবৃক্ষ
নিজ হস্তে করিনু রোপণ।

ইন্দ্র। হে অনাদি
পুরুষ-প্রধান! গতানুশোচনা কভু
সাজে না তোমারে। ওহে ত্রিপুরারি, তব
কটাক্ষ-ঈক্ষণে পতঙ্গের প্রায় দগ্ধ
হয় অযুত দনুজ-রাজ, ক্ষুদ্র কীট
বৃত্র কোন্ ছার! হে শূলিন্, স্তোকবাক্যে
ভুলায়ো না দাসে। রক্ষ এবে বিরূপাক্ষ!
দেবতার মান; তা না হলে বাসবের
অমরত্ব দাও ঘুচাইয়া।

হর। হে সুরেন্দ্র!
ত্যজ ক্ষোভ। ভাব দেখি, অমর কি পর
মোর? দেবদেব নাম ত্রিলোক-বিদিত
মহেশের; দেবতার দুঃখে সহস্রাক্ষ!
কাঁদে না কি প্রাণ মম? অধীর হয়ো না
মতিমান্! বিপদের প্রতীকার হবে
অসংশয়। মানসে স্মরণ করিলাম
আমি বিরিঞ্চি কেশবে, এই দণ্ডে হেথা
উপস্থিত হইবেন প্রজাপতি সহ
গোলোক-ঈশ্বর। সবে মিলি যুক্তি করি
করিব হে সুরপতি, যে হয় বিহিত।

(ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রবেশ)

বিষ্ণু। জয় ত্রিলোক-পালন, ত্রিপুর-নাশন,
ত্রিশূল-ধারণ, দিগম্বর!

ব্রহ্মা। জয় চণ্ডি দিগম্বরি, কৌষিকি শঙ্করি!
শৈল-সুতা-করুণা-আধার!

বিষ্ণু। জয় কালি কপালিনি, মুণ্ডমালিনি,
খর্পরধারিণি দৈত্যহরে!

ব্রহ্মা। জয় বৃষভ-বাহন ত্রিগুণ-ধারণ
অনঙ্গ-শাসন শূল করে!

বিষ্ণু। কৈলাস-ঈশ্বর! প্রণমিছে রাঙ্গা পায়
বিরিঞ্চি কেশব, অসময়ে আমাদের
কি হেতু স্মরিলে দেবদেব?

হর। স্বাগত হে গোলোক-ঈশ্বর!
সুস্বাগত প্রজাপতি!
রমাপতি, বৈকুণ্ঠের কুশল সকল?
প্রজাপতি, ব্রহ্মলোক আছে ত কুশলে?

বিষ্ণু। দেবদেব! আশীর্ব্বাদে তব গোলোকের
কুশল সকল।

ব্রহ্মা। চিদানন্দ! অনুগ্রহে
তব, ব্রহ্মলোকে সকলি আনন্দময়।

হর। শুন গোলোকের পতি, পিতামহ শুন
মন দিয়া, যেই হেতু তোমা দোঁহে এই
অসময়ে করিনু স্মরণ।

হের ওই
অবনত-মুখে দাঁড়ায়ে ত্রিদশ-পতি—
শিরে রুক্ষ কেশ-পাশ, অনাহার-শীর্ণ
কলেবর, হীন-প্রভ কোটর-প্রবিষ্ট
সহস্র লোচন—উপস্থিত দেবরাজ
হেথা অমরার ঘোর অনিষ্ট-সংবাদ
লয়ে। বৃত্রাসুর আরম্ভিল সুদুশ্চর
তপ্ বহু কল্প ধরি, তুষ্ট হয়ে তপে
অর্পিনু তাহারে শিবশূল ভয়ঙ্কর।
বরপুষ্ট দুষ্ট দানবের পতি, করি
ভূমণ্ডল জয় তুষ্ট নাহি হয়ে, স্বর্গ
করিয়াছে আক্রমণ; দেবগণে যুদ্ধে
পরাজিয়া স্বর্গচ্যুত করেছে তাদের।
ত্রিশূল-আঘাতে নিপাতিত করিয়াছে
সুরবৃন্দে পাতাল-গহ্বরে। অমরের
লাঞ্ছনার কথা বর্ণনা-অতীত। বিষ্ণু,
আছে তব প্রতি লোক-পালনের ভার।
সৃষ্টি-কর্ত্তা তুমি বিধি! সবে মিলে কর
স্থির এবে বৃত্রের দমনোপায়; নহে
রমাপতি, সৃষ্টি-লোপ হবে অসংশয়।

বিষ্ণু। বৃত্রবধ বিশ্বম্ভর! সমস্যা কঠিন—
শিববর অলঙ্ঘ্য অটুট। স্ব-ইচ্ছায়
যত দিন বৃত্র দুরাচার না লঙ্ঘিবে

শিববাক্য, তত দিন অজেয় সমরে
দনুজের পতি।
ব্রহ্মা। শিব-বরে হে কেশব!
অবসানে ব্রহ্ম-দিনমান দনুজের
সৌভাগ্য-তপন যাবে অস্তাচলে।
ইন্দ্র। ব্রহ্ম-
দিনমান কিন্তু নাহি হ'তে অবসান
বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর! অমরের নাম লুপ্ত
হবে ত্রিদিব হইতে।

(স্বপ্নের প্রবেশ)

স্বপ্ন। দেববৃন্দ! স্বপ্ন
দেবরাজদূত প্রণমে রাজীব-পদে;
আসিলাম অমরা হইতে অতি ঘোর
দুঃসংবাদ লয়ে। পিনাকীর বর-পুষ্ট
দুষ্ট বৃত্রাসুর পরিতুষ্ট নাহি হয়ে
দেবগণে স্বর্গচ্যুত করি, হানিয়াছে
তাহাদের শিরে ভয়ঙ্কর অপমান
তীক্ষ্ণ বজ্র। অমরার অধীশ্বরী শচী
পুলোমজা আছিল মরতে। দুষ্ট দৈত্য
পাঠাইল মর্ত্ত্যে নিজপুত্র রুদ্রপীড়—
কুলাঙ্গার দনুজ-তনয় আকর্ষিয়া
কেশে দেবী পৌলোমীরে লয়ে গেছে স্বর্গ-
পুরে; দাসীরূপে রাখিয়াছে তাঁরে দুষ্ট
দৈত্য-অবরোধে।
ইন্দ্র। হে ধূর্জ্জটি! এখনো কি
তৃপ্ত নহ তুমি, এখনো কি পূর্ণ নহে
বাসবের লাঞ্ছনার ভার? সিংহাসন-
বিচ্যুত বাসব দেবগণ বিতাড়িত
স্বর্গরাজ্য হ'তে, পুত্র মূর্চ্ছাগত, পত্নী
দৈত্য-অপহৃত! হান ত্রিপুরারি, হান
বক্ষে বাসবের সংহার-ত্রিশূল তব—
ঘুচে যাক অমরত্ব মোর।
শিব। শান্ত হও
আখণ্ডল! না কর বিলাপ।
ইন্দ্র। নাহি কাজ
প্রবোধিয়া মোরে বিশ্বম্ভর! বুঝিলাম
ইচ্ছা তব শিব! ইন্দ্রের লাঞ্ছনা কিছু
নাহি রবে অবশিষ্ট দনুজের করে।
কেন হে বিধাতঃ! দেবতা সৃজিলে, কেন
অমরত্ব দিলে তাহাদের? কাজ নাই
আর দেববৃন্দ! চেষ্টাহীন পরামর্শে;
বাসবে বিদায় দেহ; দেখ পরীক্ষিয়া
একা ইন্দ্র কোদণ্ড-সহায় কি করিতে
পারে স্বর্গপুরে।
শিব। শান্ত হও হে সুরেন্দ্র!
শুনিয়া শচীর কথা বড়ই বেদনা
বাজিয়াছে প্রাণে মোর। আরে দুরাচার
বৃত্র, এত দিনে কালপূর্ণ তোর। দর্প-
অন্ধ হয়ে কলঙ্কিলি রে পামর শিবদত্ত
বর, নিগ্রহি শক্তিরে—যার বলে শিব
বলীয়ান্। এত স্পর্দ্ধা তোর? বিধি এই
দণ্ডে কর ছেদ বৃত্রের নিয়তি-সূত্র।
প্রত্যাহার করিলাম সংহার-ত্রিশূল
আমি, যার বলে বিজয়ী দানব।
ব্রহ্মা। যথা আজ্ঞা ত্রিলোক-ঈশ্বর! আদেশে তোমার
বৃত্রের নিয়তি-লিপি অকালে খণ্ডিনু।
পশুপতি তব আজ্ঞাক্রমে, আর সৃষ্টি-
রক্ষা তরে, না হইতে অবসান ব্রহ্ম-
দিবা, কৃতক-নিদ্রায় মুদিব নয়ন
আমি। সেই সন্ধি-কালে, বৃত্রের নিধন।
যাও পুরন্দর! কামনা সফল তব।
এত দিনে ঘুচিল হে দেবের দুর্গতি।
যাও অবিলম্বে মর্ত্ত্যে বদরিকাশ্রমে;
হেরিবে তথায় মহাতেজাঃ মহাঋষি
এক, দধীচি তাঁহার নাম। আত্মত্যাগ
তাঁর কল্পনা-অতীত। সাধিতে দেবের
কার্য্য অবহেলে ঋষি-শ্রেষ্ঠ বিসর্জ্জিবে
প্রাণ। অস্থি তাঁর ধৌত করি ভাগীরথী-
নীরে লয়ে যাও বীর! বিশ্বশিল্পি-পাশে।
জাহ্নবী-সলিল-ধৌত দধীচির পূত
অস্থি, বিশ্বকর্ম্মা-করে হইয়ে অদ্ভুত
অস্ত্র—অমোঘ-সন্ধান প্রতি পরমাণু
তার হইবে প্রাণিত শিববল আর
ব্রহ্ম-তেজ উভয়ের সংমিশ্রণে—বজ্র
নামে অভিহিত হবে সে আয়ুধ। যাও
পুরন্দর, বৃথা কালক্ষেপে প্রয়োজন
কিবা?
ইন্দ্র। সৃষ্টিমূলা আদ্যাশক্তি! গোলোকের
পতি! দেবদেব শম্ভু! প্রজাপতি! দাস

ইন্দ্র বিদায় মাগিছে সবার চরণে
চলিনু মরতে দধীচির অন্বেষণে।
শিব। যাও দেবরাজ! করি আশীর্ব্বাদ; হও
পূর্ণ-মনস্কাম।

[ইন্দ্রের প্রস্থান।

ক্ষমা কর বৈকুণ্ঠের
পতি! কষ্ট দিছি অসময়ে আহ্বানিয়া
তোমা দোঁহে; কমলারে জানাইও মম
প্রগাঢ় আশিস্।

প্রজাপতি! দেবরিপু
অচিরে হইবে নাশ। শক্তির ইচ্ছায়,
পরিপূর্ণ আজি সবাকার মনস্কাম।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—ঐন্দ্রিলার কক্ষ।

ঐন্দ্রিলা।

ঐন্দ্রিলা। পালিবে না নিদেশ আমার? আসিবে না
কক্ষে মোর? চম্পক-কোরক বিনিন্দিত
শোভন অঙ্গুলে নাহি ক'রে দিবে মম
কবরী-রচনা? কমল-প্রতিম করে
দিবে না ললাটে মম উশীর-চন্দন-
লেপ? কণ্ঠে মম দিবে না কি দোলাইয়া
স্বহস্ত-রচিত-মন্দার-মালিকা? কোলে
তুলে সযতনে পা দুখানি মম, দিবে
না কি করিয়া রঞ্জিত অরুণ অলক্ত-
রাগে?

কেন আসিবে না? সহস্র হলেও
দাসী-মাত্র!

কোন কালে আছিল পৌলোমী
অমরা-ঈশ্বরী; কোন কালে দৈত্যরাজ-
অঙ্ক-লক্ষ্মী ছিলা বটে সামান্যা দানবী
মাত্র! কিন্তু বিপর্য্যস্ত সে অবস্থা এবে
বিধাতার ইচ্ছাক্রমে। ক্ষুধিত মার্জ্জার
সম আছিলাম এত দিন অবসর
অপেক্ষিয়া—নেহারি সম্মুখে কুহেলিকা-
সমাচ্ছন্ন যবনিকা ঘোর, ভেবেছিনু
মনে, জগতের বুঝি ওইখানে শেষ।
এবে সেই স্বপ্ন হইয়াছে দূর; এবে
চঞ্চলা নিয়তি উত্তোলিয়া ধীরে ধীরে
কুহেলিকা-যবনিকা, দেছে দেখাইয়া
মোরে কার্য্যক্ষেত্র সুদূর-বিস্তৃত—যেন
তর্জ্জনী-নির্দ্দেশে দিতেছে দেখায়ে—ওই
দেখ কর্ত্তব্যের পথ "হও অগ্রসর—
কিংবা কর পরিহার।"

বহুক্ষণ হ'ল,
পাঠায়েছি কন্দর্প-পত্নীরে, কেশে ধরি
শচীরে আনিতে হেথা, এখনো সে
কেন বিলম্বিছে?

বোধ হয়, রতিমুখে
শুনিয়া আদেশ মম, গর্ব্বিতা রমণী
উন্মত্তা হয়েছে রোষে। তাই ভালবাসি
আমি!—সিংহিনীরে পিঞ্জর-আবদ্ধ করি,
সুতপ্ত-শলাকা-বিদ্ধ করিতে তাহারে
বড় ভালবাসি আমি। বড় ভালবাসি
আশীবিষ-বিষ-দন্ত কাড়ি লয়ে, তার
সনে করিতে কৌতুক।

(রতির প্রবেশ)

কহ কামপ্রিয়া!
কি হেতু বিলম্ব এত? অবনত কেন
তব বদনমণ্ডল? শচী কি তোমারে
কিছু করেছে লাঞ্ছনা?
রতি। রাজেন্দ্রাণি! কেন
তুমি অকারণে হতেছ বিহ্বলা? তুমি
অমরার অধীশ্বরী, শচী দাসীমাত্র
তব। অসম্ভব ইন্দ্রজায়া অপমান
করিবে তোমারে!
ঐন্দ্রিলা। কহ অনঙ্গরঞ্জিণি!
কেন বিষণ্ণা নেহারি তোমা?
রতি। দৈত্যরাণি!
তব আজ্ঞাক্রমে গিয়াছিনু পরীক্ষিতে
আমি বাসব-জায়ার মন; কিন্তু যেই
দৃশ্য সেইখানে করিনু দর্শন, ত হে
সাহস না হ'ল মোর প্রকাশিতে তাঁর
পাশে নিদেশ তোমার! মম নৈসর্গিক

প্রগল্‌ভতা—সর্ব্বলোকে জানে, কামপ্রিয়া
প্রগল্‌ভার শিরোমণি—মম নৈসর্গিক
বাক্যকুশলতা গেল পলাইয়া। শুধু
নির্নিমেষ নেত্রে দেখিতে লাগিনু দেবি!
সে অপূর্ব্ব শোভা।

ঐন্দ্রিলা। কহ ত্বরা কামপ্রিয়া!
কিবা দৃশ্য করিলে দর্শন? ঔৎসুক্যে
দহিছে মম হৃদি।

রতি। দেখিলাম রাজেন্দ্রাণি!
ইন্দ্রাণী বসিয়া আছে মনঃশিলাতলে
দর্পণ-নিহিত বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি
সম। মার্ত্তণ্ডের করস্পৃষ্ট পরিম্লান
সিতাব্জের মত, বদন-মণ্ডলে ব্যাপ্ত
বিষাদের ছায়া। রুক্ষ কেশপাশ শীর্ণ
গণ্ডে পাণ্ডুর ললাটে পড়েছে ছড়ায়ে।
করতল কপোল-বিন্যস্ত, যেন এক
বৃন্তে দুটি শুভ্র কোকনদ কানে কানে
কহিতেছে বিষাদ-কাহিনী। চারু অঙ্গ
আচ্ছাদিত গৈরিক বসনে। পাদযুগ
ফুটায়েছে সহস্র কমল সেই স্বচ্ছ
মনঃশিলাতলে।

ঐন্দ্রিলা। রতি! রতি! বহুবার
শুনিয়াছি তব মুখে শচীর রূপের
কথা। তার তরে অনঙ্গ-মোহিনি! প্রেরি
নাই তোমারে শচীর পাশে। কহ তুমি—
কহ প্রকাশিয়া যেই নূতন ঘটনা
প্রত্যক্ষ করিলে তথা।

রতি। দেখিলাম দেবি!
সেই স্ফাটিক শিলায় শচীর চরণ-
তলে উপবিষ্টা যুবরাজ-জায়া।

ঐন্দ্রিলা। রতি!
সত্য কি লো এ সংবাদ! দৈত্য-কুলবধূ
এত কি নির্লজ্জা—এত কি হৃদয়-হীনা!
হানি বাজ লজ্জার মস্তকে, নিজ-বংশ-
গরিমায় দিয়া বিসর্জ্জন, সেবিতেছে
অরাতি-চরণ! না—না—রতি দৃষ্টিভ্রম
হইয়াছে তব। চল রতি, এই দণ্ডে
সেই দৃশ্য দেখাও আমারে—এই দণ্ডে
লয়ে যাও মোরে, যেথা দৈত্যকুলগ্লানি
ইন্দুবালা করিতেছে দাসী পৌলোমীর
পদসেবা। আমি এই বাম-পদাঘাতে
সেই অভিনয় ক'রে দিব শেষ।
শচি!
এতদূর স্পর্দ্ধা তোর! সিংহীর বিবরে
পশি, তারই অপমান! সরলা বালিকা—
তারে ছলি?—তবে না কি দেবগণ নাহি
জানে ছল?—আরে, আরে কপট রমণি!
ছলনা করিয়া তারে কালি দিলি তুই
কি সাহসে অকলঙ্ক দনুজের কুলে?
প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা ব্রত মম। সেই
ব্রত হবে উদ্‌যাপিত শচীর শোণিতে।

[প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—নন্দন-কাননস্থ দেবীমন্দির
মন্দিরের সোপানোপরি উপবিষ্টা
শচী ও ইন্দুবালা।

শচী। ফিরে যাও পুরে রাজবালা! কেন তুমি
অভাগিনী শচীর লাগিয়ে অকারণে
ভুঞ্জিবে যন্ত্রণা?

ইন্দুবালা। শুন অমরা-ঈশ্বরি!
কহি সত্য করি, যদি হৃদয়-শোণিত
দিয়া বিন্দুমাত্র উপকার হয় তব,
ইন্দুবালা এখনি প্রস্তুত তাহে।

শচী। হায়!
সরলা বালিকা! তুমি চাহ ঢাকিয়া
রাখিতে মোরে ঐন্দ্রিলার রোষ হ'তে
নিজ ক্ষুদ্র প্রাণটুকু দিয়া। ভেবেছ কি
রাজবালা! শচী এতই কঠিনা?—তাই
আপনারে লুকায়ে রাখিবে অন্তরালে
তব, অম্লান বদনে দেখিবে নয়নে
দনুজের নখাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হ'তে
অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত এই মন্দার-কলিকা?

ইন্দুবালা। তার তরে ভাবিও না পুলোম-নন্দিনি!
প্রাণ মম অতি ক্ষুদ্র—অতীব নগণ্য,
যদি বিনিময়ে তার বিন্দুমাত্র উপকার
হয় তব, সার্থক জীবন মম।

শচী। এই
সুবৃহৎ দৈত্যরাজপুরে একমাত্র
তুমিই সুহৃৎ মোর। ইন্দুবালা, বড়
ভাগ্যহীনা আমি ; যেই জন মোর তরে
ফেলে এক বিন্দু অশ্রুজল, বিধাতার
বিড়ম্বনে তারেই কাঁদিতে হয়। তাই
সুবর্ণ-লতিকা! আতঙ্কে শিহরে প্রাণ—
পাছে মম ভাগ্যদোষে তোমার বিপদ
কিছু ঘটে!

ইন্দুবালা। দেবেন্দ্রাণি! কেন বৃথা মোরে
নিরস্ত করিছ কর্ত্তব্যের পথ হ'তে?
দেবি! স্থির জানি আমি, বিপদ সম্পদ
সকলের মূলাধার ধূর্জ্জটীর কৃপা।
স্থির জানি আমি, দেবতার প্রতি কভু
নহে দেবতা বিরূপ, স্থির জানি আমি—
তুমি শক্তি—তুমি ভগবতী, জয় কিংবা
পরাজয় সকলি প্রপঞ্চ তব। আর
ভুলায়ো না জগৎ-জননি! মোহ-ঘোর
যদি দিয়াছ ভাঙ্গিয়া, ভ্রম-অন্ধকারে
পুনঃ কেন মোরে চাহ নিক্ষেপিতে? মাতঃ,
বল দাও মোরে অযুত অশনি হৃদে
অবাধে ধরিতে। দুই জনে বসি এস
মোরা শঙ্করী পূজিতে।

শচী। চল নৃপবালা!

শচী ও ইন্দুবালা। (দ্বৈত গীত)

শচী। ভুলিলি মা হররামা! কোন্ দোষে বল্ দেবতারে।

ইন্দুবালা। ও রাঙ্গা চরণ বিনা, নাহি কিছু ত্রিসংসারে।

শচী। বিপদ-বিশীর্ণ-কায়া,

ইন্দুবালা। দেখিস্ না কি শিবজায়া!

উভয়ে। মহামায়া! পদছায়া দে মা, এ আঁধারে।

শচী। তব রোষ-কালানলে,

ইন্দুবালা। দেবতা যে গেল জ্ব'লে,

উভয়ে। করুণা-পীযূষ-ধারা ঢাল মা গো ত্বরা ক'রে!

(ঐন্দ্রিলা ও রতির প্রবেশ)

ঐন্দ্রিলা। ছি ছি লজ্জা! ছি ছি ঘৃণা! দৈত্যকুল-বধূ,
কেশরি-নন্দিনী হয়ে করিছ কেমনে
তুমি শৃগালীর সেবা? ভুলিলা কি বালা,
পতি তব বীরকুলচূড়ামণি ; অবহেলে
পরাজিয়া দেবসেনাপতি স্কন্দে বাঁধি
আনিয়াছে পৌলোমীরে নৈমিষ হইতে?
ভুলিলা কি রাজবালা! অতি তুচ্ছ
দাসী মাত্র শচী—সামান্য বন্দিনীরূপে
রহিয়াছে দৈত্যরাজপুরে? তুমি কোন্
মুখে হানি বাজ বংশ-গৌরবের শিরে
সেবিছ তাহারে? বধূ, কি কহিবে, যবে
দৈত্যাঙ্গনাগণ শুনিবে এ কথা? ঘৃণা—
লজ্জা—রোষ তব কুকর্ম্মের ফল। কোথা
বল পাবে ঠাঁই লুকায়ে রাখিতে। যবে
গর্ব্বোন্নত-শির দনুজ-পতির পাশে
রচি গাথা পৌরশিশুগণ গাহিবে লো
এই কলঙ্কের কথা, কি কহিবে বল
দৈত্যকুলপতি?

ইন্দুবালা। মাতঃ! পূজ্যজনে পূজা-
দানে ক্ষতি কিবা? বাসবঘরণী শচী
স্বর্গরাজ্যেশ্বরী—পরমাপ্রকৃতিরূপা—
সকলের আরাধ্যা যে তিনি—বহু ভাগ্য
তার, চরণারবিন্দ তাঁর যেই করে
সেবা। মা গো! আমি অতি দীনা, ধর্ম্মকর্ম্ম-
হীনা—বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত লভিলাম যদি
ও রাঙ্গা চরণ, কেন তবে কর মানা
বুকে ধরিবারে তারে?

ঐন্দ্রিলা। হা বিধাতঃ! এত
কাল স্তন্যদুগ্ধদানে পুষিনু কি বুকে
ধরি উগ্রকালকূটভরা আশীবিষ?
আরে রে কুলপাংশুলে! দৈত্যরাণি-পাশে
কহিতে এ কথা জিহ্বা নাহি দ্বিখণ্ডিত
হ'ল তোর? বজ্র নাহি পড়িল কি শিরে?
আর পিশাচিনী শচী! সরলারে ছলে
ভুলাইয়া তুই অর্পিলি যেমন অতি
ঘোর কলঙ্ক-কালিমা, অকলঙ্ক এই
দৈত্যকুলে ; আমি উপযুক্ত প্রতিশোধ
দিব তার, নখাঘাতে উপাড়িয়া অক্ষি-
দ্বয় তোর। শির তোর করিয়া মুণ্ডন
মুখে চূণ-কালি দিয়া, ফিরাইব তোরে
অমরার পথে পথে ; ক'বে পৌরজনে
তর্জ্জনী হেলায়ে "ওই দেখ, ওই যায়
দুষ্টা মায়াবিনী! ইন্দ্রের ঘরণী!"

ইন্দুবালা। মা গো!
দাও মোরে যেই শাস্তি উপযুক্ত হয়,
ইন্দ্র-ললনারে ক'র না লাঞ্ছনা। কোন
দোষে দোষী নহে পুলোম-আত্মজা।

ঐন্দ্রিলা। আরে,
আরে কুল-কলঙ্কিনি! পদাঘাত তোর
উপযুক্ত পুরস্কার।

(ঐন্দ্রিলার পদাঘাতোদ্যম, মঙ্গল-ঘট চূর্ণ হওন ও কালীমূর্ত্তি দ্বিখণ্ডিত হইয়া তন্মধ্য হইতে জ্যোতির আবির্ভাব)

ইন্দুবালা। মা গো, কি করিলে!
মঙ্গলার হেমঘট ফেলিলে ভাঙ্গিয়া
পদাঘাতে! জ্বালিলে মা চামুণ্ডার রোষ-
হুতাশন—হায়, পতঙ্গের প্রায় আজি
দগ্ধ হয় বুঝি সমগ্র এ দৈত্যকুল!

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—সুমেরু-পর্ব্বতমালা।

পর্ব্বত-গাত্রে দেহ সংন্যস্ত করিয়া দণ্ডায়মান বৃত্র।

বৃত্র। আজি কেন—কেন আজি, শিহরিছে ক্ষণে
ক্ষণে অন্তর আমার; সহসা কেন বা
কেশরাশি মম হ'ল কণ্টকিত; কেন
আজি অকস্মাৎ তৃতীয় নয়নে মোর
পলক পড়িল; নিঃশঙ্ক বৃত্রের হৃদে
কেন আজি শঙ্কার উদ্রেক?
দেখিয়াছি
প্রকৃতির বহু ক্ষিপ্ত লীলা; দেখিয়াছি
যুগান্তের কালে দশ দিকে প্রবাহিত
হ'তে প্রলয়-মারুত-শ্বাস; দেখিয়াছি
ভীম ভূকম্পনে, কোটি খণ্ডে চূর্ণ হ'তে
ভূধরের চূড়া; দেখিয়াছি উন্মত্তা
বারিধি-বুকে; অযুত ঊর্ম্মি,
কিরীট-মণ্ডিত-শির ঊর্দ্ধে উত্তোলিয়া
গভীর আরাবে গগন করিয়া পূর্ণ
ছাইছে ধরণী-তল—কই, তাহাতেও
মুহূর্ত্তের তরে কাঁপে নি হৃদয় মম।

(নেপথ্যে বজ্রপতনশব্দ)

এ কি!
এ কি বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! কেন আজি
প্রকৃতির হেন পৈশাচিকী লীলা?
পুনঃ! অকস্মাৎ কেন কাল মেঘে ঢেকে
গেল বসুধার মুখ? কি জানি বা কেন
প্রকৃতির অতি ক্ষুদ্র নিশ্বাসপতনে
আজি দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিছে মম
প্রাণ! এ কি ধূর্জ্জটীর রোষ? কুপিত কি
মহেশ্বর মোর প্রতি? অজ্ঞানতাবশে
আমি করিনু কি কোনরূপে শঙ্করের
অপমান? হায়, বৃত্রের উন্নতিমূল—
একমাত্র চন্দ্রশেখরের দয়া। শুধু
দেবাদিদেবের বরে অমরমণ্ডলী
বিতাড়িত স্বর্গ হ'তে; দৈত্যপতি বৃত্র
অধিষ্ঠিত স্বর্গ-সিংহাসনে!
ওহো এ কি
অবসাদ! অকস্মাৎ কে যেন আমার
শক্তিপুঞ্জ লইল হরিয়া! বিজড়িত
আলসে নয়নত্রয়। অনুভব হয়
কালকূট করেছি সেবন।

(শিলাফলকে উপবেশন)

নিদ্রিত কি
জাগরিত আমি না পারি বুঝিতে। দেব
বিশ্বম্ভর! ভুলিও না অকৃতী সন্তানে।

(ঐন্দ্রিলার ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব)

কে তুমি মোহিনী-মূর্ত্তি! ঝলসিত সর্ব্ব
অঙ্গ স্বর্গীয় বিভায়, দাঁড়াইলা আসি
মম চক্ষের সম্মুখে। গুচ্ছ গুচ্ছ কুঞ্চিত
অলকদাম হিমশুভ্র ললাট-ফলকে,
গোলাপী কপোলে, সুবলিত অংসোপরি
থরে থরে রয়েছে পড়িয়া। অধরের
প্রান্তে, স্নিগ্ধ শান্ত সমুজ্জ্বল হাসিরেখা
যেন তড়িৎ রেখেছে ধরি তড়িতের
ফাঁদে? কে তুমি লো প্রস্ফুটিত কুসুমের

দাম, অজস্র ধারায় ঢালিছ সৌরভ-
রাশি চারিদিকে মোর! পুলকিত মম
কলেবর। চম্পক-কোরক সম শোভন
অঙ্গুলি নির্দ্দেশি আকাশে তুমি কি লো
দেখাইয়া দিতেছ আমারে কর্ত্তব্যের
পথ? কিংবা তুমি উদার হৃদয়-ক্ষেত্রে
মোর বিধাতার হস্ত-উপ্ত কার্য্যরূপা
মূলশক্তি আশ্বাসিতে মোরে, আজি মূর্ত্তি
পরিগ্রহি দাঁড়ায়েছ আসিয়া শোভনে,
চক্ষের সম্মুখে মম। যে হও সে হও
তুমি—দেবী কি পিশাচী—তুমি মম
উপাস্য দেবতা—আমি তব আজ্ঞাবাহী
দাস। যেথা ইচ্ছা লয়ে চল মোরে; ছায়া
সম যাইব পশ্চাতে।

(ঐন্দ্রিলার প্রবেশ)

ঐন্দ্রিলা। হৃদয়-বল্লভ!

বৃত্র। ঐন্দ্রিলে! ঐন্দ্রিলে! জান যদি, কহ ত্বরা—
তুমি সত্য, কিংবা সত্য সেই ছায়া-মূর্ত্তি?

ঐন্দ্রিলা। নাথ! কার কথা কহ কিছুই বুঝিতে
নারি। ছায়া-মূর্ত্তি কেবা?—আমি ত ছায়ার
মত আছি প্রাণেশ্বর! পশ্চাতে তোমার!

বৃত্র। না—না—দৈত্যরাণি! স্বচক্ষে দেখেছি আমি।
ছায়া-মূর্ত্তি কভু নহে কল্পনা স্বপন।
শুন দৈত্যরাজ-প্রিয়া! দেখিয়াছি আমি
হৃদয়ের উপাস্য দেবীরে, বিমণ্ডিত
স্বর্গীয় প্রতিভা-পুঞ্জে—সেই মধুরিমা
বুকে মুখে গায়ে; গর্ব্ব-বিস্ফারিত নেত্রে
সেই স্থির-প্রতিজ্ঞার রেখা; ফুলভারে
ঈষৎ আনতা কনক-বল্লরী সম
সেই দেহবল্লীখানি—ঐন্দ্রিলে! ঐন্দ্রিলে!
প্রতি অঙ্গ তার তোমারি আদর্শে গড়া।
তেজোদৃপ্ত সিংহিনীর মত প্রতি পাদ-
ক্ষেপ তার, অবিকল তোমারি মতন।

ঐন্দ্রিলা। নাথ! আমি তব হৃদিরাজ্য ক'রে আছি
অধিকার—তাই দেব! শয়নে স্বপনে
দেখিতে পাও হে মোরে।

বৃত্র। সত্য দৈত্যরাণি!
তুমি মম হৃদয়ের শক্তি-স্বরূপিণী;
কিন্তু নাহি জানি কি যে আশঙ্কার গুরু
ভারে প্রপীড়িত হৃদি মম হইতেছে
আজি; জ্ঞান হয়, অস্তমিতপ্রায় বুঝি
দৈত্যরাজ-সৌভাগ্য-তপন। দৈত্যরাণি,
শুনিলে না বিনা মেঘে বজ্রের নির্ঘোষ?
দেখিলে না অকস্মাৎ প্রলয়-বারিদ
রোধিল মার্ত্তণ্ড-কর, দিবাভাগে শিবা-
কুল উঠিল কাঁদিয়া?

ঐন্দ্রিলা। দৈত্যকুলেশ্বর!
জ্ঞানহীন ক্ষীণদৃষ্টি নর, প্রকৃতির
সনে মানবের অদৃষ্টের কাল্পনিক
সম্বন্ধ স্থাপিয়া, চেষ্টা করে ভাগ্যফল
করিতে গণনা। নাথ, সামান্য বাত্যায়
আলোড়িত হয় বটে সরোবর-নীর—
কিন্তু প্রবল ঝঞ্ঝায় বিক্ষোভিত নাহি
হয় মহার্ণব কভু।

বৃত্র। প্রিয়তমে! নারী
তুমি—সহস্র হ'লেও তুমি নারী। তুমি
কেমনে বুঝিবে কি ভীষণ ঝটিকার
হতেছে উদ্ভব, ছাইতে তিমির-জালে
মম ভাগ্যাকাশ—প্রকৃতির এই সব
আকস্মিক নিয়ম-ব্যত্যয় জেন দেবি!
ধূর্জ্জটি-ভ্রূকুটি মাত্র—পৌলোমীর পরে
অত্যাচার-পাদপের বিষময় ফল।

ঐন্দ্রিলা। নারী আমি! দৈত্যরাজ, সত্য যা কহিলে
নারী আমি; কিন্তু দেব! দানবী ঐন্দ্রিলা
নহে সামান্যা রমণী—বাসববিজয়ী
বৃত্র—তাহার হৃদয়মণি। প্রাণেশ্বর,
যদি বিজিত শত্রুর পরে স্বেচ্ছামত
নাহি পার করিবারে শাস্তির বিধান,
হেন স্বর্গজয়ে কাজ কিবা? যদি রাজ-
দণ্ড করিতে চালনা বিকম্পিত করে,
দীন নেত্রে চাহিয়া থাকিবে অপরের
মুখপানে, দৈত্যরাজ! কাজ কিবা হেন
রাজ্যে? হয় হ'ক ধূর্জ্জটী বিরূপ, কিংবা
চক্রপাণি সুদর্শন-করে পশে যদি রণে,
ডর কিবা তাতে? তব অপ্রমেয় শক্তি-
প্রভঞ্জন ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড সম দিবে
উড়াইয়া অমরের পুঞ্জীভূত বল।

বৃত্র। দৈত্যরাজলক্ষ্মি! তব বাক্যে বাহুযুগে
মম পূর্ব্বশক্তি হইল উদয়; হৃদে

মম সাহস আসিল ফিরি! যুদ্ধ—যুদ্ধ
পণ মম—মন্দাকিনী হইবে রঞ্জিত
অমর-রুধিরে। এস, দৈত্যরাজপ্রিয়ে!
[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—ইন্দুবালার কক্ষ।

রুদ্রপীড় ও ইন্দুবালা।

রুদ্রপীড়। বীরাত্মজা তুমি দেবি! বীরের অঙ্গনা;—
বীরধর্ম্ম জান ত সকলি; জান তুমি,
সমর-দুন্দুভি-ধ্বনি পশে যবে গিয়া
বীরের শ্রবণে, কি উল্লাসে কণ্টকিত
হয় প্রিয়ে, কলেবর তার! লক্ষ লক্ষ
মমতা-বন্ধন ছেদি ঝাঁপ দেয় বীর
সমর-সাগর-মাঝে। সেনা-তরঙ্গের
ভীষণ নির্ঘোষ, রুধির-চর্চ্চিত মুক্ত
কৃপাণের অবিরাম উত্থান-পতন—
প্রকাশি তড়িৎ-লেখা ঝলসি নয়ন—
আহতের আর্ত্তনাদ, রুধির-লোলুপ
শ্বাপদের নরমুণ্ড লয়ে পৈশাচিকী
ক্রীড়া—প্রকৃতির বিভীষিকা মূর্ত্তি যত
মনে হয়, জীবের নিকটে, দৃশ্য অতি
সুমধুর।

ইন্দুবালা। নাথ! ইষ্টদেব তুমি মম।
তপ জপ ধ্যান জ্ঞান সকলি আমার
তুমি। তুমি যা ব'লে বুঝাও মোরে, আমি
তাই হৃদয়ে পুষিয়া রাখি ইষ্টমন্ত্র
সম। নাহি জানি প্রাণেশ্বর, পাপ কিংবা
পুণ্য তাহা—চাহি না জানিতে।

রুদ্রপীড়। পুণ্যময়ি!
তুমি লক্ষ্য—তুমি ধ্রুবতারা জীবনের
মোর, উজলিয়া হৃদয়-আকাশ, তুমি
ছড়াইছ হেমকর অকৃপণ করে।
আমি অন্ধ—আমি স্বার্থপর—এক দিন
তরে ক্ষুদ্র চেষ্টা মাত্র না করিনু হায়!
তোমার প্রীতির তরে। কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য
কর্ত্তব্যের তরে, কুন্দকলি! দলিলাম
তোমারে চরণে নির্দয়!

ইন্দুবালা। প্রাণেশ্বর!
মুখে নাহি আন হেন কথা। আমি তব
হৃদয়-মন্দির যুড়ে আছি ব'সে; মোর
সম ভাগ্যবতী কেবা?

রুদ্রপীড়। প্রিয়তমে, ছিল
মম নিশ্চয় ধারণা, এক দিন পাব
বিশ্রামের অবসর। ভেবেছিনু মনে,
সেই দিন প্রায়শ্চিত্ত করিব পাপের—
বুঝি প্রাণেশ্বরি! সে বাসনা মম হ'ল
না পুরণ; হৃদয়ের সাধ বুঝি যায়
হৃদয়ে মিলায়ে।

ইন্দুবালা। কেন হৃদয়-ঈশ্বর!
নিরুৎসাহ কেন আজি নিরখি তোমারে?
অরাতি মথিতে সুনিপুণ চিরদিন
তুমি। বিজয়-কমলা প্রসন্না তোমার
'পরে, জানি প্রাণেশ্বর, চিরদিন—তবে
কেন কহিতেছ আজি অশুভ বারতা
হেন? অমঙ্গল চিন্তা করি কেন প্রভু,
হতেছ শঙ্কিত?

রুদ্রপীড়। জান ত সরলা! ভাগ্য
নহে সুপ্রসন্ন কারো প্রতি চিরকাল।
কমলা চঞ্চলা অতি!—আজি যারে লক্ষ্য
করি হাসিমুখে করে নিরীক্ষণ; কালি
তার দিক হ'তে রোষাচ্ছন্ন ফিরাইয়ে
লয় মুখ। এত দিন ভাগ্যলক্ষ্মী ছিলা
সুপ্রসন্না দৈত্যরাজ-পরে; এত দিন
শঙ্করের কৃপা করেছিল রক্ষা তাঁরে
সহস্র বিপদ হ'তে। এবে, ধূর্জ্জটীর
রোষে, জ্ঞান হয় বুঝি ভস্ম হয় দেবি!
সমগ্র দনুজকুল।

ইন্দুবালা। হৃদয়-ঈশ্বর!
থর থর কাঁপে মম প্রাণ, তব মুখে
শুনি এই কথা। বিক্রম-কেশরী তুমি
দেব, বিদিত ত্রিলোকে!

(এক জন পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। প্রণমি চরণে
যুবরাজ, রাজমাতা করেন আহ্বান।

রুদ্রপীড়। দাসি! জননীর শ্রীচরণে এই দণ্ডে

জানাও সংবাদ—অচিরে কিঙ্কর গিয়া
প্রণমিবে তাঁর রাঙা পায়।

পরিচারিকা। যথা
যুবরাজ!

[পরিচারিকার প্রস্থান।

রুদ্রপীড়। এস হৃদে, হৃদি-স্নিগ্ধকারী
উষীর-চন্দন-লেপ! স্পর্শে স্পর্শে তব
হৃদয়ের মাঝে মম মুহ্যমান চেতনা
উঠুক জাগি, প্রতি লোমকূপ দিয়া
মর্ম্মে মর্ম্মে পশুক বাহিয়া অমৃতের
ধারা; তোমার প্রেমের ভারে পঞ্জরের
অস্থি মম শত খণ্ডে ভাঙিয়া চূরিয়া
জনমের মত বিলুপ্ত করিয়া দিক্
তোমার আমার অন্তরের মাঝে এই
স্থূল ব্যবধান।

ইন্দুবালা। নাথ! অভাগিনী আমি।

রুদ্রপীড়। প্রিয়তমে! মুছ অশ্রু; আজি আমাদের
পূর্ণ মিলনের দিন! সুনীল গগনে
হের ওই পূর্ণ শশধর হেমকর
ছড়াইছে অকৃপণ করে, হের বাপী-
বক্ষে বিচ্ছুরিত পূর্ণ ছায়া তার, ছুটে
লাবণ্যের ধারা লহরে লহরে, হের
ওই কূলে কূলে পূর্ণ মন্দাকিনী,
পূর্ণ বুকে পূর্ণ মুখে পূর্ণ অংসোপরি
নিবিড় নিতম্বে জোছনা-নিচোল ঝাঁপি
হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছে অনন্তের
পানে; কুল কুল রবে মাতায়ে হৃদয়—
উৎসবের বংশীধ্বনি পশে গিয়া যবে
মানব-হৃদয়ের প্রতি স্পর্শে তার বাজি
উঠে হৃদিতন্ত্রী যথা করুণ মূর্চ্ছনে।
এস প্রিয়ে, ব'স আসি হৃদি পদ্মাসনে,
হৃদি-রাজ্যে মম পূর্ণ অভিষেক তব
আজি। এস প্রাণেশ্বরি, পূর্ণ আলিঙ্গনে।
হাসি মুখে দাও লো বিদায়। যদি ফিরি,
দেখা হ'বে পুনরায়, নহে এই শেষ।
আসি প্রিয়তমে, যামিনী অতীত-প্রায়।

[রুদ্রপীড়ের প্রস্থান।

ইন্দুবালা। (গীত)

আমার জীবন-নদী ওই যে বহিয়া যায়
আমি শূন্য হৃদয় ল'য়ে
দাঁড়ায়ে রয়েছি হায়!
তবু ত মাধবী রাতে শেফালী ফুটিয়াছিল
মলয়-সমীর তারে সোহাগে চুমিয়াছিল
শারদ প্রভাতে হায় অরুণ উদিয়াছিল
হেমবাসে উষারাণী আশিস্ ঢালিয়াছিল
নিদাঘ-তপন-তাপে
এবে শুকাল মুকুল হায়!
স্বপনে গড়ান ছবি
বুঝি স্বপনে মিলায়ে যায়!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—বদরিকাশ্রম।

দধীচি, মুনিগণ ও মুনিপত্নীগণ।

মুনিগণ ও মুনিপত্নীগণ। (গীত)

নিশি অবসানে হিরণ-বিমানে
সমুয়ল সলিলজ-নাথ;
নলিনী বিষাদিনী মুদল দুনয়ন
শশধর সাথ।
তমসা-দুকূল পরিহরি উষা
পিন্ধল কনক-বাস;
কণ্ঠে দোলায়ল মোতিম হার
বদনে ফুটল লহু হাস।
আও সবে মিলি প্রেম-আনন্দে
বন্দে শ্রীগুরুচরণম্
মোক্ষ ফল যদি লপ্সসি অন্তে
লহ চরণ-কমলে শরণম্।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। ঋষিশ্রেষ্ঠ! সহস্রাক্ষ প্রণমে চরণে।

দধীচি। স্বাগত হে ত্রিদিব-ঈশ্বর! আজি মম
কোন্ পুণ্যফলে দেবরাজ, তব সনে
হইল সাক্ষাৎ। পবিত্র আশ্রম তব
শ্রীপদ-পরশে। কেন শতমখ, বল

বিষণ্ণ তোমারে হেরি ; অক্ষি তব কেন
বদ্ধ ভূতলের পানে ? ললাটে চিন্তার
রেখা কি হেতু বাসব ?

ইন্দ্র। হায় ঋষিশ্রেষ্ঠ !
কেমনে কহিব বল কি ঘোর ব্যসনে
নিপতিত দেববৃন্দ আজি। তপোধন,
শতমখ নহে আর ত্রিদিব-ঈশ্বর।
ধূর্জ্জটীর বরে স্বর্গ দৈত্যকরগত ;
দনুজ-অধিপ বৃত্র অধিষ্ঠিত স্বর্গ-
সিংহাসনে ; বিতাড়িত ত্রিদশ সকলে
অমরা হইতে ; বাসবের অঙ্কলক্ষ্মী
শচী পুলোমজা, সামান্যা বন্দিনী সম
যাপিছেন কাল দৈত্যরাজ অবরোধে।

দধীচি। দেবরাজ, দানবের অত্যাচারে আছি
মোরা উৎপীড়িত চিরকাল ; যাগ যজ্ঞ
তপশ্চরণের অন্তরায় চিরদিন তারা ;
কিন্তু হেরি এবে ধৃষ্টতা তাদের গেছে
সীমা অতিক্রম করি। দেবতার সনে
বাদ—পতনের সূত্রপাত। শতমখ,
স্বর্গ উদ্ধারের করিতেছ আয়োজন
কিবা ; কোথা এবে ত্রিদিবমণ্ডল ?

ইন্দ্র। শুন
তাপস-প্রবর ! শঙ্কর-ত্রিশূলাঘাতে
পড়ি পাতালের অন্ধতম দেশে ; আমি
বহু কল্পাবধি আছিলাম নিয়তির
আরাধনে মগ্ন, কুমেরু-জঠরে। আজি
শুনিলাম দূতমুখে, দেবগণ মোহ
পরিহরি, নববলে উদ্দীপিত হয়ে
সবে মিলি করিয়াছে স্বর্গ অবরোধ।
কিন্তু ফল কিবা তাহে ? জান তুমি দেব,
দৈববলে বলীয়ান্ দৈত্যকুলপতি
দৈবশক্তি বিনা সেই বৃত্রের নিধন
নিতান্তই অসম্ভব,—কুসুমের দল
দিয়া শিলাখণ্ড ছেদন-প্রয়াস ! তাই
দেব, অবহেলি অযুত কর্ত্তব্য, ছিনু
এত কাল ধরি, অনাহারে অনিদ্রায়
কঠোর সাধনে, রুষ্টা নিয়তিরে তুষ্ট
করি জানিবারে দনুজনিধনোপায়।
আশীর্ব্বাদে তব হে তাপসশ্রেষ্ঠ !
হইয়াছে কথঞ্চিৎ সিদ্ধ মনস্কাম।
কিন্তু হায় নিরাশার ভারে প্রপীড়িত
হৃদি মম, হেরি ব্যাধি হ'তে ভেষজ
ভীষণ।

দধীচি। দেবরাজ ! কৌতূহল নিবার
আমার, প্রকাশিয়া আমূল ঘটনা।

ইন্দ্র। দেব !
শুনিলাম নিয়তির মুখে, অবসানে
ব্রহ্ম-দিনমান বৃত্রের নিধন, মম
হস্তে। কহিলেন তিনি শঙ্করের মুখে
শুনিতে সকল।

দধীচি। কি শুনিলে সহস্রাক্ষ,
ধূর্জ্জটীর মুখে ?

ইন্দ্র। নিয়তি-আদেশে, মুনে !
যাইনু কৈলাসে। প্রণমিয়া পার্ব্বতীশে
নিবেদিনু দেবতার দুর্দ্দশা-কাহিনী।
শুনি তাহা শঙ্করের উপজিল দয়া।
মানসে স্মরিয়া প্রজাপতি কেশবেরে,
তিন জনে যুক্তি করি স্থির, কালপূর্ণ
নাহি হ'তে খণ্ডিলেন বৃত্রের নিয়তি-
সূত্র।

দধীচি। আখণ্ডল ! বড় আনন্দের কথা !
মহেশ্বর রুষ্ট আজি দানবের 'পরে ;
স্থির জেন, দনুজের রক্ষা নাহি আর।

ইন্দ্র। সত্য মুনে ! এর চেয়ে আনন্দ-সংবাদ
দেবতার নাহি কিছু আর ; কিন্তু হায় !
অভাগা বাসব-ভাগ্যে অমৃত হইল বুঝি
তীব্র কালকূট। দনুজ-কবল হ'তে
লভিতে নিষ্কৃতি, বুঝি তাপস-প্রবর !
ব্রহ্ম-রোষ-হুতাশনে ভস্মীভূত হয়
আজি সহস্র-লোচন।

দধীচি। কেন দেবরাজ !
অকারণে হ'তেছ বিহ্বল ? ব্রহ্মা, বিষ্ণু,
মহেশ্বর এক সাথে মিলি সেই যুক্তি
করিলা নির্ণয়, ব্রহ্ম-রোষ-ভয় তাহে
বল, সম্ভবে কেমনে ?

ইন্দ্র। শুন তবে, শুন
ঋষিশ্রেষ্ঠ ! নিদারুণ কথা—ছত্রে ছত্রে
যার তীক্ষ্ণ কালকূট হবে উদ্গীরিত ;
উচ্চারণ-মাত্রে যাহা, প্রলয় মারুত
হবে প্রবাহিত—কক্ষচ্যুত হবে গ্রহ

তারা, বিশ্বলয়কারী কালানল হবে
বরিষণ—শুন তাপস-প্রধান! অতি
ভয়ঙ্কর বিধির বিধান—তব অস্থি হবে
বিশ্ব-শিল্পি-করে অদ্ভুত আয়ুধ—সেই
দিব্য অস্ত্রে মোর হস্তে বৃত্রের নিধন।

দধীচি। পুরন্দর! এর চেয়ে সুসংবাদ আছে
কিবা? কি সৌভাগ্য মম! আজি
মম সার্থক জীবন—তপঃখিন্নজীর্ণ
অস্থি মম, পঞ্চভূতে না হয়ে বিলীন
দেবকার্য্যে হবে নিয়োজিত—এর চেয়ে
দেবরাজ, আনন্দের কি আছে আমার?

ইন্দ্র। তাপস-প্রবর! তুমি ধন্য এ সংসারে;
ধন্য তব অলৌকিক আত্মত্যাগ। তুমি
দেব, বুঝিয়াছ সার—এই মহীতলে,
সকল ব্রতের সার পরহিত তরে
নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন। সংযম-বিহীন
উদ্দাম-প্রকৃতি মোরা—আজি উচ্চশিক্ষা
লভিলাম তব পাশে; লভিল সে শিক্ষা
আজি ত্রি-জগৎবাসী। ঋষিশ্রেষ্ঠ, যেই
জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আজি করিলা স্থাপন
সংসারসম্মুখে, সেই কীর্ত্তি-স্তম্ভোপরি
অনন্ত অক্ষয় তব পবিত্র মূরতি,
তর্জ্জনী নির্দ্দেশি, মোহ-অন্ধ জীবগণে
দিবে দেখাইয়া কর্ত্তব্যের পথ, চির-
মোক্ষফলপ্রদ।

দধীচি। চল পুরন্দর! শুভ-
কার্য্যে বিলম্বের নাহি প্রয়োজন। চল সবে
শিষ্যগণ! গুরুশোক কর পরিহার।
আজি বড় আনন্দের দিন। উচ্চৈঃস্বরে
কর সবে হরিনাম গান; পূর্ণ হ'ক
ধরা বিমল পুলকে; হিংসা দ্বেষ ভেসে
যাক্ দূরে; শান্তি ফিরে আসুক ভুবনে।

ইন্দ্র। তাপস-প্রবর! আজি যেই সুকঠোর
পরহিত-ব্রত করিলে হে উদ্‌যাপন,
নিষ্কাম ধর্ম্মের যেই পরাকাষ্ঠা তুমি
দেখাইলে ত্রিলোক-মাঝারে—উদ্ধারিলে
ত্রিদশমণ্ডলে যেই বিপত্তি-পাথার
হ'তে, অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ভোগ নহে তার
উপযুক্ত পুরস্কার। অমরমণ্ডলী
বল প্রতিদান কি দিবে তাহার? যদি
আত্মত্যাগে থাকে ফল, আজি সত্য সাক্ষ্য
করি দিনু বর—এই সুকৃতির ফলে,
হে সাত্বিকপ্রধান! নাম তব হবে
নিত্য প্রাতঃস্মরণীয় ত্রিসংসার-মাঝে।
তব বংশে জন্মিবেন ব্যাস দ্বৈপায়ন—
সাধনের অদ্ভুত বিকাশ, সত্ত্বগুণ
পূত আশ্রম তোমার—হইবে জগতে
খ্যাত, মোক্ষের অক্ষয় পথ, পুণ্যময়
বদরিকাশ্রম—পুণ্য ভারত ভিতরে।

দধীচি। চল দেবরাজ! যাই মোরা জাহ্নবীর
তীরে, সেথা আমি শিষ্যগণ-উচ্চারিত
মধুময় হরিনাম শুনিতে শুনিতে
পূত সুরধুনী-নীরে বিসর্জ্জিব অতি
ক্ষুদ্র এই প্রাণ মম দেব-সেবা তরে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—প্রাসাদের কক্ষ।

ঐন্দ্রিলা।

ঐন্দ্রিলা। হায় কষ্ট! ঘৃণায় দহিছে হৃদি। হয়ে
অমরার অধীশ্বরী এত অপমান।
পদাশ্রিতা চরণ-দলিতা কুক্কুরীর
হস্তে! আহা, ধন্য আমি অমরার রাণী,
ধন্য দৈত্যরাজ-অঙ্কলক্ষ্মী আমি; ধন্য
মম ভিত্তি-হীন অর্থহীন রূপগর্ব্ব,
ধন্য অন্তঃসার-শূন্য ঐশ্বর্য্য গরিমা
মোর! অযুত অপূর্ণ আশা রুদ্ধ করি
বক্ষের ভিতরে হৃদয়ের তপ্ত অশ্রু-
সেকে সযতনে করিয়া বর্দ্ধিত, এবে
নিজ হস্তে উন্মূলিতে হইবে তাদের;
তার চেয়ে মৃত্যু ভাল! গর্ব্বিত মস্তকে
প্রভুশক্তি করিয়া প্রচার, মন্ত্রৌষধি-
রুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের প্রায় অবনত
শিরে পলায়ন মূষিক-গহ্বরে—তার
চেয়ে মৃত্যু ভাল! তার চেয়ে লক্ষ গুণে
ভাল অনন্ত নরক-বাস! পরিতৃপ্তি—
শুধু আমার তৃপ্তির তরে, যায় যাক্

দৈত্যকুল ছারখার হয়ে। তাহে খেদ
কিবা মোর? অনন্ত অনন্ত কোটি বিশ্ব
অনন্ত শূন্যের মাঝে রহিয়াছে সদা
ভ্রাম্যমান; অনন্ত অনন্ত প্রাণী প্রতি-
দিন হতেছে বিলয়, তাহে অস্তিত্বের
ক্ষয় বৃদ্ধি কি হবে নির্ণয়? জানি আজি
আরম্ভিবে সংহারের রণ; মাতৃস্নেহ
করি বিসর্জন নিজ হস্তে সাজাইয়া
তনয়েরে পাঠাইব সংহার-সংগ্রামে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—রণস্থল।

রুদ্রপীড় ও বহ্লিক।

রুদ্রপীড়। হের সারথি সুধীর! কর নিরীক্ষণ
দেববৃন্দ রচিয়াছে ব্যূহ চক্রাকার:
চক্রদ্বারে শোভে মার্ত্তণ্ডের দিব্যরথ।
দক্ষিণে তাঁহার বহ্নি সহ প্রেতপতি
রোধিছে প্রবেশ-পথ! কম্বুর আকার
হের ওই বিচিত্র স্যন্দন, শঙ্খমণি-
বিনির্ম্মিত, চক্রনেমি হ'তে পতাকার
চূড়া প্রবালাদি রতন-খচিত; পাশী
রথী ওই রথে! ব্যূহমধ্যদেশে, দেখ
বহ্লিক সুধীর! দেবরাজ-রথ—রথ-
চূড়ে পত পত উড়ে সুবর্ণ-পতাকা;
উচ্চৈঃশ্রবা ভীষণ হ্রেষণে বিকম্পিত
রণস্থল—সুপ্রবীণ মাতলি সারথি।
বহ্লিক! ভীম বেগে চাল রথ ব্যূহদ্বার
অভিমুখে, দেবরাজে অচিরে ভেটিব
রণে।
বহ্লিক। শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব যুবরাজ!

[প্রস্থান

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। কি আশ্চর্য্য! একেশ্বর দানবকুমার
অবহেলে বিমুখিল দেবযোধগণে।
মুহূর্ত্তেকে অযুত বিশিখ, সব্যসাচী
এড়িল আকাশে, অন্ধকার-পরিব্যাপ্ত
হ'ল রণস্থল, গদাঘাতে বিচূর্ণিল
মার্ত্তণ্ডের রথ, অসহ্য বিক্রম হেরি
হুতাশন পৃষ্ঠ দিল রণে; ব্যূহদ্বার
ত্যজি পলাইল প্রভঞ্জন; মহারথী
প্রেতপতি রণস্থলে নারিল তিষ্ঠিতে।
একা রুদ্রপীড় অবাধে করিল জয়
এই সংমিলিত ত্রিদশ-বাহিনী। যাই
আশ্বাসিয়া সুররথিগণে, নিজে আজি
রুদ্রপীড়ে ভেটিব সম্মুখ-রণে।

(যুদ্ধ করিতে করিতে রুদ্রপীড় ও
জয়ন্তের প্রবেশ)

রুদ্রপীড়। শুন
ইন্দ্রপুত্র! সমর-প্রাঙ্গণ ক্রীড়াস্থলী
নহে কভু, অস্ত্র-শস্ত্র নহে ক্রীড়নক।
কোষমধ্যে রাখিয়া কৃপাণ যাও বীর,
রণস্থল ত্যজি। বীর্য্য তব বহু দিন
গেছে জানা। আজি প্রতিজ্ঞা আমার, তব
পিতৃদেবে আহ্বানিয়া সম্মুখ-সমরে
পরীক্ষিব শস্ত্র-শিক্ষা তাঁর।
জয়ন্ত। হাসি পায়,
দৈত্যাঙ্গজ! হাসি পায় ধৃষ্টতা দেখিয়া
তব। হাসি পায় শিশু-মুখে শুনিয়া
যুদ্ধের কথা। বীরবর, অতি উচ্চ
অভিলাষ তব—শ্লাঘনীয় অতি। কিন্তু
ভেটিয়াছি তোমারে সংগ্রামে আমি, এবে
উচিত কি তব, মম প্রার্থনা অপূর্ণ
রাখি রণস্থল ত্যজি অন্যত্র গমন?
তনয়ের অস্ত্র-শিক্ষা দেখ আগে বীর!
পিতাসনে রণ হইবে পশ্চাতে।
রুদ্রপীড়। বহু বার দেখিয়াছি বীরবর! বীরপনা
তব। ইন্দ্রপুত্র, ভুলেছ কি নৈমিষ-কানন?
একেবারে মিলায়েছে কি হে গাত্রে তব
রুদ্রপীড়-হস্ত-ক্ষিপ্ত শস্ত্রব্রণ যত?
ভাল বীর! ইচ্ছা তব করিব পূরণ।
হও অগ্রসর রণে।

[উভয়ের যুদ্ধ ও জয়ন্তের প্রস্থান।

রুদ্রপীড়। ঊর্দ্ধশ্বাসে নাহি
কর পলায়ন বীর, আঘাত লাগিবে

পদে। অরাতির পৃষ্ঠে কভু শস্ত্র-ক্ষেপ
নাহি করে দৈত্যরাজ বৃত্রের তনয়।

(বহ্লিকের প্রবেশ)

রুদ্রপীড়। হে সারথি! আজি মম সফল জনম।
ত্রিদিব-ঈশ্বরে আজি সম্ভাষিয়া রণে
গৌরব-উন্নত-শিরে পরিব ধীমান্!
দ্যুতিমান্ যশের কিরীট, যার বিভা
উজলিয়া তিন লোক প্রচারিবে কীর্ত্তি
মম অসুর-মণ্ডলে। আজি দেখাইব
অস্ত্র-শিক্ষা ত্রিদশ সকলে।
স্তবর!
জানি সুনিশ্চয় মৃত্যু মম বাসবের
হাতে—হেন মৃত্যু বীরের কামনা সদা।
ত্রিলোকে অজেয় ইন্দ্র ত্রিদিব-ঈশ্বর
জলদ-বাহনে আজি পশিবেন রণে
করে ধরি অক্ষয় কার্ম্মুক সুরঞ্জিত
বিচিত্র বরণে; হে সারথি! শুনিয়াছি
অতি মনোরম বাসবের শিঞ্জিনীর
ক্রীড়া, নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ করিব আজি
কৌশল তাঁহার। সূতশ্রেষ্ঠ, মৃত্যু-ভয়
বিন্দুমাত্র নাহি করে দৈত্যরাজ-সুত,
আজি সুরাসুরগণ দেখিবে আশ্চর্য্য
রণ, দেখিবে সমর-ক্ষেত্রে হাসিমুখে
বীরের মরণ। অবিলম্বে চাল রথ
ব্যূহ-অভিমুখে—আগুবাড়ি দিব রণ,
দেখিবে ত্রিদশবৃন্দ মম পরাক্রম।

[প্রস্থান।

(দৈত্যসেনাগণের প্রবেশ)

দৈত্যসেনাগণ। (গীত)
সমর-মত্ত দৈত্যসেনা ভীষণ রঙ্গে ধাও,
তীব্র প্রবাহে ধাও।
সমর-সাজে সমর-মাঝে অবাধে পশিয়া যাও।
ওই শুন রণ-কোলাহল, ছুটিছে ত্রিদশদল;
কম্পিত ত্রাসে, শঙ্কিত অমরা,
শত্রু-রক্তে রঞ্জিয়া—
সমরে ধীর দৈত্যবীর! সমর আগে ধাও।

[প্রস্থান।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। হায়! হায়! কি করিনু আজি! দুগ্ধপোষ্য
বালকেরে বধিলাম অন্যায় সংগ্রামে!
কি কহিবে সবে, শুনিবে যখন এই
নিদারুণ সমর-কাহিনী? হায়, হায়,
শিশুর শোণিত বিনা স্বর্গ উদ্ধারের
আর কিছু ছিল না উপায় বিশ্বম্ভর!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—রাজসভা

বৃত্র, মন্ত্রী ও সভাসদ্‌গণ।

বৃত্র। মন্ত্রিবর! এখন ত বহু কল্প আছে
ব্রহ্ম দিনমান হ'তে অবসান। জানি
মন্ত্রি, শিববল অলঙ্ঘ্য অটুট তবু
কেন প্রাণ মম কাঁপে থর থর—মনে
হয় মহা কুহেলিকাচ্ছন্ন দৈত্যরাজ-
ভাগ্য-দিনমণি।
মন্ত্রী। ধীর তুমি লোকপাল!
কাল্পনিক অশুভ স্মরিয়া হয়ো না
অধীর; লভিয়াছ মহেশের বর, বহু
কল্প তপস্যার ফলে—হইবে অজেয়
রণে এক ব্রহ্ম-দিনমান ব্যাপি। তব
সুকঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শিব
অর্পিলেন রুদ্রশূল তোমারে রাজন্!
লক্ষ ইন্দ্র ক্ষণমাত্র নারিবে তিষ্ঠিতে
তব সনে মহাহবে সংগ্রাম-কেশরি!
বৃত্র। মন্ত্রি, এতক্ষণ রহিয়াছি স্থির সেই
ধারণায়, কিন্তু নাহি জানি কেন আজি
কাঁপিছে অন্তর, মনে হয়, এত দিনে
বুঝি শঙ্কর বিরূপ মোর প্রতি; হায়!
বৃত্রের উন্নতি-মূল—চন্দ্রশেখরের
দয়া!
মন্ত্রী। শঙ্করের স্থির কৃপা চিরকাল
তোমার উপরে দেব! কেন অকারণে
হতেছ বিকল?
বৃত্র। অকারণে নহে মন্ত্রি!
কারণ আছে—কালি রজনীতে

আমি দেখিয়াছি স্বপ্ন অতি ভয়ঙ্কর।
সে কাহিনী করিতে বর্ণনা ধমনীতে
মোর ছুটে উষ্ণ-রক্তস্রোত—কণ্টকিত
হয় কলেবর! দেখিলাম নন্দনের
মণিবেদিকায় বিল্ববৃক্ষতলে, জীর্ণা
শীর্ণা কাঙ্গালিনী বেশে সমাসীনা নারী-
মূর্ত্তি এক কারুণ্যরূপিণী, শিরে রুক্ষ
কেশপাশ পিঙ্গল-বরণ, নিজ বক্ষ
চিরি শোণিত ঢালিয়া সেবিছে শঙ্করে।
দেখিতে দেখিতে সেই দৃশ্য মিলাইয়া
গেল—দেখিনু পশ্চাতে, ভীষণ দর্শন।
সমর-প্রাঙ্গণ কলঙ্কিত দৈত্যরক্তে,
শকুনি-গৃধিনীকুল উড়িছে চৌদিকে;
শিবাগণ বিচরিছে মাংস-অস্থি লোভে।
সেই রণস্থল-মাঝে—মন্ত্রি, সেই দৃশ্য
করিতে বর্ণনা রসনা খসিয়া যায়—
সেই রণস্থলমাঝে রুধির-রঞ্জিত
কলেবর দেখিলাম শায়িত কুমার
প্রাণ হ'তে প্রিয়তম মম রুদ্রপীড়।

(বহ্লিকের প্রবেশ)

বহ্লিক। দৈত্যরাজ!

বৃত্র। এ কি! এ কি! একা তুমি
রণস্থল হ'তে আসিলে ফিরিয়া! কোথা
মম প্রাণের কুমার?

বহ্লিক। দৈত্যকুলচূড়া!
অগ্রে দ্বিখণ্ডিত কর রসনা আমার,
রুদ্রশূল করিয়া নিক্ষেপ; তার পরে
শ্রীচরণে জানাব বারতা।

বৃত্র। বহ্লিক!
আর নাহি দগ্ধ কর মোরে ওই তব
নীরব ভাষায়। সত্বর জানাও মোরে
যুদ্ধের বারতা।

বহ্লিক। দৈত্যরাজ! দুষ্টমতি
দেবগণ, একসাথে মিলি অতি ঘোর
অন্যায় সমরে বধেছে কুমারে, বধে
যথা ব্যাধগণ সুতীক্ষ্ণ সায়কে ক্ষুদ্র
মৃগ-শাবকেরে। পাপমতি বাসবের
তীক্ষ্ণ খড়্গে রণক্ষেত্রে নিহত কুমার।

বৃত্র। শম্ভু! এতদিনে পূর্ণ কি হে সাধ তব?
দিয়া নিধি হরিলে আবার! ভাল, ইচ্ছা
তব পূর্ণ হ'ক, ইচ্ছাময় তুমি দেব!
কিন্তু দেখিব শঙ্কর! কোন্ মহাশক্তি-
বলে রক্ষিবে ত্রিদশ-বৃন্দে, পুরন্দরে
রক্ষিবে কেমনে?
কে আছিস্, শীঘ্র লয়ে
আয় মোর সংহার-ত্রিশূল; সংহারের
রণে অবিলম্বে সাজ দনুজ-বাহিনী।
আরে দুরাচার ইন্দ্র! আরে আরে দুষ্ট
দেবগণ! অন্যায় সমরে কুমারেরে
করি বধ প্রজ্বালিত করেছিস্ আজি
দৈত্যরাজ রোষ হুতাশন, যাহে ক্ষুদ্র
পতঙ্গের প্র য় শ্মীভূত হয়ে যাবে
সমগ্র ত্রিদশকুল। পাতালের অতি
ঘোর অন্ধতমপুরে, কুমেরুর নিভৃত
শিখরে, জলধির অম্বুরাশিতলে যেথা
তোরা লইবি আশ্রয়, জানিস্ নিশ্চয়
দৈত্যরাজ-রোষ-হুতাশন পশিবেক
সেথা। আজি রণে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর পশে
যদি সুদর্শন-করে, কিংবা মহেশ্বর
পশে যদি সংহার-মূরতি ধরি, ইন্দ্রে
নাহি পারিবে রক্ষিতে।

(ঐন্দ্রিলার প্রবেশ)

ঐন্দ্রিলা। দনুজ-অধিপ!
এখনো রয়েছ বসি সিংহাসন'পরে!
হেথা তুমি কল্পনার সোনালি স্বপনে
রচিতেছ আপনার মহত্ত্বের ছবি,
সেথা প্রাণাধিক কুমারের ছিন্নশির
লয়ে, কন্দুক্রীড়া করিতেছে দুরাচার
দেবগণ! কি হইবে বল দৈত্যরাজ,
নীরব ক্রন্দনে—পুত্র-শোক-মহার্ণবে
বিন্দু বিন্দু বারিক্ষেপে ফলোদয় কিবা?
দৈত্যপতি, চতুরঙ্গে সাজহ সমরে।
প্রতিহিংসা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে শতগুণে
প্রধূমিত কর, প্রাণাধিক রুদ্রপীড়
কুমার আমার যেই বহ্নি প্রজ্বালিত
করেছে ত্রিদিবে। একা যদি নাহি পার
দেব! লহ সাথে দনুজ-অঙ্গনাগণে—
লহ সাথে ঐন্দ্রিলারে পুত্র-শোকাতুরা!

অস্ত্রে শস্ত্রে নাহি প্রয়োজন ; নখাঘাতে
উপাড়িব ইন্দ্রের নয়ন। আরে আরে
দুষ্ট দেবগণ! আরে পাপিষ্ঠ বাসব!
বাঘিনীর কোল হ'তে ছিনাইয়ে লয়ে
শাবক তাহার, ভেবেছিস্ বুঝি পাবি
পরিত্রাণ!

এ কি দৈত্যরাজ! মূক সম
এখনো রয়েছ বসি। নিষ্কোষিয়া শাণিত
কৃপাণ আমূল বসায়ে দাও পুত্রহন্তা
অরাতির হৃদয়-কন্দরে, অরাতির
উষ্ণরক্ত সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া মহোৎসব
কর সবে দৈত্যনরনারী।

হায়! হায়!
দৈত্যগণ, তোমরা কি নিশ্চেষ্ট পাষাণ?
আমি কি জড়ের সনে কহিতেছি কথা?
থাক তবে—রক্ষি-পরিবৃত সভাতলে
বসি দৈত্যবীরগণ! দেখহ কৌতুক
কি করিতে পারে একা দৈত্যরাজ-লক্ষ্মী
দানবী ঐন্দ্রিলা পুত্র-শোকাতুরা!

[প্রস্থাম

বৃত্র। মন্ত্রিন্!
পুত্র-শোকে উন্মাদিনী দৈত্যরাণী! শম্ভো,
এই শেষে ছিল তব মনে ; ভক্ত-হৃদে
অকারণে নিক্ষেপিলে নিদারুণ শেল।
যাক্—দৈত্যরাজ্য হয়ে যাক্ ছারখার—
ত্রিদিব শ্মশান হ'ক্! হে শূলিন্, নাম
তব নাহি আর মুখে উচ্চারিব। আজি
সম্মুখ-সমরে তব বল পরীক্ষিব।

[প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—রণস্থল।
দৈত্যরাজলক্ষ্মী।

দৈত্যরাজলক্ষ্মী। (গীত)
দনুজ-গৌরব-রবি আর ত উদিবে না ;
তরুণ অরুণ ভাসে,
দনুজ-অঙ্গনা-মুখ-কমল
আর ফুটিবে না।
শ্মশান অমরা তাজি
রাজশ্রী ছাড়িয়ে যাবে
দনুজের শুভদিন ফিরে আর আসিবে না।

(বৃত্রের প্রবেশ)

বৃত্র। মা গো, এই গভীর নিশীথে সুষুপ্তির
নিস্তব্ধতা ভেদি কেন মাতঃ, তুলেছিস্
এই করুণার তান, প্রতি মূর্চ্ছনায়
যার হৃদিতন্ত্রী উঠিছে কাঁপিয়া? মাতঃ,
ছেড়ে যাবে অধম সন্তানে! যাও মা গো
পাপ রাজ্য ছেড়ে। ছেড়ে গেছে প্রাণাধিক
রুদ্রপীড় মোর ; শুকায়েছে দৈত্যকুল-
ফুল্লকমলিনী ইন্দুবালা ; দৈত্যরাজ-
অঙ্কলক্ষ্মী ঐন্দ্রিলাও গেছে ছেড়ে! যাও
তুমিও চলিয়া যাও দৈত্যরাজলক্ষ্মি!
পায়ে ঠেলি অকৃতী সন্তানে, রাজ্য ছেড়ে
কর পলায়ন্—অমরা শ্মশান হ'ক!

[সহসা দৈত্যরাজলক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধান]

বৃত্র। মাতঃ রাজলক্ষ্মি! তুমিও কি রুষ্টা আজি
কিঙ্করের 'পরে, তাই পীযূষ-পূরিত
তব ললিত ভাষায় নাহি আশ্বাসিলা
দাসে, গেলা চলি অমরা ত্যজিয়া! যাও
মাতঃ, কোটি কোটি প্রণাম রাজীব-পদে ;
অন্তরীক্ষে বসি দেখ আজি কিঙ্করের
পরাক্রম, দেখ আজি মা গো পুত্রহন্তা
বাসবের শোণিত-আসবে পুত্রহত্যা-
প্রতিশোধ-রূপ সুকঠোর ব্রত উদ্‌যাপন।

[প্রস্থান।

(দুই জন দৈত্য-সৈন্যের প্রবেশ)

প্র-সৈন্য। ঘুচলো ভাই স্বর্গের লীলা, প্রাণ নিয়ে
এইবার পালা।
দ্বি-সৈন্য। কি জ্বালা, এখনি কি! চুনো পুঁটি গেছে
চ'লে, বড় কাৎলাটা যে রয়েছে বাকি।
প্র-সৈন্য। ভয় নেই, কাৎলাও আজ দিচ্ছে ফাঁকি।
দ্বি-সৈন্য! সত্যি নাকি—এমন তর?
প্র-সৈন্য। দেখছি যেমন—দেবতা ব্যাটারা যে
জাল ফেলেছে বিষম বড়!
দ্বি-সৈন্য। বলিস্ কি! তা হ'লে আমাদের দশা?

প্র-সৈন্য। দিব্বি গোঁপে চাড়া দিয়ে—রাজার হালে মাটী চষা।

দ্বি-সৈন্য। আর গিন্নী?

প্র-সৈন্য। তিনি আর করবেন কি? ব'সে ব'সে দেন পীরকে সিন্নি।

দ্বি-সৈন্য। এবার আর সিন্নিতে বুঝি কুলোয় না চাঁদ!

প্র-সৈন্য। তা হ'লে এই রাস্তায় ব'সে দুজনে খুব কাঁদ—চেঁচিয়ে কাঁদ।

দ্বি-সৈন্য। না ভাই, ঠাট্টা নয়, এখন উপায়?

প্র-সৈন্য। উপায়! এখন পায় পায়। তাও যে হয়ে ওঠে বোধ হয় না—ওই শুনছিস ত জয়-ঢাকের আওয়াজ।

দ্বি-সৈন্য। আমার তো মাথায় পড়লো বাজ।

প্র-সৈন্য। কাজ নাই আর বেশী কথায়, প্রাণ নিয়ে স'রে পড়ি।

দ্বি-সৈন্য। যা বলেছিস—মিছেমিছি মুণ্ডুটা আর এখানে কেন খায় গড়াগড়ি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। ভীষণ পরীক্ষা হায় আজিকার রণ।
আজি রণে হ'লে পরাজয়—কল্পনায়
সেই ছবি হ'লে মনে, শিহরিয়া উঠে
কায়—আজিকার রণে হ'লে পরাজয়
জনমের মত দেবশক্তি স্বর্গ হ'তে
হইবে বিলয়; আশার প্রদীপ নিবে
যাবে জনমের তরে। না—না—সম্ভব
তা নয়; যেন কোন্ মহাশক্তি প্রবেশি
অন্তরে সুপ্ত আশা দিতেছে জাগায়ে;
নাহি জানি কোন্ অজানিত উদ্দীপনা-
বলে আশ্বস্ত হৃদয় মম। পুত্রশোকে
উন্মত্ত দানব, কেশরি-বিক্রমে আজি
পশিয়াছে রণে, আকুলিত করিয়াছে
দেবরথিগণে। এ কি!—সহসা কি শর-
জালে সমাচ্ছন্ন হ'ল গগনের আলো!
কিংবা বুঝি দানবের সৌভাগ্য- তপন
বিষাদ-কালিমা-ছায়ে ঢাকিয়া বদন,
নীরব ভাষায় দিলা মোরে জানাইয়া
এই অবসর ত্রিদিব-জয়ের। দেব
বিশ্বম্ভর! বল দাও বাসবের হৃদে। [প্রস্থান।

(কার্ত্তিকেয় ও সূর্য্যের প্রবেশ)

কার্ত্তিকেয়। হে মার্ত্তণ্ড! বহু যত্নে রচিনু আশ্চর্য্য
ব্যূহ পরশু-আকার, সুনিপুণ দেব-
রথি-বৃন্দে স্থাপিলাম চারিধারে, কিন্তু
কি আশ্চর্য্য, মুহূর্ত্তেকে ছিন্ন-ভিন্ন হ'ল
সব! অসহ্য বিক্রম হেরি পলাইল
দেবগণ রণস্থল ত্যজি, অসহায়
বাসবেরে ফেলি রণস্থলে।

সূর্য্য। সেনাপতি!
হের ওই বাসবের সনে দানবের
বাধিয়াছে ঘোর রণ—হের ওই মত্ত
মাতঙ্গের প্রায় দৈত্যাধম দলিতেছে
দেবসেনাগণে—জ্যানির্ঘোষে শুন ওই
মুখরিত রণস্থল—হের বাসবের
কি বিচিত্র শিঞ্জিনীর ক্রীড়া!

কার্ত্তিকেয়। গ্রহনাথ!
দুষ্ট দৈত্য গদাঘাতে বিচূর্ণিল হের
জয়ন্তের রথ। চল যাই, হই মোরা
ইন্দ্রের সহায়।

[প্রস্থান।

(যুদ্ধ করিতে করিতে ইন্দ্র ও বৃত্রের প্রবেশ)

বৃত্র। রে দম্ভী বাসব!
ভাবিয়াছ মনে আজি রণে বৃত্র-হস্তে
পাবে পরিত্রাণ! এড়িলাম হের এই
সংহার-ত্রিশূল—সাধ্য যদি থাকে কর
বীর! সংবরণ সমগ্র ত্রিদশ-শক্তি
পুঞ্জীভূত করি।

(বৃত্র কর্ত্তৃক শূল নিক্ষেপ, সহসা শ্বেতবাহুর আবির্ভাব ও অর্দ্ধপথে শূল লইয়া অন্তর্দ্ধান।)

হা শম্ভু! তুমিও বাম।
বুঝিলাম বিরূপাক্ষ! করুণা কি রোষ
তব অর্থহীন সব। শুধু আত্মশক্তি
এ জগতে প্রতিষ্ঠার মূল। দৈববলে
যেই জন করিয়া বিশ্বাস, তারি 'পরে
আত্ম-প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি করয়ে
স্থাপন, তার সম মূর্খ নাহি তিন
লোকে; ভঙ্গুর বালুকা-শৈলে গড়ে সেই
জন নিজ-বাস হেতু হর্ম্ম্য মনোরম।

ইন্দ্র। দৈত্যরাজ! কি ভাবিছ বল অধোমুখে?
এত দিনে দৈব প্রতিকূল ...
উপস্থিত জেন তুমি অ... সময়
তব।

বৃত্র। আখণ্ডল! কাপুরুষ তুমি, এই
কথা উচিত তোমার! কিন্তু মনে স্থান
নাহি দিও কভু দৈব প্রতিকূল বলি
তোমাদের মত দৈত্যরাজ পলাইবে
উর্দ্ধশ্বাসে রণস্থল ত্যজি।

ইন্দ্র। রে দানব!
বাক্যব্যয়ে নাহি প্রয়োজন; অগ্রসর
হও রণে।

বৃত্র। মহাশক্তি এড়িলাম হের,
সুরাধম! সাধ্য যদি থাকে রক্ষ আপনারে;
সৃষ্টি রক্ষা করহ বাসব!

(দৈববাণী)

"হান বজ্র,
সহস্রাক্ষ! নহে সৃষ্টি-লোপ হয়।"

ইন্দ্র। আরে
দৈত্যাধম! আর তোর নাহিক নিস্তার।

(ইন্দ্র কর্ত্তৃক বজ্র নিক্ষেপ ও বৃত্রের পতন)

বৃত্র। ওঃ—কি ভীষণ আয়ুধ; পঞ্জরের অস্থি
মম কোটি খণ্ডে চূর্ণ হ'ল। বড় তৃষা—
ওহো! দারুণ পিপাসা—দেব বিশ্বম্ভর!
দর্প-অন্ধ হয়ে লঙ্ঘিলাম তব দত্ত
বর—লভিলাম প্রতিফল তার—যা—ই।

(বৃত্রের মৃত্যু)

ইন্দ্র। আজি দেবশত্রু হইল নিপাত; যাই
সুরগণে জানাই গে এ শুভ বারতা।

[প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—প্রান্তর।

ঐন্দ্রিলা।

ঐন্দ্রিলা। উচ্চ সাধ হুতাশনে দিলাম আহুতি
তনয়ে হৃদয়-শোণিত; হেরিলাম
নিজ চক্ষে নির্ম্মম পাষাণ! রক্তসিক্ত
পতির মস্তক বিলুণ্ঠিত হইতেছে
সমর-অঙ্গন-মাঝে; অবাধে দেখিনু
চক্ষে ধীরে ধীরে বিশাল দনুজ-কুল
হয়ে গেল ক্ষয়; তাহাতেও বক্ষ মম
শত খণ্ডে চূর্ণ নাহি হ'ল। অনায়াসে
শিরে লয়ে দুঃসহ শোকের ভার, শত
আশা শত উচ্চ অভিলাষ রুদ্ধ করি
বুকের ভিতরে, সহিতেছি নিরন্তর
তাহাদের ভীষণ দংশন; জর্জ্জরিত
দেহ মম তীব্র হলাহলে। কোথা শান্তি!
কোথা পরিতৃপ্তি! কোথা এই হৃদয়ের
জ্বালা-নিবারণ? পতি-পুত্র শোকাতুরা
দানবীর হৃদয়ের দারুণ পিপাসা
মিটিবে কেমনে? পুত্র-ঘাতী অরাতির
বক্ষোরক্ত-পানে!

এস প্রতিহিংসা! লক্ষ
ফণা করিয়া বিস্তার লক্ষ মুখে ঢাল
আসি সুতীব্র গরল। লয়ে এস সাথে
তব নারকীয় চমূ, নিশ্বাসে নিশ্বাসে
তব কালানল:হ'ক বরিষণ; চূর্ণ
করি ভূধরের চূড়া প্রলয়-মারুত
বয়ে যাক বিশ্বলোপ হেতু। প্রতিহিংসা,
এস তুমি প্রলয়-মূরতি ধরি; হও
আসি অধিষ্ঠান বাহুযুগে মম; প্রতি
লোমকূপ মম পূর্ণ কর নারকীয়
তেজে। দূরে—দূরে—বহু দূরে রাখিয়া
নির্ম্মম সংসার, বহু দূরে ফেলি রাখি
শোক-পারাবার বিশ্ব-তটে যাও ছুটে
পুত্র-শোকাতুরা! নখাঘাতে উপাড়িয়া
পুত্র-ঘাতী ইন্দ্রের নয়ন পুত্র-শোক
কর নিবারণ। যাই—যাই—পুত্র-হন্তা
রয়েছে জীবিত—প্রাণাধিক রুদ্রপীড়!

[প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—মন্দাকিনীতীরস্থ শ্মশান
প্রজ্বালিত চিতায় শায়িত ইন্দুবালা ও
রুদ্রপীড়ের দেহ
বিষ্ণুদূতগণ।

(গীত)

পুরুষগণ। সতীর পরম গতি পতির চরণ
স্ত্রীগণ। লভিল এ উচ্চশিক্ষা
যতেক জগত-জন
পুরুষগণ। এক বৃন্তে দুটি ফুল ফুটেছিল নিরজনে
সোহাগ গৌরব-রাশি ঢালিত আপন মনে
স্ত্রীগণ। নিদাঘ-তপন-তাপে
পুরুষগণ। শুকাল কলিকা হায়
স্ত্রীগণ। শুধু যশের সৌরভ লয়ে
বহিছে মলয়-বায়।

বিষ্ণুদূত। ভ্রাতৃগণ! হের ক্রমে ক্রমে নিবে গেল
চিতাবহ্নি; চিতাধূম যশের পরাগ
বহি ওই উঠিছে গোলোকে, জানাইতে
গোলোক-পতিরে আজি পূত মন্দাকিনী-
নীরে যুগল ভক্তের দেহ মিশিয়াছে
পরমাণু সনে। হইয়াছে আমাদের
কর্ত্তব্য-সাধন। চল যাই মোরা প্রভু-
পদে নিবেদিতে এ শুভ বারতা। প্রাণ
ভ'রে উচ্চৈঃস্বরে কর সবে নাম গান।

বিষ্ণুদূতগণ। (গীত)

পুরুষগণ। বরিষ অমৃত-রাশি, তৃষিত অমর-ধামে।
স্ত্রীগণ। বহিবে শান্তির উৎস করুণাময়! তব নামে।
পুরুষগণ। নামের প্রতিভা তব জ্যোতি বিকাশে,
স্ত্রীগণ। প্রেমের তারকা ফুটে মানস-আকাশে।
সকলে। হরি হরি হরি হরি মধুময় হরিনাম
নামে স্বর্গ, নামে মোক্ষ, নামে সিদ্ধ সর্ব্বকাম।

[প্রস্থান।

(ঐন্দ্রিলার প্রবেশ)

ঐন্দ্রিলা। জ্বালা! জ্বালা! দারুণ বিষের জ্বালা
কেমনে জুড়াবে? কোথা পাবে হেন অমৃতের
সরোবর পুত্র-শোকাতুরা! ওহো ধিকি
ধিকি জ্বলে বহ্নি হৃদয়ের মাঝে—বুঝি
মম হৃৎপিণ্ড হ'ল ছারখার! আহা,
কার এই উপবন? বিদ্যাধর-হস্ত-
মুক্ত কুসুম-স্তবকপরে কে সুন্দরী
রচিয়াছে দিব্য ওই বাসর-শয়নে?
এ কি! এ কি! কোথা গেল? কোথায় লুকাল
সেই বিবাহ-বাসর? ওহো, চিতাধূমে
ছাইল গগন—ধূধূ ধূধূ চিতা-বহ্নি
উঠিল জ্বলিয়া—লক লক লোলজিহ্বা
বিস্তারিয়া আসিল গ্রাসিতে মোরে। মা গো
মন্দাকিনি! শুনেছি মা পতিত-পাবনী
তুই—তোর বুকে অভাগিনী পাবে না কি
স্থান? তনয়ারে নিতান্তই ঠেলিবি কি
পায়ে! প্রাণাধিক রুদ্রপীড়, কোথা বৎস!
(মন্দাকিনী-বক্ষে পতন ও মৃত্যু)

যবনিকা

মণিমালা

(সত্যঘটনা-মূলক সামাজিক উপন্যাস)

ভূমিকা।

একটিমাত্র অপরিদৃশ্যমান সূত্রের দ্বারা বিশ্বনিয়ন্তার সিংহাসনের সহিত বদ্ধ রহিয়াছে এই জড় জগৎ। সেই ক্ষীণ সূত্রটির নাম—নিয়তি। একটিমাত্র শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে কর্ম্মময় মানবজীবন। এই শক্তির নাম—মহাশক্তির ইচ্ছা, নিয়তির অচ্ছেদ্য বন্ধন ছিন্ন করা যেমন মানবচেষ্টার অসাধ্য, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা উল্লঙ্ঘন করার অভিলাষও সেইরূপ মনুষ্যের পক্ষে বাতুলতামাত্র। একটু ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের প্রত্যেকেই তাহার নিজের জীবনে এই দুইটি কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারি।

চেষ্টা দ্বারা যে বিধিলিপি খণ্ডিত হয় না, এই আখ্যায়িকায় বর্ণিত ঘটনাবলীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই অখ্যায়িকায়, আমি উল্লিখিত প্রমাণিত সত্য দুইটি ভিন্ন আর একটি গভীর স্থির ও জাজ্বল্যমান সত্যসম্বন্ধে কতকগুলি তথ্যের মীমাংসা ও মানবহৃদয়-নিহিত কতকগুলি অতি জটিল ও দুর্জ্ঞেয় রহস্যের উদ্ঘাটনের প্রয়াস পাইয়াছি।

আমাদের এই যুগ বিশ্বাসের যুগ নহে; বিজ্ঞানের যুগ, তর্কের যুগ, সংশয়-সন্দেহের যুগ। বহু বহু কাল পূর্ব্বে কবি যে সকল কাল্পনিক চিত্র চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন, বহু বহু কাল পূর্ব্বে দার্শনিক যে সকল সত্যের অবতারণা করিয়া সাধারণ্যে উপহসিত ও নির্য্যাতিত হইয়াছেন, বহু বহু কাল পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক যে সমস্ত শক্তির সত্তার কথা প্রচারিত করিতে গিয়া বাতুল অথবা বুজরুক্ প্রমাণিত হইয়া আমরণ অন্ধতমসাচ্ছন্ন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন ও অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, অথবা শক্তিমান রাজার কোপে পড়িয়া বিষপ্রয়োগে নিহত হইয়াছেন, কিংবা জ্বলন্ত চিতায় দগ্ধ হইয়াছেন, এখন জ্ঞানের বিকাশ ও স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত কাল্পনিক তথ্যের সত্যতা আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। দশরথের শব্দভেদী বাণ, দশাননের গগনবিহারী বিমান, শতক্রতুর সৃষ্টিবিধ্বংসী বজ্রায়ুধ এখন আর কল্পনা-স্বপ্ন বলিয়া উপহসিত হয় না। সূর্য্য পৃথিবীকে আবর্ত্তন করিয়া ঘুরিতেছেন না; পৃথিবীই সূর্য্যকে আবর্ত্তন করিতেছে। এই কথা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিলেও আজ আর বৈজ্ঞানিককে হেমলক্ বিষপানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হয় না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আধুনিক যুগে জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাস ও সন্দেহের মাত্রাও বাড়িয়া উঠিয়াছে। কোন দার্শনিক চীৎকার করিয়া বলিতেছেন—"ঈশ্বর নাই। কারণ, তাঁহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই।" কোন তাত্ত্বিক বলিতেছেন, "সৃষ্টি আছে—স্রষ্টা নাই। এই বিশ্বপিণ্ড আণবিক সংঘাতসঞ্জাত।" এক জন নৈয়ায়িক বলিতেছেন—"আত্মা অবিনশ্বর নহে। শরীরের সহিত আত্মার বিলয় অবশ্যম্ভাবী।" আর এক জন বলিতেছেন,—"যাহাকে তোমরা আত্মা বলিতেছ, তাহা পঞ্চভূতাত্মিকা জীবনীশক্তিমাত্র। মৃত্যুর মুহূর্ত্তেই জীবাত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় ও ভূতগণ পঞ্চ-ভূতে বিলীন হয়। আত্মার ক্ষিত্যংশ ক্ষিতিতে মিশে, জলীয়াংশ সলিলে লীন হয়, তেজ তেজে, বায়ু বায়ুতে ও আকাশ আকাশে মিলাইয়া যায়। প্রদীপ জ্বালাইয়া দাও, জ্বলিবে; নিভাইয়া দাও, নিভিয়া যাইবে। দীপ নিভিয়া গেলে আর আলোকের সত্তা কোথায় রহিল? এই দীপ-শিখাটিকে অবিনশ্বর বলা কি বাতুলতা নহে? দীপশিখার সহিত দীপের যে সম্বন্ধ, আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধও ঠিক তদনুরূপ।"

এই সকল মনীষাশালী মহাত্মাদিগকে যদি তুমি বল যে, "ভাল, ঈশ্বর নাই থাকুন, স্রষ্টা নাই থাকুন, আত্মা অবিনশ্বর নাই হউক, জগৎ সৃষ্ট হইল কেন? ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইল কি জন্য? আমরা জন্মি কেন? বাঁচিয়া থাকি কেন? আবার মরিয়াই বা যাই কেন?"

এই জটিল "কেন" প্রশ্নটির মীমাংসা তর্ক বা গবেষণার অতীত। বিশ্বাস-বলে ইহা সাধ্য। বিশ্বাসের সাহায্যে ইহা প্রতিপাদ্য। ইহাই আমার ধারণা।

মণিমালা

প্রথম পরিচ্ছেদ

নলিনীনাথ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া ডাক্তারের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর ফটক তখনও বন্ধ। নলিনীনাথ কাতরভাবে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, "ডাক্তার বাবু! ডাক্তার বাবু!"

রসময় লাহিড়ী সেকেলে ক্যাম্পবেলে পাশ করা ডাক্তার। স্কুল ছাড়িয়াই তিনি সরকারী চাকরীতে প্রবেশ করেন। খোসামুদী ও অদৃষ্ট উভয়ের জোরে তিনি পদোন্নতির চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া, জীবনের তিন কুড়ি বৎসর পাছে ফেলিয়া, চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তার বাবু বিপত্নীক। সংসারে তাঁহার আপনার বলিতে কেহই ছিল না। ছিল কেবল একটি ষোড়শবর্ষীয়া কন্যা। তাহার নাম ছিল প্রভা।

চাকরী ছাড়িয়া ডাক্তার বাবু তাঁহার দেশের পৈতৃক ভিটা ও বিষয়-সম্পত্তি যাহা ছিল, সমস্ত বিক্রয় করিয়া, সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থে তাঁহার কোম্পানীর কাগজের তাড়া আরও বাড়াইয়া লইয়া, স্বাস্থ্যবাস মধুপুরের উপকণ্ঠে একখানি ক্ষুদ্র বাগান-বাটী ক্রয় করিয়া, সেইখানেই বাস করিতে লাগিলেন।

রসময় বাবু স্বভাবতঃ একটু কৃপণ ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে একটিমাত্র ভৃত্য ছিল। পাচকের কার্য্যও সে-ই করিত। অন্য লোকজন তিনি রাখিতেন না।

বিবাহের বয়স পার হইয়া গেলেও রসময় বাবু কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে বড়ই উদাসীন ছিলেন। কোথা হইতে এক জন অপরিচিত লোক, সমাজের একটা খামখেয়ালীতে উত্তরাধিকার-সূত্রে তাঁহার শ্রমলব্ধ ও যত্নপুষ্ট অর্থস্তূপের উপর উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবে, এই কল্পনাও তাঁহাকে সূচীভেদ-যন্ত্রণা দিত।

প্রতীচ্যে যে বহু নারী চিরকুমারীই থাকে। তাহাদের সমাজ কি সমাজ নয়? তাহাদের ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়?

পারৎপক্ষে কন্যার বিবাহ দিব না, ইহাই ছিল ডাক্তার বাবুর মনোগত বাসনা। শৈশবে মাতৃহীনা বালিকা প্রভাও পিতার সেবায় প্রাণ ঢালিয়া দিয়া, সংসারের আর সব ভুলিয়া গিয়াছিল।

নলিনীনাথ যখন হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া কাতরকণ্ঠে ডাক্তার বাবুকে ডাকিতেছিলেন, প্রভা তখন বাটীর সম্মুখস্থ উদ্যানে পুষ্পচয়ন করিতেছিল। সে মুখ তুলিয়া নলিনীনাথের দিকে চাহিল। নলিনীনাথ ব্যস্তভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার বাবু বাড়ীতে আছেন কি?"

প্রভা উত্তর দিতে যাইবে, এমন সময় ডক্তার বাবু বাহির হইয়া আসিয়া রুক্ষভাবে কহিলেন, "কে তুমি? কি চাও?"

ডাক্তার বাবু মোটাসোটা, খর্ব্বাকৃতি। মাথায় প্রকাণ্ড টাক। মুখখানি সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া লম্বা পাকা গোঁপ-দাড়ি। চোখে লোহার ফ্রেমের চস্মা। পরিধানে থান কাপড়। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একটি স্থানে স্থানে চটা-ওঠা এনামেলের চায়ের বাটি। তাহার রং নীল। বাম হস্তে এক-খানি সসার (চায়ের বাটি রাখা রেকাবি), সেখা-নির রং সাদা।

নলি। আপনি?—আপনিই কি ডাক্তার বাবু? আপনাকে একবার আমাদের বাড়ী যেতে হবে। আমার মায়ের আসন্ন কাল উপস্থিত।

রস। কি রোগ?

নলি। জ্বর-অতিসার। তাঁর বয়স হয়েছে।

রস। তোমাদের বাড়ীটা কত দূর?

নলি। বেশী দূর নয়। ঐ মোড়ের উপর।

রস। তোমরা কি জাত ?

নলি। ব্রাহ্মণ—আমরা বারেন্দ্র।

রস। তোমাদের দেশ ?

নলি। পাবনা।

রস। এখানে কেন ?

নলি। হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে আসা।

রস। তুমি কি কর ?

নলি। এম্ এ, পড়ি।

রস। দেশে জমাজমী কিছু আছে ?

নলি। আছে, অল্প-স্বল্প ?

রস। সম্পত্তির আয় কত ?

নলি। আমার মা এক্‌জিকিউট্রিক্স। আমি অত খোঁজ-খবর রাখি নি।

রস। সে কি হে! অত বড় ধেড়ে হয়েছ। সম্পত্তির আয় কি, সে খোঁজটাও রাখ না! এখনকার ছেলেপিলেই হয়েছে ঐ রকম।

যত সময়ক্ষেপ হইতেছিল, নলিনীনাথের উৎকণ্ঠা ততই বাড়িতেছিল। আবার নলিনীনাথ যত উৎকণ্ঠিত হইতেছিলেন, কি জানি, প্রভাও কেন তাহার হৃদয়ে একটা দারুণ উৎকণ্ঠার যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। সমান সুরে বাঁধা দুইখানি যন্ত্রের একখানিতে ঝঙ্কার দিলে যেমন অন্যখানিও বাজিয়া উঠে, সমান সমান তড়িচ্ছক্তিসম্পন্ন দুইটি হৃদয় সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। তাহাদের একের স্পন্দনে অপরের স্পন্দন অনিবার্য্য!

নলিনীনাথের ঔৎসুক্য ও উৎকণ্ঠা দেখিয়া, বৃদ্ধ দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক,বরং মনে মনে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। পরে একটু কুটিল হাসি হাসিয়া কহিলেন, "আমার ফি-টা কত, জানা আছে তো? ষোল টাকা। তার কমে আমি কোথাও যাই না।"

নলি। তাই দিব; আপনি একটু শীঘ্র চলুন।

রস। ফি-টা সঙ্গে আছে কি ?

নলি। আমি তাড়াতাড়িতে টাকা আনিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের বাড়ী গিয়ে নেবেন এখন।

রস। সে কি হয়? আমাদের ব্যবসা। ধর, যদি তোমার মা মারাই গিয়ে থাকেন। তা হ'লে তো তুমি গিয়েই মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে বসবে। আমার ফি-টা তা হ'লে তো মাঠে মারা যাবে।

নলি। এখন বাড়ী গিয়ে টাকা আনতে গেলে অনেক দেরী হয়ে পড়বে। আচ্ছা, যদি আপনার অবিশ্বাস হয়, তা হ'লে এই বোতামসেটটি না হয় আপনার কাছে রাখুন। তার পরে আপনার প্রাপ্য টাকা পেলে আপনি এগুলি ফেরত দিবেন।

পিতার এই অসামাজিকতা, অবিশ্বাস ও অর্থগৃধ্নুতাসূচক কথাবার্ত্তা শুনিয়া প্রভা মর্ম্মপীড়িত হইতেছিল। সে এক একবার তাহার পিতার দিকে রুষ্টভাবে ও নলিনীর দিকে দীননেত্রে চাহিতেছিল। তাহার পিতার কথাবার্ত্তা ক্রমে শিষ্টতার সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেছে দেখিয়া সে আর থাকিতে না পারিয়া কহিল, "বাবা! আপনি ওঁকে অবিশ্বাস করছেন কেন? আপনি যান। বাড়ীতে গিয়ে উনি নিশ্চয় আপনাকে টাকা দিবেন।"

ডাক্তার বাবু কন্যাকে ধমক দিয়া কহিলেন, "তুই চুপ ক'রে থাক্। তোকে কর্ত্তাত্বি করতে হবে না।"

প্রভা। না বাবা! আমি কিছুতেই তোমাকে ওর বোতাম নিতে দিব না।

রস। না! তা নিতে দেবে কেন?

নলিনীনাথ ততক্ষণে তাঁহার সার্ট হইতে বোতামগুলি খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন। সেগুলি ডাক্তার বাবুর হাতে দিতে যাইবেন, এমন সময় প্রভা অগ্রসর হইয়া, হাত পাতিয়া কহিল, "দিন—আমাকে দিন।"

নলিনীনাথও যন্ত্র-পরিচালিতের ন্যায় বোতামসেটটি প্রভার হাতে দিলেন। হৃদয়ে কোনওরূপ উদ্বেগ অথবা আবেগ থাকিলে হস্তপদের সঞ্চালন একটু অসংযত হইয়া উঠে। প্রভার হাতে বোতামসেট্‌টি দিতে গিয়া, তাহার চম্পককোরকসদৃশ ঈষৎ কম্পিত অঙ্গুলিতে নলিনীনাথের অঙ্গুলি স্পৃষ্ট হইল। তড়িচ্ছক্তিপূর্ণ দুইটি তড়িদ্বহ সূত্র যেমন পরস্পর স্পৃষ্ট হইলে নিমেষমধ্যে একটি তীব্র জ্বালা, আন্দোলন ও কম্পন অনুভূত হয়, নলিনীনাথ ও প্রভা উভয়েই তাহাদের নিজ নিজ হৃদয়মধ্যে সেইরূপ অভূতপূর্ব্ব হর্ষ অনুভব করিলেন। ইহারই নাম কি ভালবাসা?

বৃদ্ধ রসময় ডাক্তার কিন্তু তাঁহার কন্যার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছিলেন না। অর্থগৃধ্নু কৃপণের

লোলুপ দৃষ্টি তখন প্রভার হাতে নলিনীনাথের সেই উজ্জ্বল মূল্যবান্ সুবর্ণময় বোতামসেটটির দিকে।

ডাক্তর বাবু কন্যাকে একটু চোখ টিপিয়া কহিলেন, "আচ্ছা—প্রভা! তোর কাছেই এখন বোতামসেটটা রেখে দে। খুব সাবধানে রাখিস্। পরের জিনিস, যেন হারিয়ে ফেলিস্‌নি। যাই—আমি এখনই কাপড় ছেড়ে আসি গিয়ে।"

ডাক্তার বাবু বেশ-পরিবর্ত্তন করিতে গেলেন। প্রভা আস্তে আস্তে নলিনীনাথের কাছে আসিয়া লজ্জায় অবনত মুখে কহিল, "মহাশয়! আপনার বোতামসেটটি লউন। এখন পরিবেন না। আপনার পকেটে রাখিয়া দিন।"

নলিনীনাথ একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। প্রভা কহিল, "আপনি বোতামগুলি না লইলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব।"

কি জানি কেন, নলিনীনাথ প্রভার অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। প্রভার হাত হইতে তিনি বোতামসেটটি লইলেন। আবার সেই সংস্পর্শ! আবার সেই ভাবাবেশ!

ডাক্তার বাবু কাপড় ছাড়িয়া আসিবামাত্র নলিনীনাথ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া গেলেন। কি এক অজানিত আকর্ষণী শক্তি যেন তাঁহাকে পশ্চাতে টানিয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

প্রভাও যতক্ষণ দৃষ্টি চলে, নির্নিমেষ নেত্রে নলিনীনাথকে দেখিতে লাগিল আর মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিল, "ঠাকুর, এই ভদ্রলোকের মাতাকে রোগমুক্ত করুন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—০—

নলিনীনাথ ডাক্তার লইয়া বাড়ীতে আসিয়াই দেখিলেন যে, বৃদ্ধ ভগবান্ দেওয়ান বৈঠকখানার দ্বারে দাঁড়াইয়া তাঁহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। বৃদ্ধের জাগরণক্লিষ্ট কোটরগত চক্ষুর্দ্বয় রোদনারুণিত। তাহার শীর্ণ কপোলদুইটি অশ্রুকলঙ্কিত।

নলিনীনাথ দেওয়ানজীকে দেখিয়া উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মায়ের অবস্থা এখন কেমন, দেওয়ানজী?"

কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে ভগবান্ দেওয়ান উত্তর দিল, "অবস্থা ভাল নয়। আপনি একবার শীঘ্র ভিতরে চলুন।"

নলিনীনাথ ছুটিয়া মায়ের শয়নকক্ষে গেলেন। রসময় ডাক্তার তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

নলিনীনাথের মাতা একখানি পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া মরণ-যন্ত্রণায় এপাশ-ওপাশ ও ছট্‌ফট্ করিতেছেন। এক জন দাসী তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পরিচর্য্যা করিতেছে। পুত্রকে দেখিয়াই মাতা যেন একটু আশ্বস্ত হইলেন। হাত নাড়িয়া তাঁহাকে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "নলিন! আমি যে তোকে দেখবার জন্য ছট্‌ফট্ কর্‌ছিলাম। তুই কোথায় গিয়েছিলি, বাবা?"

"মা! আমি ডাক্তার বাবুকে ডেকে আন্‌তে গিয়েছিলাম। এই যে তিনি এসেছেন।"

"ডাক্তারে আমার আর কি প্রয়োজন বাবা? আমার শেষ সময় উপস্থিত। এখন দয়াময় শ্রীহরিই আমার ডাক্তার। তাঁর নামামৃতই আমার ওষুধ।"

"না মা! তুমি মর্‌বে না। তুমি অসুস্থ হয়েছ মাত্র। ওষুধ খেলেই তোমার অসুখ সেরে যাবে।"

"বাবা! আমি অনেকক্ষণ চ'লে যেতাম। কেবল একটি কথার জন্য আমি যেতে পারি নি। আমার মুখে একটু গঙ্গাজল দাও।"

নলিনীনাথ একখানি ক্ষুদ্র তাম্রনির্ম্মিত কুষীতে করিয়া তাঁহার মায়ের মুখে গঙ্গাজল দিলেন। মাতা আবার বলিতে লাগিলেন, "নলিন! আমার বালিসের নীচে একতাড়া চাবি আছে। তাহা নিয়ে ঐ লোহার সিন্দুকটি খোল। সিন্দুকের কোণে একটি রূপোর বাক্স দেখতে পাবে। ঐ বাক্সটি এখানে নিয়ে এস।"

নলিনীনাথ যথাযথ তাঁহার মাতার নিদেশ পালন করিলেন।

নলিনীর মাতা কহিলেন, "বাছা নলিন! এই বাক্সটি অতিযত্নে রাখিবে। ইহার মধ্যে দেবাদিদেব পশুপতিনাথের নির্ম্মাল্য ও একছড়া মুক্তার মালা আছে। ঐ মুক্তার মালায় একখানি বিচিত্র অষ্টধাতুনির্ম্মিত নবরত্নের পদক আছে। উহা এক

জন সন্ন্যাসিদত্ত। তুমি এই মালাছড়াটি সর্ব্বক্ষণের জন্য গলায় পরিয়া থাকিবে। তাহা হইলে কোন বিপদ-আপদ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

নলিনীনাথ কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "বাছা! কেঁদো না। আমার সময় হইয়াছে। আমি তোমাদের রাখিয়া, সচ্চিদানন্দের চরণ পূজা করিতে আনন্দময় ধামে যাচ্ছি। এতে দুঃখ কি নলিন?"

নলিনীনাথের মায়ের অপাঙ্গকোণে দুই বিন্দু অশ্রু উদ্গত হইয়া তাঁহার শীর্ণ কপোল বহিয়া পড়িয়া গেল। নয়নদ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিল। শ্বাস-প্রশ্বাস মৃদুতর হইতে লাগিল। ভগবান্ দেওয়ান কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "মায়ের অন্তিমকাল উপস্থিত। আসুন, ধরাধরি করিয়া বাহিরে লইয়া যাই। অন্তর্জ্জলি করিতে হইবে।"

ভগবান্ দেওয়ান উচ্চকণ্ঠে হরিনাম করিতে লাগিল। পরম মঙ্গলময়ের নাম শুনিতে শুনিতে নলিনীর মাতা ইহলোক ছাড়িয়া গেলেন। ভগবান্ দেওয়ান ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "আজ জগদিন্দ্রনাথের গৃহ হইতে দেবী অন্নপূর্ণা অন্তর্হিত হইলেন।"

ডাক্তার বাবু চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "জগদিন্দ্রনাথ? কোন্ জগদিন্দ্রনাথ?"

ভগ। পাবনার জমীদার।

ডাক্তার। নলিনী জগদিন্দ্র বাবুর পুত্র?

ভগ। আজ্ঞে, উনিই তাঁহার একমাত্র বংশধর।

ডাক্তার। আমি যখন পাবনায় এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ছিলাম, তখন জগদিন্দ্র বাবুর সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসরের কথা। তখন তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই। যাহা হউক, যখন জানা-শুনা হ'ল, তখন আমাকে মাঝে মাঝে এসে দেখাটা শুনাটা করতে হবে।

ভগ। তা' করবেন বই কি? দাদাবাবু নিতান্ত ছেলেমানুষ। আপনাদের মত এক জন বিজ্ঞ অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে থাকা তাঁর বিশেষ প্রয়োজন।

ডাক্তার বাবু নলিনীকে কাঁদিতে দেখিয়া সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "ছিঃ, কেঁদো না। কাঁদলে তো আর মাকে ফিরে পাবে না। এখন যাও—অন্ত্যেষ্টির জোগাড় কর গিয়ে। আমিও এখন উঠি। বেলা অনেকটা হয়েছে। প্রভা একলা রয়েছে।"

নলিনীনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে মুখ তুলিয়া কহিলেন, "আপনার ফি-টা।"

ডাক্তার বাবু আম্‌তা-আম্‌তা করিতে লাগিলেন। নলিনীনাথ উঠিয়া গিয়া একটি আলমারীর ড্রয়ার খুলিয়া, তাহা হইতে পাঁচখানি দশ টাকার নোট লইয়া ডাক্তার বাবুর হস্তে দিলেন। ডাক্তার বাবু অম্লানবদনে নোটগুলি পকেটজাত করিয়া ধীর-পাবিক্ষেপে তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। যাইবার সময় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "ছেলেটা কি অমিতব্যয়ী। হাতে পড়িলেই দুই দিনে সে তাহার সমস্ত সম্পত্তি উড়াইয়া পুড়াইয়া দিবে।"

নলিনীনাথ যে একখানি গলিত সুবর্ণপূর্ণ স্পঞ্জ —তাহাকে হাতে রাখিতে পারিলে যে সমূহ লাভ, এই ধারণা ডাক্তার বাবুর মস্তিষ্কে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এ দিকে পিতার ফিরিতে যত বিলম্ব হইতে লাগিল, প্রভাও ততই উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল। নানারূপ চিন্তা আসিয়া তাহার কৈশোর হৃদয়খানিকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। প্রভা নলিনীনাথের মাতার রোগ-নিরাময়-কামনায় ঠাকুরের নিকট কত কি মানৎ করিল। তাহার পিতার ঔষধেই যেন নলিনীনাথের মাতা ব্যাধিমুক্তা হন। নলিনীনাথ তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিবেন। তাহাতেই প্রভার সুখ। তাহাতেই প্রভার আনন্দ।

প্রভা ঔৎসুক্যে দগ্ধ হইতে লাগিল। সে আর থাকিতে পারিল না। একবার লোক পাঠাইয়া নলিনীনাথের মাতার সংবাদ লইবার জন্য তাহার হৃদয়ে প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। সে তাহাদের ভৃত্য হলধরকে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় ডাক্তার বাবু আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, নলিনীর মাতা মারা গিয়াছেন। প্রভা সে সংবাদে বড়ই ব্যথিত হইল। কে জানে, কেন এই অজানিত

অপরিচিত পরিবারে একটি সাধারণ আপৎপাতের সংবাদে প্রভার হৃদয়ে নিদারুণ ব্যথা বাজিল। নিজের কক্ষে গিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রভা কতই কাঁদিল। কেন যে কাঁদিল, সে নিজেই তাহা বুঝিল না।

বেলা এগারোটা বাজিয়া গেল, প্রভা তখনও স্নান করে নাই। ডাক্তার বাবু স্নান করিয়া প্রভার কক্ষে আসিলেন। প্রভাকে দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ব্যাপার বুঝিতে তাঁহার আদৌ বিলম্ব হইল না। যেন কিছু বুঝিতে পারেন নাই, এইরূপ ভাণ করিয়া ডাক্তার বাবু কহিলেন, "প্রভা! এখনও স্নান করিলে না যে, মা!"

প্রভা। আমার শরীরটা কেমন ম্যাজ্‌ম্যাজ্‌ কর্‌ছে।

ডাক্তার। দেখি, তোর হাতটা একবার দেখি।

প্রভা হাত বাড়াইয়া দিল। ডাক্তার বাবু নাড়ী টিপিয়া দেখিলেন, কিছুই নহে। কেবল অত্যধিক আবেগে নাড়ীর গতি একটু চঞ্চল, প্রবল ও উত্তেজিত। ডাক্তার বাবু বুঝিলেন, রোগ কি? ইহাও বুঝিলেন যে, এ রোগের ঔষধি তাঁহার ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় নাই। কন্যার এই মানসিক বিকার দেখিয়া কৃপণ রসময় ডাক্তার কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না; বরং আনন্দিত হইলেন। কন্যারূপ বঁড়শী ফেলিয়া ধনী যুবক নলিনীকে আটকানো অতি সহজ হইবে, এই ভাবিয়া বৃদ্ধের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

পিতার আগ্রহাতিশয্যে প্রভা ধীরে ধীরে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিল। তাহার মন তখনও বিক্ষিপ্ত। কি এক অজানিত ব্যাকুলতায় তাহার হৃদয় তখনও আকুলিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—০—

নলিনীনাথের চেহারায় ও প্রকৃতিতে মুগ্ধ হইয়াছিল প্রভা; আর তাহার অগাধ সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া লুব্ধ হইয়াছিলেন ডাক্তার রসময়।

ডাক্তারের এখন শয়নে-স্বপনে একমাত্র চিন্তা—কেমন করিয়া তিনি নলিনীর সেই অগাধ সম্পত্তি হাত করিবেন। এই ভাবনাতেই বৃদ্ধ পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। তিনি সমস্ত রাত্রি বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। একে নিদ্রাল্পতাই বার্দ্ধক্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহাতে আবার হৃদয়ে দুরাকাঙ্ক্ষা ও দুশ্চিন্তার তীব্র কালকূট। বৃদ্ধ সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও চোখ বুজিতে পারিলেন না।

অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়াই ডাক্তার বাবু চিন্তিতভাবে বারান্দায় পাইচারি করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে ভৃত্যকে ডাকিলেন, "হলা!" কোনও উত্তর পাইলেন না। বিরক্তভাবে স্বর আরও একটু উচ্চ করিয়া আবার ডাকিলেন। ডাক এবার ভৃত্য হলধরের কানে পৌছিল। শয়ান অবস্থাতেই হলধর উত্তর দিল, "আজ্ঞে যাই!" এই বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া সে আবার নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিল। দশ পোনের মিনিট হলধরের আগমন-প্রতীক্ষায় থাকিয়া থাকিয়া ডাক্তার বাবুর যথার্থই ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। হলধরের অভৃত্যজনোচিত ব্যবহারে সাতিশয় রুষ্ট হইয়া ডাক্তার বাবু গরগর করিতে করিতে নিম্নতলে নামিয়া একেবারে হলধরের ঘরে গিয়া মুখ বিকৃত করিয়া কর্কশ স্বরে কহিলেন, "আঁটকুড়োর সন্তান! কেবল বাশ রাশ গিল্‌বেন, আর বেলা দুকুর অবধি নাক ডাকিয়ে ঘুমুবেন। ওঠ বলছি এক্‌খুনি।"

"আজ্ঞে, উঠেই তো আছি। উঠিন তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি কেউ সাড়া দিতে পারে?"

"ব্যাটার কাজের সঙ্গে খোঁজ নেই, কেবল বাক্যি।"

"আজ্ঞে, এই যে সংসারের কাজগুলো সব, এ কি আপনি আপনি হচ্ছে, না ভূতে এসে ক'রে দিয়ে যাচ্ছে, না আর পাঁচটা চাকর-চাকরাণী আপনার বাড়ীতে আছে, তারাই করছে?"

"রাখ, রাখ, বাক্যি রাখ। এখন চট্‌ ক'রে চা-টা তৈরি ক'রে নিয়ে আয়।"

"আজ্ঞে, চা তো তৈরিই আছে। কেবল দুটো শুক্‌নো খড়কুটো জ্বালিয়ে একটু গরম ক'রে ঢেলে দেবার ওয়াস্তা।"

"চা তৈরি কি রে? চা কখন্‌ তৈরি কর্‌লি? তুই তো ঘুমুচ্ছিলি।"

"আজ্ঞে, রাত্রেই যে ও কাজটা এগিয়ে রেখে দি।"

"ওরে হতভাগা! রোজ রোজ আমাকে বাসি চা খাওয়াস্!"

"আমার কি? আপনারই খরচা কমাবার জন্যে। কয়লা, ঘুঁটে, দেশলাই, এ সব ডবল্ ডবল্ খরচা যদি করতে চান, কাল থেকে আপনাকে টাট্‌কা চা-ই খাওয়াব।"

"বেটা! বাসি চা আমাকে বল্লি কেন? খেতে তো মন্দ হয় না। তুই বাসি চা-ই রাখিস্। টাট্‌কায় আর কাজ নেই। চা-টা বাসিই উপকারী। ওতে চায়ের ট্যানিন্‌টা উবে গিয়ে চায়ের দোষটা কাটিয়ে দেয়। তা হ'লে, আমি ওপরে যাই। তুই চা নিয়ে আয়।"

"যে আজ্ঞে, হুজুর!"

ডাক্তার বাবু উপরে গিয়া বারান্দায় পাইচারি করিতে লাগিলেন। হলা চা গরম করিয়া চটা-ওঠা এনামেলের বাটিতে ঢালিয়া আনিয়া, বাটিটা একখানি জীর্ণ টিপয়ের উপর রাখিয়া দিল।

বদ্ধ চা-খোরের মত তৃপ্তভাবে চায়েব রসাস্বাদন করিতে করিতে ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরে হলা! আজ চায়ে দুধ কম ঠেক্‌ছে কেন?"

"আজ্ঞে, কম একটু ঠেক্‌তেই তো পারে হুজুর! ওতে দুধ যে মোটে দিইনি।"

"কেন রে হতভাগা! বিনা দুধে চা করেছিস্?

"দুধ পাব কোথায় যে দিব। আপনি তো শুধু শুধু রাগ করেন।"

"কেন—ছাগল?"

"ছাগল কি দুধ দিচ্ছে?"

"কেন দেবে না? পয়সা দিয়ে ছাগল কিনেছি, দুধ দেবে না? তার বাবা যে সেই দেবে।"

"আপনি যে তার বাচ্চা দুটোকে কাল তের টাকায় বেচে দিলেন।"

"বাচ্চা নাই বা রইলো। তুই টেনে দুইলি নে কেন?"

"বাঁটে কি হাত দিতে দিচ্ছে, যে টেনে দুইবো?"

"তা যাক্‌গে, মরুক্‌গে। এই বিনাদুধে রাসিয়ান টি-টা খুব উপকারী। এতে হজমশক্তি বাড়ায়; ডাক্তার মেচনিকফের মতে, বিনা দুধে রাসিয়ান টি, আর ঘরে পাতা দই, দুইয়েরই গুণ ঠিক সমান। আজকের চা-টা একটু টক্‌টক্ লাগছে কেন রে হলা?"

"তা একটু লাগবে হুজুর! ওটা ডাক্তার হেঁচকি-কফের মতে তৈরি হয়েছে। শুক্‌নো হ'লেও তেঁতুল পাতার টক-রসটা যাবে কোথায়?"

"তেঁতুলপাতা কি রে আঁটকুড়োর সন্তান?"

"আজ্ঞে, ওটাও আপনারই খরচা সংক্ষেপ করবার জন্যে। তেলের সঙ্গে সোরগোঁজা চ'লে যাচ্ছে। ঘিয়ের সঙ্গে চীনে বাদামের তেল বেমালুম চ'লে যাচ্ছে। আর চায়ের সঙ্গে তেঁতুলপাতাটা চলতেই যত দোষ? ওটা আমি মাথা খেলিয়ে বের করেছি হুজুর! ওতে চায়ের সোয়াদটাকে একটু রকমারি করে। অথচ খরচার বেলায় একেবারে দশ-আনা ছ-আনা। দরকার হ'লে সাড়ে পনর-আনা, আধ-আনাও পড়্‌তা ফেলা যায়।"

প্রকৃত নিমকের চাকর হলধরের গুণপণায় ও তাহার এই অদ্ভুত সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার নবনবোন্মেষকারিণী শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ডাক্তার বাবু কহিলেন, "হলু! বাপ আমার! আজ থেকে আর চা একেবারেই কিনো না। বিশুদ্ধ তেঁতুল-পাতার ট্যানিন্-বিবর্জ্জিত ও সাইট্রিক-এসিড-পূর্ণ চা-ই আমি কাল থেকে খাবো।"

হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে হলধর কহিল, "দেখুন্ হুজুর! আমার মাথাটা কেমন সাফ্! থেকে থেকে কেমন জিনিসটা বের করেছি।"

ডাক্তার বাবু কহিলেন, "দিব্বি জিনিস্! বেড়ে জিনিস! বাঃ-বাঃ—হলধর! বেশ! বেশ!" ডাক্তার বাবু এইরূপে হলধরের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহার পেয়ালার সবটুকু তেঁতুলপাতা-সিদ্ধ জলই উদরস্থ করিয়া ফেলিলেন।

চা-পান শেষ করিয়া ডাক্তার বাবু আবার একাকী চিন্তিতভাবে বারান্দায় পরিক্রমণ করিতে করিতে অস্ফুট স্বরে কহিতে লাগিলেন, "আচ্ছা! এক কাজ করি। কোনও রকমে কৌশল ক'রে কোন অছিলায়, এই বাড়ী ছেড়ে দিয়ে কয়েক দিনের জন্য প্রভাকে সঙ্গে নিয়ে নলিনীর বাড়ীতে গিয়ে বাস করি। তার পরে, প্রভার সঙ্গে নলিনীর একটু ভাব-সাব

হয়ে গেলে, তখন প্রভাকে দিয়ে, ওর বিষয়-আষয়ের দলিলপত্রগুলি, টাকা-পয়সা, হীরে-জহরৎ, কোম্পানীর কাগজ ওর যা কিছু আছে, সবগুলি হাত ক'রে নিয়ে, তার পর একদিন খাবারের সঙ্গে একটু আর্সেনিক! বাস্—রাতারাতিই কুপো কাৎ। আমি এক সার্টিফিকেট্ দিয়ে দোবো—যে আসল এসিয়াটিক কলেরা। এক দাস্তেই ফরসা। আমার কথায় অবিশ্বাসও কেউ করতে পারবে না। রাতারাতি মুদ্দোফরাস ডাকিয়ে লাস জ্বালিয়ে দেবো। তখন আর আমায় ধরে কোন্ শালা? তার পরেই টাকার আণ্ডিল হয়ে বসবো। একে-বারে লাখ্পতি। উঃ—আমি আর থাক্‌তে পারছি নি। প্রভা এখনও ঘুমুচ্ছে। যাই—আমি তাকে ডেকে তুলি গিয়ে। একটা উপায় এখনি ঠিক করি। উঃ—লাখ্পতি। দু হাজার নয়—দশ হাজার নয়—লাখ্ লাখ্। যাই, বেলা হয়ে গেল। প্রভাকে ঘুম থেকে তুলি গিয়ে।"

পাগলের মত আবল-তাবল বকিতে বকিতে বৃদ্ধ প্রভার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—:*:—

মাতার আকস্মিক মৃত্যুতে নলিনীনাথ নিজেকে নিতান্ত অবলম্বহীন মনে করিতে লাগিলেন। সূর্য্য অস্ত যায়। কিন্তু অস্তের ললাটে উদয়ের রক্ত-চন্দনের লেপ মাখাইয়া রাখিয়া যায়। মহামায়ার মায়া, বিভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন ছাঁদে প্রকটিত হইয়া পুরুষ-হৃদয়কে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। নলিনী-নাথ মাতৃস্নেহ-পীযূষ হইতে বঞ্চিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ক্লিষ্ট ও সন্তপ্ত হৃদয়কে স্নিগ্ধ করিল, প্রভার অকৈতব হৃদয়োৎসারিত প্রণয়ের অফুরন্ত চন্দনরস। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে এখন নলিনী-নাথের একমাত্র চিন্তার সামগ্রী প্রভার সরলতা-মাখা মুখখানি, তাহার ব্রীড়ানমিত ইন্দীবরনয়নের বিলোল চাহনি।

নলিনীনাথের কি জানি কেন, এখন আর ঘরে মন টিকিত না। তিনি অধিকাংশ সময়ই সহর হইতে দূরে, প্রান্তরের একদেশে বসিয়া বসিয়া প্রকৃতির শ্যামল শোভা দেখিতেন, বনবিহ-গের কূজন শুনিতেন আর তাঁহার হৃদয়রাণীর মুখখানি হৃদয়ে ধ্যান করিতেন।

মাতার মৃত্যুর পাঁচ ছয় দিন পরে একদিন সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইয়া নলিনীনাথ ভাবিতে ভাবিতে পল্লীপথ ধরিয়া অন্য দিন অপেক্ষা সহর ছাড়িয়া একটু বেশী দূরে গিয়া পড়িলেন। রাত্রিও যে একটু অধিক হইয়া পড়িয়াছিল, নলিনীনাথের সে খেয়াল আদ-বেই ছিল না। পল্লীপথ জনশূন্য। রজনী নিস্তব্ধ, কেবলমাত্র ঝিল্লীমুখরিত। সহসা পথপার্শ্বে তিন চারিজন লোকের চাপা গলায় মৃদু আলাপ শুনিয়া নলিনীনাথ চমকিয়া উঠিলেন।

নলিনীনাথ শুনিলেন, এক জন বলিতেছে, "কোনও ভয় নেই। আমাদের কেউ সন্দেহ করবে না। আজকাল অনেক ভদ্রলোকের ছেলেরা ডাকাতি করছে! লোকে তাই মনে করবে।"

আর এক জন কহিল,"কাজে এগিয়ে আবার ভয় কি রে? বুড়ো ডাক্তারের ঢের টাকা। আর বাড়ীতে একটা চাকর ছাড়া অন্য লোক নেই। খুব সুবিধে।"

তৃতীয় দস্যু কহিল, "তাই চল্। শালা এক টেরে থাকে। ভারি কৃপণ। ঢের পয়সা। যেথানে থাকে, সে পাড়ায়ও লোকজন বেশী নেই।"

দস্যুদিগের পরামর্শ শুনিয়া নলিনীনাথ স্তম্ভিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। যেমন করিয়া হউক, এখনই গিয়া ডাক্তার বাবুকে খবরটা দিতে হইবে। তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ডাক্তার বাবুর বাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিলেন।

ডাক্তার বাবুর বাড়ীর বহির্দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। নলিনীনাথ ভীতিবিজড়িত স্বরে চীৎ-কার করিয়া বলিলেন, "কে আছেন? শীঘ্র দরজা খুলুন!" কোনও উত্তর পাইলেন না। তিনি আরও উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "ডাক্তার বাবু! ডাক্তার বাবু!"

উপরের জানালার খড়খড়ি খুলিয়া ডাক্তার বাবু কর্কশভাবে বলিলেন, "ভাল জ্বালা যে! কে তুমি? কি চাও?"

ডাক্তার বাবুর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া প্রভা।

ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসিলেন, "বল না হে, কে তুমি?"

নলি। আজ্ঞে! আমি নলিনী।

ডাক্তার। নলিনী! তুমি এত রাত্রে কি জন্য বাবা? এই আমরা ব'সে ব'সে তোমার কথাই ভাবছিলুম। তা, তোমার কোনও চিন্তা নেই। আমিই অভিভাবক হয়ে, তোমার সম্পত্তি রক্ষা করবো।

নলিনী। মহাশয়! ও সব কথা পরে হবে! এখন ভারী বিপদ। শীঘ্র দরজা খুলুন!

বিপদের কথা শুনিয়া প্রভার প্রাণ উড়িয়া গেল। পিতার অনুজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়া সে তাড়াতাড়ি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

নলিনীকান্ত হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাতরভাবে কহিলেন, "ভারী বিপদ। আপনার বাড়ীতে আজ রাত্রে ডাকাত পড়বে। আমি নিজের কানে তাদেব পরামর্শ শুনে এলুম।"

ডাকাতের নাম শুনিয়াই ডাক্তার বাবু ভয়ে অভিভূত হইয়া পডিলেন ও জড়িত স্বরে কহিলেন, "এ্যাঃ—এ্যাঃ—সত্যি নাকি! বাবা নলিনী! তা হ'লে কি হবে?"

"হবে আবার কি? সময় থাক্‌তে টাকাকড়ি-গুলো নিয়ে আমাদেব বাড়ীতে চলুন।"

"জিনিসপত্র?"

"জিনিসপত্র সব থাক। কেবল টাকা কড়ি ও গয়না-টয়নাগুলো সব সঙ্গে নিন।"

প্রভা কহিল, "বাবা! দেরী করবেন না। ওঁর কথা শুনুন। শীঘ্র চাবি দিন, চলুন।"

ডাক্তার বাবু অতি কষ্টে প্রভার হাতে চাবি দিলেন। প্রভা আয়রণ-সেফ খুলিয়া টাকা-কড়ি ও গহনাপত্রগুলি গুছাইয়া পুঁটুলি বাঁধিতে লাগিল। ডাক্তার বাবু "হায়! হায়—" করিয়া মাথা চাপড়াইতে লাগিলেন।

এমন সময়ে ডাকাতের দল "রে—রে—" শব্দ করিয়া মশাল জ্বালিয়া, শাবল ও অস্ত্রের সাহায্যে বাড়ীর বাহিরের দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ডাক্তার বাবু ভয়ে নলিনীনাথকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "নলিনী! আমাদের রক্ষা কর।"

প্রভা তাড়াতাড়ি গিয়া একটি আলমারি খুলিয়া যেন কি খুঁজিতে লাগিল। নলিনীনাথ দেখিলেন, আলমারির মধ্যে একটি ম্যাগেজিন রিভলভার ও কতকগুলি কার্ট্রিজ রহিয়াছে। নলিনীনাথ দৌড়িয়া গিয়া ক্ষিপ্র-করে সেই রিভলভারটি বাহির করিয়া তাহাতে টোটা ভরিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। সেই অবসরে ডাকাতের দলও চীৎকার করিতে করিতে সেই স্থানে প্রবেশ করিল। এক জন ডাকাত বৃদ্ধ ডাক্তারের পক্বশ্মশ্রু ধরিয়া একটান দিয়া কহিল, "দে শালা! লোহার সিন্ধুকের চাবি বের ক'রে দে।" আর এক জন দৌড়িয়া গিয়া সজোরে প্রভার হাত ধরিয়া হিড হিড় করিয়া টানিতে টানিতে কহিল, "আমি যাদু! টাকার জন্য ডাকাতি করতে আসিনি। এসেছি তোমার জন্য চাঁদবদনি!" প্রভা তাহার হাত ছিনাইয়া লইয়া দস্যুর বুকে সজোরে এক পদাঘাত করিল। দস্যু তাহাকে পুনরাক্রমণ করিতে গেল।

বৃদ্ধ ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। নলিনীনাথ এতক্ষণ ভাবিতেছিলেন, রিভলভার ব্যবহার করিবেন কি না। এখন উপায়ান্তর না দেখিয়া, যে দস্যু প্রভাকে আক্রমণ করিতেছিল, তাহার পাদদেশ লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন। নলিনীনাথের লক্ষ্য অব্যর্থ।

দস্যু আহত হইয়া ক্রোধে শার্দ্দূলের ন্যায় এক লাফে গিয়া নলিনীনাথকে আক্রমণ করিল; আর এক জন ডাকাত ছোরা হস্তে তাহার সহায়তা করিতে গেল। প্রভাও তখন একরূপ মরিয়া হইয়া গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া গিয়া নলিনীনাথের হাত হইতে পিস্তলটি লইয়া আততায়ীদিগের উপর অজস্র গুলী ছুঁড়িতে লাগিল। স্ত্রীলোকের এইরূপ বীরত্ব ও সাহস দেখিয়া ডাকাতের দল ভীত হইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। যে ডাকাত নলিনীনাথকে ছোরা লইয়া আক্রমণ করিয়াছিল, নলিনীনাথ তাহার দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে একটি কঠিন মুষ্ট্যাঘাত করায়, তাহার হাত হইতে ছোরাখানি ঠিকরিয়া পড়িয়া, অচেতন ডাক্তার বাবুর বক্ষস্থল বিদ্ধ করিল। সেই সাংঘাতিক আঘাতেই ডাক্তার বাবুর প্রাণবিয়োগ হইল। প্রভা দৌড়িয়া গিয়া 'বাবা।' 'বাবা!' বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ডাকাতের দল তখন পলাইয়া গিয়াছে। বাণবিদ্ধা কুরঙ্গীর ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভা কহিল, "বাবা! তুমি চ'লে গেলে। আমার স্থান এখন

কোথায়?" "কেন প্রভা! আমার হৃদয়তলে তোমার তরে সুবর্ণসিংহাসন পাতা রয়েছে।" এই বলিয়া নলিনীনাথ প্রভাকে বুকে টানিয়া তাহার গোলাপী গণ্ডে একটি উষ্ণ চুম্বন অঙ্কিত করিলেন।

প্রভা এতক্ষণে দেখিতে পাইল, নলিনীনাথেরও উত্তরীয় রক্তসিক্ত। তিনিও আততায়ী দ্বারা আহত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

লতিকার আশ্রয়ভূত বৃক্ষটি যখন ঝড়ে পড়িয়া যায়, তখন অন্য বৃক্ষ অবলম্বন না করিলে সে বাঁচে কেমন করিয়া? নিরাশ্রিতা প্রভা পরদিন হইতেই নলিনীনাথের গৃহে আশ্রয়লাভ করিলেন। ভবিতব্যতার সূত্র ছিন্ন করে,—সে সাধ্য কাহার? ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার গতি প্রতিরুদ্ধ করিবে কে?

অবস্থার সমতা মানবহৃদয়ে সমবেদনার উদ্রেক করে। তাহাতে তাহাদের মধ্যে যদি আবার সমপ্রাণতা বর্ত্তমান থাকে, তবে ত কথাই নাই। একটি হৃদয়কে আর একটির সহিত দৃঢ় পাশে আবদ্ধ করিতে হইলে যতগুলি সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়, নলিনীনাথ ও প্রভার সম্পর্কে সে সবগুলিই যেন একসঙ্গে আসিয়া, তাহাদিগকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিল। এ বাঁধন যে বিধাতার নির্ব্বন্ধ।

দশ দিনে কলিকাতার বাটীতে গিয়া, গঙ্গাতীরে নলিনীনাথ তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। প্রভাও তাঁহাদের সঙ্গেই রহিল। অভিভাবকবিহীন স্বাধীনবৃত্তি যুবক-যুবতীর একত্রবাস বিনা কারণেও নিন্দুকের রসনার টীকাটিপ্পনীর হাত এড়াইতে পারে না। নলিনীনাথ তাহা বেশ বুঝিয়াছিলেন এবং প্রভার সম্পর্কে তাঁহার কর্ত্তব্য কি, তাহাও পূর্ব্ব হইতেই, তিনি এক প্রকার স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। ভগবান্ দেওয়ান প্রভাকে বধূর ন্যায় আদরের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। এইভাবে দুই তিন মাস গত হইল। বিবাহ-ব্যাপারে বরকন্যা উভয়েরই প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও লজ্জা আসিয়া অভীষ্টের পথে অন্তরায় হয়। কেহ আসিয়া এই লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলে সিদ্ধি সহজলভ্য হইয়া পড়ে। বৃদ্ধ ভগবান্ দেওয়ান সেই ভার নিজে গ্রহণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই দেখিয়া একদিন নলিনীনাথকে একান্তে পাইয়া, একটু ঢোক গিলিয়া তাহার বার্দ্ধক্য-ম্লানজ্যোতি নয়নকোণে একটু শঠতাপূর্ণ হাসির রেখা লুকাইয়া রাখিয়া, আস্তে আস্তে প্রভার সহিত নলিনীনাথের বিবাহের প্রস্তাবটি পাড়িল। নলিনীনাথও তাহাই চাহিতেছিলেন। তিনি মৌনাবলম্বনে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

সেই দিনই কুলপুরোহিত ও কুলগুরু মহাশয় পাঁজি পুথি লইয়া নলিনীনাথের কলিকাতার বাটীর দপ্তরখানায় বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভগবান্ দেওয়ানের সিহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বিবাহের দিন স্থির করিলেন ও চারি হস্তে শূন্য আশীর্ব্বাদের রাশি ছড়াইয়া, তাহার বিনিময়ে দক্ষিণায় পূর্ণহস্তে, রজনী প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় নিজ নিজ বাটীতে ফিরিয়া গেলেন।

তাহার পরে, এক চন্দ্রমালোকিত, মলয়-সেবিত বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে, গুরুজন ও নমস্যদিগের সধান্য-দূর্ব্বা আশীর্ব্বাদের মধ্যে, পুরোহিতের বেদমন্ত্রাহূত হব্যলোলুপ হোমাগ্নিতে পবিত্র লাজক্ষেপের সঙ্গে, নবদম্পতি-শিরে অজস্র কুসুমরাশিবর্ষণের মধ্যে, বয়স্য সতীর্থ ও সখাগণের হৃদয়োৎসারিত হাস্য-পরিহাস ও কলরবের মধ্যে দিগন্ত পূর্ণ করিয়া আনন্দের লহর ছুটাইয়া সপ্তমে গীত সানাইয়ে সাহানার মুগ্ধ তানের মধ্যে চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় নানা প্রকার সুখাদ্য সুপেয়ে পরিতৃপ্ত ও পূর্ণোদর 'ইতরেজনার' আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে হরিণীনয়ন পুরাঙ্গনাগণের মাঙ্গলিক উলুধ্বনির মধ্যে, সুখস্বপ্নবিভোর বর নলিনীনাথ ও এই আকস্মিক অবস্থা-বিপর্য্যয়ের ফলাফল সম্বন্ধে সন্দিহানা, অথচ নলিনীনাথের রূপে ও গুণে মুগ্ধা, নিতান্ত মুগ্ধা বেপথুমতী প্রভার ভাগ্যসূত্র একসঙ্গে গ্রথিত হইয়া গেল।

বিবাহ এক প্রকার নিষ্কণ্টকে কাটিয়া গেল। বিবাহের তৃতীয় রজনীতে ফুলশয্যা। ফুলশয্যার রজনীতে প্রভার সহিত প্রথম মিলনের ব্যাকুলতায় যেমন নলিনীনাথ শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন, অমনি কি জানি কেন, তাঁহার কণ্ঠ হইতে সন্ন্যাসিদত্ত

সেই মণিমালাটি খসিয়া পড়িল। প্রভা তাড়াতাড়ি আসিয়া উহা কুড়াইয়া লইয়া স্বামীর গলায় পরাইয়া দিল। নলিনীনাথ কি যেন একটা ভাবী দুর্নিমিত্তের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "প্রভা! আমার বোধ হয়, আমাদের কোনও একটা ভয়ঙ্কর অমঙ্গল হবে। তা না হ'লে, কেন হঠাৎ আমার হারটি বিনা কারণে খসে পড়লো?"

প্রভা স্বামীকে ব্যাকুল দেখিয়া চিন্তিত হইল। নলিনীনাথ কহিলেন, "এই ভাবী দুর্নিমিত্তের একটি প্রতিক্রিয়া করা প্রয়োজন। আমি কালই হরিদ্বার রওনা হবো এবং সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো।"

প্রভা স্বামীকে কত বুঝাইল। এত তাড়াতাড়ি হরিদ্বার যাইতে তাঁহাকে কত মানা করিল। নলিনীনাথ কোন কথাই মানিলেন না। তাঁহার মন উদ্বিগ্ন হইয়াছে। ভগবান্ দেওয়ানকে তখনই সেইখানে ডাকান হইল। তাঁহার সহিত পরামর্শে স্থির হইল, পরদিন রাত্রেই পঞ্জাবমেলে নলিনীনাথ হরিদ্বার যাইবেন। দুইদিনের জন্য যাওয়া। সেই জন্য নলিনীনাথ সঙ্গে লোকজন চাকর-বাকর লইবেন না।

সেই ব্যবস্থানুরূপ কার্য্যও হইল।

নলিনীনাথ চলিয়া গেলে পর, প্রভা বালিসে মুখ লুকাইয়া কত কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বালিস ভিজিয়া গেল। তবু সে কান্না থামে না। প্রভার নয়ন-কোণে যে সপ্তসাগরের সমস্ত বারি লুকাইয়া ছিল, ইহার আগে সে নিজেও তাহা জানিত না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ডাক্তার বাবুর চাকর হলধর আর এখন সে 'হলা' নাই। এখন সে একটা 'কেষ্ট-বিষ্ণুর' মধ্যে পরিগণিত হইয়া প্রভার বাটীতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছে। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হলধরের বেশভূষারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং তাহার গায়ে ফিনফিনে জালিদার রং-করা গেঞ্জী। পরিধানে চওড়া লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী। পায়ে চটী জুতা! স্কন্ধে মুরগীআঁকা তোয়ালে। বহু দিন ডাক্তারের বাড়ীতে চাকরী করায় চাকর-বাকর-মহলে ধারণা যে, হলধর তাহার পুরাতন মনিবের দুই চারিটি প্রেস্‌ক্রপসন ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিকিৎসাশাস্ত্রে জ্ঞানও কিঞ্চিৎ মারিয়া লইয়াছিল। হলধরের নলিনীনাথের বাটীতে অধিষ্ঠানের পর হইতে চাকর-মহলে মাঝে মাঝে এক আধটুকু চিকিৎসা-বিভ্রাট ও ক্ষুদ্র আপদবিপদ ঘটিত। প্রথমে কেহই তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। ক্রমে জানা গেল যে, হলধরের ডাক্তারীই সেই সকল ক্ষুদ্র বিভ্রাটের মূল কারণ।

একদিন লবধন নামে একটি চাকর তাড়াতাড়ি আসিয়া হলধরকে কহিল, "হলা দাদা! তুমি এখানে নিশ্চিন্দি ব'সে রয়েছ, আর এ দিকে আমি যে মরি। আমার পেট গেল দাদা! পেট গেল।"

হল। কেন রে, তোর কি হয়েছে?

লব। আমার পেট ভয়ানক সেঁটে ধরেছে।

"তার জন্য ভয় কি? এই দেখ্—এখ্‌খুনি সারিয়ে দিচ্ছি।" এই কথা বলিয়া হলধর ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া গিয়া, পাশের ঘর হইতে একটি প্রকাণ্ড গড়গড়ার নল আনিয়া, তাহার এক দিক লবধনের মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিল, অপর দিক তাহার নিজের কানে দিয়া কহিল, "কাস, দেখি একবার, একটু জোরে।" লবধন কাসিতে লাগিল।

হল। থাক্! থাক্! আর কাস্‌তে হবে না। তোর পেটে কুপিত মল আছে দেখ্‌ছি। এক কাজ কর্। রেড়ীর তেল এক বাটি খা। তাতে, ভরি খানেক আফিং গুলে নিস্। যদি রেড়ীর তেলে বেশী নাবায়, তা হ'লে আফিংয়ে সেটাকে টেনে রাখ্‌বো বুঝলি কি না? যা—দেরী করিস্‌নি।

লব। হলু দা! আফিংয়ে তেলে খাব? শেষে কিছু হবে না ত?

হল। হবে আবার কি? আমি কি বই-টই না দেখেই তোকে যা তা একটা ওষুধ দিচ্ছি।

লবধন 'আচ্ছা' বলিয়া ঔষধের চেষ্টায় গেল। আফিং মিলিল না বলিয়া, কেবল খানিকটা রেড়ীর তেল আনিয়া সে খাইয়া ফেলিল। ইহাতে দারুণ

অনিষ্ট অবশ্য একটা কিছু ঘটিল না। তবে তৈলের মাত্রা অধিক হওয়ায় রেচন কিছু বেশী হইল। কথাটা চাকরদিগের মধ্যে কানঘুষা হইতে হইতে ক্রমে ভগবান্ দেওয়ানের কানে পৌছিল।

দেওয়ানজী লবধনকে একাকী ডাকিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। লবধন হলধরের চিকিৎসা-চাতুর্য্য ব্যাপারটি আমূল খুলিয়া বলিল।

দেওয়ানজী চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "সর্ব্বনাশ! ওরে ব্যাটা! তেল আফিং তুই-ই খেয়েছিস্ নাকি?"

লব। আজ্ঞে, খালি তেল খেয়েছি। আফিং পেলাম না।

দেও। যা বেটা! বেঁচে গিইছিস্। খবরদার, আফিং খাস্‌নি।

ইহার কিছুক্ষণ পরে দেওয়ানজী হলধরকে একান্তে ডাকিয়া কহিলেন, "বাবা হলধর! আর যা হয় কর। এই চিকিচ্ছেটা ছেড়ে দাও। কবে পুলিপোলাও যাবে?"

"আজ্ঞে, দেওয়ানজী! আপনি সে ভাবনা করবেন না। আমি ডাক্তার বাবুর কাছে থেকে এ বিদ্যেটা অনেক শিখে নিইছি।"

"তা ত দেখতে পাচ্ছি। তবে কি না, নতুন বিয়ের ক'নেগুলো একটু ডাক্তারির উপর চটা। তুমি বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছ। তা ডাক্তারিটা না ছাড়লে তো আমরা তোমার জন্য উপযুক্ত পাত্রী যোগাড় কর্‌তে পারছি না।"

বলা বাহুল্য যে, বিয়ে-পাগলামিটা হলধরের বিকৃত মস্তিষ্কের একটা প্রধান খেয়াল ছিল। দেওয়ানজী এ কথা জানিতেন এবং এই মানসিক দুর্ব্বলতার অরক্ষিত রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়া হলধরকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিয়া লইতে কূটবুদ্ধি বৃদ্ধ জমীদারের দেওয়ান ভগবানের বড় অধিক সময়ক্ষেপ করিতে বা বেগ পাইতে হইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—০—

হরিদ্বারে পৌছিয়া নলিনীনাথ সেই দিনই সত্য-নারায়ণজীর মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই মন্দিরটি হরিদ্বার হইতে প্রায় চারি ক্রোশ উত্তরে। সেখানে পৌছিতে নলিনীনাথের বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইল। সেখানে সন্ন্যাসীর সন্ধান লইতে লইতে জানিতে পারিলেন যে, মহাপুরুষ প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে পশুপতিনাথ দর্শন করিবার জন্য নেপালে গিয়াছেন। কবে ফিরিবেন, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। নলিনীনাথ এক দিন সেখানে থাকিয়া, তাহার পরদিন অনন্যোপায় হইয়া হতাশভাবে হরিদ্বার অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ও সেই দিনই গঙ্গা পার হইয়া চণ্ডীদেবীর পর্ব্বত বামে রাখিয়া সোজা পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহার গন্তব্যস্থানের তখন কোনও স্থিরতা ছিল না। আকাশে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। নলিনীনাথ দেখিলেন যে, আনমনে চলিতে চলিতে তিনি একটি নিবিড় পার্ব্বত্য অরণ্যের প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছেন। যে পথ ধরিয়া তিনি আসিতেছিলেন, সেই পথ-রেখা ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া এইখানেই আসিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। সেখানে লোকালয়ের লেশ মাত্র নাই। কেবল দূরে পর্ব্বত-গাত্রে এক আধটি জীর্ণ-পর্ণশালার রন্ধ্রপথে ক্ষীণ দীপালোক দেখা যাইতেছিল। নলিনীনাথ কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। এই সময় এক-দল পার্ব্বত্য বালিকা সেই পথে গৃহে ফিরিতেছিল। ইহাদের দেহের কানায় কানায় রূপ। নয়ন-কোণে উচ্ছলিত উদার প্রীতি ও সরলতা। এই দুর্গম বনস্থলে অপরিচিত আগন্তুককে দেখিয়া বালিকাগণ একটু বিস্মিত হইল। তাহারা একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতে লাগিল। নলিনীনাথ পার্ব্বতীয় ভাষা জানিতেন না। মিশ্র হিন্দুস্থানীতে জানাইলেন যে, তিনি বিদেশী, বিপন্ন, পথভ্রান্ত, শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত। বালিকাগণ তাঁহার কথা শুনিয়া ব্যথিত হইল ও তাঁহাকে দূরে একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য গ্রাম দেখাইয়া কহিল, "ওইটি আমাদের পল্লী। চলুন ওইখানে, আপনাকে লইয়া যাই।" এই বালিকা-দলের নেত্রী

ছিল এক জন যুবতী। যুবতী সুবর্ণ-লতিকার ন্যায় তন্বী। চম্পককলিকার মত গৌরী। ফুল্লযূথিকার ন্যায় হাস্যময়ী। গিরি-নির্ঝরিণীর ন্যায় প্রাণময়ী। সে বালিকাদলকে পার্ব্বত্যভাষায় কি আদেশ দিল। বোধ হয়, পথিকের জন্য কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলিল। তাহার কথায় বালিকাগণ হাসিতে হাসিতে গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল। সে তখন নলিনীনাথের সমীপে আসিয়া ভগ্ন হিন্দুস্থানীতে কহিল, "আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আপনি দেখিতেছি অত্যন্ত ক্লান্ত। পল্লী এখান হইতে অনেক দূর। আপনি তত দূর চলিয়া যাইতে পারিবেন না। এখানে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের গহ্বর আমার জানা আছে। সেইখানে কোনও প্রকারে রাত্রিটা কাটাইয়া কাল প্রাতেই আমি আপনাকে পল্লীতে লইয়া যাইব।"

নলিনীনাথ বাস্তবিকই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। আর পথ চলিতে পারিতেছিলেন না। তিনি যুবতীর পরামর্শ গ্রহণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিতে পাইলেন না। যুবতী আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল; অন্ধকারে সঙ্কীর্ণ কঙ্করময় বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে চলিতে নলিনীনাথের বিষম কষ্ট হইতে লাগিল। দুই একবার পদস্খলিত হইয়া তিনি পড়িয়াও গেলেন। তাহা দেখিয়া প্রকৃতির দুহিতা বিমল-স্নেহপূর্ণ-হৃদয়া কলঙ্কলেশশূন্যা এই পার্ব্বত্য রমণী পার্ব্বত্যসরলতায় ছুটিয়া আসিয়া নলিনীনাথের হাত ধরিল।

সেই স্পর্শে নলিনীনাথ প্রমোহিত হইলেন। তাঁহার অক্ষিদ্বয় রসাবেশে নিমীলিতপ্রায় হইয়া আসিল। তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। তাঁহার কলেবর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

নলিনীনাথ জিজ্ঞাসিলেন, "শুভে, তোমার নাম কি?"

যুবতী উত্তর দিল, "আমার নাম মহামায়া।"

নলিনীনাথ পাশ্চাত্য দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রাচ্য দর্শনেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। শঙ্করাচার্য্য, গৌতম, কণাদ প্রভৃতি মনীষী ঋষিগণ যে 'মায়ার' স্বরূপ তত্ত্ব জানিবার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া তপস্যায় কাটাইয়াছেন, যাহার সন্ধানে, তাঁহারা হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, আটক হইতে গান্ধার অবধি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন, আজ কি তপস্যার বলে, কোন্ পুণ্যফলে নলিনীনাথ বুঝিতে পারিতেছিলেন না, সেই জ্ঞানযোগিগণ-চিরবাঞ্ছিত মায়া আজ এরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে এই স্বভাবসুন্দরী পার্ব্বত্য-রমণীর রূপ ধরিয়া আসিয়া মহামায়া নামে তাঁহার সকাশে পূর্ণ মহিমায় প্রকাশিত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

কিছুদূর গিয়া, নলিনীনাথ পর্ব্বতগাত্রে একটি ক্ষুদ্র গহ্বর দেখিতে পাইলেন। তাহার মুখটি একখানি শিলাফলকে নির্ম্মিত কবাটের মত জিনিষের দ্বারা আবদ্ধ। সেই শিলাফলকখানিকে একটু কৌশলে ঠেলিয়া দিতেই গহ্বরের মুখ দেখা গেল। মহামায়া নলিনীনাথের হাত ধরিয়া তাঁহাকে অতি সন্তর্পণপাদবিক্ষেপে সেই গহ্বরমধ্যে লইয়া গেল। গুহাটি অন্ধকারময়। মহামায়া অচিরে তাহার পৃষ্ঠবিলম্বিত একটি থলি হইতে একখণ্ড লৌহ, একখানি চক্‌মকি প্রস্তর ও এক টুক্‌রা সোলা বাহির করিল লৌহ ও প্রস্তরে পরস্পর আঘাত করিয়া প্রস্তর হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইলে, সে তাহারই সাহায্যে সেই সোলার টুকরাতে অগ্নি জ্বালাইল। তাহার পর সে দৌড়িয়া গিয়া বাহির হইতে কিছু শুষ্ক পত্র ও লতাগুল্মাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করিল। সেই আলোকে নলিনীনাথ দেখিতে পাইলেন যে, গহ্বরটি বেশ বড়। তাহার মধ্যস্থলে একখণ্ড সমতল শিলা। তাহার উপর এক জন মানুষ অক্লেশে শয়ন করিতে পারে। অগ্নির উত্তাপে গহ্বরটি বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছিল। মহামায়া নলিনীনাথকে সেই শিলাতলে শয়ন করিতে ইঙ্গিত করিল। নলিনীনাথও বিশ্রামেরই জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বিনাবাক্যব্যয়ে গিয়া শিলাতলে শয়ন করিলেন। মহামায়া তাঁহার নিকটে উপবেশন করিয়া ধীরে ধীরে নলিনীনাথের মস্তকটি আপন উৎসঙ্গে উঠাইয়া লইয়া একদৃষ্টে তাঁহার চিন্তা ও অবসাদক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

নলিনীও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় যুবতীর মুখের পানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

পাঠক, মানব-হৃদয়-নিহিত চৌম্বক-শক্তি-সত্তায় আস্থাবান্ কি না জানি না, কিন্তু তাঁহার জীবনে যে তিনি, বহুবার না হউক, অন্ততঃ এক আধবারও এই বিরাট শক্তির বিকাশ, ইহার প্রবল আকর্ষণ-বিকর্ষণ, ইহার আশীবিষ-দংশনের ন্যায় তীব্র জ্বালা, ইহার চন্দন-রসের ন্যায় স্নিগ্ধতা অনুভব করেন নাই, তাহা আমি কল্পনা করিতে পারি না। জড়-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ জড়জগতের অন্তর ও বহির্নিহিত বহু বহু প্রবল শক্তির অস্তিত্ব সপ্রমাণিত করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা প্রমাণিত ও কল্পিত বৈদ্যুতিক শক্তিই বল, আর রেডিং বৈদ্যুতিক শক্তিই বল, উৎকটতায়, জ্বালায়, স্নিগ্ধতায়, সে সমস্ত শক্তিই যে মানবের মনোজগতের অন্তর্নিহিত এই প্রবল চৌম্বকশক্তির নিকট পরাস্ত হয়, ইহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের উপলব্ধি করা অসম্ভব। এই শক্তির ক্রিয়া অতীব জটিল রহস্যময়, সাধারণ যুক্তিমার্গবিগর্হিত, নিয়মবিরহিত ও সৃষ্টিছাড়া। সমধর্ম্মাক্রান্ত দুইটি হৃদয়, এই শক্তির পরিধিমধ্যে উপস্থিত হইলে একের স্নায়বিয় সূত্র ও মস্তিষ্কের কেন্দ্রপথে ইহা অপরের হৃদয়ে সংক্রামিত হয়। তখন এই দুইটি হৃদয়ের মধ্যে জড়জগতে পরিদৃশ্যমান পার্থক্য ঘুচিয়া গিয়া তাহারা একীভূত হইয়া যায়। তাহাদের বিশ্লেষণ একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে। এই শক্তির আর একটি প্রধান ধর্ম্ম এই যে, ইহা মানুষকে অহমিকা বিসর্জ্জিত করিতে শিক্ষা দেয়, তাহাকে পরের জন্য প্রাণ দিতে প্রলুব্ধ করে, তাহাকে মোক্ষের অক্ষয় পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। স্থান-কালপাত্রভেদে ইহার নাম, ক্রিয়া ও অভিব্যক্তি বিভিন্ন। বালকে বালকে এই আকর্ষণের নাম—সৌহৃদ্য। যুবক-যুবতীতে এই আকর্ষণের নাম—অনুরাগ। গুরু-শিষ্যে এই আকর্ষণের নাম—ভক্তি। পিতামাতার ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে এই আকর্ষণের নাম—বাৎসল্য। নলিনীনাথ ও এই সরলা পার্ব্বত্য-বালিকা যে প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্ত্তেই তাহাদের নিজ নিজ সত্তা হারাইয়া একীভূত হইয়া গিয়াছিল, তাহার কারণ এই মানবীয় চৌম্বক-শক্তি। আর কিছুই নহে।

সেই রাত্রে নলিনীনাথও ঘুমাইলেন না। মহামায়াও ঘুমাইল না। উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া সুদীর্ঘ ত্রিযামা জাগ্রত স্বপ্নে কাটিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

—:০:—

এ দিকে মহামায়ার পিতামাতা ও আত্মীয়গণ মহামায়ার সঙ্গিনীগণের নিকট সেই অপরিচিত যুবকের কথা শুনিয়া তখনই কন্যার অন্বেষণে বাহির হইল। তাহারা মশাল জ্বালাইয়া বনের প্রত্যেক অংশ, প্রত্যেক ঝরণার খাদ, প্রত্যেক পর্ব্বত গুহা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল; নিয়তির লীলা বিচিত্র। যে গুহায় নলিনীনাথ ও মহামায়া আশ্রয় লইয়াছিলেন, সে দিকে ভুলিয়াও কেহই আসিল না। নিষ্ফল অন্বেষণে ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। তাহারা হতাশভাবে গৃহে ফিরিয়া গেল। পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই তাহারা আবার মহামায়ার খোঁজে বাহির হইল। তখন নলিনীনাথ ও মহামায়া গুহা পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়াছেন ও পল্লী অভিমুখে যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন।

মহামায়াকে দেখিয়াই তাহার মাতা দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিল। তাহার পিতাও তাহার নিকটে গিয়া কহিল, "কেন বল তো মা! কাল রাত্রে আমাদিগকে এত ভোগাইয়াছিলি? তুই কোথায় ছিলি?"

মহা। কেন, ওই গুহার মধ্যে। আমার বরের সঙ্গে।

পিতা। কে তোর বর?

মহা। ওই বাবুজি।

পিতা। ছি মা! ও কথা কি বল্‌তে আছে? উনি বিদেশী লোক। আমাদের জাত নয়। ওঁর সঙ্গে কি বিয়ে হয়?

মহা। আমি ওঁকে বিয়ে করেছি। উনিও আমায় বিয়ে করেছেন। উনিই আমার বর। এই দেখ, উনি কাল রাত্রে আগুন সাক্ষী ক'রে আমার গলায় এই মালা পরিয়ে দিয়েছেন।

কেমন সুন্দর মোতির মালা। এমন সুন্দর মালা কারও নেই। এমন সুন্দর বরও কারও নেই।

এই কথা বলিয়া মহামায়া তাহার মরাল-বিনিন্দিত নিটোল, সুডৌল, সুশোভন কণ্ঠে বিলম্বিত সুন্দর মুক্তাহার সকলকে দেখাইল। প্রেমে কিরূপ বিস্মৃতি ঘটে, পাঠক তাহা বুঝিয়াছেন কি? এই হার নলিনীনাথের মাতৃদত্ত সেই মণিমালা— যাহা তিলেকের জন্য কণ্ঠচ্যুত করাও তাঁহার মাতার মরণকালীন নিষেধাজ্ঞা। মাতৃভক্ত নলিনীনাথ তাহাও ভুলিয়াছিলেন। এই জন্যই বলে, 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।'

মহামায়ার মাতা কন্যাকে বুঝাইয়া কহিলেন, "ছি মা! ও রকম অন্যায় আব্দার কি কর্তে আছে? শান্তমায়া ঠিক এমনইতর এক জন অপরিচিত যুবকের প্রণয়ে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করলে। তার বরও তাকে প্রথম প্রথম কত আদর-যত্ন করলে। শেষে তাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের দেশে পালিয়ে গেল। মা! অপরিচিত বিদেশীকে কি বিশ্বাস করতে হয়? তোর দিদি খুব চালাক আর দেখতেও খুব সুশ্রী ছিল, তাই দিল্লীতে গিয়ে বাইজীর গান শিখে ও সেই ব্যবসা ক'রে এখন বেশ অবস্থা ভাল করেছে। মনে কর তো মা! যদি সে তা না করতো, তবে তার কি দশা হতো?"

মহামায়ার পিতামাতা তাহাকে কত বুঝাইল। সে কিছুতেই তাহাদের নিষেধ মানিল না। স্পষ্ট কহিল যে, এ বিবাহে যদি তাহার পিতামাতা আপত্তি করে, তবে সে আত্মহত্যা করিবে।

কন্যার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অগত্যা মহামায়ার পিতামাতাকে সম্মত হইতে হইল।

সেই দিনই গোধূলিলগ্নে মৌনমুগ্ধ পার্ব্বত্য প্রকৃতির সাক্ষাতে পার্ব্বত্য রীত্যনুসারে নলিনীনাথ ও মহামায়ার বিবাহ হইয়া গেল।

নলিনীনাথ যেমন তাঁহার নিজকণ্ঠের বনযূথিকা-রচিত মালা মহামায়ার কণ্ঠে পরাইয়া দিবেন, অমনি প্রকৃতির বিরাট আস্যে একটি বিকট হাস্য-রেখা দেখা দিল। গগনতল উদ্ভাসিত করিয়া একটি তীব্রোজ্জ্বল বিদ্যুল্লেখা স্ফুরিত হইল। তাহা দেখিয়া নলিনীনাথ চমকিয়া উঠিলেন।

পাঠক নিশ্চয়ই নলিনীনাথকে হৃদয়হীন বহুপত্নীক বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছেন। আমি কিন্তু দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, ইহাতে নলিনীনাথের দোষ কিছুই নাই। মানুষ নিয়তির হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকামাত্র। বিশ্বনিয়ন্তা বিরাট পুরুষোত্তম শিল্পীর হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকার হস্ত-পদাদি-সংলগ্ন সমস্ত রজ্জুগুলি ধৃত রহিয়াছে। তিনি যেমন ভাবে নাচাইবেন, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সেইরূপ ভাবেই মানুষকে নাচিতে হইবে।

সম্পূর্ণরূপে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া নলিনীনাথ যেন নিমেষে মুছিয়া ফেলিয়া দিলেন—তাঁহার সমস্ত অতীত জীবনের স্মৃতিখানিকে, তাঁহার ভবিষ্যতের আশাটুকুকে। তাঁহাকে জীবিত রাখিল—কেবল বর্ত্তমান!—কেবল মহামায়া।

একাদশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

দিনের পর দিন চলিয়া গেল। সপ্তাহও কাটিতে বসিল। কৈ, নলিনীনাথ তো গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। তাঁহার কোন পত্রাদিও পাওয়া গেল না। প্রভা দারুণ উদ্বেগে ও দুশ্চিন্তায় পাগলিনীর ন্যায় হইয়া উঠিলেন। হরিদ্বারে চেনা-শুনা পাণ্ডাদিগের নিকট কত টেলিগ্রাম পাঠান হইল; নলিনীনাথের কোন সংবাদই তাহারা দিতে পারিল না। প্রভা ভাবিলেন, নিশ্চয়ই কোনও নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তিনি আর কাহারও কোন কথা শুনিলেন না; কোন প্রবোধ মানিলেন না। ভগবান্ দেওয়ানকে ডাকাইয়া কহিলেন, "আজ রাত্রেই পঞ্জাবমেলে আমি হরিদ্বার রওনা হইব। দুই তিন জন দাস-দাসী ও এক জন পাচক সঙ্গে লউন। উপযুক্ত পাথেয়ও ঠিক করিয়া রাখুন।"

ভগবান্ দেওয়ানও বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলেন। প্রভার এই প্রস্তাব তিনি সাগ্রহে অনুমোদন করিলেন।

প্রভা সেই দিন রাত্রেই ভগবান্ দেওয়ানকে সঙ্গে লইয়া হরিদ্বার অভিমুখে যাত্রা করিল। পথে বিষম উৎকণ্ঠায় প্রভার দুই দিন কাটিল।

হরিদ্বারে পৌঁছিয়াই প্রভা তন্ন তন্ন করিয়া নলিনীনাথের খোঁজ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল যে, এক জন বাঙ্গালী বাবু সপ্তাহ পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি এক দিন-মাত্র থাকিয়া কোথায় যে চলিয়া গিয়াছেন, তাহা কেহই জানে না। প্রভা নলিনীনাথের সন্ধানে চারিদিকে লোকজন পাঠাইল, অকাতরে অর্থব্যয় করিতে লাগিল। সকলেই হতাশ হইয়া ম্লান-মুখে ফিরিয়া আসিল। কেহ কোনও সংবাদ আনিতে পারিল না। প্রভা মনে মনে স্থির করিল যে, যত দিন নলিনীনাথের কোনও সন্ধান না পান, তত দিন হরিদ্বারের পথে যত নগর গ্রাম আছে, সে সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিবে। তাহার আরাধ্য স্বামি-দেবতার অনুসন্ধানে প্রয়োজন হইলে, তাহার সমস্ত জীবনটাকেই কাটাইবে। ভগবান্ দেওয়ান একপ্রকার হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। সে-ও সমস্ত বিষয়ে প্রভার অনুবর্ত্তী হইয়া তাহার প্রভুর কার্য্যে অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

—o—

এ দিকে মহামায়ার পিতার সেই জীর্ণ পর্ণকুটীরে ছিন্ন দড়ির খাটে শুইয়া, মৃগয়ালব্ধ মাংস, বনজাত ফল-মূল, সজী ও মোটা চাউলের অন্ন আহার করিয়া এবং মহামায়ার আদর-সোহাগ ও যত্নে নলিনীনাথের দিনগুলি বেশ কাটিতে লাগিল। মানুষের অদৃষ্ট বেজায় খামখেয়ালী। সুখে হউক, দুঃখে হউক, একইভাবে মানুষের সময় কাটিতেছে— ইহা যেন তাহার চক্ষুঃশূল। ভাল হউক, মন্দ হউক, একটু বিচিত্রতা তার চাই-ই চাই।

এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আকাশে সূর্য্য যখন ডুবুডুবু, তখন বনজাত-কুসুম-গন্ধ-সুরভিত একটি লতা-বিতানের পার্শ্বে শিলাতলে একান্তে উপবিষ্ট হইয়া নলিনীনাথ মহামায়ার সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলেন। সহসা সেই বনপথে দূরে একটি অনুচর-বেষ্টিতা সালঙ্কারা সুবেশা সুন্দরীকে দেখিয়া নলিনীনাথ চমকিয়া উঠিলেন। মহামায়াও তাহাকে দেখিবামাত্র আহ্লাদে করতালি-ধ্বনি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "ঐ আমার দিদি শান্তমায়া! ও-ই! ও-ই দিল্লীতে বিখ্যাত মমতাজ বাইজী নামে পরিচিত। এত দিন পরে বোধ হয়, ওর আমাদের কথা মনে পড়েছে। তাই আমাদের দেখ্‌তে এসেছে।"

মহামায়ার কথা শেষ হইতে না হইতেই শান্তমায়া ওরফে মমতাজ বাইজী সেইখানে আসিয়া, নলিনীনাথকে দেখিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। পরে ভগিনীকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া মৃদু-স্বরে জিজ্ঞাসিল, "ঐ লোকটি কে রে, মহামায়া?"

"কেন? আমার বর।"

"তোর বর! তোর আবার বিয়ে হ'ল কবে?"

"কেন, দশ বারো দিন হলো!"

মমতাজ, কি জানি কেন, তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে একটা দারুণ বিষের জ্বালা অনুভব করিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, "অদৃষ্টের এ কি ক্রূর পরিহাস! মহামায়া এই দুর্গম বনভূমির ক্রোড়ে লালিতা। তাহার ভাগ্যে এমন বর! জীর্ণ পর্ণশালায় শয়ন করিয়া আমমাংসে ও কদর্য্য তণ্ডুলান্নে অর্দ্ধাশনে থাকিয়াও ইহার হৃদয়ে এত আনন্দ! আর আমি?-- আমি হতভাগিনী মর্ম্মরময় প্রাসাদে দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত মূল্যবান্ পর্য্যঙ্কে দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শয়ান থাকিয়াও, আমার হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে শত বৃশ্চিকের দংশনজ্বালা অনুভব করি। বিলাসী যখন তাহার লালসাদীপ্ত আসব-লিপ্ত ওষ্ঠে, আমার ওষ্ঠপুটে চুম্বন অঙ্কিত করে, তখন আমি আমার সর্ব্বাঙ্গে বিষব্রণের জ্বালা অনুভব করি। যখন তাহার ভুজঙ্গপিচ্ছিল বাহুদ্বয় আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে, তখন আমার মনে হয় যে, এই বারবনিতার ব্যবসায় অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হ'ল না কেন? একবার যদি এঁকে পাই, আমি সব ছেড়ে দিয়ে, সব সাধ, সব আশা, সব কামনা ঐ পদতলে ঢেলে দিয়ে দাসী হয়ে এঁর পদ সেবা করি। আহা মরি মরি, কি রূপ! কি চাহনি! কি সরলতা! কি মধুরতা!"

নলিনীনাথের রূপ দেখিয়া মমতাজ পাগলিনী হইল। সে প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন করিয়া হউক, নলিনীনাথকে সে ভুলাইবে। নলিনীনাথকে সে তাহার আপনার করিয়া লইবে। বাজে বাজুক

তাহাতে তাহার ভগিনীর হৃদয়ে দারুণ ব্যথা। যায় যাক্ তাহাতে মহামায়ার হৃদয় শতখণ্ডে চূর্ণ হইয়া! মহামায়া কি নলিনীনাথের উপযুক্তা স্ত্রী? সে বালিকা! সে সরলা। সে প্রকৃতি-পালিতা বনবিহারিণী হরিণী, সে অযত্ন-লালিতা বনলতা; উদ্যানে তাহাকে মানাইবে কেন?

প্রণয়ের কালকূট যখন হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন মানুষ এমনই হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

—০—

বারাঙ্গনার শিল্পে ও চাতুর্য্যে মমতাজ সিদ্ধহস্ত ছিল। কিন্তু নলিনীনাথকে মুগ্ধ করিবার সমস্ত প্রয়াসই তাহার নিষ্ফল হইল। তাহার কারণ— মমতাজের একটু ক্ষুদ্র ভ্রম। মমতাজ এত দিন যে সকল জীবের উপর দিয়া তাহার বারাঙ্গনা-কলার অনুশীলন করিয়াছে এবং যাহাদিগকে অতি সহজে তাহার প্রণয়-বাগুরায় আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহারা কেহই তাহার নিকট হৃদয় আদান-প্রদানের জন্য যায় নাই। গিয়াছে মূল্য দিয়া রূপ কিনিতে। গিয়াছে অর্থের বিনিময়ে স্ফূর্ত্তি কিনিতে। প্রাণ তাহারা খোঁজেও নাই, প্রাণ তাহারা পায়ও নাই। পেট ভরিয়া মিষ্টান্ন খাইলে কি কখনও পিপাসা মিটে? যতই স্নিগ্ধ হউক না, সলিলে তো ক্ষুধা তৃপ্ত হয় না, প্রাণ চাহে প্রাণ; সম্ভোগ চায় না। ভোগী চাহে ভোগ্য। প্রাণ তাহার আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী নহে। কিন্তু পুরুষই হউক, আর রমণীই হউক, হৃদয় যখন আছে, তখন তাহার বিনিময় সে চাহে! তাহা পাইলেই তাহার সুখ। না পাইলে তাহার অতৃপ্তি! সেই জন্য মমতাজ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইলেও হতভাগিনী। মহামায়া জীর্ণ কুটীরবাসিনী হইলেও রাজ-রাজেশ্বরীর সম্পদে সম্পন্না।

মমতাজ যখন দেখিল যে, তাহার হাবভাবে নলিনীনাথকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা ফলবতী হইল না, তখন এক দিন নলিনীনাথকে একান্তে পাইয়া, সে আবেগে আপনার হৃদয়ের সমস্ত কথা প্রকাশ করিল এবং তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্ররোচনে সে একেবারে যাইয়া নলিনীনাথের বক্ষস্থলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। নলিনীনাথ ঘৃণাভরে তাহাকে দূরে সরাইয়া দিলেন। এইরূপ প্রত্যাখ্যাতা হইয়া মমতাজ নিরুদ্ধবীর্য্য ফণিনীর মত রোষে গর্জ্জিতে লাগিল। নলিনীনাথ সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

মমতাজ অনেকক্ষণ সেইখানে একাকী বসিয়া রহিল। ক্রোধে ও অপমানে সে তাহার হৃদয়ে দারুণ বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। তাহার পঞ্জর ভাঙ্গিয়া দীর্ঘশ্বাস বহিতে লাগিল। তাহার নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিল। তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইতে লাগিল। সে মনে মনে এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য কত কি উপায় কল্পনা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া মমতাজ যেন একটু আশ্বস্তা হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল। তাহার মুখে সয়তানের মত স্থির-প্রতিজ্ঞার চিহ্ন। তাহার অক্ষি-কোণে ঈর্ষ্যা ও প্রতিহিংসার ভ্রূকুটিলীলা ও তীব্র বহ্নিজ্বালা

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

—০—

পার্ব্বতীয়গণ পুরুষ-রমণীতে, পিতা-পুত্রে, ভ্রাতা-ভগ্নীতে, শ্বশুর-জামাতায় একসঙ্গে বসিয়া মদ্যপান করে। ইহা পার্ব্বতীয় সমাজে দূষণীয় বা নিন্দনীয় হয় না। বরং এরূপ আমোদে কেহ যোগদান না করিলে,সে সামাজিক নিয়মকে তাচ্ছীল্য করিতেছে বলিয়া তাহার চরিত্র নিন্দার্হ হয়।

সংসর্গ মানুষের চরিত্রে পরিবর্ত্তন আনে। নলিনীনাথ পূর্ব্বে কোন মাদক সেবন করিতেন না। এক্ষণে তিনি পাহাড়ীয়াদিগের সহিত রীতিমত মদ্যপান করেন।

মমতাজ নলিনীনাথের বড় শ্যালিকা। সেই জন্য তাহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া নলিনীনাথ ক্রমে ক্রমে মদ্যপ হইয়া পড়িয়াছেন।

এক দিন সন্ধ্যার পরে প্রাঙ্গণে বসিয়া সকলে মিলিয়া এইরূপ মদ্যপান চলিতেছে। মমতাজ নিজ-হস্তে পানপাত্র পূর্ণ করিয়া সকলকে মদ্য দিতেছে।

যতই রাত্রি হইতে লাগিল, ততই নেশা ও আমোদ জমিতে লাগিল।

মমতাজ ইচ্ছা করিয়া মহামায়া ও নলিনীনাথকে ঘন ঘন মদ দিতে লাগিল। তাহার মৎলব দুই-জনকে মাতাল করিয়া ফেলা। সে কিন্তু নিজে খুব অল্প পরিমাণে খাইতে লাগিল। ক্রমে মমতাজ যখন দেখিল যে, তাহাদের দুই জনেরই নেশা বেশ পাকিয়া আসিয়াছে, তখন সে তাহার অঞ্চল হইতে একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া একটা কি চূর্ণবস্তু তাহাদের মদ্যে মিশাইয়া দিল। নেশার ঝোঁকে তাহারা বুঝিল না যে, মদ্যের সহিত অন্য কোন জিনিস মিশ্রিত করিয়া দিয়াছে। ইহার কিছুক্ষণ পরেই তাহারা দুইজনেই একেবারে অচেতন হইয়া পড়িল। তখন সকলেরই মাতাল অবস্থা। সেই জন্য নলিনীনাথ ও মহামায়ার এই অস্বাভাবিক অবস্থান্তর কেহই লক্ষ্য করিল না।

মমতাজের সহিত দুই জন মুসলমান অনুচর ছিল। ইহারা দিল্লীর দুই জন নামজাদা গুণ্ডা ও খুনে। যখন সকলে নেশার ঝোঁকে ঘুমাইয়া পড়িল অথবা স্থানান্তরে গেল, তখন মমতাজ তাহার অনুচরদ্বয়কে ডাকিয়া নলিনীনাথকে দেখাইয়া চুপি চুপি কহিল, "ইহার মুখ বাঁধিয়া একেবারে শিবি৷ কার মধ্যে লইয়া ইহাকে আটকাইয়া ফেল গিয়া—আমিও এখনই আসিতেছি। বাহকদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখিও। আমি আসিবামাত্র এখান হইতে রওনা হওয়া চাই।"

অনুচরদ্বয় সেলাম করিয়া কহিল, "বাইজী! সব ঠিক আছে।"

মমতাজের আদেশমত সেই অবস্থায় নলিনী-নাথকে স্থানান্তরিত করা হইল। কেহই জানিল না যে, ব্যাপারটি কি ঘটিল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া মহামায়ার পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনগণ সকলেই একবাক্যে অপরিণামদর্শি-তার জন্য মহামায়াকে দোষ দিতে লাগিল। সকলে মিলিয়া তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, পর কখনও আপন হয় না। তেলে জলে মিশে না। বিদেশী বাবু চিরদিনই বেইমান হয়। মহামায়া মুখ ফুটিয়া একটি কথাও কহিল না। তাহাদের কথার কোনও উত্তর সে দিল না, তাহাদের কোনও কথায় সে বিশ্বাসও করিল না। মন নারায়ণ। ব্যাপার-খানা যে কি—তাহার মনই তাহাকে বলিয়া দিল। কেমন করিয়া মহামায়া তাহার হারানিধি ফিরিয়া পাইবে, সে সম্বন্ধে সে কাহারও পরামর্শ লইল না। কাহারও সহিত যুক্তিও সে করিল না। যখন এই ব্যাপার লইয়া পল্লীতে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে, মহামায়া তখন তাহার জন্মভূমি ও পালয়িত্রী বিশম্ভরী পার্ব্বত্য প্রকৃতির নিকট চিরবিদায় লইয়া সঙ্কীর্ণ ও দুর্গম পার্ব্বত্য পথ বাহিয়া 'মরুদেশ' অভি-মুখে যাত্রা করিয়াছিল।

সে ঠিক বুঝিয়াছিল যে, তাহার ভগ্নী তাহার স্বামীর উপর অনুরাগিণী হইয়া কৌশলে তাহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। দিল্লীতে গিয়া, হয় মহামায়া রাক্ষসী ভগ্নীর কবল হইতে তাহার হারাধন ফিরাইয়া আনিবে, আর তাহা না পাবিলে, কালিন্দীর জলে এ জন্মের মত সে তাহার শোকতাপ ডুবাইয়া দিবে।

মহামায়ার মুখে কথা নাই। চক্ষের জল অন-বরত পড়িয়া, তাহার কপোলদ্বয়, গণ্ডস্থল ও বক্ষঃস্থলের বসন দিনরাত আর্দ্র করিয়া রাখিয়া ছিল। গিরি নির্ঝরিণীর সলিলের ভাণ্ডার যেমন অফুরন্ত, মহামায়ার চোখের জলের প্রস্রবণও সেইরূপ অফুরন্ত।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

—০—

সেই দিনই সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মহামায়া হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নাট্যকার ঘটনার পর ঘটনা গাঁথিয়া, নাটক রচনা করিয়া তাহার কৃতিত্ব দেখায়। বিশ্বস্রষ্টা তাঁহার প্রপঞ্চ এই জগতে নাট্যশালায়, তাঁহার সৃষ্ট মানবের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই প্রত্যেক মুহূর্ত্তে এইরূপ নূতন নাটক রচিতেছেন। সেই বিশ্বনাট্যের অধ্যক্ষ বিশ্বম্ভরের কৌশলে হরিদ্বার পৌঁছিয়াই মহামায়ার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইল প্রভার।

নলিনীনাথ তাঁহার মাতৃদত্ত রত্নহার মহামায়ার সহিত প্রথম সাক্ষাতের রাত্রেই তাহার গলায় দিয়াছিলেন। সেই অবধি সে হার মহামায়ার গলায়ই ছিল। প্রয়োজন হইলে মহামায়া বরং

তাহার পঞ্জরের অস্থিগুলি এক একখানি করিয়া খুলিয়া দিতে পারিত বরং তাহার শরীরের বিন্দু বিন্দু রক্ত সে অকাতরে দান করিতে পারিত, কিন্তু তাহার স্বামিদত্ত রত্নহার অন্নাভাবে মরিলেও সে তাহার কণ্ঠচ্যুত করিতে পারিত না।

মহামায়ার অসংযত বেশভূষা, অবিন্যস্ত রুক্ষ কেশপাশ, রোদনারুণিত চক্ষুর্দ্বয়, অশ্রু-কলঙ্কিত মুখ দেখিয়া সকলেই মনে করিল, যুবতী পাগলিনী। তাহার গলার হার মূল্যহীন। রাস্তা হইতে কুড়ান কাচ-দ্বারা রচিত। ইহাও সূক্ষ্ম দূরদর্শিনী নিয়তিরই বিধান। তাহা না হইলে এই অসহায়া রমণীকে দস্যু-তস্করের হাত হইতে রক্ষা করিত কে? আর নলিনীনাথের জীবন-নাট্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সূত্র এই রত্নমালাটি ছিন্ন ও অপহৃত হইলে অভিনয়-সমাপনই বা হয় কেমন করিয়া? সেই সূত্র, সেই নিদর্শন, বরাবর অবিচ্ছিন্ন ও অটুট রাখিবার ভার পরম-মঙ্গলময় বিশ্বনাট্যের অধ্যক্ষ সেই বিরাট পুরুষের উপর।

পাগলিনী মহামায়াকে দেখিয়া করুণাপরবশ হইয়া কোনও গৃহস্থ তাহাকে কিছু খাদ্য দিতে গেল। পাগলিনী তাহা স্পর্শও করিল না। কেহ পয়সা ভিক্ষা দিতে গেল, সে সে দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। দলে দলে পল্লীবালকগণ এই বিশেষত্বময়ী পাগলিনীর পাছে লাগিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

রাজপথে জনতা দেখিয়া ও কোলাহল শুনিয়া, প্রভা বাতায়নের মধ্য হইতে মুখ বাড়াইয়া ব্যাপার কি দেখিতে গেল। পাগলিনীর গলায় তাহার স্বামীর মুক্তাহার দেখিয়া তাহার শরীরের প্রতি শিরা-উপশিরায় তড়িদ্বেগে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহার বক্ষের স্পন্দনে ঢেঁকির পাড়ের মত শব্দ হইতে লাগিল, সে লজ্জা-সরম পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়া রাজপথে বাহির হইল। জনতা ঠেলিয়া বরাবর পাগলিনীর নিকট গিয়া তাহাকে বাহুপাশে জড়াইয়া ধরিয়া প্রভা একেবারে হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া তাহাকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া আসিল। এই ঘটনাটি এরূপ তাড়াতাড়ি ঘটিল যে, সকলেই অবাক্ হইয়া গেল। কেহ উহার কোন প্রতিবাদ করিবার অবসর পাইল না।

বাড়ীর মধ্যে লইয়া আসিয়া প্রভা আর একবার পাগলিনীর গলার রত্নমালাছড়াটি ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। দেখিল যে, সন্দেহের কোন কারণ নাই। এ তাহার স্বামীর রত্নহার। নানা অমূলক কল্পনা, চিন্তা ও ভয় প্রভার হৃদয়কে আকুলিত করিয়া তুলিল।

সে উৎসুকভাবে পাগলিনীকে জিজ্ঞাসিল, "বহিন্! তুমি তোমার গলার ঐ হারছড়াটি কোথায় পাইলে?"

মহা। কেন, আমার বর ইহা আমাকে দিয়াছে।

প্রভা। তোমার বর কে? কোনও পার্ব্বতীয় যুবা কি?

মহা। না—আমার বর বাবুজী, তিনি বাঙ্গালী।

প্রভার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বিবাহ কবে হইয়াছে?"

মহা। বারো তেরো দিন পূর্ব্বে।

আর সন্দেহের কারণ কোথায়?

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বর এখন কোথায়?"

মহা। তাঁকে আমার দিদি চুরি ক'রে নিয়ে গেছে।

বর চুরি হয়! প্রভা নিদারুণ দুঃখের মধ্যেও এই পার্ব্বত্য যুবতীর বালিকা-সুলভ সরলতায় না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

প্রভা। তোমার দিদি তাকে চুরি ক'রে নিয়ে গেল কেন? তার কি নিজের বর নেই?

মহা। সে যে বাইজী। তার বর থাকবে কেমন ক'রে?

রহস্য ক্রমে জটিল হইয়া আসিল। প্রভার মুখে চিন্তার মেঘ আরও ঘনাইয়া উঠিল। প্রভা জিজ্ঞাসিল, "তোমার দিদি কোথায় থাকেন?"

মহা। দিল্লীতে। তাহার নাম আগে ছিল—শান্তমায়া, এখন তাহার নাম—মমতাজ বাইজী। তার অনেক টাকা-কড়ি, অনেক গহনা-কাপড়। তা হলেও, আমার বর তাকে চায় না। আমাকেই চায়, সেই রাগেই তো সে আমার বরকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। আমি আমার বরকে তার হাত থেকে ছিনিয়ে আন্‌তে যাচ্ছি।

রমণীর প্রেমের মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন। কোনওটির সহিত কোনওটির সম্পূর্ণ মিল থাকে না।

কিন্তু প্রেমের এ মূর্ত্তি সম্পূর্ণ নূতন। ইহার আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্তের মধ্যে একটা বিশেষত্ব প্রভা দেখিতে পাইল। সে পাগলিনীকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "বহিন্! তুমি একলা পারিবে না, চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই। দু'জনে, একসঙ্গে মিলে তোমার বরকে ধ'রে আনবো।"

মহামায়া বিস্মিত হইয়া কহিল, "সত্যি! তবে এখনই চল।"

প্রভা কহিল, "এখনই?"

মহামায়া দৃঢ়ভাবে উত্তর দিল, "এখনই।" তাহার মুখে স্থির-প্রতিজ্ঞার চিহ্ন।

প্রভা ভাবিল, এ কি কোনও স্বর্গের দেবী তাহাকে তাহার কর্ত্তব্যপালনে উৎসাহিত ও স্থির-প্রতিজ্ঞ করিবার জন্য এই পার্ব্বত্য রমণী-মূর্ত্তিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন?

প্রভা মহামায়াকে লইয়া সেই দিনই দিল্লীযাত্রা করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

—০—

মমতাজের ব্যবহারে নলিনীনাথ প্রথমে তাহার উপর বড়ই রুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু সে যখন কথায় বার্ত্তায় কার্য্যকলাপে বুঝাইয়া দিল যে, নলিনীনাথের উপর তাহার অকৃত্রিম অনুরাগই তাহার ঐ সকল নীচ কৌশল অবলম্বনের হেতু, তখন তাঁহার ক্রোধ ক্রমশঃ শান্ত হইয়া অসিল।

রমণীর সাধা দান পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, এরূপ সামর্থ্য কয় জন পুরুষের আছে? নলিনীনাথ মমতাজকে তাহার কাতর-যাচিত ভিক্ষা না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

নলিনীনাথকে পাইয়া মমতাজ তাহার ব্যবসা এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিল। অর্থের অভাব তাহার ছিল না। সে নলিনীকে বিলাস, আমোদ ও যত্নের সমুদ্র-মধ্যে ডুবাইয়া ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমোদের স্রোতে গা ঢালিয়া, গানের স্বপ্নে ও মদিরার মোহে ডুবিয়া থাকিয়া, নলিনীনাথ প্রতিমুহূর্ত্তেই এক এক পদ করিয়া নরকের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মহামায়াকে পাইয়া তিনি প্রভাকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। মমতাজকে পাইয়া তিনি মহামায়াকে ভুলিলেন।

দিল্লীতে আসিয়া মমতাজ বাইজীর সন্ধান করিতে প্রভাকে তত বেগ পাইতে হইল না। মমতাজ তখন দিল্লীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাইজী। দিল্লীতে পৌছিয়াই প্রভা অজস্র অর্থব্যয়ে এক দল গোয়েন্দা ঠিক করিয়া, বইজীর সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করিতে লাগিল। প্রভা সঠিক জানিল যে, নলিনীনাথ যে কেবল মমতাজ বাইজীর প্রণয়বাগুরায় আবদ্ধ, তাহাই নহে। তিনি এখন বাইজীর মর্ম্মরময় হর্ম্ম্যের কারায় প্রকৃত নজরবন্দী কয়েদী। তাঁহার সেখান হইতে বাহির হইবার ক্ষমতা নাই। বাড়ীর ফটক বহু প্রহরী দ্বারা দৃঢ় ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিরক্ষিত। বল-বিজ্ঞানের সর্ব্বপ্রথম সূত্র হইতেছে এই যে, একটি বলের শক্তি ও ক্রিয়া প্রতিহত ও নষ্ট করিতে হইলে, তাহার বিপরীত দিকে একটি তদনুরূপ অথবা তদধিক বল দিতে হইবে। নলিনীনাথ এক্ষণে মমতাজের রূপ, যৌবন, সোহাগ, আদর, যত্ন ও ভালবাসার আকর্ষণে আকৃষ্ট। নলিনীনাথের স্কন্ধে এক্ষণে প্রেতিনী ভর করিয়াছে। তাহাকে নামাইতে হইলে অনেক ধূলা-পড়া সরিষা-পড়ার প্রয়োজন। প্রভার সহিত একবার চাক্ষুষ দেখা-শুনা না হইলে, নলিনীনাথের এই উৎকট ব্যাধিমুক্তির অন্য কোনও উপায় নাই।

রমণীর কার্য্যকরী শক্তি, বুদ্ধির স্থিরতা ও কৌশল অনেক সময় পুরুষের শক্তিকেও হারি মানাইয়া দেয়। তাহার অভীষ্টসাধনকল্পে প্রভা থাকিয়া থাকিয়া একটি সুন্দর কৌশল উদ্ভাবিত করিল। সে অজস্র অর্থব্যয়ে মমতাজের দাসদাসী, দরোয়ান, পাচক প্রভৃতি সমস্ত লোকগুলিকে প্রথমে হাত করিয়া লইল। তাহারা এরূপ বশীভূত হইল যে, প্রভার কথায় তাহারা মমতাজেরও গলায় ছুরি দিতে পশ্চাৎপদ হইত না।

তাহার পর অবসর বুঝিয়া ও পূর্ব্ব হইতে সমস্ত খবর লইয়া এক দিন প্রভা পুরুষবেশে মমতাজের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

প্রভার গাড়ী যখন মমতাজের বাটীর দ্বারে গিয়া লাগিল, মমতাজের কক্ষ তখন উৎসবের

আলোকে আলোকিত, বিলাসের হিল্লোলে আন্দোলিত, গীতের মূর্চ্ছনায় ঝঙ্কৃত ও মুখরিত।

বারুণী-সেবনে মমতাজের হৃদয়ের সমস্ত কবাট-গুলি তখন খুলিয়া গিয়াছে। সেই উন্মুক্ত দ্বার-পথে তাহার প্রাণপাখীটি তখন তাহার প্রাণ-দেবতাকে বেড়িয়া বেড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। প্রণয়ের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে বারাঙ্গনাসুলভ চাতুর্য্য ও কপটতা তখন মমতাজের হৃদয় হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে, তানলয়বিশুদ্ধকণ্ঠে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিয়া সুকণ্ঠী মমতাজ তখন গান ধরিয়াছে—

"আজ কেন বঁধু! অধর-কোণেতে
লুকালো হাসির রেখা?
মরমের হাসি চুরি কে করেছে—
বল গো পরাণ-সখা!
কেন শূন্য আঁখি নেহারি?
ব্যাকুল চাহনে, সব কি দিয়েছ,
যা ছিল সরমে মাখা?
কার ছায়া জাগে মরমে?
নিমেষে ফুরাল জনমের সাধ
বরষে বরষে আঁকা!"

গীতের অক্ষরে অক্ষরে স্বর্গীয় সুধা ক্ষরিত হইতেছিল। তাহার ছন্দে ছন্দে শ্রোতৃগণের প্রাণ নাচিয়া উঠিতেছিল।

প্রভা এতক্ষণে একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ হইল। এ গীত যে তাহার বড় পরিচিত। এ গীত যে নলিনী-নাথ কৌমুদী-প্লাবিত মলয়-সমীর-সেবিত তাঁহাদের ফুলশয্যার রজনীতে প্রভার কাছেই গাহিয়া-ছিলেন। যে গীত এক দিন প্রভার শিরায় শিরায় অমিয়ারস ঢালিয়া দিয়াছিল, আজ জানি না কেন, তাহারই প্রত্যেকটি ছন্দ তীক্ষাগ্র ভল্লের মত প্রভার বক্ষোবন্ধ অযুত খণ্ডে দীর্ণ করিল। প্রভা গাড়ীতে বসিয়া কাতর ঔৎসুক্যে সেই গান শুনিতে লাগিল।

সুরের শেষ রেশ্ না মিলাইতে মিলাইতে আবার মমতাজ গান ধরিল—

"এস হে প্রাণ! হৃদয়-ধন!
হেরিব তোমারে ভরিয়ে নয়ন।
তোমারি তরে সে হৃদি বিদরে;
আঁখিনীরে সদা ভাসে নয়ন।
কত কেঁদেছি বুক বেঁধেছি
তোমা লাগিয়ে কত সয়েছি!
নয়নবারি এস নিবারি—
দুখ পাসরি (তোমায়) করি হে চুম্বন।" *

দ্বারবান্ উপরে গিয়া বাইজীকে জানাইল যে, এক জন পশ্চিমদেশীয় রাজপুত্র বাইজীর সহিত কয়েক মিনিটের জন্য দেখা করিতে চাহেন। নলিনীনাথ কহিলেন, "ভদ্রলোক দেখা করিতে চাহিতেছেন। দেখা করিতে দোষ কি? তাঁহাকে এখানেই আসিতে বল।"

দ্বারবান্ গিয়া সেই কথা বলিল। পুরুষ-বেশে প্রভা আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। প্রভাকে দেখিয়াই নলিনীনাথ বিস্মিত ও হতবুদ্ধির ন্যায় ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

প্রভা বরাবর নলিনীনাথের নিকট গিয়াই তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আমার সঙ্গে এস।" নলিনীনাথ যন্ত্রপরিচালিতের ন্যায় প্রভার সঙ্গে বাহির হইয়া গেলেন। ব্যাপারটি এত অকস্মাৎ ঘটিল যে, মমতাজ কোন বাধা দিবার অব-সর পাইল না। চাকরবাকর দরোয়ানগণ তো পূর্ব্ব হইতেই প্রভার বশ হইয়াছিল। তাহারা ইচ্ছা করিয়াই নলিনীনাথ ও প্রভার পলায়নে কোন বাধা দিল না।

মমতাজ নিষ্ফল ক্রোধে পরিচারক ও দরোয়ান-দিগের উপর তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল।

তখনই গাড়ী যুতিতে হুকুম দিয়া, মমতাজ অধীর-ভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। গাড়ীতে উঠিয়া সে দিল্লীর পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নলিনীনাথের সন্ধান করিতে লাগিল।

* মদ্‌রচিত এই গীত দুইটি বহু দিন হইতে সাধারণ্যে গীত ও আদৃত হইয়া আসিতেছে। আমার 'রিজিয়ার' কয়েকটি গীত ও এই গীত দুইটির সহিত আমার কতিপয় কৈশোর-সুহৃদের অমৃতময়ী স্মৃতি ওতপ্রোত-ভাবে বিজড়িত আছে। সেই স্মৃতিটিকে চিরজাজ্বল্য ও জাগরূক রাখিবার প্রয়াসই এই গীত দুইটিকে এখানে সন্নিবেশিত করার একমাত্র কারণ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

মমতাজের বাটী হইতে নলিনীনাথকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া, প্রভা কোচম্যানকে দিল্লী রেলওয়ে ষ্টেশনে যাইতে আদেশ দিলেন। তাঁহারা যখন ষ্টেশনে পৌছিলেন, তখনও কলিকাতার গাড়ী ছাড়িবার আর আধ ঘণ্টা দেরী আছে। প্রভা তাঁহার জামার পকেট হইতে দুইখানি এক শত টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন। নলিনীনাথ দুইখানি কলিকাতার জন্য প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া আনিলেন। 'ওয়েটিং-রুমে বসিয়া দুই জনে কথোপকথন হইতে লাগিল।

নলিনীনাথ তাঁহার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস বিবৃত করিয়া প্রভাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে আমার সন্ধান পেলে কি ক'রে?"

প্রভা। হরিদ্বারে এক জন ভিখারিণীর গলায় তোমার মুক্তার মালা দেখে।

নলি। ভিখারিণী! কে সে? তাহার নাম তুমি জান?

প্রভা। জানি—তাহার নাম মহামায়া। এই রমণীর সম্বন্ধে আরও একটি কথা আমি জানি। তুমি তাহাকে বিবাহ করিয়াছ।

নলিনীনাথ লজ্জায় বদন নত করিলেন।

প্রভা তাহা বুঝিতে পারিয়া কহিল, "তাহাতে দোষ কি, প্রিয়তম? হিন্দুসমাজে বহু বিবাহ তো দোষের নহে। ভাল কথা, আমি আর অত্যধিক সৌভাগ্যে, অত্যধিক আনন্দে আমার একটি প্রধান কর্ত্তব্য ভুলে গিয়েছি। যাহার জন্য আমি তোমাকে ফিরে পেলেম, আমি এত অকৃতজ্ঞ যে, আমি তার কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়েছি।"

নলি। সে ভালই হয়েছে। প্রভা! আমি এখনও বুঝতে পারি না যে, আমি জীবিত অথবা মৃত। জাগ্রত কিংবা নিদ্রিত। আমি কি যেন একটা ভয়াবহ নরককুণ্ডে ডুবেছিলাম। কল্যাণি! তুমি আজ আমাকে সেই নরক হ'তে উদ্ধার ক'রে এনেছ।

প্রভা। প্রিয়তম! শান্ত হও। এতে তোমার কোনও দোষ নাই। সব আমার অদৃষ্টের দোষ। অনুতাপে পাপের শান্তি। পাপের শান্তি হইয়াছে। এখন সব দিকেই ভাল হইবে।

স্বামি-স্ত্রীতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় গভীর নিক্কণে ঘণ্টাধ্বনি হইল। মেদিনী কম্পিত করিয়া হুস্ হুস্ শব্দে পঞ্জাবমেল আসিয়া দিল্লী ষ্টেশনের প্লাট্‌ফরমে লাগিল। নলিনীনাথ ও প্রভা একটি শূন্য ফার্ষ্ট ক্লাসের কামরা পাইয়া তাহাই গিয়া দখল করিয়া বসিলেন।

নলিনীনাথ জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া প্লাট্‌ফরমের দিকে চাহিয়া ছিলেন। দেখিলেন, দুই জন রমণী ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া প্লাট্‌ফরমের শেষ প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত গাড়ীগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতেছে। দেখিবামাত্র নলিনীনাথ ইহাদিগকে চিনিলেন। ভয়ে তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। তাঁহার গা শিহরিয়া উঠিল। মমতাজ কেমন করিয়া মহামায়ার দেখা পাইল? আর কোন্ সূত্র ধরিয়াই বা তাহারা উভয়ে নলিনীনাথের পশ্চাদনুসরণ করিল?

পঞ্জাব মেলটি ভয়ানক লম্বা। অর্দ্ধেক গাড়ী খোঁজা শেষ হইতে না হইতেই এঞ্জিন হুইস্‌ল্ দিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। মমতাজ ব্যর্থমনোরথ হইয়া, রাগের জ্বালায় মহামায়াকে বিষম জোরে এক ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। কহিল, "সয়তানী! তোর জন্যই তো আমার এই সর্ব্বনাশ হইল। যা, তুই জাহান্নমে যা।"

তখন ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধাক্কা খাইয়া মহামায়া প্লাট্‌ফরমের শাণের উপর উবুড় হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার ললাটে বিষম আঘাত লাগিল। নলিনীনাথ দেখিলেন যে, মহামায়ার তুষারের মত শুভ্র ললাট ফাটিয়া দরদর ধারে রক্ত পড়িতেছে ও সেই রক্তে মহামায়ার বসনাঞ্চল সিক্ত হইতেছে। তাহার গলায় তখনও সেই মুক্তাহার। সেই হারের মুক্তাগুলিও সমস্ত রক্তরঞ্জিত।

প্লাটফরমে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, প্রভা তাহার কিছুই দেখিতে পান নাই। তিনি গাড়ীর অপর পার্শ্বস্থ আসনে বসিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সাত পাঁচ ভাবিতেছিলেন। নলিনীনাথ-ও ঘটনাবলীর আকস্মিকতায় এতদূর হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন যে, গাড়ী না ছাড়া পর্য্যন্ত তাঁহার আদৌ

বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ট্রেণ ছাড়িয়া দিলে, তিনি প্রভার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "প্রভা, বড় অন্যায় কাজ হইয়া গিয়াছে। মহামায়া ও মমতাজ উভয়ে ষ্টেশন পর্য্যন্ত আমাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিল। আমি স্বচক্ষে তাহাদিগকে দেখিয়াছি।"

"আমাকে সে কথা বলিলে না কেন?"

"অবসর পাইলাম কৈ? শুন প্রভা! আরও যাহা ঘটিয়াছে, তাহা শুনিলে তুমি হৃদয়ে দারুণ বেদনা পাইবে। আমাদের দেখিতে না পাইয়া, সেই প্রতিহিংসাপরায়ণা ঘৃণিতা পিশাচী মমতাজ বিষম জোরে এক ধাক্কা দিয়া মহামায়াকে ফেলিয়া দিল। শাণে পড়িয়া গিয়া তাহার কপাল ফাটিয়া দরদর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। রক্তে তাহার কাপড় ভিজিয়া গেল। তাহার গলায় সেই রত্নহার। তাহাও রক্ত-সিক্ত।"

"যা হ'ক, এখন আর নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। এই পার্ব্বত্য রমণী যখন এক দিনের জন্য, এক মুহূর্ত্তের জন্য তোমার অঙ্ক-স্বর্গে স্থান পাইয়াছে, তাহাকে সে অধিকার হইতে একেবারে বঞ্চিত করিবার সামর্থ্য আমার নাই। আমরা হিন্দু রমণী। স্বার্থত্যাগই আমাদের প্রণয়ের বীজমন্ত্র। এই সরলাকে রক্ষা তোমাকে করিতেই হইবে। আমি আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর মত ইহাকে দেখ্‌বো। তুমি যাহা হয় ব্যবস্থা কর; যত টাকা লাগে—লও!" এই কথা বলিয়া প্রভা নলিনীর হাতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া দিল। জল্পনায় কল্পনায় প্রায় অর্দ্ধ-ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। ট্রেণ গাজিয়াবাদ ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। গাড়ী থামিবামাত্র নলিনীনাথ গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া টেলিগ্রাফ আফিসের দিকে ছুটিয়া গেলেন ও তাড়াতাড়ি নিম্নলিখিত জরুরি তারটি লিখিয়া সিগ্‌ন্যালারের হস্তে দুইখানি দশ টাকার নোট ও তারের ফরমখানি দিয়া কহিলেন, "তারটা বিশেষ জরুরি। এখনই পাঠাইয়া দিন। ইহার খরচ বাদে অবশিষ্ট টাকা আপনার বক্‌শিস্।"

সিগ্‌ন্যালার কথা গণিয়া দেখিল যে, তাহার খরচ পাঁচ টাকারও অনধিক। আশাতীত বক্‌শিস্ লাভ করিয়া, সে দু'হাতে নলিনীনাথকে সেলাম করিয়া কহিল, "আমি এখনই তারটি পাঠাইয়া দিতেছি।" এই কথা বলিয়া কলের বোতাম টিপিয়া 'টরে টক্কা' আরম্ভ করিয়া দিল।

টেলিগ্রামটিতে লেখা ছিল—

"Station Master Delhi.

Left behind. At Delhi Railway platform. A yonng lady. Age about fifteen with a pearl necklace and hill-girls' dress. Wired you Thousand Rupees for expenses. Kindly arrange Escort and send her to Nalininath Rays house No...... Camac Street Calcutta. Your reward Rupees five hundred."

"ষ্টেশনমাষ্টার দিল্লী:—দিল্লীর রেলওয়ে ষ্টেশনে এক জন ভদ্র মহিলা ট্রেণে উঠিতে পারে নাই। তাহার বয়স অনুমান পোনর। তাহার পরিচ্ছদ পার্ব্বতীয় রমণীর। গলায় এক ছড়া মুক্তার হার। খরচের জন্য আপনার নিকট তারে এক হাজার টাকা পাঠান হইল। উপযুক্ত সঙ্গী বন্দোবস্ত করিয়া তাহাকে নং ক্যামাক ষ্ট্রীটে নলিনীনাথ রায়ের বাটীতে পাঠাইয়া দিবেন। আপনার পুরস্কার পাঁচ শত টাকা।"

এই টেলিগ্রামটি যখন দিল্লীর ষ্টেশন-মাষ্টারের হাতে পৌছিল, তাহার বহুক্ষণ পূর্ব্বেই মমতাজ ক্রোধে গরগর করিতে করিতে এবং মহামায়ার উপর অজস্র গালিবর্ষণ করিতে করিতে আপন বাটীতে ফিরিয়া গিয়াছিল। অসহায়া আশ্রয়হীনা মহামায়া প্লাটফরমের এক কোণে বসিয়া কাঁদিতেছিল। তাহার চারিদিকে ষ্টেশনের কুলীগণ ও বিনামূল্যে পরামর্শদাতা বা সহানুভূতিকারিগণ দাঁড়াইয়া জটলা পাকাইতেছিল। ষ্টেশন-মাষ্টার সাহেবকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া, বুটের লাথির ভয়ে, তাহারা বিভিন্ন অভিমুখে প্রস্থান করিল।

সাহেব তারখানি বাম হস্তে লইয়া, দক্ষিণ হস্তে একখানি ছোট সরু ওয়াকিং ষ্টিক্ ঘুরাইতে ঘুরাইতে আসিয়া মহামায়াকে লক্ষ্য করিয়া বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কহিলেন, "বিবি! টুমি পশ্চাট্ পড়িয়া আছে। হামি টোমাকে কলিকাটা প্রেরণের জন্য পরামর্শ পাইয়াছে। টুমি পরের গাড়ীটে কলিকাটা যাইবার জন্য প্রস্টুট হও। হামি এক জন বুঢ়ঢ় কেরাণীবাবু ও একটি আয়াকে টোমার সাঠে প্রেরণ করিবে

মহামায়ার স্বামী তাহা হইলে তাহাকে ভুলেন নাই। তাহার হৃদয় আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল পরের গাড়ীতে উপযুক্ত বন্দোবস্তে মহামায়া নলিনীনাথের কলিকাতার বাটীতে প্রেরিত হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

মমতাজ বাড়ীতে ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। প্রণয়াস্পদের অভাবে সংসার তাহার নিকট শ্মশানের মত বোধ হইতে লাগিল। সে রাত্রে তাহার চোখে এক ফোঁটাও ঘুম আসিল না। শয্যা কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কতবার সে আপনার মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। সংসারে এক জন ছাড়া কি পুরুষ নাই? যখন সহস্র পুরুষের মধ্য হইতে একটিকে মনোমত বাছিয়া লইবার সুবিধা আমার আছে, তখন কেন আমি অনর্থক ভাবিয়া ভাবিয়া আমার জীবনটিকে বিষময় করিয়া তুলিতেছি? কিন্তু মন সে কথা মানে কৈ? জাগ্রতে, নিদ্রায়, স্বপ্নে মমতাজের চক্ষের সম্মুখে যে সেই একই মনোমোহন ছবি ভাসিতেছিল। শত চেষ্টায়ও মমতাজ যে তাহা লুপ্ত করিতে পারিতেছিল না।

সমস্ত রাত্রি এইরূপ দুশ্চিন্তায় কাটাইয়া, প্রত্যূষে উঠিয়াই মমতাজ তাহার ভৃত্যগণকে পরিচ্ছদাদি ও বাহিরের জন্য আবশ্যক তৈজসপত্রাদি প্যাক করিতে আদেশ দিল। কিছু দিনের জন্য দিল্লী ছাড়িয়া সে কলিকাতায় গিয়া থাকিবে, এইরূপ অভিপ্রায় তাহাদিগকে জানাইল। বাইজীর হঠাৎ এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ও খামখেয়ালী দেখিয়া তাহারা একটু বিস্মিত হইল।

সেই দিন রাত্রের মেলেই মমতাজ চারি জন ওস্তাদ, তিন জন পরিচারক ও এক জন পরিচারিকা সঙ্গে লইয়া কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইল। কলিকাতায় আসিয়া মমতাজ মেছুয়াবাজারের নিকট চিৎপুর রোডে একটি প্রকাণ্ড বাটী ভাড়া লইল। ভাগাড়ে মৃত জানোয়ার পড়িলে গৃধ্রদল যেমন তাহা জানিতে পারে, দিল্লীর সুবিখ্যাত বাইজী মমতাজের আগমনবার্ত্তাও সেইরূপ লম্পট-সমাজের মাথায় টনক্ নড়াইয়া দিল। সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতেই তাহার বাড়ীর সামনের রাস্তা গাড়ী-ঘুড়ী-মটরের ভিড়ে সাধারণ পথিকের পক্ষে দুর্গমনীয় হইয়া উঠিল।

মমতাজ পুরামাত্রায় ব্যবসার ভাণ আরম্ভ করিয়া অল্পদিনমধ্যেই তাহার পসার খুব জমাইল বটে; কিন্তু তাহার গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ। সে নলিনীনাথের সন্ধান করিতেই কলিকাতায় আসিয়াছিল।

ভগবানের নিকট যে যাহা ঐকান্তিকভাবে কামনা করে, সে তাহা পায়। মমতাজ নলিনীনাথের সন্ধান পাইবার জন্য একান্তে কামনা করিতেছিল। ঈশ্বর তাহাকে তাহা মিলাইয়া দিলেন।

নলিনীনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া একটি বড় লেফাপায় গবর্ণমেণ্টের শিল-মোহরাঙ্কিত একখানি চিঠি পাইলেন। তাহাতে জানিলেন যে, তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক 'রাজা' পদবীতে ভূষিত হইয়াছেন। এই সম্মানলাভের সুযোগে প্রজারঞ্জক জমীদার নলিনীনাথ তাঁহার জমীদারীর প্রজা ও জোৎদারগণকে ও জেলার রাজপুরুষগণকে সম্মানিত ও সংবর্দ্ধিত করিবার ইচ্ছায় একটি উৎসবের আয়োজন করিলেন। এই উৎসবের স্থান, তাঁহার পাবনার বাটীতেই নির্ব্বাচিত হইল।

এই উৎসবের জন্য আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্তও নানা প্রকারের হইতে লাগিল। বাইজী মহলে দালালের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। এক জন দালাল আসিয়া নলিনীনাথের বাটীতে মুজরার জন্য মমতাজ বাইজীকে বায়না করিয়া গেল।

পাঠক বুঝিলেন কি? ইহাও সেই অটুট অলঙ্ঘ্য নিয়তিরই খেলা!

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ফেনিল উচ্ছ্বাসময়ী তরঙ্গবিভঙ্গময়ী পুণ্য-স্রোতস্বতী পদ্মাবতী-তীরে, নলিনীনাথের বাটীর সুপরিসর প্রাঙ্গণ-ভূমিতে, বহু অর্থব্যয়ে কলিকাতার এক জন নিপুণ ডেকরেটরের তত্ত্বাবধানে একটি প্রকাণ্ড নাট্যশালা রচিত হইয়াছে। তাহা বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত ও পত্র-পুষ্প-লতা-পতাকায় সুরুচির

সহিত সজ্জিত করা হইয়াছে। নাট্যশালার ঠিক মধ্যস্থলে একটি বেদী। সেই বেদীটি একখানি বহুমূল্য কার্পেট দ্বারা আবৃত। তাহার উপর সারি সারি সুকোমল মখমলের তাকিয়া। বেদীর এক পার্শ্বে কয়েকখানি গ্লাসমণ্ডিত গদিওয়ালা চেয়ার এবং কৌচ, জেলার রাজপুরুষগণের উপবেশনের জন্য সজ্জিত হইযাছে।

সন্ধ্যা হইল। পূরবীর তানে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। উৎসবের প্রথম পর্ব্ব আরম্ভ হইল।

রাত্রি আটটার সময় কলিকাতা হইতে আনীত বাইজীর নাচ আরম্ভ হইল। বেদীর উপরেই নলিনীনাথ ও তাঁহার বন্ধুবর্গের জন্য আসন আস্তৃত হইয়াছে। তাহার অনতিদূরে চিকের অন্তরালে পাশাপাশি প্রভা, মহামায়া ও অন্যান্য পুরস্ত্রীগণের বসিবার স্থান হইয়াছে।

মমতাজ প্রকৃত সুন্দরী। তাহার উপর অন্য বিচিত্রভাবে সফেদা, পিউড়ী ও চীনে সিন্দুরের সাহায্যে সে তাহার রূপ একেবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছে। মমতাজের পরিধানে বহুমূল্যবান্ সুবর্ণতন্তুবিজড়িত চুম্‌কি-খচিত আসমানি রঙের সিল্কের পেশোয়াজ। গায়ে তাহারই অনুরূপ আঙ্গরাখা। সর্ব্বোপরি একখানি পাত্‌লা ওড়না।

তাহার গহনা সমস্তই বহুমূল্য মণি-মাণিক্য-হীরক-মরকত-খচিত। নৃত্যকলায় মমতাজের সমকক্ষ তখন আর কেহই ছিল না। তাহার হাব-ভাব, অঙ্গসঞ্চালন সমস্তই অনুপম ও গভীর অনুশীলনের পরিচায়ক। মমতাজের অপ্সরোবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর মীড়-গমক-মূর্চ্ছনায় প্রাণময় হইয়া রাগরাগিণীগুলিকে মূর্ত্তিমান ও জাগ্রত করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহার চরণলগ্ন নূপুরের শিঞ্জন শ্রোতৃহৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত করিতে লাগিল। সঙ্গীতের তালে তালে নাচিতে নাচিতে মমতাজ সহসা তাহার মণিখচিত কটিবন্ধে আবদ্ধ মণিময় কোষ হইতে একখানি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া, সেইখানি বার বার ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া লুফিয়া লুফিয়া লইয়া, তাহার অদ্ভুত নৃত্যকুশলতা দেখাইতে লাগিল। যখন মমতাজ সেই তীক্ষ্ণফলা ছুরিখানি উৎক্ষিপ্ত করিতেছিল, তখন তাহার উজ্জ্বল ফলকে বৈদ্যুতিক আলোক প্রতিফলিত হইয়া বিচিত্র শোভার বিকাশ করিতেছিল। মমতাজের নৃত্যের এই সকল কুশলতা তাহার এত স্বভাবগত ছিল যে,তাহার ক্রিয়াকলাপে কোনরূপ মনোযোগের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছিল না। তাহার তীব্র দৃষ্টি যেন সেই জনতার মধ্যে কাহার অনুসন্ধান করিতেছিল। সর্পীর ন্যায় তাহার অত্যুৎকট জ্বালাময় চক্ষুর্দ্বয় যেন চিকের অন্তরালে আসীনা প্রভার মুখের দিকে বার বার ঈর্ষ্যান্বিত কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতেছিল, দর্শকগণ মোহিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহার নৃত্যকলার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মমতাজও তাঁহাদের প্রত্যেকের কাছে গিয়া 'ভাও বাৎলাইতে' আরম্ভ করিল। এইরূপ ভাণ করিয়া মমতাজ গৃহের কর্ত্রী প্রভার সমীপবর্ত্তিনী হইবার জন্য বার বার চেষ্টা করিতে লাগিল; ক্রমে ক্রমে তাহার সমীপবর্ত্তিনীও হইল। নাচিতে নাচিতে মমতাজ প্রভার কাছে গিয়া একবার তাহার ছুরিখানি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিল। পরে প্রভাকে একটু অন্যমনস্ক দেখিয়া মমতাজ সেই সুযোগে তাহার ছুরিখানি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া, প্রভার বক্ষঃস্থলে আমূল বসাইয়া দিয়া আবার সেখানিকে টানিয়া বাহির করিয়া লইল। প্রভা চীৎকার করিয়া ভূমে পড়িয়া গেল। মহামায়া তাড়াতাড়ি প্রভাকে দেখিতে গেল। সেই অবসরে মমতাজ ছুরিখানি মহামায়ার বক্ষে আমূল বসাইয়া দিল। জনতা এই ব্যাপারে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সাহেব, তাঁহাদের সাক্ষাতে এইরূপ দুই দুইটা খুন হইল দেখিয়া যেন কিছু থতমত খাইয়া গেলেন। মমতাজ নিমেষে ছুরিখানি মহামায়ার বুক হইতে উঠাইয়া লইয়া নিজের বুকে আমূল বসাইয়া দিল। অর্জ্জুনের বাণবিদ্ধ বসুন্ধরার বক্ষ হইতে উৎসারিত ভোগবতীর ন্যায় মমতাজের বক্ষঃস্থল ভেদিয়া রক্তধারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া তাহার পরিধেয় সিক্ত করিয়া ফেলিল। জনতা হাহাকার করিয়া উঠিল। নলিনীনাথ উন্মাদের ন্যায় আততায়িনীর সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন যে, বাইজী আর কেহ নহে—মমতাজ!"

নলিনীনাথ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এ্যাঁ—কে তুমি? মমতাজ!"

মমতাজ ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "হ্যাঁ—আমি মমতাজ।"

নলিনীনাথ জিজ্ঞাসিলেন, "কেন মমতাজ! তুমি এমন কাজ করিলে?"

মমতাজ আপন ললাটের দিকে দেখাইয়া কহিল, "বিধিলিপি।"

এই কথাটির সঙ্গে সঙ্গে মমতাজের ক্ষীণ প্রাণ-বায়ুটুকু আকাশে মিশাইয়া গেল।

প্রভা ও মহামায়ারও আঘাত সাংঘাতিক। ছুরিকা তাহাদের উভয়ের হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছিল। তাহারা দুই জনই রক্তমোক্ষণে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

জনতা 'হায়! হায়!' করিতে করিতে বিদায় হইল। রাজপুরুষগণ রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া আপন আপন আবাসে প্রস্থান করিলেন। কেবল পুলিস-সাহেব খুনের রিপোর্ট দিবার জন্য 'অকু'স্থলে হাজির রহিলেন।

উৎসবমণ্ডপ বিরাট শ্মশানে পরিণত হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

নিশা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। উষার অস্পষ্টালোকে দেখা যাইতেছে, পদ্মাতীরে বালুকার চড়ার উপর সারি সারি তিনটি নির্ব্বাণ-প্রায় চিতা! এখনও সেগুলি হইতে অল্প অল্প ধূমোদ্‌গিরণ হইতেছে, ধূমরেখা ক্রমে ক্ষীণা হইয়া আসিল। চিতা নিভিল। তিনটি নারীহৃদয়ের অব্যক্ত বেদনার জ্বালা সর্ব্বংসহা পদ্মাবতী নিজের বুকে টানিয়া লইয়া বিশ্ব-প্রীতিউচ্ছ্বসিত গীতি গাহিতে গাহিতে অনন্ত সাগর-পানে চলিলেন। প্রাণময়ী গাহিতেছিলেন, "আয়—কে কোথায় শোকসন্তপ্ত ত্রিতাপদগ্ধ আছিস, আমার বুকে স্থান পাইবি।" অন্ত্যেষ্টি সমাধা করিয়া সকলে চলিয়া গিয়াছে। কেবল নলিনীনাথ সেই বালির চড়ার উপর বসিয়া একবার আকাশপানে চাহিতেছেন, একবার সেই নির্ব্বাণ চিতার দিকে দেখিতেছেন। নলিনীনাথ ভাবিতেছিলেন যে, তাঁহার জীবন-নাটক যেমন লোমহর্ষণ ঘটনারাজিতে পূর্ণ, এমন বুঝি আর কাহারও হয় না। এইখানেই কি ইহার শেষ? এইখানেই কি ইহার যবনিকা পড়িবে? নলিনীনাথের কণ্ঠে তাঁহার মাতৃদত্ত সেই রত্নহার। নলিনীনাথ মনে করিলেন—এই রত্নহারই আমার কাল। তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার গলদেশ হইতে রত্ন-মালাটি খুলিলেন; বার বার তাহা দেখিতে লাগিলেন। বাল-সূর্য্যের কিরণ নবরত্ন-খচিত পদকে পড়িয়া চতুর্দ্দিকে ঠিকরিয়া পড়িতে লাগিল। পদকটি প্রাণময় চৈতন্যময় ভাবিয়া নলিনীনাথ শিহরিয়া উঠিলেন। তাড়াতাড়ি সেটিকে পদ্মাবতীর বক্ষে টান মারিয়া ফেলিয়া দিবার উদ্যোগ করিলেন।

সহসা কে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে মোহজনক স্পর্শে নলিনীনাথের স্কন্ধে অতি সন্তর্পণে অঙ্গুলি-তাড়ন করিল।

নলিনীনাথ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন—এক জন মহাপুরুষ। মরণের প্রাক্কালে নলিনীনাথের মাতা যে মহাপুরুষের কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত ইঁহার আকৃতির সৌসাদৃশ্য আছে।

তবে ইনিই কি তিনি?

নলিনীনাথ মহাপুরুষকে সাষ্টাঙ্গে প্রণমিয়া কহিলেন, "দেবতা! আমি চিনিয়াছি—আপনি কে? যদি আসিলেন, তবে এত দেরী করিয়া কেন?"

মহাপুরুষ কহিলেন, "না, নলিনীনাথ! আমি ঠিক সময়েই আসিয়াছি। তুমি মনে করিও না যে, তোমার জীবন-নাট্যের যবনিকা এইখানেই। কেবল একটিমাত্র অঙ্ক শেষ হইয়াছে। এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে।"

নলিনী। না প্রভু! আমি এইখানেই এই বিসদৃশ নাট্যাভিনয় শেষ করবো। দুর্ল্লঙ্ঘনীয়া নিয়তিও আর আমার সঙ্কল্পের পথে অন্তরায় হ'তে পারবে না। আর বেঁচে থেকে ফল কি?"

ধীরগম্ভীর স্বরে মহাপুরুষ কহিলেন, "সৌম্য! কার্য্যমাত্র তোমার। ফলাফল শ্রীকৃষ্ণের। স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃতোপম উপদেশ বিস্মৃত হয়ো না। তিনি বলিয়াছেন,—

'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্।' * প্র

বৎস! তোমার এখানকার কাজ শেষ হয়েছে; কিন্তু এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর প্রশস্ততর কার্য্য-ক্ষেত্র তোমার সম্মুখে। শোক পরিহার কর। কার জন্য শোক? কিসের জন্য শোক? কে মৃত? কে জীবিত? সবই তাঁহার মায়া। সমস্তই তাঁহার প্রপঞ্চ।

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।'+ দ্বি

"নলিনীনাথ! আমার সঙ্গে এস।"

* প্র—কর্ম্মেই তোমার অধিকার। ফলে নহে। ফলের আশায় কর্ম্ম করিও না। আর পাছে কর্ম্ম-ফল তোমার সংসারবন্ধের কারণ হয়, এই ভয়ে কর্ম্ম হইতে বিরতও হইও না।

হে ধনঞ্জয়! নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ কর; কর্ম্ম সফলই হউক, নিষ্ফলই হউক, তজ্জন্য হৃষ্টও হইও না, বিষণ্ণও হইও না! এই সমত্বজ্ঞানের নামই—যোগ। তুমি যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিয়া যাও।

হে ধনঞ্জয়! জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কাম্য কর্ম্ম নিকৃষ্টতর। অতএব তুমি জ্ঞানসাধনে কর্ম্মযোগ আশ্রয় কর এবং সেই জ্ঞানসাধনের জন্য ঈশ্বরের শরণ লও। সকাম মানবেরা হেয়! তুমি নিষ্কাম হও।

সমত্ববুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানযোগী ইহজন্মেই সুকৃত ও দুষ্কৃত ত্যাগ করেন। তুমিও নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিয়া যাও। নিষ্কাম কর্ম্মে কুশলতা অর্জ্জনই প্রকৃত যোগ।

সমস্ত বিষয়ে সমতাবুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানিগণ কর্ম্ম-ফলাশা ত্যাগ করিয়া থাকেন এবং অন্তে জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বোপদ্রবশূন্য মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন।

+ দ্বি—(আত্মা) কখনও জন্মেন না। মৃতও হন না। ইঁহার উদ্ভব নাই। স্থিতিও নাই। কারণ, ইনি জন্মরহিত, নিত্য, অপক্ষয়শূন্য ও পরিণামশূন্য। শরীরের বিনাশ হইলেও, ইঁহার কিছুতেই লয় নাই।

এই বলিয়া মহাপুরুষ পদ্মার সিকতাময় তট বহিয়া বরাবর চলিতে লাগিলেন। নলিনীনাথ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

উপসংহার

—:০:—

যে সময়ে পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার পরে পূর্ণ দশ বৎসর অতীত হইয়াছে। কর্ম্মময় জগৎ জগৎপতির বিরাট হস্তে নিয়তির ক্ষীণ তন্তুতে বদ্ধ থাকিয়া, যুগ যুগ ধরিয়া যে মার্গে যে বিধিতে চলিয়া আসিয়াছে, আজিও ঠিক সেইরূপ চলিতেছে। এই সুদীর্ঘ দশ বৎসরে সাগর-বক্ষে বুদ্‌বুদ-কণিকার মত বিশ্বের বুকে কত প্রাণী জন্মিয়াছে, আবার বিলীন হইয়া গিয়াছে, কে তাহার সংবাদ লয়? কে তাহা ভাবে?

নলিনীনাথ নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার পর ভগবান্ দেওয়ান তাঁহার সন্ধান করিবার জন্য কত চেষ্টা করিলেন; পত্রিকায় পত্রিকায় বহুদিন ধরিয়া এই নিরুদ্দেশের সংবাদ ঘোষণা করিলেন; বহু পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইলেন; কোন ফলই ফলিল না। পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া, নলিনীনাথের সম্পত্তি কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের হস্তে দিয়া বৃদ্ধ বৃন্দাবনবাসী হইলেন। নলিনীনাথের নিদারুণ দুঃখময় জীবনলীলা কালস্রোতে বিস্মৃতির অতল গর্ভে ডুবিয়া গেল।

এইমাত্র নিশা অবসান হইয়াছে। নবোদিত অরুণোদয়ে পশ্চিমাশা হিঙ্গুলরাগে রঞ্জিত হইয়াছে। হিমকর কমলমধুর ন্যায় ঈষল্লোহিত পক্ষপুটশালী পরিণত-বয়ঃ কলহংসের মত, সুরতরঙ্গিণী মন্দাকিনীর রজতময় সৈকত তট হইতে পশ্চিমসাগরের বিশাল পুলিনে অবতরণ করিতেছেন। দিক্‌চক্রবালে কে এক জন নিপুণ শিল্পী যেন একখানি বিশাল পাণ্ডুবর্ণ রাঙ্কবাস্তরণ রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের করস্পর্শে সেই ধূসরিমা ক্রমে সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। গজরুধির-লিপ্ত কেশরি-কেশরের ন্যায়, নবোদ্গত কিশলয়ের ন্যায়, ঈষত্তপ্ত লাক্ষাতন্তুর ন্যায় পাটলবর্ণ সুদীর্ঘ

সূর্য্যরশ্মিগুলি যেন পদ্মরাগমণিশলাকার বিরচিত সম্মার্জ্জনী দ্বারা গগনকুট্টিম হইতে নিশারাণীর হস্তোৎক্ষিপ্ত তারকাকুসুমগুলিকে সমুৎসারিত করিয়া দিতেছে। পুণ্যমূর্ত্তি সপ্তর্ষিমণ্ডল উত্তরাশার অম্বর-তলরূপ পর্ণ-শয়ন পরিত্যাগ করিয়া প্রাতঃস্নানের জন্য মানসসরসীর তীরে অবতরণ করিতেছেন। অরুণের হেমবর্ণরশ্মিজাল তুষার কিরীটী হিমালয়ের শুভ্র-শীর্ষে প্রতিফলিত ও বিচ্ছুরিত হইয়া নির্ম্মল স্ফটিক-দর্পণে কনক-রেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। বিকসিত শুক্তি সম্পুট-স্খলিত মুক্তাফলের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মেঘগুলি পশ্চিমসমুদ্রতট ধবলিত করিয়াছে। তপোবনবাসী তাপসদিগের সদ্যঃসংস্কৃত উটজাঙ্গনে প্রজ্বলিত হোমাগ্নি হইতে উত্থিত ধূসর ধূমরেখা তরুশিখরে পারাবতমালার ন্যায় কুণ্ডলিত হইয়া ঘুরিতেছে।

শঙ্করাবতার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত যোশীমঠ হিমালয়ের হিমময় বক্ষে পবিত্র কেদারক্ষেত্রে অবস্থিত। এই যোশীমঠের সন্নিকটে একটি পরম শান্তি-নিকেতন তপোবন। তপোবনের প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি বিল্ববৃক্ষ। তাহার তলে অজিনাসনে উপবেশন করিয়া এক জন দীর্ঘাকার প্রবীণ মহাপুরুষ। তাঁহার সম্মুখে বসিয়া এক জন নবীন তাপস। তাঁহাদের উভয়ের মুখে বিমল প্রেমানন্দ। তাঁহাদের চোখে উচ্ছলিত জ্ঞান ও প্রতিভার তীব্র জ্যোতি।

ধীরগম্ভীর স্বরে মহাপুরুষ কহিলেন, "নলিনী-নাথ! তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ পূর্ণ দশ বৎসর পূর্ব্বের এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—এই সিতপক্ষীয় গুরুবাসরে। মনে পড়ে কি সে কথা? তুমি মোহ-পরবশ হয়ে অনিত্যের জন্য শাশ্বত ধন হারাতে যাচ্ছিলে। এখন তোমার কি বিশ্বাস? সুখ-ভোগে না ত্যাগে?"

"ত্যাগে"

সমাপ্ত

লা মিজারেবল্

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানুষ না দেবতা !

ইংরাজী ১৮১৫ অব্দে মসিও চার্লস্ ফ্রান্‌কোয়া বিয়েনভেনু মিরিয়েল ফ্রান্সের অন্তঃপাতী ডি— নগরের বিশপ বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযাজক ছিলেন। ধর্ম্মযাজকের আবাস রাজপ্রাসাদের ন্যায় বৃহৎ ও সুন্দর। এক অংশে একটি নাতি-বৃহৎ একতলা বাড়ী। এই বাড়ীটি মিরিয়েল আসিবার পূর্ব্বে হাঁসপাতালরূপে ব্যবহৃত হইত। মিরিয়েল এখানে আসিয়াই নিজে ঐ একতলা বাড়ীতে নিজের আবাসস্থান স্থির করিলেন এবং রোগীদিগকে তথা হইতে সরাইয়া ধর্ম্মযাজকের আবাস-প্রাসাদে লইয়া গেলেন এবং সেইখানেই তাহাদের স্থায়িভাবে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

মসিও মিরিয়েলের ভূসম্পত্তি কিছুই ছিল না। ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিধবা ভগ্নীর পাঁচ শত ফ্র্যাঙ্কমাত্র আয়ের কোম্পানীর কাগজ ছিল। মসিও মিরিয়েল সরকার হইতে বাৎসরিক পোনের শত ফ্রাঙ্ক বেতন পাইতেন। তাহা নিম্নলিখিতরূপে ব্যয়িত হইত। বিশপ নিজ হস্তে তাঁহার সংসার-খরচের যে তালিকা করিয়াছিলেন, তাহা এই :—

"আমার সংসারের আয়ব্যয়ের তালিকা :—স্থানীয় স্কুল-পরিচালনের ব্যয় ১৫০০ ফ্র্যাঙ্ক ও মিশন পরিচালন ব্যয় ১০০ ফ্রাঙ্ক ; স্থানীয় কুষ্ঠাশ্রমের জন্য ১০০ ফ্র্যাঙ্ক ; বাহিরের মিশনের জন্য ৩০০ ফ্র্যাঙ্ক ; প্যালেষ্টাইনে ধর্ম্ম-মন্দির সংস্থাপন ও তাহার পরিচালনের ব্যয় ৩০০ ফ্রাঙ্ক, খুচরা দান ১০০ ফ্র্যাঙ্ক ; কারাগারের উন্নতিকল্পে ৫০০ ফ্র্যাঙ্ক ; কয়েদী খালাসের জন্য ৫০০ ফ্র্যাঙ্ক ; দেনার দায়ে কারারুদ্ধ পুত্রকলত্রবান্ সংসারী দরিদ্র লোকের কারামুক্তির জন্য ১০০০ ফ্র্যাঙ্ক ; স্থানীয় বিদ্যালয়ের স্বল্পবেতনের শিক্ষকদিগের সাহায্যকল্পে ২০০০ ফ্রাঙ্ক ; দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের জন্য শস্যক্রয়ার্থে ১০০ ফ্র্যাঙ্ক ; স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়ের সাহায্য জন্য ১৫০০ ফ্র্যাঙ্ক ; দরিদ্রদিগকে ভিক্ষাদান ৬০০০ ফ্র্যাঙ্ক ; নিজ ব্যয় ১০০০ ফ্র্যাঙ্ক। মোট ১৫০০০ ফ্র্যাঙ্ক।

মিরিয়েল যত দিন ডি—নগরের বিশপের কার্য্য করিয়াছিলেন, উল্লিখিত বন্দোবস্তের কোনও পরিবর্ত্তনই তিনি করেন নাই। ম্যাডাম ব্যাপটিষ্টিন্‌ও হাসিমুখে ভ্রাতার এই ধর্ম্মকার্য্যের সমর্থন ও সহায়তা করিতেন। ভগ্নী ভ্রাতাকে সহোদরের মত ভালবাসিতেন ; কিন্তু গুরুর মত ভক্তি করিতেন। বিশপ তাঁহার বেতন হইতে মাত্র হাজার ফ্র্যাঙ্ক নিজ খরচের জন্য রাখিতেন ; আর তাঁহার ভগ্নীর কোম্পানীর কাগজের সুদ পাঁচ শত ফ্র্যাঙ্ক। এই দেড় হাজার ফ্র্যাঙ্কেই ভ্রাতা ও ভগ্নীর আড়ম্বর-শূন্য জীবিকা স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হইত।

এক এক জন বিশপের তত্ত্বাবধানে অনেকগুলি করিয়া গ্রাম থাকে এবং তাঁহাকে সময়ে সময়ে রীতিমত সেই সকল গ্রামস্থ ধর্ম্মমন্দির সকল পরিদর্শন করিতে হয়। সেই জন্য সকল বিশপই গাড়ী-ঘোড়া রাখিয়া থাকেন। বিশপ মিরিয়েল ডি—নগরে আসিয়াই অনাবশ্যক বোধে গাড়ী-ঘোড়া বিক্রয় করিয়া দিলেন। সেই বিক্রয়-লব্ধ অর্থ তিনি দরিদ্রের সাহায্যার্থে ব্যয় করিলেন। তাই বলিয়া তাঁহার নিয়মিত পরিদর্শন-কার্য্যে কোন ত্রুটী লক্ষিত হইল না। নিকটস্থ গ্রামে তিনি পদব্রজই যাতায়াত করিতেন, দূরের জন্য একটি ক্ষুদ্র অশ্ব রাখিয়াছিলেন। এক দিন তাঁহার সেই অশ্বটি অসুস্থ ছিল, বিশপের সে দিন এক দূরবর্ত্তী নগরে ধর্ম্ম-মন্দির-পরিদর্শনের পালা। কি করিবেন ? একটি গর্দ্দভ ভাড়া করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক

বিশপ মিরিয়েল সেই নগরে উপস্থিত হইলেন। বিশপকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ঐ নগরের মেয়র ও বড় বড় লোক সকলে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বিশপকে এই অদ্ভুত যানে আসীন দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। গ্রামের দুষ্ট বালকেরা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। কেহ কেহ বিদ্রূপের কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেও ছাড়িল না। বিশপ মিরিয়েলের অবস্থা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি মেয়র ও সমবেত ভদ্রলোকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়গণ! আপনাদের বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। যে যানে এক দিন আমাদের ত্রাণকর্ত্তা আরোহণ করিয়াছিলেন, আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র লোকের সেই যানে আরোহণ অতিমাত্র স্পর্দ্ধার কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি স্পর্দ্ধার জন্য ইহা করি নাই। প্রয়োজনবশতঃই আমাকে এই যানের শরণ লইতে হইয়াছে।"

অতিথি ও আর্ত্তের জন্য বিশপ মিরিয়েলের দ্বার সর্ব্বদা অবারিত ছিল। পীড়িতের সেবার জন্য, মৃতের অন্তিম-ক্রিয়ার জন্য, প্রয়োজন হইলে গভীর রাত্রিতেও বিশপ মিরিয়েলকে পাওয়া যাইত। ধর্ম্মজীবনে যেরূপ, কর্ম্মজীবনেও বিশপ মিরিয়েলের চিন্তা সেই এক। বিশপ সাংসারিক দৈন্যকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে দৈন্যে নিরানন্দের লেশমাত্র ছিল না। তাঁহার জীবন স্বর্গীয় বিমল আনন্দে পূর্ণ। বৃদ্ধাবস্থায় রাত্রিতে নিদ্রা কম হয়। বিশপও অতি অল্পকাল নিদ্রা যাইতেন। কিন্তু যেটুকু ঘুমাইতেন, সেটুকু খুব গভীর। প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া তিনি এক ঘণ্টা একান্তে উপাসনা করিতেন। তৎপরে মন্দিরে যাইয়া সমবেত ভক্তমণ্ডলীর সহিত কিছুক্ষণ ধর্ম্মালোচনা করিতেন। উপাসনান্তে গৃহে ফিরিয়া এক পেয়ালা ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ ও এক টুকরা রুটী দ্বারা প্রাতর্ভোজ সমাধা করিতেন। ভোজন-সমাপনান্তে তিনি কখনও কখনও একখানি ছোট নিড়ানি লইয়া জমী নিড়াইতেন। কখনও কখনও ঘরে বসিয়া লেখাপড়া করিতেন; এই উভয়বিধ কার্য্যকে তিনি একই নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। বিশপ বলিতেন, "মানুষের মন একখানি সুন্দর উদ্যান ভিন্ন আর কিছুই নয়।"

বিশপের আজ্ঞাক্রমে তাঁহার বাড়ীর সমস্ত দরজাগুলির তালা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। দরজাগুলি অর্গল দ্বারা আবদ্ধ থাকিত মাত্র। তাঁহার ভগ্নী ব্যাপ্টিষ্টিন ও পরিচারিকা ম্যাডাম ম্যাগলোয়ার প্রথম প্রথম একটু ভয় পাইতেন; কিন্তু পরে যখন দেখিলেন যে, কোন আপৎপাতের আশঙ্কা নাই, তখন আর কিছু বলিতেন না। বিশপ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিতেন, "চিকিৎসকের দ্বার কখনও রুদ্ধ থাকা উচিত নহে, ধর্ম্মযাজকের দ্বার সর্ব্বদা খোলা রাখা উচিত।"

এইরূপে উপাসনায়, উপদেশে, ভিক্ষাদানে, আর্ত্তের ও বিপন্নের রক্ষণে, উদ্যানকর্ষণে, অতিথির অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নে, সাধু চিন্তায়, সরল বিশ্বাসে, ভগবৎ-প্রেম-জনিত পূর্ণানন্দে সাধু বিশপ মিরিয়েলের জীবন পূর্ণ ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভবঘুরে।

ইংরাজী ১৮১৫ সালের অক্টোবর মাসের প্রারম্ভে এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক জন অপরিচিত ভবঘুরে আসিয়া এই ক্ষুদ্র ডি—নগরে প্রবেশ করিল। এই নবাগত ভবঘুরের খোস্‌খৎ চেহারা যে দেখিল, সে-ই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। তাহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইলেও তাহার নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব সবল মাংসল দেহ দেখিয়া বোধ হয়, যেন তাহার দেহ এখনও যৌবন-সুলভ তেজে পূর্ণ। তাহার মস্তকে একটি ছিন্ন চামড়ার টুপী। মুখ হইতে দরদরধারে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতেছে। তাহার পরিধানে একটি জীর্ণ টিকিনের পায়জামা। গায়ে একটি ছিন্ন হরিদ্রা রঙের বোতাম-বিহীন কালিকোর সার্ট। সেই দ্বিধা-বিভক্ত আঙ্গরাখার মধ্য দিয়া তাহার লোমশ বক্ষঃস্থল দেখা যাইতেছিল। সেই সার্টের উপরে একটি জীর্ণ নীলবর্ণের কোট। তাহাও সার্টের ন্যায় বোতাম-বিহীন। একটি প্রকাণ্ড ঝুলি তাহার স্থূল যষ্টির অগ্রভাগে সংলগ্ন থাকিয়া, তাহার পেশীবহুল পৃষ্ঠোপরি লম্বিত রহিয়াছে। তাহার পাদযুগ আজানু ধূলিধূসরিত ও ঘর্ম্ম-কলঙ্কিত। লোকটিকে দেখিলেই বোধ হয় যে, সে ভয়ানক পরিশ্রান্ত—

পর্য্যটনক্লান্ত। যে রাজপথ ধরিয়া এই লোকটি আসিতেছিল, তাহার পাশেই সহর-কোতোয়ালী। কোতোয়ালীর দ্বারে এক জন সশস্ত্র প্রহরী পরিক্রমণ করিতেছিল। লোকটি তাহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। প্রহরী একবার স্থির দৃষ্টিতে লোকটির আপাদমস্তক দেখিয়া লইল। অস্পষ্টভাবে কি বলিতে বলিতে সে কোতোয়ালীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। রাজপথ জনশূন্য হইতে আরম্ভ হইল। লোকটি অনন্যোপায় হইয়া একটি পান্থনিবাসে প্রবেশ করিল। আবাসের অধ্যক্ষ তখন কার্য্যে ব্যস্ত। এক জন আগন্তুকের প্রবেশ বুঝিতে পারিয়া, রন্ধনপাত্রের দিক হইতে মুখ না তুলিয়াই সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি চান?"

আগন্তুক। রাত্রির আহার্য্য ও থাকিবার স্থান।

অধ্যক্ষ। দুই-ই এখানে পাইবেন।

এতক্ষণে মুখ উঠাইয়া আগন্তুকের দিকে সসন্দেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পান্থ নিবাসের অধ্যক্ষ বলিল, "দাম?" আগন্তুক তাহার জীর্ণ কোটের বুকের পকেট হইতে একটি বৃহৎ চামড়ার ব্যাগ বাহির করিয়া বলিল, "আমার নিকট টাকা আছে।" অধ্যক্ষ বলিল, "তাহা হইলে আপনি যাহা চাহিতেছেন, তাহা পাইবেন।" আগন্তুক আবার তাহার মণিব্যাগটি ধীরে ধীরে যথাস্থানে রাখিয়া দিল। দ্বারের এক ধারে তাহার যষ্টি ও ঝুলি রাখিয়া অবসন্নভাবে একখানি টুল লইয়া বসিয়া পড়িল। আগন্তুকের অবস্থা এবং চেহারা দেখিয়া পান্থ-নিবাসের অধ্যক্ষ অত্যন্ত সন্দেহাকুলিত হইয়া পড়িল। উৎসুকভাবে আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল, "খাবার কখন্ প্রস্তুত হইবে? হোটেল-স্বামী উত্তর করিল, "এখনই।" এই সময়ে সে আস্তে আস্তে একখানি পুরাতন সংবাদপত্রের কোণ ছিঁড়িয়া লইয়া পেন্সিলে কি লিখিয়া একটি বালক ভৃত্যের হস্তে সেইখান দিল এবং ভৃত্যের কানে কানে কি বলিয়া দিল। ভৃত্য সেই পত্রখানি লইয়া দৌড়িতে দৌড়িতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে একেবারে কোতোয়ালীতে গিয়া উপস্থিত হইল। আগন্তুক এ সকল কিছুই দেখিতে পাইল না; সে তখন অবসন্ন-দেহে শূন্য-মনে আপন দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিতেছিল।

ভৃত্যটি ফিরিয়া আসিয়া একখানি পত্র হোটেল-স্বামীর হস্তে দিল। সে অতি ব্যস্তভাবে পত্রখানি পাঠ করিয়া কিছুক্ষণ আপন মনে কি চিন্তা করিল; পরে একেবারে আগন্তুকের সম্মুখীন হইয়া বলিল, "মহাশয়! আমি আপনাকে এখানে স্থান দিতে পারি না।" আগন্তুক বজ্রাহতের ন্যায় তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া কাতরভাবে বলিল, "কেন মহাশয়! আপনার যদি ভয় হইয়া থাকে যে, আমি আপনার দাম দিতে পারিব না, না হয়, আপনি অগ্রিম লউন।"

হোটেল-স্বামী। আমার শয়ন-গৃহ খালি নাই।

অতি সংযতভাবে আগন্তুক উত্তর করিল, "আমাকে আস্তাবলে একটু জায়গা দিন।"

হোটেল-স্বামী বলিল, "আস্তাবলে জায়গা নাই। সব ঘোড়ায় ভরা!"

আগন্তুক বলিল, "তাহা হইলে সিঁড়ির পাশে একটু স্থান ও এক আঁটি বিচালি দেন, আমি কোনমতে রাত্রি কাটাইব।"

হোটেল-স্বামী রুক্ষভাবে কহিল, "আমি তোমাকে খাবারও দিতে পারিব না।"

আগন্তুক বলিল, "সে কি কথা। দেখিতেছ না, আমি ক্ষুধায় মরিতেছি। আমি সকাল থেকে পথ চলিতেছি। সমস্ত দিন বারো লীগ হাঁটিয়া আসিয়াছি। আমি পয়সা দিতেও প্রস্তুত আছি। আমাকে আহার্য্য দাও।"

হোটেল-স্বামী রুক্ষভাবে উত্তর করিল, "আহার্য্য আমার নাই।"

আগন্তুক এই কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি বিদ্রূপের হাসি নহে। তীব্র নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক ও কঠোর যন্ত্রণার পরিচায়ক। আগন্তুক থরে থরে সজ্জিত পক্ক ও পচ্যমান খাদ্যের দিকে দেখাইয়া বলিল, "ও সব কি?"

পান্থনিবাসাধ্যক্ষ বলিল, "ও সব খরিদ্দারগণ কিনিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তোমার নিকট অন্য কৈফিয়ৎ দিবার প্রয়োজন নাই। বল, তুমি যাইবে কি না? আমি তোমাকে আহার্য্য দিতে কিংবা বিশ্রামের স্থান দিতে পারিব না। তুমি কে—আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি। শুনিবে কি? তুমি জন্ ভলজীন। শুনিলে ত! এখন আস্তে আস্তে অন্যত্র যাও।"

আগন্তুক একটি বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে তাহার যষ্টি ও ঝুলি তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। ক্ষুধায় কাতর, পরিশ্রমে অবসন্ন, মানসিক যন্ত্রণায় ও নৈরাশ্যে খিন্ন জন্ ভলজীন এক টুকরা রুটীর জন্য নগরের প্রতি দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াও ব্যর্থমনোরথ হইয়া নিজের অদৃষ্টকে গালি দিতে দিতে একটি পরিত্যক্ত বাটীর সোপানের উপরে শয়ন করিয়া রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

একটি বৃদ্ধা মহিলা সেই সময়ে গীর্জ্জা হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন; জন্ ভলজীনকে তদবস্থায় পতিত দেখিয়া তিনি বলিলেন, "বন্ধু! তুমি ওখানে কি করিতেছ?"

রুক্ষভাবে ভলজীন উত্তর করিল, "তোমার চক্ষু নাই? দেখিতেছ না, আমি শয়নের উদ্যোগ করিতেছি।"

স্ত্রীলোকটি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "কি বলিলে? তুমি এই সিঁড়ির উপর পাথরে শুইয়া রাত কাটাইবে?"

ভলজীন উন্মত্তের ন্যায় বিকট হাসিয়া কহিল, "উনিশ বৎসর ধরিয়া কাষ্ঠ-নির্ম্মিত শয্যায় আমি অভ্যস্ত হইয়াছি, এখন প্রস্তরের শয্যা কেমন দেখা যাউক।"

স্ত্রীলোক। ওঃ! তুমি বুঝি সৈনিকের কাজ করিতে?

ভলজীন। হাঁ।

স্ত্রীলোক। তুমি কোন সরাইয়ে যাও না?

ভলজীন। পয়সা নাই।

স্ত্রীলোকটি একটু দুঃখিতভাবে বলিল, "তাই ত, আমারও সঙ্গে বেশী কিছু নাই। দুইটি পেনী আছে।"

ভলজীন। তাহাই আমাকে দিতে পার।

স্ত্রীলোকটি ভলজীনকে পেনী দুইটি দিয়া বলিলেন, "দুই পেনীতে বোধ হয় তোমাকে কোন সরাইয়ে রাত্রি কাটাইতে দিবে না, তবে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার। না হয় তো কোন গৃহস্বামী তোমাকে আজ রাত্রির মত আশ্রয় দিতে পারে।"

ভলজীন। আমি এই নগরের প্রতি গৃহে গৃহে একটু আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছি।

মহিলা। বটে!

ভলজীন। এবং কুকুরের ন্যায় তাড়িত হইয়াছি।

বৃদ্ধা অঙ্গুলিনির্দ্দেশে বিশপ মিরিয়েলের আবাস দেখাইয়া বলিলেন, "তুমি বোধ হয়, ঐ বাড়ীতে আশ্রয় পাইবার চেষ্টা কর নাই?"

ভলজীন বলিল, "না।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "তবে ঐ বাড়ীতে একবার চেষ্টা করিয়া দেখ।"

বৃদ্ধা প্রাস্থান করিলেন। ভলজীন আস্তে আস্তে উঠিয়া বিশপ মিরিয়েলের আবাস-অভিমুখে গেল।

বিশপ মিরিয়েলের আজ সান্ধ্য-ভ্রমণের পরে বাড়ী ফিরিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে। তিনি ঘরে বসিয়া "মানবের কর্ত্তব্য" নামক একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন। ম্যাডাম ম্যাগলোয়ার আসিয়া আলমারী হইতে বাসনাদি নামাইতেছেন, দেখিয়া বিশপ বুঝিলেন যে, নৈশ-ভোজনের সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং তাঁহার ভগ্নী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাড়াতাড়ি পুস্তক বন্ধ করিয়া তিনি কক্ষান্তরে গিয়া দেখেন যে, মেজে আহার্য্য সজ্জিত। ম্যাডাম ইজিল্ ব্যাপটিষ্টিন্ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বিশপ তাঁহার নিয়মিত আসনে উপবেশন করিলে, ব্যাপাটিষ্টিন্ ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন, "দাদা, শুনিয়াছেন কি? এক জন ডাকাত না কি আজ এই সহরে আসিয়াছে। সহরের সমস্ত লোক ভয়ে কম্পমান।"

বিশপ বলিলেন, "বটে! তোমায় এ খবর কে দিলে?" ব্যাপটিষ্টিন্ উত্তর করিলেন, "সহরের প্রত্যেক লোকের মুখেই কেবল সেই ডাকাতের কথা। সবাই বলিতেছে যে, আজ রাত্রে একটা ভয়ানক কাণ্ড হবে। দাদা, আমাদের কোন দরজায় ত তালা নাই। এরূপ ভাবে থাকা কি নিরাপদ?"

ঠিক এই সময়েই বহির্দ্বারে সবলে কড়া নাড়ার শব্দ শ্রুত হইল। বিশপ বলিলেন, "কে? ভিতরে আইস।" সবলে ধাক্কা দেওয়ায় দরজা খুলিয়া গেল। আগন্তুক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়াই ম্যাডাম ম্যাগলোয়ার ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। ম্যাডাম ইজিল ব্যাপটিষ্টিন আগন্তুকের মুখের দিকে দেখিয়াই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া তাঁহার ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিশপ স্থিরদৃষ্টিতে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে স্বাগত

জিজ্ঞাসা করিতে যাইবেন, এমন সময় আগন্তুক নিজেই তাহার পরিচয় দিল।

আগন্তুক কহিল, "আমার নাম জন্ ভলজীন। আমি এক জন কারামুক্ত কয়েদী। উনিশ বৎসর আমি কারাগারে ছিলাম। চারি দিন মাত্র আমি মুক্তিলাভ করিয়া'ছি। এই কয় দিন কেবল পথে পথে ঘুরিতেছি। আমার অবস্থা শুনিয়া এবং আমার হরিদ্রা-বর্ণের ছাড়পত্র দেখিয়া, কোন ভদ্রলোক আমায় স্থান দেয় না; দোকানদার, হোটেলওয়ালা আমাকে কুকুরের মত তাহাদের দরজা হইতে তাড়াইয়া দেয়। পয়সা দিতে চাহিলেও, তাহারা আমার কাছে খাবার বিক্রয় করিতে চাহে না। আমি এত ভয়ানক জীব! আমি বড় ক্ষুধার্ত্ত - বড় ক্লান্ত! আমায় কি আশ্রয় দিবেন?"

বিশপ তাড়াতাড়ি উঠিয়া একখানি কেদারা অগ্নি-কুণ্ডের নিকট সরাইয়া দিয়া আগন্তুককে উপবেশন করিতে কহিলেন, এবং পরিচারিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ম্যাডাম ম্যাগলোয়ার! আর এক প্রস্থ কাঁটা-চামচ মেজে সাজাও এবং আমার শয়ন-কক্ষের পার্শ্বের কক্ষের পালঙ্কে পরিষ্কার চাদর বিছা-ইয়া দাও।"

ভলজীন্ বিশপের অমায়িকতায় বিস্মিত ও স্তম্ভীভূত হইয়া গেল। সে আপন চক্ষু-কর্ণকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল, "সত্য সত্যই কি আপনি আমায় আশ্রয় দিবেন? আপনি কে? এটি কি হোটেল?"

বিশপ উত্তর করিলেন, "না এটি হোটেল নয়! আমি এক জন ক্ষুদ্র ধর্ম্মযাজক। আমি এই বাটীতে বাস করি।"

ইতিমধ্যে ম্যাডাম ম্যাগলোয়ার রৌপ্যনির্ম্মিত পাত্রে খাদ্যাদি পরিবেশন করিয়া গেল। আগন্তুকের সম্মানার্থে রৌপ্য-নির্ম্মিত বাতিদান জ্বালাইয়া কক্ষ আলোকিত করা হইল। ভলজীন বিশপের আতিথ্যে বিস্মিত ও নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—০—

পাপী ও পুণ্যাত্মা।

গীর্জ্জার ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল। জন্ ভলজীনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বিশ বৎসর ধরিয়া ভলজীন কাষ্ঠ-শয্যায় রাত্রিযাপন করিয়া আসিতেছিল, সুকোমল শয্যা তাহার সহিবে কেন? মধ্যরাত্রেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। পূর্ণ চারি ঘণ্টা সুনিদ্রায় তাহার পথপর্য্যটন-ক্লান্তি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছে। সে একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিল, বাহিরে অসীম নির্জ্জনতা। আবার পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিল। পরিশ্রান্ত ও চিন্তাভারাক্রান্তের নিদ্রা সহজে আসে, কিন্তু এক-বার সে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে পুনরায় নিদ্রিত হই-বার প্রয়াস তাহার পক্ষে প্রায়শঃ নিষ্ফল হয়। ভলজীনেরও তাহাই হইল। আর নিদ্রা আসিল না। চিন্তা আসিয়া তাহার মস্তিষ্ক অধিকার করিয়া বসিল।

যেমন ঢেউয়ের পরে ঢেউ আসে, তেমনই চিন্তার পর চিন্তা আসিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি চিন্তা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া অন্য চিন্তা-গুলিকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে চিন্তাটি বড়ই প্রবল, বড়ই বেগবতী বলিয়া ভল-জীনের মনে হইতে লাগিল। যে কক্ষে ভলজীন শয়ন করিয়াছিল, তাহার পার্শ্বের কক্ষেই বিশপ নিদ্রিত। বিশপের শয্যার সন্নিকটে একটি আল-মারীতে রৌপ্য-নির্ম্মিত বাসনগুলি ছিল। যখন ম্যাডাম ম্যাগলোয়ার সেগুলি গুছাইয়া আলমারীতে রাখেন, ভলজীন তাহা দেখিয়াছিল। বাটীর সকলেই নিজ নিজ শয়ন-কক্ষে সুখসুপ্ত, এমন অবসর আর হইবে না। ভলজীনের হৃদয় সংশয়ের দোলায় দুলিতে লাগিল। এই ভাবে পূর্ণ এক ঘণ্টা অতি-বাহিত হইয়া গেল। ঢং ঢং করিয়া ঘড়ীতে তিনটা বাজিল। ভলজীন চক্ষু মেলিয়া কক্ষের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, ধীরে ধীরে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। অত্যধিক উত্তেজনায় ভলজীন বুঝিতে পারিতেছিল না যে, সে নিদ্রিত কি জাগ্রত। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া ভলজীন চমকিয়া উঠিল, এ দিকে

ও দিকে চাহিয়া পায়ের জুতা খুলিয়া সে আস্তে আস্তে ঝুলির মধ্যে রাখিয়া দিল। আবার চিন্তা! আবার সংশয়! আবার বিবেকের বৃশ্চিকদংশন! গীর্জ্জার ঘড়ী ঢং শব্দে অর্দ্ধঘণ্টা বিজ্ঞাপিত করিল। আর চিন্তার সময় নাই। ভলজীন উঠিয়া দাঁড়াইল। মার্জ্জারের ন্যায় সতর্ক পাদবিক্ষেপে সে জানালার নিকটে গেল; জানালার কবাট ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া দেখিল, উদার গগন-তলে ত্রয়োদশীর চাঁদ হাসিতেছে, কখনও বা মেঘের অন্তরালে মুখখানি ঢাকিয়া, ধরাবক্ষে আলো ও ছায়ায় একটি বিচিত্র ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছে। সেই অস্পষ্ট আলোকে ভলজীন একবার চারিধার বেশ করিয়া দেখিয়া লইয়া অতি সন্তর্পণে বিশপের শয়ন-কক্ষের দ্বারের নিকটে গিয়া দেখিল যে, দ্বার উন্মুক্ত। বিশপ তাহা অর্গলবদ্ধ করেন নাই।

ভলজীন নিঃশব্দে বিশপের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বিশপ শান্তিময়ী সুষুপ্তির অঙ্কে সুখ-শয়ান; তাঁহার মুখ স্বর্গীয় আলোকে বিভাসিত। সেই দিব্য-প্রতিভাদীপ্ত মুখ দেখিয়া ভলজীন শিহরিয়া উঠিল; তাহার শরীরের ভিতর দিয়া যেন অকস্মাৎ একটি তড়িতের প্রবাহ ছুটিয়া গেল। বিশপ নিদ্রিত। তাঁহার শিয়রে ভিত্তিগাত্রে বিলম্বিত একটি ক্রুশবদ্ধ যীশুর মূর্ত্তি, যেন এক হস্ত বিস্তার করিয়া বিশপের শিরে অজস্র আশীর্ব্বাদ ও অপর হস্তে পাপী ভলজীনের মস্তকে ক্ষমা বর্ষণ করিতেছে। ভলজীন আস্তে আস্তে আলমারীর নিকট গেল; পকেট হইতে একটি সূক্ষ্মাগ্র লৌহফলক বাহির করিয়া আলমারীর চাবি ভাঙ্গিতে যাইবে, এমন সময় দেখিল যে, চাবি তালাতেই লাগান আছে। তখন বিনা আয়াসে সেই চাবির সাহায্যে আলমারী খুলিল। তাহার পরে যে শয়ন-কক্ষে সে নিদ্রা গিয়াছিল, সেই শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাড়াতাড়ি তাহার ঝুলি ও যষ্টি স্কন্ধে ফেলিয়া জানালা খুলিয়া শার্দ্দূলের ন্যায় এক লম্ফে বাগানে পড়িল। ঝুলিটি দূরে ফেলিয়া বাসনগুলি ঝুলির মধ্যে রাখিয়া আর এক লম্ফে বাগানের প্রাচীর পার হইয়া পলায়ন করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—০—

ভলজীনের দীক্ষা।

পরদিন অতি প্রত্যূষে বিশপ উদ্যানে ভ্রমণ করিতে-ছেন। ম্যাডাম ম্যাগলোয়ার অতি ব্যস্তভাবে তাঁহার নিকটে আসিয়া ভীতি-বিজড়িত স্বরে বলিল, "মসিও! মসিও! আপনি জানেন কি, বাসনের ঝুড়ি কোথায়?"

বিশপ উত্তর করিলেন, "হাঁ, জানি।"

ম্যাডাম ম্যাগলোয়ার বলিল, "যা হ'ক্, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! আমি খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রাণ হইয়া গিয়া-ছিলাম।"

বিশপ ইতিপূর্ব্বে শূন্য ঝুড়িটি বাগানের মধ্যে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। তিনি সেটি ম্যাডাম ম্যাগ-লোয়ারের হাতে দিয়া বলিলেন, "এই লও বাসনের ঝুড়ি।"

ম্যাডাম ম্যাগলোয়ার। বাসন কোথায়?

বিশপ। তাহা আমি বলিতে পারি না।

এই কথা শুনিয়া ম্যাডাম ম্যাগলোয়ার অতি ত্রস্তে পুনরায় বাড়ীর মধ্যে যে কক্ষে পূর্ব্বরাত্রে ভল-জীন শয়ন করিয়াছিল, সেই কক্ষে গিয়া দেখিল যে, শয্যা খালি—ভলজীন পলাইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বিশপকে জানাইল, "মসিও! কল্য রাত্রের সেই লোকটিই চোর। সে-ই বাসন লইয়া পলাইয়াছে।"

বিশপ উত্তর করিলেন, "ম্যাডাম ম্যাগলোয়ার! ঐ বাসনগুলি কি আমার? উহা দরিদ্রের। আমি যে ঐগুলি এত দিন তাহাদিগকে না দিয়া অনর্থক অভিমানের বশে আলমারীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম, ইহাই অত্যন্ত অন্যায়। এখন যাহার জিনিস, সে লইয়াছে। কা'ল রাত্রির সেই লোকটি দেখিলে না ভয়ানক গরীব। সে ঐ বাসনগুলি বিক্রয় করিয়া কয়েক দিন অন্ততঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।"

বিশপের উত্তর শুনিয়া ম্যাডাম ম্যাগলোয়ার অবাক্ হইয়া রহিল। এই কথোপকথনের পর প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়াছে। বিশপ ও তাঁহার বিধবা ভগ্নী ম্যাডাম ইজিল ব্যাপ্টিষ্টিন প্রাতর্ভোজনে উপ-বেশন করিয়াছেন। রৌপ্য-নির্ম্মিত কাঁটা-চামচের

পরিবর্ত্তে কাঠের কাঁটা-চামচ মেজে সজ্জিত। বিশপের মন অন্য দিনের অপেক্ষা আজ যেন একটু বেশী প্রফুল্ল, অধিকতর হাস্যময়। ম্যাডাম ইজিল ব্যাপ্টিষ্টিনের মুখে হাসি কিংবা বিষাদ কোন ভাবই নাই। ম্যাডাম ম্যাগলোয়ার মনে মনে বড়ই দুঃখিত; কিন্তু পাছে বিশপ কিছু মনে করেন, সেই জন্য তাঁহার মনের দুঃখ মনেই রাখিতে হইয়াছে। প্রাতরাশ শেষ হইল। বিশপ ম্যাডাম ম্যাগলোয়ারকে বলিলেন, "কেমন ম্যাডাম! এক পেয়ালা দুগ্ধে এক টুকরা রুটী ভিজাইয়া আহারের জন্য রৌপ্য-নির্ম্মিত বাসন কিংবা কাঁটা-চামচ অনাবশ্যক আড়ম্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

এই সময়ে বহির্দ্বারে সবল করাঘাতের শব্দ শ্রুত হইল। বিশপ তাঁহার যথাভ্যস্ত রীতি অনুসারে কহিলেন, "কে? ভিতরে আসুন।" দরজা খুলিয়া চার জন লোক ভিতরে প্রবেশ করিল। এই চারি জনের মধ্যে তিন জন পুলিসের পরিচ্ছদধারী। অপর ব্যক্তি পাঠকের পূর্ব্বপরিচিত জন্ ভলজীন। জন্ ভলজীনের হস্ত কঠিন রজ্জুবদ্ধ। তিন জন পুলিস-কর্ম্মচারীর মধ্যে এক জন বিশপের দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে সৈনিকোচিত অভিবাদন করিয়া কহিল, "মসিও!" বিশপ ভলজীনকে চিনিতে পারিয়া ও তদবস্থ দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহার সম্মুখে গিয়া কহিলেন, "এ কি! আপনি? আপনার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। আমি যে রৌপ্য-নির্ম্মিত বাতীদান দুটিও আপনাকে দিয়াছিলাম। সে দুটি আপান বোধ হয় ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছেন। তাহার দামও দুই শত ফ্রাঙ্ক হইবে। আমি সে দুটিও আপনাকে আনিয়া দিতেছি—লইয়া যাউন।"

ভলজীন বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে বিশপের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

পুলিস-কর্ম্মচারী কহিল, "মসিও! তাহা হইলে এ ব্যক্তি যাহা বলিয়াছে, তাহা সত্য। আমরা তাহাকে সন্দেহের উপর আটক করিয়াছি। তাহার মত অবস্থার লোক এত রৌপ্য-নির্ম্মিত বাসন কোথায় পাইল?"

বিশপ তাহাকে বাধা দিয়া কহিলেন, "ওঃ! বুঝিয়াছি, সে বোধ হয় বলিয়াছে যে, এক জন ক্ষুদ্র ধর্ম্মযাজকের গৃহে সে কল্য রাত্রিযাপন করিয়াছে। তাহারই প্রদত্ত এই ক্ষুদ্র উপহার। সে ঠিক বলিয়াছে। আপনারা তাহাকে অন্যায়রূপে আটক করিয়াছেন।"

প্রহরিগণ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "তাহা হইলে তাহাকে আমরা ছাড়িয়া দিতে পারি?"

বিশপ কহিল, "অবশ্য।"

প্রহরিগণ ভলজীনের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল। ভলজীন কাঁপিতে কাঁপিতে বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে কহিল, "সত্যই কি আমি মুক্তি পাইলাম?"

প্রহরিগণ কহিল, "হাঁ।"

বিশপ প্রহরিগণকে বলিলেন, "তাহা হইলে তোমরা এক্ষণে যাইতে পার।"

প্রহরিগণ চলিয়া গেলে বিশপ ভলজীনকে বলিলেন, "ভদ্র! যাইবার পূর্ব্বে তোমার বাতীদান দুইটি লইয়া যাইবে।"

এই কথা বলিয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বাতীদান দুইটি লইয়া আসিয়া ভলজীনের হস্তে দিয়া বলিলেন, "বন্ধু! তুমি এখন স্বচ্ছন্দে যাইতে পার। ভাল কথা, যদি আবার তোমার এখানে আসিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বাগানের ভিতর দিয়া আসিবার কোন আবশ্যকতা নাই। আমার সদর দরজা সর্ব্বদা খোলা থাকে।"

বিশপের ব্যবহার ভলজীন একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল, বুঝি সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে। বিশপ ভলজীনের কাছে আরও সরিয়া গিয়া তাহার কানে কানে অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "জন্ ভলজীন! ভাই আমার! তুমি আর এখন সয়তানের নহ। এখন তুমি ঈশ্বরের। তোমার আত্মাকে সয়তানের নিকট হইতে কিনিয়া লইয়া আমি পরমমঙ্গলময়ের পদতলে তাহা অর্পণ করিয়াছি।"

ভলজীনের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সে মাতালের মত টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল। সমস্ত দিন সে নগরের পথে পথে পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইল। অচিন্ত্যপূর্ব্ব চিন্তার রাশি আসিয়া তাহার মস্তিষ্ক অধিকার করিয়া বসিল। সত্যই কি ভলজীন ঈশ্বরের? সত্যই কি সয়তানের হাত হইতে সে চিরতরে মুক্তিলাভ করিল? বিষম আবেগে, গুরু চিন্তায় ভলজীনের চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইতে লাগিল। একে একে গত জীবনের সমস্ত কথাগুলি

তাহার স্মরণপথে পতিত হইতে লাগিল। তাহার সেই প্রথম অপরাধ—পেটের দায়ে একখানি রুটী চুরি, সেই লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড, উনিশ বৎসর কারাবাস, সেই দীর্ঘ কারাবাসজনিত ক্লেশে ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও মানবের মনুষ্যত্বে অবিশ্বাস, বিশপ মিরিয়েলের দেবোপম চারিত্রিক সম্পদ্-এই সকল চিন্তা, একের পর আর একটি তাহার হৃদয়ে আসিয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল, সেই বিষম আলোড়নে ভলজীনের চরিত্রে এক অতি অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিল।

পরদিন প্রভাতে, ডি—নগরে কেহই আর সেই কারামুক্ত কয়েদী ভবঘুরে জন্ ভলজীনকে দেখিতে পাইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—:*:—

নাগর-নাগরী।

ফ্রান্সের রাজধানী পারিস সহর চিরদিনই বিলাসের নন্দন-কাননরূপে জগদ্বিখ্যাত। পারিসের একটি ছাত্রাবাসে চারিটি ছাত্র বাস করেন। তাঁহাদের নাম প্রথম ফেলিক্স্ থলোমাইস্, দ্বিতীয় লিস্টোলিয়ার, তৃতীয় ফ্যামুইল, চতুর্থ ব্লাক্ভিল। এই চারি জনের কেহই পারিসের বাসিন্দা নহে। চারি জনেরই বাড়ী পারিসের বাহিরে, ভিন্ন ভিন্ন জনপদে। চারি বন্ধুর চারি জন প্রণয়িনীও আছেন। তাঁহাদের নাম ফেভারিট, ড্যালিয়া, জেফিন্ ও ফ্যাণ্টাইন। ফেভারিট, ড্যালিয়া, জেফিন ও ফ্যাণ্টাইন চারি জনই যুবতী, পরম রূপলাবণ্যবতী। তাহাদের মধ্যে ফ্যাণ্টাইন সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়স্কা ও সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী। ফ্যাণ্টাইনের মস্তকে প্রচুর সোনালি কেশভার। মুখে মুক্তার ন্যায় দন্তপাতি। এই দুই সৌন্দর্য্য-সম্পদের জন্য ফ্যাণ্টাইনের সমবয়স্কা সকল রমণীই তাহাকে ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখিত।

এক দিন থলোমাইস্ তাঁহার বন্ধুত্রয়কে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ! এই সুদীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া আমরা চারি বন্ধুতে আপন আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়া বিলাসের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া তীরবেগে নরকের দিকে অগ্রসর হইতেছি। আমরা মনুষ্য; বিলাসিনীদিগের কুহকে পড়িয়া মনুষ্যত্ব হারাইয়া আমরা পশু হইয়াছি। আইস, আমরা আবার মানুষ হইতে চেষ্টা করি।" চারি বন্ধুতে গোপনে অনেক পরামর্শ হইয়া শেষে একটা সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইল। থলোমাইস্ অনেক দিন হইতে সুন্দরীগণকে বলিয়া আসিতেছিলেন যে, এক দিন তাঁহারা চারি বন্ধুতে বড় রমকের একটা মজা করিবেন। রঙ্গিণীরাও সেই রঙ্গ দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। স্থিরীকৃত হইল,—পরদিন একটি বনভোজনের আয়োজন করিয়া সেই রঙ্গটি দেখাইতে হইবে। কার্য্যেও তাহাই হইল।

পরদিন অতি প্রত্যূষে চারি বন্ধু ও তাহাদের প্রণয়িনীগণ একখানি অম্নিবাস গাড়ীতে করিয়া পারিসের চারি পাঁচ ক্রোশ দূরে একটি গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইল। দিনটি বেশ পরিষ্কার ও মেঘশূন্য। যুবকগণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, আনন্দের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে, হাসির লহর ছুটাইয়া, বিলাসিনীদিগের সঙ্গে নানা রঙ্গ আরম্ভ করিয়া দিল। কখন বা তাহারা উপবন-মধ্যে লতাকুঞ্জের অন্তরালে লুকোচুরি খেলিতে লাগিল, কখনও বা নাগরচতুষ্টয় রাশি রাশি বনপুষ্প চয়ন করিয়া নাগরীদিগকে বনদেবী সাজাইয়া দিল। এইরূপ রঙ্গরসে, আমোদে, ক্রীড়ায় দুই প্রহর কাটিয়া গেল। মুক্ত বায়ু-সেবনে ও দৌড়ঝাঁপে বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হইল। তখন নাগরনাগরীগণ শ্রান্তি দূর করিবার জন্য প্রকৃতির হস্তরচিত একটি বিটপিকুঞ্জের স্নিগ্ধ ছায়ার শ্যামল শাদ্বল শষ্প-শয্যা-তলে আশ্রয় লইয়া ক্ষুধা ও ক্লান্তি দূর করিতে লাগিল।

চারি জন নাগরীর মধ্যে ফেভারিট সর্ব্বাপেক্ষা রসিকা, মুখরা ও বয়োধিকা। সে থলোমাইসকে মজা দেখাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল। থলোমাইস উত্তর দিলেন, "সবুরে মেওয়া ফলে।" ফেভারিটও হটিবার মেয়ে নয়। সেও কাটা-কাটা জবাব দিতে পরিপক্ক; বলিল, "না হয় অসবুরে কুলটা আমড়াটাই ফলুক না।" খুব একটা হাসির গর্‌রা উঠিয়া গেল।

থলোমাইস বন্ধুত্রয়ের মুখের দিকে একবার কটাক্ষপাত করিলেন। যেন তাঁহার অক্ষিকোণে একটু হাসির রেখাও ফুটিয়া উঠিল। বন্ধুত্রয়ের মুখ-দর্পণেও যেন সেই অস্পষ্ট হাস্যরেখা প্রতিফলিত

হইল। যে "মজা" দেখিবার জন্য রঙ্গিণীগণের এত আগ্রহ, সেই মজার সময় হইয়া আসিয়াছে। সৈন্যগণ কাওয়াজের সময় যেমন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়, থলোমাইসের ইঙ্গিতে বন্ধু-চতুষ্টয় সেইরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদের সর্ব্বাগ্রে থলোমাইস, পশ্চাতে অপর তিন জন। থলোমাইস ওষ্ঠে তর্জ্জনী দিয়া সঙ্কেতে নাগরীদিগকে কোন প্রশ্ন করিতে বারণ করিয়া দিলেন এবং তাঁহারাও যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিবেন না, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। রমণীগণ এ উহার মুখপানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। মজার পূর্ব্বাভাষ ত ভালই। উপসংহার দেখিবার জন্য সুন্দরীকুল আকুল হইয়া উঠিল। যুবক-চতুষ্টয় আপন আপন প্রণয়িনীর ললাটে এক একটি উষ্ণ চুম্বন অঙ্কিত করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিয়া গেল। বিলাসিনীগণ সোৎসুকনেত্রে যতক্ষণ তাহাদিগকে লক্ষ্য হয়, ততক্ষণ তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল। থলোমাইস ও তাহার সহচরগণ গ্রামস্থ ডাক-গাড়ীর আফিসে উপস্থিত হইয়া চারিখানি টিকিট ক্রয় করিল। বেগবান্‌-অশ্ব-সংযোজিত ডাক-গাড়ীতে আরোহণ করিয়া অনতিবিলম্বেই অদৃশ্য হইয়া গেল। এ দিকে সুন্দরীগণ নাগরদিগের আগমন-প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ থাকিয়া তাহাদের প্রত্যাগমন সম্বন্ধে নানারূপ কল্পনা-জল্পনা করিতে আরম্ভ করিল। যুবকদিগের যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, যুবতীদিগের ঔৎসুক্য ততই উৎকণ্ঠায় পরিণত হইতে আরম্ভ হইল। এমন সময়ে একটি লোক একখানি পত্র লইয়া আসিল। ফেভারিট ব্যস্তসমস্ত হইয়া গিয়া পত্রবাহকের নিকট হইতে পত্রখানি লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল, পত্রে শিরোনামা নাই। পত্র কাহার, কে দিয়াছে, জিজ্ঞাসা করায় পত্রবাহক বলিল, "আমি ডাক-গাড়ীর আফিসের চাপরাসী। চারি জন ভদ্রলোক ঘণ্টাখানেক আগে চারিখানি টিকিট লইয়া ডাকগাড়ীতে চলিয়া গিয়াছেন; এই চিঠিখানি আপনাদিগকে দিতে বলিয়া গিয়াছেন।" ফেভারিট চিঠিখানি লইয়া ছিঁড়িয়াই পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। চিঠিতে লেখা ছিল:—

"প্রিয়তমাগণ!

মনে রাখিও, আমরা একেবারে বেওয়ারিস্‌ নহি। আমাদের মা-বাপ আছেন। আমরা তাঁহাদের কুসন্তান। আমাদের জন্য তাঁহারা নিতান্ত মর্ম্মপীড়া ভোগ করিতেছেন। এত দিন তোমাদের কুহকে পড়িয়া তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। আর না—আমরা আবার পিতা-মাতার নিকট ফিরিয়া চলিলাম। আশা করি, তোমরাও আমাদিগকে শীঘ্র ভুলিয়া যাইবে এবং দু' এক ফোঁটা মায়া-কান্না কাঁদিয়া আবার নবীন নাগর খুঁজিয়া লইয়া সুখী হইবে। প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া তোমাদিগকে সুখী করিবার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি; সেইটুকু স্মরণ করিয়া আমাদের উপর রাগ করিও না।

ব্ল্যাকভিল
ফ্যামুইল
লিস্‌টোলিয়ার
ফেলিক্স থলোমাইস।"

পত্র পাঠ করিয়া যুবতীগণ পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। কাহারও মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না। ফলতঃ তাহারা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না যে, এটি বাস্তবিক কিংবা পরিহাসমাত্র। সকলেই মনে করিল, ইহা পরিহাস। হাসিতে হাসিতে রমণীগণ আর কালবিলম্ব না করিয়া পারিসযাত্রী শকটের সন্ধানে গেল।

এই ব্যাপারের এক ঘণ্টা পরেই রমণীগণ নিজ নিজ কক্ষে উপস্থিত হইল। রাত্রি ক্রমে অধিক হইতে লাগিল। ফেভারিট, জেফিন্‌ ও ড্যালিয়া হাসিতে হাসিতে যাইয়া শয়ন করিল। ফ্যাণ্টাইনের চক্ষে নিদ্রা নাই। সে যে থলোমাইসকে যথার্থই প্রাণ দিয়াছে। তাহাদের সেই অকৃত্রিম প্রণয়ের ফলস্বরূপ ফ্যাণ্টাইন্‌ যে একটি কন্যাও কোলে পাইয়াছে! ফ্যাণ্টাইন্‌ আকুলভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। কন্যাটিকে বুকের মধ্যে লইয়া, শয্যায় মুখ লুকাইয়া ফ্যাণ্টাইন্‌ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—•—

অনাথিনী

পারিস নগরের অনতিদূরে মণ্টফারমিল একটি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামের মধ্য দিয়া রাজপথ।

পথের পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র সরাই বা পান্থনিবাস। থেনার্ডিয়ার এই সরাইয়ের স্বত্বাধিকারী।

ক্রোড়ে একটি দুই বৎসরের শিশু, পৃষ্ঠে একটি ব্যাগ, সুন্দর মুখখানি স্বেদ ও অশ্রু-কলঙ্কিত, চক্ষুর্দ্বয় রাত্রি-জাগরণে ও রোদনে রক্তাভ, অনাথিনী ফ্যাণ্টাইন্ সাধের পারিস ছাড়িয়া কর্ম্মের সন্ধানে পদব্রজে নিজ গ্রামের অভিমুখে চলিতে লাগিল। পারিসে তাহার স্থান হইল না। জননী জন্মভূমি তাঁহার সেই ক্ষুদ্র জনপদ এম-সুর-এমও কি তাহাকে একটু স্থান দিবেন না? অবশ্য দিবেন। সেই আশায়, সেই আশ্বাসে রমণী চলিতে লাগিল।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। ফ্যাণ্টাইন্ পথশ্রমে কাতর হইয়া পান্থ-নিবাসের সোপানে বসিয়া পড়িল। অদূরে থেনার্ডিয়ারের দুইটি কন্যা একটি বৃক্ষশাখা-সংলগ্ন রজ্জুর উপর বসিয়া দোল খাইতেছিল। ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার কিছু দূরে বসিয়া তাহাই দেখিতেছিল। বাল্যে আপনার পর, ধনী দরিদ্র বিচার থাকে না। ক্রীড়ারত থেনার্ডিয়ার কন্যাযুগল অচিরেই ফ্যাণ্টাইনের কন্যাকে ডাকিয়া লইয়া তাহাদের খেলার সাথী করিয়া লইল। কসেটও তাহাদের সহিত খেলা করিতে করিতে ক্ষণিকের জন্য তাহার স্নেহময়ী মাতাকেও বিস্মৃত হইল। তাহা দেখিয়া সেই দুঃখ ও নিরাশা-প্রপীড়িত মাতার হৃদয়েও যেন আশা ও আনন্দের বিদ্যুল্লেখা ঈষৎ চমকিয়া উঠিল।

ফ্যাণ্টাইন্ জননী থেনার্ডিয়ারকে কহিলেন, "আপনি বড়ই সৌভাগ্যবতী, আপনার মেয়ে দুইটি বড় সুন্দরী, আপনার নাম কি?"

অপরিচিত পথিকের মুখে কন্যাদ্বয়ের প্রশংসা শুনিয়া ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার অত্যন্ত আনন্দিত হইল। কোন্ মাতা না আপনার সন্তানের প্রশংসা শুনিলে হৃদয়ে পুলক অনুভব করে?

ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার উত্তর করিল, "আমার নাম থেনার্ডিয়ার, আমাদেরই এই সরাই। আপনার মেয়েটিও খুব সুন্দর। ইহার বয়স কত?" ফ্যাণ্টাইন্ বলিল, 'প্রায় দুই বৎসর।"

জননী থেনার্ডিয়ার কহিল, "দেখুন, ছেলেরা কত শীঘ্র পরকে আপন করিয়া লয়। এখন এই তিনটি মেয়েকে দেখিলে, কাহার সাধ্য বলিবে যে, ইহারা মায়ের পেটের বোন্ নয়।"

আবার আশার অতি ক্ষীণ আলোকরেখাপাতে মুহূর্তের জন্য ফ্যাণ্টাইনের হৃদয়ের গাঢ় অন্ধকার বিদূরিত হইল! ফ্যাণ্টাইন্ সাহসে বুক বাঁধিয়া জননী থেনার্ডিয়ারকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আমার এই কন্যাটির ভার লইতে পারেন কি?"

ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার এই কথা শুনিয়া একটু চমকিয়া উঠিল। ফ্যাণ্টাইনের প্রস্তাবে তাহার সম্মতি কিংবা অসম্মতি কিছুই সে জানাইল না।

ফ্যাণ্টাইন্ বলিতে লাগিল, "দেখুন, আমাকে কোন স্থানে চাকরী করিয়া খাইতে হইবে। আমার কোলে মেয়ে দেখিলে আমার চাকরী পাওয়া দুষ্কর। আমার সৌভাগ্যক্রমে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। আপনার হৃদয় দেখিতেছি, জননী-সুলভ কোমলতায় ও কারুণ্যে পূর্ণ। আপনি আমার কন্যাটিকে আশ্রয় দিন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন।"

জননী থেনার্ডিয়ার কহিল, 'আচ্ছা দেখা যাইবে।"

একটু সাহস পাইয়া ফ্যাণ্টাইন্ বলিল, "ইহার ভরণপোষণের ব্যয় আমি মাসে ছয় ফ্র্যাঙ্ক করিয়া দিব।"

এই সময় সরাইয়ের একটি কক্ষ হইতে পুরুষের গলায় এই কয়টি কথা শ্রুত হইল, "না, সাত ফ্র্যাঙ্কের কমে হইবে না, এবং ছয় মাসের টাকা অগ্রিম চাই।"

ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার ঝটিতি "ছয় সাতে বিয়াল্লিশ" নামতা পড়িয়া ছয় মাসের টাকার পরিমাণ ঠিক করিয়া ফেলিল। ফ্যাণ্টাইন্ পারিস পরিত্যাগ করিবার সময় তাহার যাহা কিছু ছিল, বিক্রয় করিয়া আশী ফ্রাঙ্ক পাইয়াছিল। এই টাকা তাহার নিকটেই ছিল। ফ্যাণ্টাইন্ জননী থেনার্ডিয়ারের প্রস্তাবে সম্মত হইল, কক্ষ হইতে আবার পুরুষের গলায় শব্দ আসিল, "বাজে খরচ বাবদ আরও সতের ফ্রাঙ্ক চাই।"

তখনই জননী থেনার্ডিয়ার মুখে মুখে অঙ্ক কষিয়া বলিল, "বিয়াল্লিশ আর সতের একুনে উনষাইট ফ্রাঙ্ক।" ফ্যাণ্টাইন্ কহিল, "তাহাই দিব। আমার আশী ফ্রাঙ্কের মধ্যে উনষাইট ফ্রাঙ্ক আপনাদিগকে দিলে, আমার হাতে যাহা থাকিবে, তাহা দিয়াই কোনমতে কায়ক্লেশে আমি বাড়ী পৌঁছিতে পারিব। তার পরে সেখানে চাকরী করিয়া

আমার হাতে কিছু পয়সা জমিলেই আমি আবার আসিয়া আমার সোনার বাছাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইব।"

আবার পুরুষকণ্ঠে শুনা গেল, "মেয়েটির কাপড়-চোপড় আছে ত?"

জননী থেনার্ডিয়ার ফ্যাণ্টাইনকে কহিল, "ভিতর হইতে আমার স্বামী কথা কহিতেছেন।"

ফ্যাণ্টাইন্ তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল। তাই তাহারই প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "অবশ্য!—আমার সোনার পুতুলকে কি আমি বিনা বস্ত্রে রাখিয়া যাইব?"

দরদস্তর ঠিক হইয়া গেল। ফ্যাণ্টাইন্ রাক্ষসীর হস্তে তাহার নয়নের মণি কসেট ও যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া, সমস্ত রাত্রি চিন্তা ও জাগরণে কাটাইল। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এম-সুর-এম অভিমুখে প্রস্থান করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ফাদার ম্যাডিলিন।

এম-সুর-এম ফ্রান্সের রাজধানী পারিস হইতে কিছু দূরে একটি নাতি-বৃহৎ গণ্ডগ্রাম। বহুকাল হইতে এই গ্রামে অনেকেই নকল চুণি প্রস্তুতের কারবার করিয়া বেশ দু পয়সা রোজগার করিত। এই গ্রামে অনেকগুলি বিত্তশালী বণিক্ও বাস করিত। ফ্যাণ্টাইন্ এম-সুর-এম গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, গ্রামের অবস্থা একেবারেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। নকল চুণির কারবার এখন একমাত্র মসিও ম্যাডিলিনের হস্তে। অন্যান্য ব্যবসায়িগণ তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া কতক দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে, কতক বা চুণির ব্যবসা ছাড়িয়া অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। ফাদার ম্যাডিলিন এই গ্রামের বনিয়াদী অধিবাসী নহেন। তিনি কয়েক বৎসরমাত্র পূর্ব্বে এই গ্রামে আসিয়াছেন। সামান্য পুঁজি লইয়া কারবার খুলিয়া অদ্ভুত অধ্যবসায়গুণে এবং একটি নূতন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনে অতি অল্পকালমধ্যেই প্রভূত ধনসঞ্চয় করিয়া নকল চুণির কারবার একেবারে একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার কারখানায় প্রস্তুত চুণি এত সুন্দর যে, তাহার কাছে আসল চুণিও হার মানিয়া যায়; এবং দক্ষ মণিকারও সময়ে সময়ে আসল কি নকল চিনিতে না পারায় ভ্রমে পতিত হয়।

কয়েক বৎসরমধ্যে ফাদার ম্যাডিলিনের আর্থিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া সে পরিবর্ত্তন কিছুই বুঝা যায় না। তিনি প্রথমে যে দিন গ্রামে প্রবেশ করেন, তখন যেমন, এখনও ঠিক সেইরূপ। তাঁহার কেশ পক, চক্ষু উজ্জ্বল, বদন প্রশান্ত, হৃদয় চিন্তা-ভারাক্রান্ত। তিনি লোকের সহিত বেশী আলাপ করেন না। নিজের সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত মিতাচারী ও মিতব্যয়ী। প্রাতঃকালীন ও সান্ধ্য ভ্রমণ তাঁহার একমাত্র ব্যসন। ভ্রমণকালে সর্ব্বদাই একটি বন্দুক তাঁহাব হাতে থাকিত, কিন্তু প্রায়শঃ তিনি তাহা ছুড়িতেন না। তবে যখন ছুড়িতেন, তখন তাঁহার লক্ষ্য কদাচ ব্যর্থ হইত না। যখন তিনি বাহির হইতেন, তখন তাঁহার বড় বড় পকেটগুলি হেপেনিতে ভরা থাকিত। যখন বাড়ী ফিরিতেন, তখন খালি পকেটে ফিরিতেন। মসিও ম্যাডিলিনকে পথে যাইতে দেখিলেই গ্রাম্য বালক-বালিকাগণ মৌমাছির মত আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত। মসিও ম্যাডিলিন বহু সৎকার্য্য করিতেন—কিন্তু সমস্তই গোপনে। তিনি ধর্ম্মকার্য্য করিয়া তাহা ঢক্কানিনাদে বিজ্ঞাপিত করিতে ভালবাসিতেন না।

১৮২১ সালের প্রারম্ভে সাধু বিশপ মিরিয়েলের মৃত্যুসংবাদ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিনই প্রাতঃকালে মসিও ম্যাডিলিনকে শোকসূচক কৃষ্ণবর্ণ ক্রেপ ধারণ করিতে দেখা গেল। তাহাতে নানা লোকে নানা জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিল। কোন কোন উর্ব্বরমস্তিষ্ক পরলোকগত বিশপের সহিত মসিও ম্যাডিলিনের কোন ঘনিষ্ঠ শোণিতসম্বন্ধ কল্পনা করিতেও বিরত হইল না। অত্যধিক অনুসন্ধান-পরায়ণা কোন ভদ্রমহিলা এক দিন মসিও ম্যাডিলিনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বর্গীয় বিশপ কি মসিওর জ্ঞাতি-ভ্রাতা?" মসিও ম্যাডিলিন কহিলেন, "না।" অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া

মহিলাটি কহিলেন, "তাহা হইলে মসিও শোকচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন কি জন্য?" মসিও তাহার কৈফিয়ৎ দিলেন যে, তিনি বাল্যে বিশপের ভৃত্য ছিলেন।

যাহা হউক, মসিও ম্যাডিলিনের প্রতিপত্তি ও খ্যাতি এতাধিক প্রসারিত হইল যে, স্বয়ং সম্রাটের কানে পর্য্যন্ত তাঁহার নাম উঠিল। এই সময়ে মেয়রের পদ শূন্য হওয়ায় সম্রাটের মনোনয়নে মসিও ম্যাডিলিন এম-সুর-এম গ্রামের মেয়র নির্ব্বাচিত হইলেন। এই নির্ব্বাচনে গ্রামবাসী সকলেই সুখী হইল। সুখী হইল না কেবল এক জন লোক—সে পুলিস-ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্ট। জ্যাভার্ট মসিও ম্যাডিলিনের এম-সুর-এম গ্রামে চুণির কারবার স্থাপনের প্রথম অবস্থা অবগত ছিলেন না। যখন মসিও ম্যাডিলিন সৌভাগ্যের উচ্চতম সোপানে অধিরূঢ়, সেই সময়ে তিনি অন্য স্থান হইতে বদ্‌লী হইয়া আসিলেন। কিন্তু মসিও ম্যাডিলিনের সহিত প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্ত্ত হইতেই যেন জ্যাভার্টের মনে একটা খট্‌কা বাধিল; অনির্ব্বাচ্য একটি সন্দেহ তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত হইল। এ সৌসাদৃশ্য কি ঠিক, না কাল্পনিক? মসিও ম্যাডিলিনের উপর জ্যাভার্টের শ্যেনদৃষ্টি পতিত হইল।

ঠিক এই সময়ে একটি ঘটনায় জ্যাভার্টের সন্দেহ সিদ্ধান্তের পথে নীত হইতে লাগিল। ঘটনাটি এই:—এক দিন প্রাতঃকালে মসিও ম্যাডিলিন প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। কিছু দূরে একটি জনতা দেখিয়া, দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হইয়া ম্যাডিলিন দেখিলেন যে, ফক্‌লেভেণ্ট নামে একটি বৃদ্ধ শকটবান্, শকটের চক্রের তলায় পড়িয়া গিয়াছে পথ কর্দ্দমে পূর্ণ; গাড়ীখানি বোঝাই। সুতরাং চাকা ক্রমে কর্দ্দমে বসিয়া যাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ফক্‌লেভেণ্টের আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক্ পূর্ণ হইল। সমবেত জনতা স্তম্ভিতভাবে সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখিতে লাগিল, কেহই বৃদ্ধ ফক্‌লেভেণ্টকে এই অবশ্যম্ভাবী মরণের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইল না। মসিও ম্যাডিলিন সমবেত জনমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "এখানে কাছাকাছি কাহারও জ্যাক নাই?" এক জন কৃষক উত্তর করিল. "জ্যাক আনিতে পাঠান হইয়াছে।" মসিও ম্যাডিলিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতক্ষণে সেটি আসিতে পারে?" এক জন কহিল, "আধঘণ্টার এ দিকে নহে।"

রাত্রিতে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পথ কর্দ্দমাক্ত। বোঝাই গাড়ীর চাকা কর্দ্দমে বসিয়া যাইতেছে। অতি অল্পক্ষণেই বৃদ্ধ ফক্‌লেভেণ্টকে মরণের করাল কবলে পতিত হইতে হইবে। অর্দ্ধঘণ্টার বহুপূর্ব্বেই ফক্‌লেভেণ্টকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইবে।

মসিও ম্যাডিলিন চীৎকার করিয়া কহিলেন, "বন্ধুগণ। আধঘণ্টা দেরী সহিবে না। তাহার বহুপূর্ব্বেই লোকটি মারা পড়িবে। এখনও সময় আছে। একবার ইহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। আমাদের মধ্যে কি এমন কোন বলবান্ ব্যক্তি নাই, যে এই গাড়ীর চাকার নীচে কাঁধ দিয়া গাড়ীখানিকে একটু উঁচু করিয়া ধরিতে পারে? তাহাকে আমি দশ লুইস বক্‌সিস্ করিব।"

সকলেই অধোমুখ, সকলেই নীরব। মসিও ম্যাডিলিন কহিলেন, "এস, কুড়ি লুইস।" সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্টও তথায় উপস্থিত ছিল। সে কহিল, "মসিও, এই জনসংঘ-মধ্যে এমন কেহই নাই যে, ঐ দুর্ভাগ্য শকটবান্‌কে রক্ষা করিবার জন্য ইচ্ছুক নহে, কিন্তু এক জনের এমন সামর্থ্য নাই যে, গাড়ীখানিকে তুলিয়া ধরে; অথচ একের অধিক লোক ওখানে যাইতে পারে না।" এই সময়ে জ্যাভার্ট তীব্র দৃষ্টিতে একবার মসিও ম্যাডিলিনের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। জ্যাভার্ট বলিতে লাগিল, "মসিও ম্যাডিলিন! আপনি যে প্রস্তাব করিতেছেন, তাহা করিতে সমর্থ সমগ্র ফ্রান্সমধ্যে একটি লোক আছে।" এই কথায় ম্যাডিলিন একটু চমকিত হইয়া উঠিলেন। জ্যাভার্টের দৃষ্টি মসিও ম্যাডিলিনের মুখের দিকে। জ্যাভার্ট বলিল, "সে লোকটি টুলো জেলখানার এক জন কয়েদী!" মুহূর্ত্তের জন্য মসিও ম্যাডিলিনের মুখখানি ছাইয়ের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। এই সময় ফক্‌লেভেণ্ট যন্ত্রণায় ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিল "আমি মরিলাম, আমায় বাঁচাও।"

মসিও ম্যাডিলিন সেই করুণ চীৎকার শুনিলেন, একবার চারিদিকে চাহিলেন, দেখিলেন, জনতা পূর্ব্ববৎ নিস্তব্ধ, ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্টের শ্যেনদৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর। মুহূর্ত্তমধ্যে মসিও ম্যাডিলিন তাঁহার ওভারকোটটি খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সবল

দেহের পেশীগুলি যেন ফুলিয়া উঠিল। একটি কথা-মাত্র উচ্চারণ না করিয়া তিনি হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন। জনতার মধ্যে কেহই একটি কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি গাড়ীর নীচে উপুড় হইয়া পড়িয়া চাকায় কাঁধ লাগাইয়া দিলেন। দুইবার তাঁহার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া মসিও ম্যাডিলিন শকটখানিকে কিছু-মাত্র উত্তোলিত করিতে পারিলেন না। সমবেত জনতা একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "মসিও ম্যাডিলিন! বাহির হইয়া আসুন, তাহা না হইলে আপনিও চাপা পড়িয়া মরিবেন।" মরণোন্মুখ ও বৃদ্ধ ফক্‌লেভেণ্টও কাতরভাবে বলিল, "মসিও ম্যাডিলিন! আপনি বাহির হইয়া যান। আমি ত মরিবই। সঙ্গে সঙ্গে আপনিও কেন মরিবেন?" মসিও ম্যাডিলিন কোন উত্তর দিলেন না। সহসা শকটখানি নড়িয়া উঠিল, চক্রগুলি কর্দ্দমের মধ্য হইতে বাহির হইল। অর্দ্ধরুদ্ধ-কণ্ঠে ম্যাডিলিন বলিলেন, "ভাই সকল! এইবার সকলে মিলিয়া ধরিয়া তোল।" কুড়ি পঁচিশ জন লোক একসঙ্গে ছুটিয়া গিয়া শকটখানিকে তুলিয়া ধরিল। দুই তিন জন ধরাধরি করিয়া ভগ্নপঞ্জরাস্থি বৃদ্ধ ফক্‌লেভেণ্টকে চাকার নীচে হইতে বাহির করিয়া লইল। মসিও ম্যাডিলিন আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ বিবর্ণ ও ঘর্ম্মক্লিন্ন। তাঁহার পরিচ্ছদ ছিন্ন ও কর্দ্দমলিপ্ত। বৃদ্ধ ফক্‌লেভেণ্ট কৃত-জ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে যাইয়া একেবারে মসিও ম্যাডিলিনের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। ম্যাডিলিনের মুখ হইতে আত্মপ্রসাদের স্বর্গীয় বিমল জ্যোতি স্ফুরিত হইতে লাগিল। ইন্‌স্পেক্টর জ্যাভার্টের স্থির নির্নিমেষ চক্ষুও যেন সে জ্যোতি সহিতে না পারিয়া ক্ষণিকের তরে ধরাতললগ্ন হইল।

একখানি শিবিকা আনাইয়া মসিও ম্যাডিলিন ফক্‌লেভেণ্টকে তাঁহার কারখানায় লইয়া গেলেন। কারখানার হাঁসপাতালে তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কয়েকদিনমধ্যে ফক্‌লেভেণ্ট সুস্থ হইলে পারিসের সেণ্ট এণ্টোয়াইন মহল্লায় একটি চিরকুমারী ব্রতধারিণীর আশ্রমে তাহাকে উদ্যানরক্ষকের কর্ম্ম যোগাড় করিয়া দিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ফ্যাণ্টাইন ম্যাডিলিনের কারখানায়।

ফ্যাণ্টাইন পারিস হইতে নিজ গ্রামে ফিরিয়া দেখিল যে, সেখানে কেহই তাহাকে চিনিল না, অপরিচিতাকে কেহই আশ্রয় দিল না। মসিও ম্যাডিলিনের কারখানার দ্বার কিন্তু সবারই জন্য উন্মুক্ত। সেখানে আশ্রয় চাহিবামাত্র ফ্যাণ্টাইন্ আশ্রয় পাইল। সেই দিন হইতে সে কারখানার রমণী-বিভাগে ভর্ত্তি হইয়া গেল। কারখানার কার্য্য ফ্যাণ্টাইনের পক্ষে এই প্রথম। অভ্যস্ত না হইলে কার্য্যে পটুতা জন্মে না; পারিশ্রমিকও সেই অনুপাতে কম-বেশী হয়। ফ্যাণ্টাইন রোজগার বেশী করিতে পারিত না, তবে যাহা পাইত, তাহাতে তাহার গ্রাসাচ্ছাদন একপ্রকার চলিয়া যাইত। অভ্যাসে কার্য্যে অনুরক্তি জন্মায়। কার্য্যানুরক্তির সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছন্দতা ও মানসিক স্ফূর্ত্তি আসে এবং জীবন ভোগ্য ও স্পৃহণীয় হয়। ফ্যাণ্টাইনও সুখের মুখ দেখিতে লাগিল। তাহার একমাত্র চিন্তা এখন কসেট।

বিবাহিতা বলিয়া পরিচয় দিবার মুখ তাহার নাই। ঘুণাক্ষরে কাহারও নিকট কসেটের কথা বলিলেই তাহার সর্ব্বনাশ! কিন্তু মায়ের প্রাণ! মাঝে মাঝে সোনার পুতুলের খবর না লইলে বাঁচে কেমন করিয়া? ফ্যাণ্টাইন নিজে লিখিতে পড়িতে জানে না। অগত্যা তাহাকে পেশাদার লেখকের সাহায্য লইতে হইল। কথা তিন কান হইলে আর কয়দিন গোপন থাকে? অচিরেই ফ্যাণ্টাইনের এই "চিঠিচালনা" লইয়া কারখানার অন্যান্য শ্রমজীবিগণের মধ্যে খুব কানাঘুষা চলিতে লাগিল। কেহ কেহ গোপন অনুসন্ধানও চালাইতে লাগিল। ক্রমে প্রকাশ পাইল যে, ফ্যাণ্টাইন অনূঢ়া অবস্থাতেই সন্তানের মাতা হইয়াছেন। কথা ক্রমে কারখানার রমণীবিভাগের অধ্যক্ষের কানে উঠিল। তিনি কর্ম্মকুশলতার অভাব বশতঃ ফ্যাণ্টাইনের উপর একটু বিরক্ত ছিলেন। শেষে এই ছিদ্র পাইয়া তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া দিলেন। তিনি ফ্যাণ্টাইনকে বিদায় দিবার সময় পঞ্চাশটি ফ্র্যাঙ্ক মেয়রের নাম করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন যে মেয়র তাহার কর্ম্মে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বরখাস্ত

করিয়াছেন এবং অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাকে পঞ্চাশ ফ্র্যাঙ্ক দান করিয়াছেন। বস্তুতঃ মেয়র এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। রমণী-বিভাগের সমস্ত বিষয়ের ভার এই অধ্যক্ষের উপর ছিল। ফ্যাণ্টাইন বুঝিল না যে, কি অপরাধে তাহার কর্ম্ম গেল। সে শুধু আপনার অদৃষ্টকে দোষ দিয়া কারখানা ত্যাগ করিল। কয়েক দিন সে গ্রামে চাকরাণীর কাজ খুঁজিয়া বেড়াইল, কিন্তু কারখানা হইতে তাড়িত হইয়াছে শুনিয়া আর কেহই তাহাকে স্থান দিতে চাহিল না। যে বাড়ীতে ফ্যাণ্টাইন ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিল, সেই বাড়ীওয়ালীর নিকট ফ্যাণ্টাইন কিছু ঋণগ্রস্ত হইয়াছিল, কয়েক মাসের ভাড়াও তাহার বাকী পড়িয়াছিল। সে এখন বেকার বসিয়া আছে জানিয়া বাড়ীওয়ালীও তাহার উপর বিষম জুলুম আরম্ভ করিল। কি করিয়া এই দেনা শোধ করিবে, তাহাই ফ্যাণ্টাইনের দারুণ চিন্তা। তাহার উপর আর এক চিন্তা—কসেট।

সন্তানবৎসলা মাতা একবার মনে করিল, এই দুরবস্থার সময় বুঝি কন্যাকে কোলে পাইলে সকল দুঃখ-কষ্ট ঘুচিয়া যায়। পরক্ষণেই ভাবিল —না, আমি কষ্ট পাইতেছি, সোনার পুতুলকে কেন আর সে কষ্টের অংশভাগিনী করিব? আর কসেটকে আনিতে গেলেই বা থেনার্ডিয়ার তাহাকে ছাড়িয়া দিবে কেন? তাহার যে চারি মাসের খোরাকি বাকী পড়িয়াছে। আর তাহাকে আনিবার পথ-খরচই বা কোথায় পাইব?

ফ্যাণ্টাইন শীতের শেষে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিল। আবার শীত আসিল। ফ্যাণ্টাইন্ কাজকর্ম্মের কোনই সুবিধা করিতে পারিল না। পাওনাদারগণ ক্রমে পরুষ ব্যবহার আরম্ভ করিল। থেনার্ডিয়ারের তাগাদায় ফ্যাণ্টাইন্ অস্থির হইয়া উঠিল।

এক দিন ফ্যাণ্টাইন্ থেনার্ডিয়ারের এক পত্রে জানিল যে, কসেট বিনা বস্ত্রে দারুণ শীতে কষ্ট পাইতেছে। কয়েকটি ফ্লানেল সার্ট তাহার নিতান্ত আবশ্যক। না হইলে, ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ হইবে। ইহার জন্য অন্ততঃ দশ ফ্র্যাঙ্ক দরকার। দশটি কানাকড়ি ফ্যাণ্টাইনের ছিল না; দশ ফ্র্যাঙ্ক সে কোথায় পাইবে? সমস্ত দিন ধরিয়া সে পত্রখানি একবার দেখে, আবার ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দেয়—আবার বাহির করে, আবার ভাঁজ করে।

এইরূপে সমস্ত দিন কাটাইয়া সন্ধ্যাবেলা সে বাহির হইল। একটি পরচুলা-ব্যবসায়ীর দোকানের সম্মুখে গিয়া সে তাহার মস্তকের চিরুণী খুলিয়া লইয়া সুন্দর সুচিক্কণ প্রচুর কেশদাম আলুলায়িত করিয়া দিল। কেশ-বিক্রেতা সাশ্চর্য্যে কহিল, "কি সুন্দর চুল!"

ফ্যাণ্টাইন্ বলিল, "কত হইলে তুমি এই কেশগুলি কিনিতে পার?"

সে উত্তর দিল, "দশ ফ্র্যাঙ্ক।"

ফ্যাণ্টাইন্ কহিল, "কাটিয়া লও।"

কেশ-বিক্রয়-লব্ধ অর্থে ফ্যাণ্টাইন্ কসেটের জন্য দুইটি সুন্দর গরম পশমী পোষাক কিনিয়া থেনার্ডিয়ারের নিকট পাঠাইয়া দিল। থেনার্ডিয়ার কিংবা তাহার পত্নী কেহই তাহাতে তুষ্ট হইল না; বরং নগদ টাকা না পাঠাইয়া পোষাক পাঠানতে থেনার্ডিয়ারদম্পতি ফ্যাণ্টাইনের উপর যৎপরোনাস্তি রুষ্ট হইল। ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার ফ্যাণ্টাইনের প্রেরিত পরিচ্ছদে নিজকন্যা ইপোনাইনকে সজ্জিত করিয়া দিল; কসেট শীতে কাঁপিতে লাগিল।

কয়েক দিন পরে ফ্যাণ্টাইন্ থেনার্ডিয়ারের আর একখানি পত্র পাইল। পত্রে লেখা ছিল, "কসেট ভয়ঙ্কর টাইফয়েড জ্বরে পীড়িত হইয়াছে। তাহার জন্য মূল্যবান্, ঔষধ ও পথ্য খরিদ করিতে করিতে আমরা জেরবার হইয়াছি। আর আমরা পারি না। যদি তুমি পত্রপাঠমাত্র চল্লিশ ফ্র্যাঙ্ক না পাঠাও, তাহা হইলে তোমার কন্যার জীবনের আশা নাই।"

হাসিতে হাসিতে, গীত গাহিতে গাহিতে ফ্যাণ্টাইন্ রাস্তায় বাহির হইয়া গেল। ফ্যাণ্টাইনের এই অদ্ভুত ভাবান্তর দেখিয়া তাহারই এক জন বয়স্যা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তোর এত স্ফূর্ত্তি দেখিতেছি কেন?" ফ্যাণ্টাইন হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল, "মানুষের নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া! আমি খাইতে পাই না—আমার কাছে একটি লোক চল্লিশ ফ্র্যাঙ্ক চাহিয়া পাঠাইয়াছে।" বয়স্যা বুঝিল—ফ্যাণ্টাইন্ প্রকৃতিস্থা নহে।

ফ্যাণ্টাইন্ বাজারের পার্শ্বস্থ রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে দেখিল যে, এক জন লোক মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া সমবেত জনমণ্ডলীর সমক্ষে অনর্গল বক্তৃতা করিতেছে এবং বিনামূল্যে নানা রোগ-প্রতীকারের

উপায় বলিয়া দিতেছে এবং যৎকিঞ্চিৎ মূল্য লইয়া ঔষধাদিও বিতরণ করিতেছে। যদিও এই বৈদ্যরাজ সর্ব্বপ্রকার রোগেরই ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার প্রধান ব্যবসায় দন্ত-উৎপাটন ও কৃত্রিম দন্ত বাঁধান। ফ্যাণ্টাইনও সেই অলস ও কৌতুকপ্রিয় জনতার মধ্যে মিশিয়া গেল এবং তাহাদের সহিত হাসিতে ও কৌতুক করিতে আরম্ভ করিল। ফ্যাণ্টাইনের মুক্তার ন্যায় সুন্দর দন্তপাঁতি দেখিয়া দন্তব্যবসায়ীর অত্যন্ত লোভ হইল। বিদ্রূপচ্ছলে সে ফ্যাণ্টাইনকে বলিল, "হাস্যময়ি সুন্দরি! তোমার দন্তগুলি বড়ই সুন্দর! তোমার সম্মুখের দুইটি দন্ত বিক্রয় করিবে? আমি দুইটি দন্তের দাম দুই নেপোলিয়ন দিতে পারি।" দন্তব্যবসায়ীর প্রস্তাবে ফ্যাণ্টাইন শিহরিয়া উঠিল, "কি ভয়ানক কথা!" অদূরে দন্তবিহীন একটি বৃদ্ধা এই প্রস্তাব শুনিল। সে কহিল, "এই স্ত্রীলোকটির কি সৌভাগ্য! দুই দন্তের মূল্য দুই নেপোলিয়ন!"

ফ্যাণ্টাইন দুই হাতে নিজের কান বন্ধ করিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। দন্তব্যবসায়ী চীৎকার করিয়া বলিল, "ভদ্রে! আবার ভাবিয়া দেখিও। দুই নেপোলিয়ন! তোমার অনেক কাজে আসিতে পারে। যদি রাজি হও, তবে আমার সঙ্গে আজ রাত্রে 'টিলাক-ডি-আরজেণ্ট' হোটেলে আসিয়া দেখা করিবে।"

ফ্যাণ্টাইন একদৌড়ে বাড়ী গেল। পার্শ্বের ঘরের ভাড়াটিয়া মারগারেটকে ডাকিয়া, তাহাকে সেই "অপ্রেয়ে" দন্ত-চিকিৎসকের অসঙ্গত প্রস্তাবের বিষয় শুনাইল ও তাহার শিরে অজস্র গালি বর্ষণ করিল।

মারগারেটও অত্যন্ত দরিদ্র। সেও একসঙ্গে দুই নেপোলিয়ন কখনও চক্ষে দেখে নাই। তাহার নিকট প্রস্তাবটি তত অসঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। মুখে মুখে হিসাব করিয়া মারগারেট বলিল, "দুই নেপোলিয়ন—অর্থাৎ চল্লিশ ফ্র্যাঙ্ক।"

ফ্যাণ্টাইন্ ভাবিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া ফ্যাণ্টাইন জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই! বলিতে পার, টাইফয়েড জ্বর কাহাকে বলে? এই জ্বরে কি অনেক দামী ঔষধ লাগে?" মারগোরেট উত্তর করিল, "হাঁ।" ফ্যাণ্টাইন জিজ্ঞাসা করিল, "এই জ্বর কি ছোট ছেলেপিলের বেশী হয়?" মারগারেট উত্তর দিল, "হাঁ।" ফ্যাণ্টাইন জিজ্ঞাসা করিল, "এই জ্বরে কি অনেক ছেলেপিলে মরে?" মারগারেট উত্তর করিল, "এক শয়ের মধ্যে দু'চার জন এই জ্বরে রক্ষা পায়।" মারগারেট নিজ কক্ষে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। ফ্যাণ্টাইন বালিসে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল; সহসা সে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিল, ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহির হইয়া রু-দে-পারি নামক পথ ধরিয়া টিলাক্-ডি-আরজেণ্ট হোটেলের অভিমুখে চলিল।

পরদিন অতি প্রত্যূষে মারগারেট ফ্যাণ্টাইনের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল—ফ্যাণ্টাইন্ শয্যার উপরে একখানি মলিন রুমালে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া আছে। রুমালখানি রক্তাক্ত। বালিসেও শোণিতের দাগ। দুই কস বহিয়া শোণিতাক্ত লালা পড়িতেছে। মারগারেট জিজ্ঞাসা করিল, "ফ্যাণ্টাইন্! তুমি ওরূপ করিতেছ কেন? তোমার কি হইয়াছে?" ফ্যাণ্টাইন্ মুখের রুমাল সরাইয়া লইল। মারগারেট দেখিল, ফ্যাণ্টাইনের সম্মুখের দুইটি দন্ত নাই। বিষাদের হাসি হাসিয়া ফ্যাণ্টাইন অঙ্গুলিনির্দ্দেশে টেবিলের উপর কি দেখাইল। মারগারেট দেখিল,—টেবিলের উপর দুইটি সুবর্ণমুদ্রা (নেপোলিয়ন) চক্ চক্ করিতেছে। মারগারেটের বুঝিতে বাকী রহিল না।

ফ্যাণ্টাইন্ তাহার দন্ত-বিক্রয়-লব্ধ চল্লিশ ফ্র্যাঙ্ক সেই দিনই থেনার্ডিয়ারের নিকট পাঠাইয়া দিল। বাস্তবিক কসেটের কোন পীড়া হয় নাই। পীড়ার কথা কেবল ফ্যাণ্টাইনের নিকট হইতে কিছু টাকা ঠকাইয়া লইবার মৎলবে থেনার্ডিয়ার কর্ত্তৃক রচিত একটি বিরাট মিথ্যা।

পরমা সুন্দরী ফ্যাণ্টাইন্ এখন কেশদন্তবিহীনা—ভীষণ-দর্শনা। যে ফ্যাণ্টাইন্‌কে দেখিয়া এক দিন রাস্তার লোক চাহিয়া রহিত, যাহার সুন্দর সুপ্রচুর কেশদাম ও মুক্তা-বিনিন্দিত দন্ত-পাঁতি সুন্দরীগণের ঈর্ষ্যার বিষয় ছিল, আজ তাহার কুৎসিত মূর্ত্তি দর্শকদিগের ঘৃণিত। মুকুরে আপনার সুন্দর মুখখানি দেখিয়া এক দিন ফ্যাণ্টাইন্ আনন্দে আত্মহারা হইত, আজ সেই একই দর্পণে প্রতিফলিত আপনার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া ফ্যাণ্টাইন্ নিজেই ভয় পাইতে লাগিল। সে দর্পণখানি জানালা দিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিল। দর্পণখানি রাস্তায় পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

ফ্যাণ্টাইন্ পথে দাঁড়াইল।

ফ্যাণ্টাইনের যাহা কিছু ছিল, পাওনাদারগণ সমস্ত বিক্রয় করিয়া লইল। থেনার্ডিয়ার পত্রের পর পত্র লিখিতে লাগিল; ফ্যাণ্টাইন্ টিকিটের পয়সার অভাবে তাহার উত্তর পর্য্যন্ত দিতে পারিল না। থেনার্ডিয়ার ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল; শেষে এক পত্র লিখিল। তাহার মর্ম্ম এই:—"তুমি কয় মাস হইতে এক কপর্দ্দকও পাঠাও নাই। আমরা এত দিন বিনা খরচে তোমার মেয়েকে রাখিলাম। যদি পত্রপাঠ এক শত ফ্র্যাঙ্ক না পাঠাও, তাহা হইলে আমরা কসেটকে তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইব। তাহাতে সে মরুক আর বাঁচুক, আমাদের দোষ নাই।"

এক শত ফ্র্যাঙ্ক! ফ্যাণ্টাইন্ চমকিয়া উঠিল। এমন কোন্ ব্যবসায় আমি করিতে পারি, যে ব্যবসায়ে এক দিনে এক শত স্থ আমি উপার্জ্জন করিতে পারি? ফ্যাণ্টাইনের বিষম চিন্তা হইল। তাহার ললাটের শিরা সজোরে দপ্ দপ্ করিতে লাগিল। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। একটি করুণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ফ্যাণ্টাইন্ বলিল, "ভাল, যদি ঈশ্বরের তাহাই অভিপ্রায় হয়, আমি আমার যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাই বিক্রয় করিব। পুণ্যের পথ যখন আমায় পক্ষে রুদ্ধ হইল, তখন নরকের পথই ধরিব।"

ফ্যাণ্টাইন্ বারবনিতার ব্যবসায় অবলম্বন করিল।

শীতকাল। পথ তুষারে সমাচ্ছন্ন। ফ্যাণ্টাইন্ "খরিদ্দারের" প্রতীক্ষায় বারান্দার নীচে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরিধানে একটি পাতলা গলা-ঢিলে রেশমী বলের পোষাক। চুলের মধ্যে ফুল গোঁজা।

সুন্দর পরিচ্ছদধারী একটি লোক নিকটস্থ হোটেল হইতে বাহির হইল। তাহার গায়ে একটি পরিষ্কার গরমের ওভারকোট; মস্তকে ফেল্টের টুপী; মুখে পাইপ। ফ্যাণ্টাইন্‌কে দেখিয়া লোকটি বিদ্রূপ-ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "মেয়েমানুষ! তোমার চেহারা খানি ত বেড়ে সুন্দর; কেবল দুঃখু, সাম্‌নের দুটি দাঁত নেই।" ফ্যাণ্টাইন্ সে বিদ্রূপ গায়ে মাখিল না, সে যেন লোকটির কথা শুনিয়াও শুনিল না, বিষণ্ণভাবে পাইচারী করিতে লাগিল। লোকটি আবার নানাপ্রকার বিদ্রূপ করিতে লাগিল! অভাগিনী ফ্যাণ্টাইন্ নীরবে তাহা সহ্য করিয়া গেল। লোকটি যখন দেখিল যে, কথায় কিছু হইল না, তখন তাহাকে উত্তেজিত করিবার জন্য এক উপায় অবলম্বন করিল। ফ্যাণ্টাইন্ পাইচারী করিতে করিতে যেমন লোকটির দিকে পশ্চাৎ ফিরাইল, লোকটি অমনি রাস্তা হইতে খানিকটা বরফ কুড়াইয়া লইয়া তাহা ফ্যাণ্টাইনের স্কন্ধের উপর ছাড়িয়া দিল। তুষার-চূর্ণগুলি সমস্ত তাহার পৃষ্ঠ এবং বক্ষ বহিয়া কোমরের নিকট গিয়া জমা হইল এবং শরীরের উত্তাপে ধীরে ধীরে গলিয়া জল হইতে লাগিল। ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত হইল। ফ্যাণ্টাইন্ এক লাফে বাঘিনীর মত যাইয়া লোকটির কলার চাপিয়া ধরিল এবং আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল এবং তাহার মস্তক হইতে টুপীটি ছিনাইয়া লইয়া, কর্দ্দমের মধ্যে ফেলিয়া সেটিকে দুই পদে দলিত করিয়া সেই ব্যভিচারীর দুষ্কার্য্যের কতকটা প্রতিশোধ লইল।

এই বিসদৃশ অভিনয় দেখিবার জন্য রাস্তায় অনেক লোক জমিয়া গেল। সেই জনতা ভেদ করিয়া পুলিসের পরিচ্ছদে সজ্জিত এক ব্যক্তি আসিয়া ফ্যাণ্টাইন্‌কে গ্রেপ্তার করিল এবং উদ্ধতভাবে কহিল, "আমার সঙ্গে চল।" পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইবামাত্রই ফ্যাণ্টাইন্ যেন মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্যা-ভুজঙ্গীর ন্যায় হইয়া পড়িল। পুলিস ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্টকে সে বিলক্ষণ চিনিত। বিনা বাক্যব্যয়ে সে তাহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী হইল। কৌতুক-প্রিয় জনতা তাহাদের পাছে পাছে কোতোয়ালীর দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গেল। ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্ট ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসামী ফ্যাণ্টাইন কোতোয়ালীর আফিস কক্ষে প্রবেশ করিল।

দশম পরিচ্ছেদ

—•—

ফ্যাণ্টাইনের মুক্তি।

গম্ভীরভাবে জ্যাভার্ট কহিল, "রমণি! তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, তাহার শাস্তি ছয় মাস সশ্রম কারাবাস।"

ফ্যাণ্টাইন এই নিদারুণ দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল, ইন্স্পেক্টর জ্যাভার্টের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কহিল, "ছয় মাস! আমি ছয় মাস কারাগারে থাকিলে আমার কসেটের কি দশা হইবে?" হতভাগিনী মাতা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। জ্যাভার্টের আজ্ঞাক্রমে দুই জন পুলিস প্রহরী আসিয়া কারাগারে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ফ্যাণ্টাইন্ কাতরভাবে তাহাদের পা জড়াইয়া ধরিল এবং জ্যাভার্টকে কহিল, "মসিও জ্যাভার্ট! হতভাগিনীর প্রতি দয়া করুন। আমি আপনাকে সত্য বলিতেছি, আমার কোনই অপরাধ নাই। আপনি আগাগোড়া দেখেন নাই; তাই আমাকে অপরাধী মনে করিতেছেন। সেই ভদ্রলোকটিকে আমি কস্মিন্কালেও দেখি নাই। তিনি আমার সহিত নিতান্ত অভদ্রের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। আমি তাহাও নীরবে সহ্য করিয়াছিলাম। শেষে রাস্তা হইতে কতকগুলি বরফ কুড়াইয়া লইয়া তিনি আমার গায়ে দিলেন। সেই জন্যই আমার বড় রাগ হইয়াছিল। জানেনই ত মসিও জ্যাভার্ট! আমাদের মত দরিদ্র বারবনিতার একটি ভিন্ন ভাল পোষাক নাই। সেইটি পরিয়া আমরা রাত্রে বাহির হইয়া থাকি। আমার সেই পোষাকটি একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া কি আমার চটিবার যথেষ্ট কারণ নয়? যাহা হউক, যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে। আমায় এবার ক্ষমা করুন। আমি জেলে গেলে, আমার মেয়েটি নিশ্চয় মারা পড়িবে। মসিও জ্যাভার্ট! আমাকে দয়া করিয়া এইবার ছাড়িয়া দিন। আমি জীবনেও এমন কাজ আর করিব না।"

জ্যাভার্ট রুক্ষভাবে কহিল, "তোমার যাহা বক্তব্য ছিল, তাহা ত শেষ হইয়াছে? এখন যাও, তোমাকে ছয় মাসের জন্য জেলে যাইতে হইবে।" জ্যাভার্ট প্রহরীদিগকে ইঙ্গিত করিলেন। প্রহরীরা আসিয়া ফ্যাণ্টাইনের হাত ধরিয়া টানিয়া লইবার উদ্যোগ করিল।

ইহারই কিছু পূর্ব্বে অন্যের অলক্ষিতে একটি ভদ্রলোক সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া, কপাটে ঠেসান দিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা দেখিতেছিলেন। যে সময়ে প্রহরিগণ ফ্যাণ্টাইনকে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, সেই সময়ে তিনি একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর।" জ্যাভার্ট চক্ষু উঠাইয়া দেখিলেন এবং দেখিবামাত্র চিনিলেন—তিনি মসিও ম্যাডিলিন। মেয়রকে দেখিয়াই জ্যাভার্ট উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "মসিও লি মেয়র! আমার অশিষ্টতা ক্ষমা করিবেন। আপনি কখন্ এই কক্ষে আসিয়াছেন, তাহা আমি দেখি নাই।"

"মেয়র" এই শব্দটি উচ্চারিত হইবামাত্র ফ্যাণ্টাইন একলম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রহরিগণ বাধা দিবার পূর্ব্বেই ছায়াময়ী প্রেতাত্মার ন্যায় সে মসিও ম্যাডিলিনের সম্মুখীন হইয়া একটি বিকট অট্টহাস্য করিয়া কহিল, "ওঃ! তুমিই মেয়র?" আবার অট্টহাস্য করিয়া মসিও ম্যাডিলিনের মুখের উপরে একরাশি নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল। ম্যাডিলিন ধীরভাবে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিলেন, আস্তে আস্তে মুখ মুছিয়া ফেলিয়া জ্যাভার্টকে বলিলেন, "ইন্স্পেক্টার জ্যাভার্ট! এই স্ত্রীলোকটিকে এখনই ছাড়িয়া দিন।"

ইন্স্পেক্টার জ্যাভার্ট হতবুদ্ধির ন্যায় দণ্ডায়মান; যে মেয়রকে সমাজে সকলে দেবতার ন্যায় পূজা করে, তাঁহার প্রতি এইরূপ ব্যবহার। জ্যাভার্ট কখনও এরূপ ঘটনা কল্পনাও করিতে পারিতেন না; আজ সেই ব্যাপার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিলেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, মেয়র আবার সেই অপরাধীকে বিনা শাস্তিতে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিতেছেন। জ্যাভার্ট নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ হইয়া রহিল।

ফ্যাণ্টাইন্ও সংজ্ঞাশূন্য। সে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "আমাকে ছাড়িয়া দিবে? তাহা হইলে আমাকে ছয় মাসের জন্য কারাগারে যাইতে হইবে না? কে আমাকে মুক্তি দিল?

নিশ্চয় ঐ রাক্ষস অবতার মেয়র নহে। মসিও জ্যাভার্ট! আপনি বড় দয়ালু—আপনিই আমাকে ছাড়িয়া দিলেন। মসিও জ্যাভার্ট! আপনি এক জন প্রকৃত ভদ্রলোক; আপনি ঠিক বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আজিকার ঘটনায় আমার কোনই দোষ ছিল না। আপনি পুলিসের লোক। আপনি কি করিবেন? একটা হাঙ্গামা হইলে তো আপনি অপরাধীকে ধরিতে বাধ্য। তাই আমায় ধরিয়াছিলেন। কিন্তু দেখিলেন যে, আমি নির্দ্দোষ—তাই আমায় ছাড়িয়া দিতেছেন।"

ফ্যাণ্টাইন উঠিয়া দাঁড়াইল, বস্ত্রাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, সে প্রস্থানের জন্য দ্বারের অভিমুখে গেল। দ্বার অর্গলবদ্ধ ছিল। ফ্যাণ্টাইন যেমন খিল খুলিতে যাইবে, অমনি জ্যাভার্ট প্রহরিগণকে কহিল, "দেখিতেছ না। আসামী যে পলায়! উহাকে কে ছাড়িয়া দিয়াছে?" প্রহরিগণ মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল, মসিও ম্যাডিলিন কহিলেন, "আমি।" জ্যাভার্টের কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র ফ্যাণ্টাইন অর্গল ছাড়িয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং একবার জ্যাভার্টের মুখের দিকে, একবার মসিও ম্যাডিলিনের মুখের দিকে দীননেত্রে তাকাইতে লাগিল। ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্ট কহিল, "মসিও লি মেয়র, আসামীকে ছাড়া যাইতে পারে না। সে একটি ভদ্রলোককে অপমান করিয়াছে।"

অতি সংযত স্বরে এবং স্থিরভাবে মসিও ম্যাডিলিন উত্তর করিলেন, "ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্ট! আমার কথা শুনুন:—আপনি বুদ্ধিমান্ লোক; আপনাকে বুঝাইতে আমার বেশী কষ্ট হইবে না। আমি পথের অপর দিকের ফুটপাথে দাঁড়াইয়া এই ঘটনার আদ্যোপান্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং সমবেত লোকদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া দেখিয়াছি যে, আপনি প্রকৃত দোষীকে ছাড়িয়া দিয়া এই নিরপরাধিনী স্ত্রীলোককে অনর্থক নিগৃহীত করিতেছেন।"

জ্যাভার্ট কহিল, "এইমাত্র সে আপনাকে অপমান করিয়াছে।"

মসিও ম্যাডিলিন কহিলেন, "আমার অপমানের কথা আমি বুঝিব।"

জ্যাভার্ট কহিল, "আপনাকে অপমান—আদালতের অবজ্ঞা।"

মসিও ম্যাডিলিন কহিলেন, "ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্ট! মনুষ্যের বিবেক সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আদালত। আমি স্বচক্ষে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং যে আদেশ দিতেছি, তাহা বেশ বুঝিয়া সুঝিয়াই দিতেছি।"

জ্যাভার্ট কহিল, "আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

ম্যাডিলিন কহিলেন, "বুঝিতে না পারেন, আদেশ পালন করুন।"

জ্যাভার্ট কহিল, "আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিব; কর্ত্তব্য বলিতেছে যে, এই স্ত্রীলোকের ছয় মাসের কারাদণ্ড হওয়া উচিত।"

পূর্ব্ববৎ অতি ধীরভাবে ম্যাডিলিন কহিলেন, "শুনুন, ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্ট! এই স্ত্রীলোক এক দিনের জন্যও কারাগারে যাইবে না।"

মেয়রের এই অবিচলিত ভাব দেখিয়া জ্যাভার্ট স্থিরনয়নে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "মসিও লি মেয়র! আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, জীবনেও যাহা আমাকে করিতে হয় নাই, আজ তাহাই আমাকে করিতে হইতেছে। আপনার সহিত এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে হইতেছে। কিন্তু আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে, আমি ন্যায়ত ও ধর্ম্মত ঠিক কার্য্যই করিতেছি। এই স্ত্রীলোকটি প্রকাশ্য রাস্তার উপর এক জন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে অপমানিত করিয়াছে, এই অপরাধের বিচারের ক্ষমতা আমারই আছে।"

মসিও ম্যাডিলিন কহিলেন, "ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্ট! আপনি ভুল বুঝিয়াছেন। এই ঘটনা ষ্ট্রীট-পুলিসের বিচার্য্য নহে। ইহা বরো পুলিসের বিচার্য্য। ফৌজদারী কার্য্যবিধির নয়, এগার, পোনর এবং ছেষট্টি ধারা অনুসারে আমিই ইহার বিচার করিতেছি এবং হুকুম দিতেছি যে, এই স্ত্রীলোককে অবিলম্বে মুক্ত করা হউক।"

জ্যাভার্ট শেষ যুক্তি দেখাইতে কৃতসংকল্প হইয়া কহিল, "কিন্তু মসিও লি মেয়র—"

মেয়র বাধা দিয়া কহিলেন, "আমি আপনাকে ১৭৯৯ সালের ১৩ই ডিসেম্বর আইনের একাশী ধারা দেখিতে অনুরোধ করি। বিনা দোষে কোন লোককে আবদ্ধ করার ফল কি, তাহা উক্ত ধারায় দেখিতে পাইবেন।"

জ্যাভার্ট কহিল, "অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার—"

মেয়র কহিলেন, "আর একটি কথাও নহে।"

জ্যাভার্ট কহিল, "তবু—"

মসিও ম্যাডিলিন বলিলেন, "আপনি এই কক্ষ পরিত্যাগ করুন।"

প্রকাণ্ড একটি সেলাম ঠুকিয়া অবনতমস্তকে জ্যাভার্ট সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

জ্যাভার্ট চলিয়া গেলে মসিও ম্যাডিলিন ফ্যাণ্টাইনকে কহিলেন, "ভদ্রে! আমি তোমার সমস্ত ইতিহাস জানিয়াছি। তোমার প্রত্যেকটি কথা সত্য বলিয়াই আমার বিশ্বাস। তুমি যে আমার কারখানা ছাড়িয়া আসিয়াছ, তাহার বিন্দুবিসর্গও আমি জানিতাম না। যখন কর্ম্মচ্যুত হইলে, তখন কেন তুমি আমার কাছে দরখাস্ত করিলে না? যাহা হউক, এখন আমি সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছি। আমি তোমার সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়া দিব। তোমার কন্যাকে তোমার নিকট আনাইয়া দিব। তুমি পারিসে কিংবা অন্যত্র যেখানে তোমার ইচ্ছা থাকিতে পার। তোমার ও তোমার কন্যার সমস্ত ব্যয়ভার আমিই বহন করিব। মনুষ্যের চক্ষে তুমি পতিত ও ঘৃণিত হইতে পার—কিন্তু রমণি! ঈশ্বরের চক্ষে তুমি ধর্ম্মের সুবর্ণ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা।"

ফ্যাণ্টাইন বুঝিতে পারিতেছিল না যে, সে জাগ্রত কিংবা নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছে। সে ভাবিতেছিল, সত্য সত্যই কি বিধাতা আমার ভাগ্যে এত সুখ লিখিয়াছেন? সত্যই কি আমি এই পাপের পথ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যের পথে যাইতে সমর্থ হইব? সত্যই কি আমার বুকের ধন কসেটকে আবার আমি বুকে ফিরাইয়া পাইব? এই সুখময় ভবিষ্যৎ-চিন্তাও ফ্যাণ্টাইনের দুর্ব্বল মস্তিষ্ক যেন সহ্য করিতে পারিল না। কৃতজ্ঞতার আবেগে ফ্যাণ্টাইন দৌড়িয়া গিয়া মসিও ম্যাডিলিনের পা জড়াইয়া ধরিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার পদচুম্বন করিতে লাগিল। মসিও তাহাকে ধরিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই ফ্যাণ্টাইন্ তাঁহার চরণে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

মসিও ম্যাডিলিন একখানি শিবিকা আনাইয়া মূর্চ্ছিতা ফ্যাণ্টাইনকে তাঁহার কারখানায় লইয়া গেলেন এবং নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এখানে আসিয়াই ফ্যাণ্টাইন কঠিন জ্বরে পড়িল। মসিও ম্যাডিলিন প্রতিদিনই তাহাকে দেখিতে আসিতেন এবং ঘণ্টাখানেক করিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন। ফ্যাণ্টাইনও মসিও ম্যাডিলিনকে তাহার শয্যাপার্শ্বে দেখিলে অত্যন্ত প্রীত হইত এবং জ্বরের সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া যাইত।

একাদশ পরিচ্ছেদ

—:•:—

জ্যাভার্টের অনুতাপ।

যত সন্তর্পণে, যত যত্নসহকারে, যত উজ্জ্বল বর্ণেই না কেন আমরা জীবনের রহস্যময় চিত্র অঙ্কিত করিতে যাই, অদৃষ্টের কালিমাময় রেখা যেন সে ঔজ্জ্বল্যের মধ্য দিয়া ক্রমাগত ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করে।

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার কয়েকদিন পরে এক দিন প্রাতঃকালে মসিও ম্যাডিলিন তাঁহার পাঠাগারে বসিয়া, মেয়রের কার্য্য-সম্বন্ধীয় কতকগুলি কাগজপত্র দেখিতেছেন। কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য তাঁহার হাতে রহিয়াছে। সেইগুলি না সারিয়া তিনি কসেটকে আনিবার জন্য মণ্টফারমিলে যাইতে পারিবেন না। আর তিনি স্বয়ং না গেলেও কসেটকে থেনার্ডিয়ারের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আনা সহজ নহে। সেই জন্য ঐ কার্য্যগুলি তিনি শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া লইতেছেন। এই সময় একটি ভৃত্য কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্টের কার্ড দিল। জ্যাভার্টের নাম দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য মসিও ম্যাডিলিনের মুখে একটু বিরক্তির ছায়া লক্ষিত হইল। পরক্ষণেই তিনি ভৃত্যকে বলিলেন, "তাঁহাকে ভিতরে আসিতে বল।"

জ্যাভার্ট কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই মেয়রকে যথোচিত সম্ভ্রমেরসহিত অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। আজ জ্যাভার্টের মুখের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত, তাহাতে ঘৃণা, ক্রোধ কিংবা সন্দেহের চিহ্নমাত্র নাই। যে মুখ প্রস্তর-ফলকের ন্যায় ভাববিহীন ও দুর্ব্বোধ্য, আজ তাহা বিষাদের ঘনান্ধকার-সমাচ্ছন্ন। মেয়র ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্টকে কহিলেন, "এস জ্যাভার্ট! সংবাদ কি?" জ্যাভার্ট এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিলেন; যেন একটু ভাবিয়া লইলেন,

কিরূপ ভাবে কথা কহিতে হইবে; পরে বলিলেন, "মহাশয়! এক জন অপরাধীর বিচার আমি প্রার্থনা করি। অপরাধ গুরু—ধর্ম্মাধিকরণের সমুচ্চ আসনে উপবিষ্ট বিচারপতির প্রতি. তাঁহার অধীনস্থ এক জন নগণ্য কর্ম্মচারীর অমার্জ্জনীয় অবজ্ঞা এবং অযৌক্তিক সন্দেহ।" ম্যাডিলিন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি জ্যাভার্টকে বলিলেন, "জ্যাভার্ট! কে সেই অপরাধী? স্পষ্ট করিয়া বল।" জ্যাভার্ট উত্তর করিল, "আমি।" ম্যাডিলিন কহিলেন, "কে সেই বিচারপতি, যাহাকে তুমি অবজ্ঞা করিয়াছ?" জ্যাভার্ট কহিল, "আপনি স্বয়ং। মসিও লি মেয়র, আমি ভয়ঙ্কর অপরাধ করিয়াছি। আমি ইন্‌স্পেক্টার পদের অযোগ্য। আপনি আমাকে বরখাস্ত করুন। তাহা হইলে আমার অপরাধের কতক প্রায়শ্চিত্ত হইবে।" মেয়র কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না যে, জ্যাভার্টের অপরাধ কি এবং কিরূপে সে বিচারালয়ের অবমাননা করিয়াছে। জ্যাভার্ট নীরব ও অধোমুখ।

কিছুক্ষণ পরে জ্যাভার্ট আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "মসিও লি মেয়র! আপনি বলিতে পারেন যে, "তুমি ইচ্ছা করিলে ত তোমার পদত্যাগপত্র পাঠাইতে পার। তবে তুমি কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত হইতে চাহিতেছ কেন?" মসিও! তাহার কারণ এই যে, "সম্মানের সহিত পদত্যাগ করিয়া গেলে আমার অপরাধের শাস্তি হইল কৈ?" মসিও ম্যাডিলিন কহিলেন, "জ্যাভার্ট! কেন তুমি বাতুলের ন্যায় প্রলাপ বকিতেছ? তুমি আমার সম্পর্কে কোনরূপ অনুচিত ব্যবহার কর নাই।" জ্যাভার্ট কহিল, "মহাশয়! আমি এক জন কারামুক্ত কয়েদীর সহিত আপনার দৈহিক সৌসাদৃশ্য দেখিয়া অন্যায়রূপে আপনাকে সন্দেহ ও ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছিলাম। আপনার অসাধারণ দৈহিক সামর্থ্য বৃদ্ধ ফকলেভেণ্ট ঘটিত সেই ব্যাপার, বন্দুক চালনে আপনার অব্যর্থ লক্ষ্য, আপনার চলন-বলন দেখিয়া আমি নিশ্চয় ধারণা করিয়াছিলাম যে, আপনিই ছদ্মবেশে সেই ভীষণ দস্যু জন্ ভলজীন্। শুধু তাহাই নহে, মসিও! আমার ধৃষ্টতা কতদূর অমার্জ্জনীয়, বুঝুন। আমি উক্ত মর্ম্মে একটি মন্তব্য আমাদের উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট দিতে পশ্চাৎপদ হই নাই।"

মসিও ম্যাডিলিন ঈষৎ অন্যমনস্কভাবে কহিলেন, "তোমার উপরিতন কর্ম্মচারী তাহার কি উত্তর দিয়াছেন?" জ্যাভার্ট কহিল,—"তিনি লিখিয়াছেন, আমি পাগল। কারণ, আসল ভলজীন ধরা পড়িয়াছে। সে চ্যাম্প ম্যাথু নাম লইয়া পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতেছিল। অল্পদিন হইল, একটি আতা চুরির সম্পর্কে ধরা পড়ে। অনুসন্ধানে তাহার প্রকৃত নাম বাহির হইয়া পড়িয়াছে, আরাসের সেসনে তাহার বিচার চলিতেছে। ব্রেভেট নামক ভলজীনের সমসাময়িক এক জন কারামুক্ত কয়েদী তাহাকে সনাক্ত করিয়াছে। পুলিস-কমিশনার আমাকেও ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমিও গিয়া ভলজীন্‌কে ঠিক চিনিলাম। আমার দারুণ ভ্রম সংশোধিত হইল। আরও বুঝিলাম যে, আমি পুলিসের কার্য্যের নিতান্ত অনুপযুক্ত। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, আপনার নিকট সমস্ত বিষয় খুলিয়া বলিব, বলিয়া জন্মের মত পুলিসের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিব। মসিও আমায় ক্ষমা করুন; আমায় কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত করুন; আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক।" মসিও ম্যাডিলিন অন্যমনস্কভাবে কহিলেন, "জ্যাভার্ট! এ সকল বিষয় লইয়া আন্দোলন অনর্থক। যাহা হউক বোধ হয়, তাহা হইলে তোমাকে এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইবে।" জ্যাভার্ট কহিল, "হাঁ—আমি সপিনা পাইয়াছি। কালই আমাকে উপস্থিত হইতে হইবে।" ম্যাডিলিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিচার কি কালই শেষ হইবে?" জ্যাভার্ট কহিল, "হাঁ, তবে আমি মোকদ্দমার শেষ পর্য্যন্ত সেখানে থাকিব না। আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়া গেলেই আমি ফিরিয়া আসিব।" এই কথা শুনিবামাত্র মসিও ম্যাডিলিন্ যেন একটু বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তিনি জ্যাভার্টকে কহিলেন, "শুন জ্যাভার্ট! তুমি এমন কোন গুরুতর অপরাধ কর নাই, যাহার জন্য এতদূর অনুতপ্ত হইয়েছ। চাকরী পরিত্যাগের সংকল্প তুমি ছাড়িয়া দাও এবং নিশ্চিন্তমনে যাইয়া আপন কর্ত্তব্য করিয়া যাও। তুমি কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই আমার ধারণা ছিল। এক্ষণে সেই ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল। তুমি এক্ষণে যাইতে পার। সময়ান্তরে সাক্ষাৎ হইবে।"

এই কথা বলিয়া মেয়র জ্যাভার্টকে বিদায়

অভিবাদন জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন; জ্যাভার্ট সসম্ভ্রমে একটু পিছাইয়া গেল। সে মেয়রের হস্ত স্পর্শ করিল না এবং অতি বিনীতভাবে কহিল,— "মসিও লি মেয়র! আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনার হস্ত আমি স্পর্শ করিব, সে মুখ আমার কোথায়? আপনি মেয়র—আমি হীন গোয়েন্দা-মাত্র।" এই কথা বলিয়া জ্যাভার্ট সসম্ভ্রমে দূর হইতে মেয়রকে অভিবাদন করিয়া নিঃশব্দে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

মসিও ম্যাডিলিন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জ্যাভার্ট দৃষ্টির অন্তরালে গেল, ততক্ষণ দেখিতে লাগিলেন। পরে চিন্তাকুলিতভাবে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আসনে উপবেশন করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মসিও ম্যাডিলিনই জন্ ভলজীন্।

যে দিন প্রাতে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনা সংঘটিত হইল, সেই দিন সন্ধ্যাকালে যথানিয়মে মসিও ম্যাডিলিন্ ফ্যাণ্টাইন্‌কে দেখিতে গেলেন। তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিলেন। ফ্যাণ্টাইনের গায়ে তখনও খুব জ্বর। কিন্তু যতক্ষণ মসিও ম্যাডিলিন ফ্যাণ্টাইনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, ততক্ষণ তাহার কোন অসুখ আছে বলিয়া বোধ হইতেছিল না। তিনি উঠিতে যাইবেন, এমন সময়ে ফ্যাণ্টাইন জিজ্ঞাসা করিল, "মসিও লি মেয়র! আমার কসেটকে কবে আনিয়া দিবেন? ঈষৎ হাসিয়া মসিও উত্তর করিলেন, "খুব শীঘ্র।" সেই কথা শুনিয়া ফ্যাণ্টাইন্ যেন একটু আশ্বস্তা হইল। সে পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল।

মসিও ম্যাডিলিন্ সেখান হইতে ফিরিয়া গিয়া আবার তাঁহার পাঠগৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই কক্ষে ভিত্তি-গাত্রে একখানি মানচিত্র বিলম্বিত ছিল। তিনি মনোযোগের সহিত তাহাই দেখিতে লাগিলেন। এই মানচিত্রখানিতে পারিস হইতে ভিন্ন ভিন্ন নগর ও জনপদের পথ ও দূরত্ব লিখিত আছে। ম্যাডিলিন আপনার পকেট হইতে নোটবুক ও একটি পেন্সিল বাহির করিয়া কি লিখিলেন, আবার নোটবুকখানি পকেটে রাখিয়া দিলেন।

মসিও ম্যাডিলিন আবার কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একটি জনশূন্য পল্লীপথ ধরিয়া গ্রামের প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তথায় একটি আস্তাবলে প্রবেশ করিয়া আস্তাবলের অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাষ্টার স্কফেয়ার! তোমার ভাল ঘোড়া আছে?" বিনীতভাবে সেলাম করিয়া আস্তাবলস্বামী কহিল, "মসিও লি মেয়র! আমার সব ঘোড়াই ভাল। আপনি কি প্রকার ভাল জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমি বুঝিতে পারিলাম না।" মসিও কহিলেন, "ভাল মানে, যে ঘোড়া ডাক না বদলাইয়া বারো ঘণ্টায় বিশ লীগ রাস্তা যাইতে পারে এবং কেবল-মাত্র রাত্রিটুকু বিশ্রাম করিয়া আবার পরদিন প্রাতে ফিরিতে সমর্থ হয়।" মাষ্টার স্কফেয়ার মাথা চুলকা-ইতে চুলকাইতে বলিল, "মসিও লি মেয়র! আপনি যেমনটি চাহিতেছেন, ঠিক তেমনি ঘোড়াই আমার আছে। কিন্তু সে ঘোড়া জিন-সোয়ারিতে চলিবে না, টম্‌টমে চলিবে। আপনি কি টম্‌টম্ হাঁকাইয়া যাইতে পারিবেন?" মসিও উত্তর দিলেন, "পারিব।"

স্কফেয়ার। আপনি একলা যাইবেন ও কোন ভারী জিনিস-পত্র সঙ্গে লইতে পারিবেন না।

ম্যাডিলিন। তাহাই হইবে।

স্কফেয়ার। আমাকে দৈনিক ত্রিশ ফ্র্যাঙ্ক করিয়া ভাড়া দিতে হইবে এবং যে দিন বসিয়া থাকিবেন, সে দিনেরও পূরা ভাড়া দিতে হইবে। আর ঘোড়ার খোরাকী-খরচও আপনাকেই বহন করিতে হইবে।

ম্যাডিলিন। বেশ! আমি তাহাতেই স্বীকৃত আছি।

মসিও ম্যাডিলিন পকেট হইতে মণিব্যাগ বাহির করিয়া দুইটি নেপোলিয়ন টেবিলের উপর রাখিয়া কহিলেন, "দুই দিনের ভাড়া অগ্রিম দিলাম। টম্‌টম্ ঠিক রাত্রি সাড়ে চারিটার সময় আমার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিবে।" স্কফেয়ার উত্তর করিল, "ঠিক রাত্রি সাড়ে চারিটার সময় টম্‌টম্ আপনার ফটকে যাইয়া উপস্থিত হইবে।"

পাঠক অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন যে, মসিও ম্যাডিলিনই প্রকৃত জন্ ভলজীন।

—— ——

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

—•—

বিবেকের জয়

সে রাত্রিতেও ম্যাডিলিনের চক্ষে নিদ্রা আসিল না। সহস্র চিন্তা একসঙ্গে তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে একটি ভীষণ ঝটিকার সৃষ্টি করিল। ম্যাডিলিনের হৃদয়-মধ্যে এই ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্ব; কিন্তু তাঁহার মুখচ্ছবি প্রশান্ত, কপোল করতল-ন্যস্ত, দৃষ্টি ভূতল-সংলগ্ন। একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মসিও আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "আমার কিসের চিন্তা? কিসের ভয়? আমার অতীত জীবন বর্ত্তমানের উপর আসিয়া চাপিয়া পড়িবার একটিমাত্র রাস্তা ছিল। এখন সে রাস্তাটিও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্ট ছায়ার মত আমার পাছে পাছে থাকিয়া, আমার জীবন ক বিড়ম্বিত করিতেছিল। আজ তাহার সন্দেহ সম্পূর্ণ-রূপে বিদূরিত হইয়াছে। কারণ, সে মনে করিতেছে যে, প্রকৃত ভলজীন ধরা পড়িয়াছে। আমার সম্বন্ধে এই অমূলক বিশ্বাসে, আপনার কার্য্য-কুশলতার উপরে বিশ্বাসহীন ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্ট হয় ত পুলি-সের চাকরী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। তাহাতে আমার দোষ কি? এই যে একটি আদ্যো-পান্ত ভ্রমাত্মক নাটকের অভিনয় হইতেছে, ইহার জন্য দায়ী কে? আমি ত ইহার কোন অংশই অভি-নয় করিতেছি না। নিশ্চয় ভগবানের ইচ্ছাক্রমে এই ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। আমি কেন ইচ্ছা করিয়া ধরা দিতে যাইব? ধরা দিয়া এই ঘটনা-স্রোতকে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন অন্যদিকে প্রবাহিত করাইব? তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমি নীরবে দেখি।"

ম্যাডিলিন আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ললাটের শিরা স্ফীত, চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত, করতলে কপোল বিন্যস্ত। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া ভলজীন আবার অস্ফুটস্বরে আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "আচ্ছা, আমি যদি এখন আত্ম প্রকাশ করি, তাহা হইলে কি হয়? প্রথমতঃ এক জন নির্দ্দোষী আইনের কঠোর হস্ত হইতে রক্ষা পায়। দ্বিতীয়তঃ, আমাকে বিবেকের বৃশ্চিক-দংশন সহ্য করিতে হয় না। তৃতীয়তঃ পরলোকে নবকের পথ আমার জন্য চিরতরে বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু অন্য দিকে আবার জগতের কত ক্ষতি! একদিকে বৃদ্ধ চ্যাম্প ম্যাথু আইনের কবল হইতে রক্ষা পাইবে বটে, কিন্তু আমাকে অবশিষ্ট জীবন কারাগারে পচিয়া মরিতে হইবে। আমার সঙ্গে সঙ্গে এই সুন্দর কারখানাটির দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে। অসংখ্য শ্রমজীবী ও তাহাদের পরিবারবর্গ আমার কল্যাণে বাঁচিয়া আছে, তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। এই সমৃদ্ধিশালী নগরীটি পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। ঐ যে অসংখ্য চিম্‌নী হইতে দিবা-রাত্রি ধূম নির্গত হইতেছে, ঐ যে নগণ্য শ্রমজীবীর পাক-পাত্রে পর্য্যন্ত মাংসখণ্ড পাচিত হইতেছে, ঐ সকলের কর্ত্তা কে?—আমি।

আমিই এই নগরে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, অর্থ উপার্জ্জন, রক্ষণ ও বর্দ্ধনের উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছি, একটি পতিত মৃত ব্যবসায়কে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছি। আমি চলিয়া গেলে এই ব্যবসায়ের প্রাণও চলিয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে আমার রচিত এই বিশাল যন্ত্রখানি ভগ্ন ও প্রাণশূন্য হইয়া পড়িবে। তাহার পর, এই চির-দুঃখিনী রমণী ফ্যাণ্টাইন্ যাহার দুর্ভাগ্যের ও দুর্দ্দশা'র আমি অন্যতম গৌণ কারণ, যাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যাহার নয়নের মণি কসেটকে ফিরাইয়া আনিয়া দিতে আমি কৃতসংকল্প, ইহাদের কি দশা হইবে? হতভাগিনী ফ্যাণ্টাইনের সম্পর্কে কি আমার কোন কর্ত্তব্যই নাই? আমি চলিয়া গেলে ইহাদের কি হইবে? ভগ্নহৃদয়া মাতা মরিবে, নিরাশ্রয়া কন্যা পথে দাঁড়াইবে।

অন্যদিকে, আমি আত্মপরিচয় না দিলে ক্ষতি কি? ক্ষতি—বৃদ্ধ চ্যাম্প ম্যাথু কারাগারে যাইবে। সে চুরি করিয়াছে, চুরি সপ্রমাণিত হইলে, কারা-গারে যাইবে। তাহাতে জগতের ক্ষতি-বৃদ্ধি কি? আমার লাভালাভ কি? আর আমি পৃথিবীতে থাকিলে, এই ব্যবসায় চালাইলে, দশ বৎসরের মধ্যে দশ কোটি টাকা অবাধে উপার্জ্জন করিব। এই দশ কোটি টাকা আমি ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে, সংসা-রের উন্নতিকল্পে ব্যয় করিব। তাহাতে কারখানার সংখ্যা বাড়িবে, শ্রমজীবীগণের আর্থিক উন্নতি হইবে, সহস্র সহস্র পরিবারের ভরণ-পোষণের উপায়ের পথ উন্মুক্ত হইবে; দৈন্য বিতাড়িত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে চৌর্য্য, গণিকাবৃত্তি, হত্যা, ষড়যন্ত্র সমস্ত পাপ সংসার

হইতে অন্তর্হিত হইবে।" ম্যাডিলিন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, চিন্তিতভাবে কক্ষে পাদচারণা করিতে করিতে হঠাৎ একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিতে লাগিলেন, "না—আর না—আর এ বিষয় লইয়া আন্দোলন করিব না। আমার সহিত জন্ ভলজীনের সম্বন্ধ-সূত্র একেবারে ছিন্ন করিয়া ফেলিব। এই গৃহ-মধ্যেই, আমার হাতের কাছে, চক্ষের সম্মুখে এমন কতকগুলি জিনিসপত্র আছে, যাহা সেই সম্বন্ধের মূক সাক্ষ্য। আমি এখনই সেগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলিব।" ম্যাডিলিন তাঁহার পকেট হইতে মণি-ব্যাগ বাহির করিলেন। মণিব্যাগ খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি ছোট চাবি বাহির করিলেন। সেই চাবিটির সাহায্যে ভিত্তিগাত্রে প্রোথিত একটি আলমারী খুলিয়া কয়েক টুকরা ছিন্ন মলিন বস্ত্রখণ্ড বাহির করিলেন—একটি ছিন্ন নীল রংএর কোর্ত্তা, একটি জীর্ণ পায়জামা, একটি পুরাতন ঝুলি, একখানি স্থূল যষ্টি, তাহার দুইধারে লোহার ফলক পরান। ১৮১৫ সালের অক্টোবর মাসে যাহারা জন্ ভলজীনকে ডি—নগরের মধ্য দিয়া যাইতে দেখিয়াছিল, তাহারা সেই জিনিস কয়টি দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারিত যে, সেগুলি দস্যু ভলজীনেরই সাজসজ্জা। ম্যাডিলিন একবার শঙ্কিতভাবে দরজার পানে তাকাইলেন। দরজা অর্গলবদ্ধ। এইবার আলমারীর মধ্য হইতে তিনি দুইটি রৌপ্যনির্ম্মিত বাতীদান বাহির করিলেন। এই দুইটি বাতীদানই বিশপ মিরিয়েল, ভলজীনকে দান করিয়াছিলেন। ম্যাডিলিন আলমারী বন্ধ করিলেন। ভিত্তিগাত্রে অগ্নিকুণ্ডে ধিকি ধিকি অগ্নি জ্বলিতেছিল, তিনি কুণ্ডমধ্যে বেশী করিয়া দুই হাতা কয়লা নিক্ষেপ করিয়া, একটু খোঁচাইয়া দিলেন। অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ম্যাডিলিন্ তাঁহার ভলজীন-জীবনের মূক সাক্ষ্য ছিন্ন জীর্ণ পোষাকগুলি ও বাতীদান দুইটিই সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। ধূ ধূ করিয়া পোষাকগুলি জ্বলিয়া উঠিল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভস্মে পরিণত হইল। অত্যধিক চিন্তায় ও উৎকণ্ঠায় ম্যাডিলিনের মাথার মধ্যে যেন আগুনের হল্কা ছুটিতেছিল। তিনি অপ্রকৃতিস্থের ন্যায় অবাক্ হইয়া অগ্নিকুণ্ডের পানে চাহিয়া রহিলেন। অত্যধিক উত্তেজনায় ম্যাডিলিন শুনিলেন, দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কে যেন তাঁহাকে সেই পুরাতন, ঘৃণিত নাম ধরিয়া ডাকিতেছে—'জন ভলজীন!' ভলজীন ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন।

ঘড়ীতে তিনটা বাজিয়া গেল। মসিও ম্যাডিলিন তখনও কক্ষমধ্যে পাগলের মত বেড়াইতেছেন। তাহার পরে চেয়ারে বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার একটু তন্দ্রা আসিল। সে তন্দ্রাটুকু দুঃস্বপ্নের ভারে নিদ্রায় পরিণত হইল না। রাত্রি পোহাইয়া আসিল। অগ্নিকুণ্ডে অগ্নি নির্ব্বাপিত। মুক্ত বাতায়ন-পথে প্রভাতের শীতল বাতাস আসিতে লাগিল। ম্যাডিলিন সেই তন্দ্রামধ্যেই যেন অশ্ব-পদশব্দ ও ঠিকা গাড়ীর ঝন্ ঝন্ শব্দ শুনিতে পাইলেন।

ঠিক এই সময়ে কে যেন তাঁহার শয়ন-কক্ষের দ্বারে আসিয়া করাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। ম্যাডিলিন ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন, "কে তুমি?" ম্যাডিলিন শুনিলেন, বাহির হইতে কে যেন উত্তর দিল, "মহাশয়, আমি।" মসিও ম্যাডিলিন বুঝিতে পারিলেন যে, সে তাহার বৃদ্ধা দাসীর কণ্ঠস্বর।

"মহাশয়, টম্‌টম্ গাড়ী আসিয়াছে।"

"কিসের টম্‌টম্?"

"আপনি ভাড়াটিয়া টম্‌টমের কথা বলিয়া আসিয়াছিলেন। আস্তাবলের সহিস টম্‌টম্ আনিয়াছে।"

"কোন্ আস্তাবল?"

"এম্ স্কফেয়ারের আস্তাবল।"

এই কথা শুনিয়া মসিও চমকিত হইয়া উঠিলেন। যেন বিদ্যুতের আভায় তাঁহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল। অন্যমনস্কভাবে তিনি কহিলেন, "হাঁ, এম্ স্কফেয়ার।" মসিও আবার চিন্তামগ্ন হইলেন। কোন উত্তর না পাইয়া দাসী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "মসিও লি মেয়র, আমি তাহাকে কি উত্তর দিব?" মসিও বলিলেন, "তাহাকে বল, আমি এখনই যাইতেছি।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

—০-

আরাসের পথে।

অতি প্রত্যূষে একখানি ডাকের গাড়ী দ্রুতবেগে এম্-সুর-এম্ অভিমুখে আসিতেছিল। মসিও ম্যাডিলিনও উন্মত্তের মত তীব্রবেগে টম্‌টম্ হাঁকাইয়া বিপরীত দিকে যাইতেছেন। হঠাৎ ডাকের গাড়ীর ব্যোম আসিয়া টম্‌টমের চাকার মধ্যে প্রবেশ করিল।

টম্‌টমের চাকা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল না বটে, কিন্তু ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইল। ম্যাডিলিনের সে দিকে লক্ষ্য নাই, তিনি বেগে টম্‌টম্ হাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন। ডাকগাড়ীর কোচম্যান বিরক্তভাবে অস্ফুটস্বরে কহিল, "লোকটার দেখছি বেজায় তাড়া।"

আরাসের পথে হেস্‌ডিন গ্রাম, এম-সুর-এম হইতে পাঁচ লীগ দূর। এখানে একটি সরাই দেখিয়া, ম্যাডিলিন একটু গাড়ী থামাইলেন। অশ্বটিকে একটু বিশ্রাম করাইয়া এবং খাওয়াইয়া লইয়া আবার যাত্রা করিবেন, এইরূপ কল্পনা করিলেন। তখন বেশ বেলা হইয়াছে—রৌদ্র উঠিয়াছে। ম্যাডিলিন গাড়ীতে বসিয়াই ঘোড়ার জন্য কিছু দানা আনিতে সরাইয়ের সহিসকে আদেশ দিলেন। সহিস দানা লইয়া আসিয়া ঘোড়াকে দিতে যাইবে, এমন সময়ে একটু নীচ হইয়া গাড়ীর চাকার অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এই গাড়ীতে কতদূর আসিয়াছেন?"

"পাঁচ লীগ।"

"আঃ সর্ব্বনাশ!"

"কেন—আশ্চর্য্য হইলে কেন?"

সহিস আবার একটু হেঁট হইয়া চাকার পানে চাহিয়া রহিল, কিছুই বলিল না। কিছু পরে চক্ষু উঠাইয়া বলিল, "এই চাকা লইয়া আপনি পাঁচ লীগ আসিয়াছেন! কিন্তু বোধ হয়, আর এক মাইলও যাইতে পারিবেন না।"

বাস্তবিকই চাকা ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল। ম্যাডিলিন গাড়ী হইতে নামিয়া চাকা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, এইরূপ ভগ্নচক্রে গাড়ী চালান বড়ই বিপজ্জনক। তিনি সরাইয়ের সহিসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাছাকাছি কি কোন মিস্ত্রী খানা আছে?" সহিস উত্তর করিল, "হাঁ, মহাশয়! আছে—মিস্ত্রীকে ডাকিব নাকি? মাষ্টার বোরগেলার্ড ঘরে আছ?" মাষ্টার বোরগেলার্ড দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল। সহিসের ডাক শুনিয়া সে গাড়ীর নিকটে আসিয়া, অত্যন্ত মনোযোগের সহিত গাড়ীর ভগ্ন চক্রখানি পরীক্ষা করিতে লাগিল। ম্যাডিলিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই চাকাখানি মেরামত করিয়া দিতে পার?"

"হাঁ মহাশয়!"

"আমি আবার কখন্ রওনা হইতে পারিব?"

"কাল দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে কিছুতেই নয়। পুরা এক দিনের কাজ। আপনার কি বিশেষ তাড়াতাড়ি আছে?"

"তাড়াতাড়ি! আমি এক ঘণ্টার বেশী দেরী করিতে কিছুতেই পারি না।"

"অসম্ভব! কা'ল সকালের পূর্ব্বে আপনি কিছুতেই যাইতে পারিবেন না।"

"এখানে কোন ভাড়াটিয়া টম্‌টম্ পাওয়া যাইবে?"

"না।"

"কিনিতে পাওয়া যায়?"

"না।"

"আরাস-গামী ডাকগাড়ী এখানে কখন্ আসে?

"রাত্রি একটার সময়।"

"আর কোন মিস্ত্রীখানা এখানে আছে?"

"না।"

মসিও ম্যাডিলিন মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি যেন ঠিক অনুভব করিলেন যে, পরমেশ্বর অলক্ষ্যে বসিয়া তাঁহার ভাগ্যচক্র নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। এই যে পথের মধ্যে গাড়ীখানি ভাঙ্গিয়া গেল, ইহাও তাঁহারই ইচ্ছায়! এই যে অর্দ্ধ-পথে তাঁহার গতি রুদ্ধ হইল, ইহাও সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের ইচ্ছা। ম্যাডিলিন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসিয়া কহিল, "মহাশয়, আমার পুত্রের মুখে শুনিলাম যে, আপনি একখানি টম্‌টম্ ভাড়া চাহিতেছেন। আমার একখানি টম্‌টম্ আছে। আপনি লইতে পারেন।"

ম্যাডিলিন একটু চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার ভাগ্যচক্রের বিবর্তন যেন বিপরীত অভিমুখে আরম্ভ হইল বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি আর বৃথা কালক্ষেপ করিতে চাহিলেন না। তিনি বৃদ্ধার সেই টম্‌টম্‌ ভাড়া লইলেন, দ্রুতবেগে আরাসের অভিমুখে চলিলেন।

সন্ধ্যা হইল। ম্যাডিলিন টিনকোয়েস গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তিনি আর সে গ্রামে বিশ্রাম করিলেন না। গ্রাম হইতে বাহির হইয়া, যে রাস্তা ধরিয়া তাঁহাকে আরাসে যাইতে হইবে, সেই রাস্তায় খোয়া বিছাইতেছে দেখিয়া তিনি অশ্বকে সংযোজিত করিলেন। যাহারা রাস্তা মেরামত করিতেছিল, তাহাদের এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখান হইতে আরাস কতদূর?

"সাত লীগেরও বেশী।"

"সে কি। পোষ্টাফিসের কেতাবে সওয়া পাঁচ লীগ লিখিতেছে।"

"পোষ্ট আফিসের পুস্তকে ঠিকই লিখিয়াছে। সে এই সোজা রাস্তা ধরিয়া গেলে। এই রাস্তা মেরামত হইতেছে, আপনাকে অন্য রাস্তা ধরিয়া যাইতে হইবে। সেই রাস্তায় অনেক ঘুর হয়।"

"অন্ধকারে রাস্তা হারাইব না ত?"

"রাস্তা ভুলিয়া যাইবার সম্ভব। মহাশয়! যদি আমাদের কথা শুনেন, তবে রাত্রে টিনকোয়েসে ফিরিয়া যান। সেখানে সুন্দর হোটেল আছে। রাত্রিটুকু সেইখানে বিশ্রাম করিয়া লইয়া কা'ল খুব ভোরে উঠিয়া যাইবেন।"

"সে হবে না। যেমন ক'রে হ'ক, আমায় আজ রাত্রেই আরাসে পৌঁছিতে হবে।"

"তার ওপরে আর কথা নেই।"

ম্যাডিলিন সজোরে অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিলেন। অশ্বও সাধ্যমত বেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল। যাহারা রাস্তা মেরামত করিতেছিল, তাহারা অবাক্ হইয়া পরস্পর মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিল। এক জন বলিল, "বোধ হয়, লোকটার মাথা খারাপ।" আর এক জন বলিল, "তা নয়—বোধ হয়, উহার কোন জরুরি মামলা-মোকদ্দমা আছে।" অপর এক জন কহিল, "বোধ হয়, লোকটার কোন আত্মীয়-স্বজন খুব পীড়িত।"

রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। অন্ধকার গাঢ়তর হইল। রাস্তা মেরামতকারিগণ দিনের কার্য্য শেষ করিয়া স্ব স্ব আবাসে ফিরিয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

:০:—

ফ্যাণ্টাইনের উৎকণ্ঠা।

ফ্যাণ্টাইন শুনিল যে, মসিঁও ম্যাডিলিন কোন কার্য্য বশতঃ দুই তিন দিনের জন্য এম-সুর-এম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাহার স্থির ধারণা হইল যে, মসিঁও নিশ্চয়ই তাহার কসেটকে আনিবার জন্য মণ্টফারমিলে গিয়াছেন। সে দিনটি ফ্যাণ্টাইনের খুব আনন্দে কাটিল; রাত্রিতে তাহার জ্বর খুব বাড়িল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ফ্যাণ্টাইন জাগিয়া রহিল; একটুও ঘুমাইতে পারিল না। পরদিন প্রাতে যখন ডাক্তার তাহাকে দেখিতে আসিলেন, ফ্যাণ্টাইন তখন প্রলাপ বকিতেছে। তাঁহার একটু ভয় হইল। তিনি যাইবার সময় প্রধানা নার্সকে বলিয়া গেলেন যে, "রোগীর অবস্থা তত সুবিধা নয়। মসিঁও আসিয়া পৌঁছিলেই যেন আমাকে খবর দেওয়া হয়।"

সমস্ত সকালবেলা ফ্যাণ্টাইনকে বড়ই চিন্তাযুক্ত ও বিষণ্ণ দেখা গেল। সে কখনও আপন মনে শুইয়া শুইয়া বিছানার চাদরের কোণ ভাঁজ করিতে লাগিল, আবার ভাঁজ খুলিয়া ফেলিতে লাগিল। কখনও ব. আপন মনে বিড় বিড় করিয়া কি বকিতে লাগিল, যেন সে কোন স্থানের দূরত্বের হিসাব করিতেছে। তাহার চক্ষুর্দ্বয় নির্নিমেষ ও প্রভাহীন। প্রধানা নার্স সিষ্টার সিমপ্লিস যখনই তাহাকে জিজ্ঞাসা করে—সে কেমন আছে, তখনই ফ্যাণ্টাইন উত্তর করে, "আমি খুব ভাল আছি। মসিঁও ম্যাডিলিন কখন্ ফিরিয়া আসিবেন?"

বেলা প্রায় আড়াইটার সময় ফ্যাণ্টাইন যেন একটু বেশী অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার পরে বিশ মিনিট সময়ের মধ্যে সে অন্ততঃ বিশবার নার্সকে জিজ্ঞাসা করিল, "বেলা কয়টা বাজিয়াছে?" ঘড়ীতে তিনটা বাজিল। ফ্যাণ্টাইন শয্যার উপরে বিনা সাহায্যে ঘুরিতে ফিরিতে পারিত না। সে

একেবারে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল, বুকের উপরে তাহার শীর্ণ বিবর্ণ হাত দুইখানি রাখিয়া এমন একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল যে, মনে হইল বুঝি বা সেই নিশ্বাসের চাপে তাহার পঞ্জরের অস্থিগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেল। তাহার পরে, ফ্যাণ্টাইন সতৃষ্ণনয়নে দ্বারের পানে চাহিতে লাগিল, যেন সে কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। কিন্তু কক্ষে কেহই প্রবেশ করিল না, দ্বার কেহ উদ্ঘাটিত করিল না। এই ভাবে প্রায় পোনর মিনিট কাটিয়া গেল।

ফ্যাণ্টাইনের চক্ষুর্দ্বয় অনিমিষ, স্থির ও অচঞ্চল ভাবে দ্বারের দিকে নিবদ্ধ, নিশ্বাস পর্য্যন্ত রুদ্ধ। নার্স ভয়ে ব্যাকুল হইল, সে হতবুদ্ধির ন্যায় নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। ঘড়ীতে এক কোয়ার্টার বাজিল, ফ্যাণ্টাইন একটু চমকিয়া উঠিয়া বালিসের উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। কিন্তু কেহই আসিল না।

ফ্যাণ্টাইন ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ম্যাডিলিনের আত্মপ্রকাশ।

রাত্রি প্রায় আটটার সময় ম্যাডিলিন্ আরাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার টমটমের ঘোড়ার গা বহিয়া টস্ টস্ করিয়া ঘাম ঝরিতেছে। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। একটি পান্থশালায় গাড়ী থামাইয়া জনৈক ভৃত্যকে ডাকিয়া ম্যাডিলিন তাঁহার ব্যাগটী ভিতরে লইয়া যাইতে বলিলেন, এবং অশ্বটিকে খুলিয়া ঠাণ্ডা করিতে এবং আহার্য্য দিতে আদেশ দিলেন। আপনি আর বিশ্রাম না করিয়া পদব্রজে আরাস কোর্টের অভিমুখে চলিলেন।

আরাসের সেসন আদালতে আজ বড় ভিড়। ভীষণ দস্যু জন্ ভলজীন ধরা পড়িয়াছে। আজ তাহার বিচার। আদালত-গৃহ লোকে পরিপূর্ণ, সাধারণের প্রবেশের দ্বারগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একটি মাত্র দ্বার খোলা আছে। সেই দ্বার দিয়া ব্যারিষ্টার ও আদালতের কর্ম্মচারী ভিন্ন আর কাহারও যাতায়াত নিষিদ্ধ। ম্যাডিলিন কি করিয়া আদালত-গৃহে প্রবেশ করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। সহসা যেন তাহার মাথার মধ্যে একটা বুদ্ধি খেলিল। তিনি পকেটবুক হইতে একখানি কাগজ ছিঁড়িয়া লইয়া তাঁহার নাম ও পদবী তাহাতে লিখিয়া চাপরাসীকে বলিলেন, "জজ সাহেবকে এই কার্ডখানি দাও।" বিচারাসনে উপবিষ্ট জজ সাহেবের নিকট কার্ড প্রেরণ করিবার সাহস যাহার আছে, সে হয় কোন বিশিষ্ট পদস্থ ব্যক্তি, না হয় বাতুল। লোকটি এই দুইয়ের মধ্যে কি ?—চাপরাসী তাহা অচিরেই বুঝিয়া লইল। কার্ডখানি পড়িয়াই চিফ জষ্টিস্ একখানি কাগজে কি লিখিয়া চাপরাসীর হস্তে দিলেন এবং বলিলেন, তাঁহাকে ভিতরে লইয়া এস।" বিচারকদিগের পার্শ্বেই মেয়র মসিও ম্যাডিলিনের জন্য একখানি আসন দেওয়া হইল।

সেই দুর্ভাগ্য চির-অসুখী মানব—যাহার জীবন-চরিত লইয়া এই আখ্যায়িকা—সেই জন্ ভলজীন বিচারালয়ের দ্বারের বাহিরে অচল শিলাস্তূপের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। চাপরাসী আসিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে জজ সাহেবের লিখনখানি দিল চাপরাসীর অভিবাদনে ম্যাডিলিনের চমক ভাঙ্গিল। তিনি চাপরাসীর হস্ত হইতে লিখনখানি লইয়া পাঠ করিলেন, চাপরাসী পথ দেখাইয়া চলিল। মসিও ম্যাডিলিন অন্যমনস্কভাবে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাঁহার জন্য নিরূপিত আসনে উপবেশন করিলেন।

আদালতে কেহই তখন তাঁহাকে বিশেষ লক্ষ্য করিল না। কারণ, সকলেরই চক্ষু তখন এক জনের দিকে আকৃষ্ট—সে সেই অপরাধী জন্ ভলজীন: আজিকার দায়রায় তাহারই বিচার। যখন মসিও ম্যাডিলিন্ আদালতে প্রবেশ করিলেন, তখন আসামীর পক্ষের কৌঁসুলী তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিয়া আসন গ্রহণের উদ্যোগ করিতেছেন। তিনি অকাট্য প্রমাণ ও যুক্তি দেখাইয়া প্রমাণ করিলেন যে—তাঁহার মক্কেল আপেল চুরি করে নাই; আপেল রাস্তায় পড়িয়া ছিল, সে কুড়াইয়া লইয়াছে মাত্র। জন্ ভলজীন ও তাঁহার মক্কেল এক লোক নহে; চ্যাম্প, ম্যাথুর বিরুদ্ধে কোন চার্জ্জই টিকিতে পারে না। সরকারী কৌঁসুলী উঠিয়া তাহার জবাব দিলেন

আসামীর কৌঁসুলীর যুক্তির সারবত্তার উপর শ্লেষাত্মক কটাক্ষপাত করিতেও ত্রুটী করিলেন না। সরকারের পক্ষে প্রধান সাক্ষী ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্ট। জ্যাভার্টের জবানবন্দী তিনি উচ্চকণ্ঠে আদালতের সমক্ষে পাঠ করিলেন। হলপ লইয়া জ্যাভার্ট এই মোকদ্দমায় বলিয়াছে, "আমি আসামীকে বেশ চিনিয়াছি এবং তাহাকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে সনাক্ত করিতে সমর্থ। আসামীর নাম কখনও চ্যাম্প ম্যাথু নহে। সে নিশ্চয়ই সেই ভীষণ ডাকাত জন্ ভলজীন। উনিশ বৎসর সে টুলো জেলখানায় কয়েদী ছিল। আমি উনিশ বৎসর যাবৎ তাহাকে দেখিয়া আসিতেছিলাম। সে পাঁচ ছয়বার জেল হইতে পলাইয়াছিল। আবার ধরা পড়িয়া জেলে আনীত হয়। শেষে তাহার মেয়াদের সময় কাটিয়া গেলে সরকার অনিচ্ছা-সত্ত্বে তাহাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। তাহার পরে সে ডি—নগরের বিশপের বাটীতে চুরি করিয়াছে এবং এত দিন পুলিসের চক্ষে ধূলি দিয়া সে পলাইয়া বেড়াইতেছে। আমি তাহাকে ঠিক চিনিয়াছি।" জ্যাভার্টের জবানবন্দী পাঠ শেষ করিয়া সরকারপক্ষের আরও তিন জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। প্রথম সাক্ষী ব্রেভেট বলিল, "আমি আসামীকে চিনিয়াছি। জন্ ভলজীনের সঙ্গে আমি একই সময়ে টুলোর জেলখানায় মেয়াদ খাটিয়াছি। সে এখন নির্ব্বুদ্ধিতার ভাণ করিতেছে। সে খুব চালাক লোক। আমি তাহাকে ঠিক চিনিয়াছি।" দ্বিতীয় সাক্ষী চেনিলডিউ—সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত এক জন কয়েদী। সে-ও আসামীকে সনাক্ত করিল। তৃতীয় সাক্ষী কোচপেলও জন্ ভলজীনের সমসাময়িক এক জন কয়েদী। সে-ও আসামীকে সনাক্ত করিল। চিফ জষ্টিস আসামীকে বলিলেন, "আসামী! তোমার বিরুদ্ধে সরকারপক্ষ হইতে যে সাক্ষ্য-প্রমাণ দিল, তাহা তুমি সব শুনিলে। এক্ষণে তোমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে বলিতে পার।" আসামী উত্তর দিল, "অতি সুন্দর! অতি সুবিচার।"

আসামীর এই প্রলাপ শুনিয়া সমবেত জনমণ্ডলী একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল, আদালতে এক বিষম হাসির রোল উঠিয়া গেল। ঠিক এই সময়ে চিফ জষ্টিসের পশ্চাদ্দিকে একটু গোলযোগ শুনা গেল, এবং কে যেন উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ব্রেভেট, চেনিলডিউ, কোচপেল্! একবার এই দিকে চাও।" সে কণ্ঠস্বর এত কাতর যে, আদালতে উপস্থিত সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে ধাবিত হইল।

জজেরা, সরকার কৌঁসুলি, জুরীদিগের মধ্যে অনেকেই যাহারা তাঁহাকে চিনিত, একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—"মসিও ম্যাডিলিন!"

মসিও ম্যাডিলিনই বাস্তবিক ঐরূপ অস্বাভাবিক চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি জজদিগের 'ডায়েস' হইতে নামিয়া আসামীর কাঠগড়ার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ স্বর্গীয় আলোকে বিভাসিত, পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন ও সংযত। যে সময়ে তিনি আরাসে প্রবেশ করেন, সে সময়ে তাঁহার কেশ কাঁচায় পাকায় মিশ্রিত ছিল, কিন্তু এই কয়েক ঘণ্টার উৎকট চিন্তায় তাহা রৌপ্যের মত সাদা হইয়া গিয়াছে।

মসিও ম্যাডিলিন্ উচ্চকণ্ঠে ফরিয়াদীর সাক্ষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ব্রেভেট, চেনিলডিউ, কোচপেল! তোমরা কেহই আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?" সাক্ষিগণ হতবুদ্ধি—জনতা স্তম্ভীভূত। মসিও ম্যাডিলিন বিচারক এবং জুরীদিগের পানে চাহিয়া কহিলেন, "আদালত ও জুরীগণ! আসামী নির্দ্দোষ—তাহাকে মুক্তি দিন। আমাকে গ্রেপ্তার করুন। আপনারা যাহাকে চাহিতেছেন, এ ব্যক্তি সে নহে। আমিই সেই জন্ ভলজীন।"

আদালত-গৃহ কৌতূহলী জনতায় পূর্ণ। কিন্তু জজ হইতে সামান্য দর্শক পর্য্যন্ত সকলেই নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া,ঘটনারাজির এই নূতন ও অভাবনীয় পরিণতি দেখিয়া এক অতি বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেল। সকলেই ভাবিল, মসিও ম্যাডিলিনের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। চিফ জষ্টিসেরও ধারণা তাহাই। তিনি একবার সরকারী কৌঁসুলীর মুখপানে চাহিলেন, ইঙ্গিতে তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিয়া লইয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, "এই সমবেত জনতার মধ্যে কি কোন ডাক্তার উপস্থিত নাই?" তাহার পরে সরকারী কৌঁসুলী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "জুরী মহোদয়গণ ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলী! আপনারা অনেকেই দেশবিখ্যাত এম সুর-এম্ নগরের মেয়র মসিও ম্যাডিলিনকে জানেন। অন্ততঃ তাঁহার নাম ও সুখ্যাতি শুনেন নাই, এমন লোক আমাদের মধ্যে বোধ হয় কেহই নাই। তিনি সহসা একটু অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। আপনাদিগের মধ্যে

যদি কেহ চিকিৎসক থাকেন, তবে তিনি আসিয়া মসিও ম্যাডিলিনকে সাহায্য করুন।"

সরকারী কৌঁসুলীর উক্তি শেষ হইবার পূর্ব্বেই মসিও ম্যাডিলিন অতি ভদ্র এবং সংযতভাবে তাঁহাকে এবং বিচারকদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আমি আপনাদিগকে এই অনুকম্পার জন্য ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু আমি পাগল হই নাই। আপনারা শীঘ্রই তাহা বুঝিতে পারিবেন। আপনারা একটি ভয়ানক ভ্রমে পতিত হইতেছিলেন। সেই ভ্রমের ফলে এক জন নিরপরাধ জীব অনর্থক নির্য্যাতিত হইতেছিল। আমি আমার কর্ত্তব্যমাত্র পালন করিতেছি। আমি সত্য বলিতেছি যে, আমিই সেই হতভাগ্য নরপিশাচ জন্ ভলজীন। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি; তাঁহার নিকট কিছুই গোপন নাই। ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আপনারা এখনই আমাকে ধরিতে পারেন, আমি ধরা দিব বলিয়াই এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি জগতে ভাল হইয়া থাকিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু দেখিতেছি যে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় অন্যরূপ। আমি নাম বদলাইয়াছি, যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি, মেয়রের পদ পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছি। আমি ভাল লোকের মধ্যে মিশিয়া ভাল হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু দেখিতেছি যে, তাহা হইবার নহে। আমি বিশপের বাড়ী হইতে চুরি করিয়াছি এবং জন্ ভলজীন যে এক জন বিপজ্জনক দস্যু, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই;— যদিও আমার সমগ্র পাপের জন্য আমি দায়ী নহি। তবে শুনুন, ভদ্র মহোদয়গণ, যদিও আমার ন্যায় ঘৃণিত জীবের সমাজকে উপদেশ দিবার চেষ্টা করা পরিহাসজনক, তবুও ভুক্তভোগীর কথাটা একেবারে ঠেলিয়া ফেলিবার নয়। কথাটি এই—অবস্থায় মানুষকে পাপের পথে লইয়া যায়, কারাগার পাপীর সৃজন করে। টুলোর জেলে যাইবার পূর্ব্বে আমি দরিদ্র কৃষকমাত্র ছিলাম; কিন্তু জেল খাটিয়া একটি পাকা দস্যু হইয়া বাহির হইলাম। আমি পূর্ব্বে নির্ব্বোধ ছিলাম, পরে বদমায়েস হইলাম। তাহার পরে ঈশ্বরের অপরিমিত করুণা আমাকে পাপের পথ হইতে পুণ্যের পথে লইয়া গেল, স্বর্গীয় আলোক-রেখা-পাতে আমার জীবন উদ্ভাসিত করিল। আমি সয়তানের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিলাম। কিন্তু, আমায় ক্ষমা করুন, বোধ হয়, আমার মনের ভাব আপনাদিগকে বুঝাইতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলিলাম। আপনারা আমাকে গ্রেপ্তার করুন। কি আশ্চর্য্য! আমার কারার সহচর এই তিন জনও আমায় চিনিতে পারিল না। এ সময়ে যদি জ্যাভার্ট এখানে উপস্থিত থাকিত, সে নিশ্চয়ই আমাকে চিনিত।" তাহার পরে ব্রেভেটকে লক্ষ্য করিয়া ম্যাডিলিন্ বলিলেন, "ব্রেভেট! আমি তো তোমাকে ঠিক চিনিয়াছি, তুমি আমায় চিনিতে পারিতেছ না? আচ্ছা, তোমার মনে আছে কি, যখন তুমি কারাগারে ছিলে, সে সময়ে তুমি সর্ব্বদা রঙ্গিন গ্যালিস পড়িতে খুব ভালবাসিতে?" এই কথা শুনিয়া ব্রেভেট চমকিয়া উঠিল এবং ভাল করিয়া একবার মসিও ম্যাডিলিনের আপাদমস্তক দেখিয়া লইল। মসিও ম্যাডিলিন আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "চনিলডিউ! তোমার দক্ষিণস্কন্ধে একটি পুড়িয়া যাওয়ার ক্ষতচিহ্ন আছে। মনে আছে কি, তোমার দেহে অঙ্কিত টি, এফ, পি, (T. F. P,) অক্ষর কয়টি লুপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে তুমি প্রজ্বলিত অঙ্গারপূর্ণ একখানি লৌহকটাহ তোমার দেহের ঐ স্থানে রাখিয়াছিলে? তাহার ফলে ঐ ক্ষতটি হয়। এইবার মনে করিয়া দেখ, আমি ঠিক বলিতেছি কি না?" চেনিলডিউ বলিল, "হাঁ, ঠিক।" মসিও ম্যাডিলিন তৃতীয় সাক্ষীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কোচ্‌পেল! তোমার বাম-বাহুর তলপিঠে বগলের কাছে নীল অক্ষরে একটি তারিখ লেখা আছে। ঐ তারিখ ১লা মার্চ্চ ১৮১৫ সাল। সেই তারিখে সম্রাট ক্যানে নগরে আসিয়া অবতরণ করেন। তুমি জামার আস্তিন গুটাও দেখি।" কোচ্‌পেল তাহাই করিল। এক জন প্রহরী যাহয়া একটি আলোক লইয়া আসিল। সকলেই দেখিল, মসিও ম্যাডিলিন যথার্থই বলিয়াছেন। মসিও ম্যাডিলিন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "এখন আপনারা বোধ হয় স্থির বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমিই জন্ ভলজীন। যাহা হউক, আমি আর অনর্থক আপনাদের মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিব না। আমি ধরা দিতে আসিয়াছিলাম। আপনারা আমাকে ধরিলেন না; আমারও অনেক কার্য্য করিতে

আছে। আমাকে আপনারা চেনেন। যখন আপনাদের ইচ্ছা, আমায় গ্রেপ্তার করিতে পারেন।"

এই কথা বলিয়া মসিও ম্যাডিলিন দ্বারের দিকে গেলেন। সমবেত লোকের মধ্যে কেহই কোন কথা কহিল না, কেহই তাঁহার গতিরোধ করিবার স্বল্প চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না। সকলেই সেই দেবোপম মনুষ্যকে অতি সন্তর্পণে পথ ছাড়িয়া দিল। তিনি ধীরে ধীরে আদালত হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

মসিও ম্যাডিলিন প্রস্থান করিলে, জুরীগণ এক-বাক্যে চ্যাম্প ম্যাথ্‌কে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিলেন। চ্যাম্প ম্যাথ্ খালাস পাইয়া হতবুদ্ধির মত চলিয়া গেল। যাইবার সময় সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল। "পৃথিবীতে মানুষমাত্রেই পাগল!"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

ম্যাডিলিন ফ্যাণ্টাইনের শয্যাপার্শ্বে।

রাত্রি ভোর হইয়া আসিতেছে। সমস্ত রাত্রি ফ্যাণ্টাইনের নিদ্রা হয় নাই। জ্বর খুব বেশী হইয়াছিল। কিন্তু সমস্ত রাত্রিটুকু সে সুস্বপ্ন দেখিয়াছে। প্রভাতের সমীরণ-স্পর্শে তাহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। সিষ্টার সিমপ্লিস সেই অবসরে ফ্যাণ্টাইনের জন্য একমাত্র ঔষধ জ্বাল দিবার আয়োজন করিতেছেন। এমন সময়ে হঠাৎ দ্বারের দিকে তাঁহার নজর পড়ায় তিনি একটু চমকিয়া উঠিলেন। মসিও ম্যাডিলিন অতি সন্তর্পণে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সিষ্টার সিমপ্লিস পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। তিনি ব্যস্তভাবে মসিওকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কখন্ ফিরিয়া আসিয়াছেন?" মসিও ম্যাডিলিন মৃদুস্বরে কহিলেন, "এইমাত্র। ফ্যাণ্টাইন কেমন আছে?" সিমপ্লিস কহিল, "তত খারাপ নয়। তবে কা'ল আমাদের বড়ই ভয় হইয়াছিল। কা'ল সমস্ত দিনই জ্বর খুব বেশী ছিল। জ্বরের মধ্যে ফ্যাণ্টাইন ক্রমাগত প্রলাপ করিতেছিল। তাহার বিশ্বাস যে, আপনি তাহার কন্যাকে আনিবার জন্য মণ্টফারমিলে গিয়াছেন; এবং সেই বিশ্বাসে তাহার মনটাও যেন খুব প্রফুল্ল ছিল। আমরাও তাহার কথায় সায় দিয়া যাইতেছিলাম।" ম্যাডিলিন কহিলেন, "সে ভালই করিয়াছ।" সিষ্টার সিমপ্লিস কহিল, "এখন আপনি তাহার সঙ্গে দেখা করিলেই তো সে তাহার কন্যাকে দেখিতে চাহিবে। তখন কি বলিবেন?" ম্যাডিলিন এক মুহূর্ত্ত নীরবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, "পরমেশ্বর উপযুক্ত উত্তর যোগাইয়া দিবেন।"

এই সময়ে গৃহটি সূর্য্যালোকে বেশ আলোকিত হইয়াছিল। হঠাৎ ম্যাডিলিনের মস্তকের দিকে সিষ্টার সিমপ্লিসের নজর পড়িল। সে চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "মহাশয়! আপনার কি হইয়াছে? সমস্ত কেশগুলি একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে যে।" ম্যাডিলিনও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "কি!"

সিষ্টার সিমপ্লিস নিকটস্থ আলমারী হইতে একখানি ক্ষুদ্র আয়না বাহির করিয়া আনিয়া মসিও ম্যাডিলিনের হস্তে দিলেন। মসিও দেখিলেন যে, তাঁহার মস্তকের কেশ সমস্ত পাকিয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার এই অনৈসর্গিক পরিবর্ত্তনের কোন কৈফিয়ৎ দিলেন না। সিষ্টার সিমপ্লিস মনে মনে আঁচিয়া লইলেন যে, কোন একটি বিষম দুর্ঘটনা অথবা দুশ্চিন্তাই ইহার কারণ।

মসিও ম্যাডিলিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন একবার ফ্যাণ্টাইনের সহিত দেখা করা যায় না?"

সিষ্টার সিমপ্লিস কহিল, "তাহার কন্যাকে না আনিয়াই দেখা করিতে চান না কি?"

ম্যাডিলিন কহিলেন. "অবশ্য,—কসেটকে আনিতে হইলে অন্ততঃ আরও তিন চারি দিন দরকার।"

সিষ্টার সিমপ্লিস কহিল, "আপনি আজ দেখা না করিয়া, কসেটকে আনিয়া দেখা করিলে দোষ কি?"

মসিও ম্যাডিলিন কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া ধীরভাবে কহিলেন, "না ভগি! আজই আমি তাহার সহিত দেখা করিব। দেরী করিলে সম্ভবতঃ দেখা না হইলেও হইতে পারে।" ভগ্নী সিমপ্লিস কহিল, "তাহা হইলে এখনই দেখা করিতে পারেন। কিন্তু ফ্যাণ্টাইন বোধ হয় এখন ঘুমাইতেছে।"

মসিও ম্যাডিলিন ফ্যাণ্টাইনের কক্ষে প্রবেশ করিলেন; আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার শয্যার সন্নিকটে গেলেন এবং ধীরে ধীরে মশারিটি একটু সরাইয়া দিলেন। ফ্যাণ্টাইন নিদ্রাভিভূত।

তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসে একরূপ শব্দ হইতেছিল, যে অস্বাভাবিক শব্দ কেবল ক্ষয়কাসগ্রস্ত রোগীর শ্বাসেই শ্রুত হইয়া থাকে। যদিও ফ্যাণ্টাইনের শ্বাস-প্রশ্বাস এইরূপ কষ্টকর, তথাপি তাহার মুখে গভীর শান্তির চিহ্ন বিরাজিত। ম্যাডিলিন দেখিলেন, ফ্যাণ্টাইনের অধরোষ্ঠ যেন একটু কম্পিত হইতেছে। তাহার রোগ-খিন্ন শীর্ণ দেহ-বল্লীও যেন ঈষৎ কাঁপিতেছে। বৃক্ষের শাখা হইতে যখন ফল পাড়া যায়, তখন যেমন শাখাটি কাঁপিয়া উঠে, মরণের রহস্যময় অঙ্গুলি যখন হাত বাড়াইয়া দেহ হইতে আত্মারূপ ফলকে বিচ্ছিন্ন করিতে যায়, তখনও দেহের ঠিক সেইরূপ একটু কম্পন পরিলক্ষিত হয়।

মসিও ম্যাডিলিন কয়েক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া একবার নিদ্রিত ফ্যাণ্টাইনের মুখখানি দেখিয়া আবার তাহার শিয়রে ভিত্তিগাত্রে বিলম্বিত ক্রুশের দিকে দেখিতে লাগিলেন। ফ্যাণ্টাইনের ঘুম ভাঙ্গিল। মসিও ম্যাডিলিনকে তদবস্থ দেখিয়া ফ্যাণ্টাইনের মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ, আমার কসেট ?"

আজ ফ্যাণ্টাইনের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে আনন্দে বিহ্বলতা নাই। মসিও ম্যাডিলিনের উপর ফ্যাণ্টাইনের বিশ্বাস প্রগাঢ়, নির্ভর অতুলনীয়। ম্যাডিলিন তাড়াতাড়ি কি উত্তর দিলেন, পর মুহূর্ত্তে তিনি নিজেই তাহা স্মরণ করিতে পারিলেন না। ভাগ্যক্রমে ঠিক তখনই ডাক্তার আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার ফ্যাণ্টাইনকে কহিলেন, "লক্ষ্মীটি! একটু শান্ত হও, তোমার মেয়ে এইখানেই আছে।" ডাক্তারের কথা শুনিয়া ফ্যাণ্টাইনের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সে কহিল, "ডাক্তার মহাশয়! আপনার পায়ে পড়ি, কসেটকে আমার কোলে আনিয়া দিন।" মাতৃ-স্নেহের কি মর্ম্মস্পর্শী মোহ! ফ্যাণ্টাইন্ মনে করিতেছিল যে, তাহার কসেট আজও সেই দুই বৎসরের শিশুই রহিয়াছে। মসিও ম্যাডিলিন ফ্যাণ্টাইনের রুগ্ন, শীর্ণ, শীতল হাতখানি তাঁহার নিজের হাতের মধ্যে লইয়া স্নেহার্দ্র হৃদয়ে কহিলেন, "সোনা! লক্ষ্মীটি! ডাক্তার মহাশয়ের কথা শুন। অত ব্যস্ত হইও না। তোমার কসেট এইখানেই আছে, সে ভাল আছে। তুমি এত ব্যস্ত হইলে, আবার তোমার কাসি বাড়িবে।"

বাস্তবিকই ফ্যাণ্টাইন খুব কাসিতেছিল। ফ্যাণ্টাইনের হস্ত তখনও মসিও ম্যাডিলিনের হাতের মধ্যে। ফ্যাণ্টাইন আবদার করিয়া বলিতে লাগিল, "মসিও! আপনি বলিয়াছিলেন যে, আমার কসেট আসিলে তাহার খেলিবার জন্য একটি সুন্দর বাগান করিয়া দিবেন। তাহাই এখন দিতে হইবে। আমার কসেট সেই বাগানে ফুল-গাছের মধ্যে প্রজাপতি তাড়াইয়া বেড়াইবে।"

এই কথা বলিতে বলিতে ফ্যাণ্টাইন সহসা চুপ করিল এবং অত্যন্ত শঙ্কিতভাবে কক্ষের দ্বারের দিকে চাহিয়া এক অতি ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিল। ম্যাডিলিন আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "ফ্যাণ্টাইন! তোমার কি হইল ?" ফ্যাণ্টাইন কোন উত্তর করিল না; কেবল মসিও ম্যাডিলিনের হাত টিপিয়া ইঙ্গিতে তাঁহাকে দরজার দিকে দেখিতে বলিল।

ম্যাডিলিন মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, "দরজার গায়ে ঠেস দিয়া দণ্ডায়মান—পুলিস-ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্ট।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

ফ্যাণ্টাইন মরিল।

জাভার্ট কেমন করিয়া এখানে আসিল ?

পাঠকের স্মরণ আছে যে, যখন মসিও ম্যাডিলিন আত্মপ্রকাশ করিয়া আরাসের আদালত পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন, তখন তথায় উপস্থিত সমস্ত লোকই হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। মসিও ম্যাডিলিনের প্রস্থানে কেহই বাধা দিল না। চোর পলাইলে বুদ্ধি বাড়ে! মসিও ম্যাডিলিন চলিয়া যাইবার ক্ষণকাল পরেই জজ, জুরীগণ ও সরকারী কৌঁসুলীর মধ্যে এই বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ পরামর্শ হইল। পরামর্শে স্থিরীকৃত হইল যে, অবিলম্বে আদালতের সহি-মোহর-যুক্ত ওয়ারেণ্ট মসিও ম্যাডিলিনের নামে বাহির করা হউক এবং পুলিস-ইনস্পেক্টার জ্যাভার্টের উপর ম্যাডিলিনকে ধৃত করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হউক। কার্য্য সেইমতই হইল।

পরদিন প্রত্যূষে ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্ট কেবলমাত্র

শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়াছেন, এমন সময় ম্যাডিলিনের নামে ওয়ারেণ্ট ও তাঁহাকে ধৃত করিবার আদেশ তাঁহার হস্তগত হইল। ক্ষুধিত ব্যাঘ্র শীকার কাছে পাইলে যেমন এক লাফে গিয়া তাহার উপর পড়ে, জ্যাভার্টেরও অবস্থা তাই। আদেশ পাইবামাত্র জ্যাভার্ট চারি পাঁচ জন লোক সঙ্গে করিয়া, মসিও ম্যাডিলিনের আবাসে যাইয়া উপস্থিত হইল। মেয়রের নিকট জ্যাভার্ট সরকারী কার্য্যোপলক্ষে প্রায়ই যাতায়াত করিত; সুতরাং জ্যাভার্টের এই প্রাতঃকালীন আগমনে সন্দেহ বা সন্ত্রাসের কোনই কারণ ছিল না। পরিচারকদিগকে জিজ্ঞাসা করিবামাত্র জ্যাভার্ট উত্তর পাইল যে, মেয়র এক্ষণে ফ্যাণ্টাইনের কক্ষে আছেন। আর কোন কথা না বলিয়া জ্যাভার্ট বরাবর ফ্যাণ্টাইনের কক্ষের দিকে গিয়া দেখিল যে, দ্বার বন্ধ রহিয়াছে। ওয়ারেণ্টের আসামীর সহিত আবার শিষ্টতা কিংবা শীলতা কি? জ্যাভার্ট দ্বার-সংলগ্ন চাবী ঘুরাইয়া আস্তে আস্তে গৃহে প্রবেশ করিল। ফ্যাণ্টাইন দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়াছিল, সেই জন্য সে-ই প্রথমে জ্যাভার্টকে দেখিতে পাইল। যমদূতকে সম্মুখে দেখিয়া সে ভয়ে চীৎকার করিয়া কহিল, "মসিও ম্যাডিলিন! আমাকে রক্ষা করুন।"

ভলজীনের (এখন হইতে আমরা ভলজীনকে তাহার আসল নামেই আখ্যাত করিব) ঘটনা বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি ফ্যাণ্টাইনকে কহিলেন, "তুমি ভয় করিও না, উনি তোমায় ধরিতে আসেন নাই।" জ্যাভার্টকে কহিলেন, "আমি জানি, তুমি কি চাও।" জ্যাভার্ট রুক্ষভাবে কহিল, "এস, সত্বর হও।" ফ্যাণ্টাইন বড়ই ভীত হইয়া পড়িল। সে চীৎকার করিয়া কহিল, "মসিও লি মেয়র!" জ্যাভার্ট পিশাচের ন্যায় অট্টহাস্য করিয়া কহিল, "এখানে মসিও লি মেয়র কেহ নাই।" পরে ভলজীনকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "তাহা হইলে তুমি সহজে আসিবে না? আমাকে বলপ্রয়োগ করিতে হইবে?" এই কথা বলিয়া সে শার্দ্দূলের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া ভলজীনের সার্টের কলার চাপিয়া ধরিল। ভলজীন তাহাকে কোন বাধা দিলেন না; কেবল বলিলেন, "জ্যাভার্ট!" জ্যাভার্ট কহিল, "আমাকে মসিও লি ইন্‌স্পেক্টার বলিয়া সম্বোধন কর।" ভলজীন কহিলেন, "আমি গোপনে তোমার সহিত দুইটি কথা কহিতে চাই।" জ্যাভার্ট কর্কশ-স্বরে কহিল, "আমি তোমার ন্যায় লোকের সহিত গোপনে কথাবার্ত্তা কহিতে চাহি না।" ভলজীন কহিলেন, "তাহা হইলে আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর। আমায় তিন দিন সময় দাও। আমি সেই সময়ের মধ্যে এই অভাগিনী জননীর একমাত্র কন্যাকে আনিয়া দিই। এই অনুরোধ রক্ষা করিলে তুমি যাহা চাও, আমি তাহাই তোমাকে দিব এবং ইচ্ছা করিলে তুমিও আমার সঙ্গে যাইতে পার।" এই প্রস্তাব শুনিয়া জ্যাভার্ট হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; ভলজীনকে কহিল, "তুমি কি আমার সহিত পরিহাস করিতেছ? আমাকে কি তুমি বোকা বুঝাইতেছ? তুমি একবার একটুকু ফাঁক পাইলে কি ছাড়িয়া কথা কহিবে? একবার পলাইলে তোমাকে ধরে, কাহার সাধ্য?"

ফ্যাণ্টাইনের ক্ষীণ জীবনতন্তু কেবল একটিমাত্র আশায় এখনও পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয় নাই। যখন সে শুনিল যে, তাহার কসেটকে আনা হয় নাই, তখন সেই নৈরাশ্যের তীব্র আঘাত সে সহ্য করিতে পারিল না। একই আঘাতে তাহার জীবনতন্তু ছিন্ন হইয়া গেল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস তাহার জীবন-প্রদীপকে ফুৎকারে নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলিল। ভলজীন আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি যেমন বালকের হস্ত অবলীলাক্রমে সরাইয়া দিয়া আপনাকে তাহার বাহুপাশ হইতে ছাড়াইয়া লয়, ভলজীনও সেইরূপে জ্যাভার্টের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইলেন।

কক্ষের এক পার্শ্বে একখানি ভগ্ন লৌহময় খট্টা ছিল। ভলজীন ধীরে ধীরে উঠিয়া সেই খট্টার নিকটে গেলেন। একটানে পর্য্যঙ্কের একটি পায়া খুলিয়া লইয়া আবার ফ্যাণ্টাইনের পার্শ্বে আসিয়া শয্যোপরি উপবেশন পূর্ব্বক জ্যাভার্টকে কহিলেন, "আমার কথা শুন, ভাল চাও ত আমায় এখন বিরক্ত করিও না।"

ভয়ে জ্যাভার্টের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। সে একবার মনে করিল—যাই, নীচে যাইয়া সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া আনি। আবার ভাবিল—যদি সেই অবসরে আসামী পলায়? শেষে সেখান হইতে না নড়াই সাব্যস্ত করিল। ভলজীন ফ্যাণ্টাইনের শয্যার উপরে উপবেশন করিয়া আস্তে আস্তে

তাহার মস্তকটি আপনার কোলে তুলিয়া লইলেন। ধীরে ধীরে অঙ্গুলি দ্বারা মরণের স্পর্শে স্থির ও জড় চক্ষু দুইটি বুজাইয়া দিলেন। সংসারের বন্ধন ভল-জীনের ছিল না। কিন্তু আজ এক অপরিচিতা পরিত্যক্তা রমণীর মরণে ভলজীনের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইতে লাগিল। সবল কর্কশ হস্তে চক্ষুজল মুছিয়া ভলজীন ফ্যাণ্টাইনের মস্তকটি আপনার কোল হইতে অতি সন্তর্পণে নামাইয়া উপধানের উপর রাখিলেন, তাহার পরিধানের বসন যাহা আলুথালু হইয়া গিয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া দিলেন। তাহার পরে মৃতার ললাটচুম্বন করিয়া ভলজীন ভূমিতলে হাঁটু গাড়িয়া ঊর্দ্ধোত্থিত ও যুক্ত করে ভগবানের নিকট মৃতার আত্মার সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করি-লেন। অনন্তর জ্যাভার্টের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এস, আমায় ধর, আমি প্রস্তুত আছি।"

জ্যাভার্ট ভলজীনকে ধরিয়া লইয়া গিয়া সতর্ক প্রহরিবেষ্টিত স্থানীয় জেলখানায় আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

ভলজীন আবার পলাইল।

মসিও ম্যাডিলিনকে ধৃত করায় এম-স্যুর-এম নগরে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কিন্তু যখন লোকে জানিল যে, সে ছদ্মবেশে ডাকাত জন্ ভলজীন, তখন আর কেহই তাহার সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিল না। মসিও ম্যাডিলিনের সমস্ত সৎ-কার্য্যগুলি বুদ্-বুদের ন্যায় মিলাইয়া গেল। তাহার দোষগুলি অতিরঞ্জিত হইয়া বিরাট্ দৈত্যের মত আকার ধারণ করিল। কেহই মসিও ম্যাডিলিনের এই আকস্মিক বিপৎপাতে দুঃখিত হইল না। দুঃখিত হইল কেবল তিন চারিটি লোক। তাহার মধ্যে ম্যাডিলিনের বৃদ্ধা পরিচারিকা এক জন।

যে দিন ম্যাডিলিন ধরা পড়িলেন, সেই দিনই কারখানার কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল। সেই দিনই সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধা পরিচারিকা অভ্যাসানুযায়ী প্রভুর কক্ষের দীপ জ্বালাইয়া দিয়া বিষণ্ণ-মনে শয্যা-রচনা করিতেছে, এমন সময় সে দেখিতে পাইল, কে যেন বাহির হইতে হাত গলাইয়া জানালার অর্গল খুলিতেছে। সে কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিল; পরে একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করায় চিনিতে পারিল যে, সে হস্ত, সে কোটের আস্তিন, সে অঙ্গুলি তাহার প্রভুরই, অন্য কাহারও নয়। পরক্ষণেই ভলজীন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরিচারিকা অনুচ্চস্বরে কহিল, "এ কি মসিও! আপনি কি করিয়া আসিলেন? আমি মনে করিয়াছিলাম—" ভলজীন কহিলেন, "আমি যে কারাগারে ছিলাম, তাহা ঠিক, তবে কারাগারের জানালার একটি শিক বাকাইয়া আজি বাহির হইয়া পলাইয়া আসিয়াছি। আমি এইখানেই আছি, তুমি একবার শীঘ্র যাইয়া ভগ্নী সিমপ্লিসকে ডাকিয়া লইয়া আইস।"

অনতিবিলম্বে ভগ্নী সিমপ্লিস আসিয়া ভলজীনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। ভলজীন ধরা পড়ার পর হইতে ভগ্নী সিমপ্লিস ক্রমাগত রোদন করিতেছিলেন, তাঁহার মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে, হাত-পা কাঁপিতেছে। জন্ ভলজীন একখানি কাগজে কি লিখিয়া তাহা সিমপ্লিসের হাতে দিয়া কহিলেন, "ভগ্নি! পাদরী মহাশয়কে এই চিঠিখানি দিবে। তুমি পড়িয়া দেখ, ইহাতে কি লেখা আছে।" সিষ্টার সিমপ্লিস পড়িলেন। পত্রে লেখা আছে—"আমি পাদরী মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি যে, তিনি যেন এখানে স্থাবর অস্থাবর আমার যে সমস্ত সম্পত্তি আছে, তাহা আসিয়া দখল করেন। তাহা হইতে মৃতা ফ্যাণ্টাইনের অন্তিম কার্য্যের জন্য যাহা ব্যয় হইবে, তাহা খরচ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা যেন দরিদ্র-দিগকে দান করেন।" ভগ্নী সিমপ্লিস কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আবেগে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, "প্রভু! আপনি একবার ফ্যাণ্টাইনকে শেষ দেখা দেখিবেন না?" ভলজীন কহিলেন, "না ভগ্নি! আমি কারাগার হইতে পলাইয়াছি, এ কথা এতক্ষণ রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে, আমাকে ধরিবার জন্য পুলিসের লোক ছুটিয়াছে।"

ভলজীনের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কক্ষের বাহিরে মনুষ্য-পদশব্দ ও কলরব শ্রুত হইল। সেই কলরবমধ্যে বৃদ্ধা পরিচারিকার আওয়াজ শুনা গেল। সে কাহাকে বলিতেছিল, মহাশয়! "আমি শপথ

করিয়া বলিতেছি যে, তিনি আদবে এখানে আসেন নাই। আমি এক মিনিটের জন্যও বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাই নাই।" একটি লোক তাহাতে উত্তর দিল, "ঐ যে ঐ ঘরে আলো জ্বলিতেছে।" সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভলজীন বুঝিলেন যে--সে জ্যাভার্ট। এই কক্ষের দেয়ালে এমন একটি স্থান ছিল যে, বাহির হইতে একটি স্প্রীং টিপিলে দেয়ালের মধ্যেই একটি শূন্য আলমারীর মত বাহির হইত। ভলজীন বাহিরের স্প্রীংটি টিপিয়া, সেই আলমারীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে স্প্রীং টিপিয়া দিলেন এবং একেবারে কক্ষ হইতে অন্তর্দ্ধান হইয়া গেলেন। ভগ্নী সিমপ্লিসও জানু পাতিয়া বসিয়া সান্ধ্য উপাসনার অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিলেন। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া জ্যাভার্ট যেন একটু থতমত খাইয়া গেল। তাহার নিশ্চয় ধারণা ছিল যে, ভলজীন সেই গৃহেই আছে। উপাসনানিরতা একাকিনী ভগ্নী সিমপ্লিসকে দেখিয়া সে একটু বোকা বনিয়া গেল; পরে ভগ্নী সিমপ্লিসকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভগ্নি! আপনি কি এই গৃহে একলা আছেন?" সিমপ্লিস উত্তর কবিল, "তাহা ত দেখিতেই পাইতেছেন।" জ্যাভার্ট একটু শিষ্টতা দেখাইয়া কহিল, "তাহা হইলে আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি কর্ত্তব্যের অনুরোধে আপনাকে বিরক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি। সে জন্য আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি।" এই কথা বলিয়া নমস্কার-পূর্ব্বক জ্যাভার্ট প্রস্থান করিল। সিষ্টার সিমপ্লিসের কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণই জ্যাভার্ট পাইল না।

এই ঘটনার প্রায় এক ঘণ্টা পরে একটি লোক নৈশ অন্ধকার ও কুজ্ঝটিকার আবরণে দেহ ঢাকিয়া দ্রুতপদে রাজপথ বাহিয়া এম-স্থুর-এম হইতে পারিসের অভিমুখে যাইতেছিল। তাহার গায়ে একটি ব্লাউজ, স্কন্ধোপরি একটি পুঁটুলি। সে লোকটি আর কেহ নহে—জন্ ভলজীন।

অভাগিনী ফ্যাণ্টাইন সম্বন্ধে একটি শেষ কথা—জগতের জীবমাত্রেই এক মাতার সন্তান, একই জননীর স্তন্যপানে পরিপুষ্ট। তিনি বিশ্বম্ভরা ভগবতী বসুন্ধরা। জীবনে যাহা পায় নাই, ফ্যাণ্টাইন মরণে বিশ্বজননীর কোলে যাইয়া সেই শান্তিটুকু পাইল। ভলজীনের ত্যক্ত সম্পত্তি যতদূর সম্ভব পাদরী মহাশয় আত্মসাৎ করিলেন। হতভাগ্য দরিদ্রদিগের অন্ত্যেষ্টির জন্য নিরূপিত "কবর-স্থানের" এক কোণে অভাগিনী ফ্যাণ্টাইনের শেষ-শয্যা রচিত হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

থেনার্ডিয়ার।

ওয়াটারলুর শোণিতদিগ্ধ সমর-প্রাঙ্গণে ফরাসী গৌরব-রবি অস্তমিত। সমর-স্থলী আহতের আর্ত্তনাদে ও নরমাংসভুক্ শ্বাপদকুলের বিকট বিরাবে পূর্ণ। রজনী গাঢ়তমসাচ্ছন্ন। জয়োন্মত্ত ইংরাজ-শিবিরে পরমানন্দে এক্স্যুৎসব চলিতেছে। বিজয়ী প্রুসিয়ানব্যূহ বিজিত ফরাসীদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। জয়-দৃপ্ত আয়রণ ডিউক একান্তে আপনার শিবিরে বসিয়া লর্ড বাথহর্ষ্টের জন্য যুদ্ধের রিপোর্ট লিখিতেছেন।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। এক জন লোক সেই ভীষণ অন্ধকার-প্লাবিত সমর-ক্ষেত্রে শ্বাপদের ন্যায় হামাগুড়ি দিয়া যেন কি অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে। এই লোকটির আকৃতি ইংরাজের মতও নয়, ফরাসীর মতও নয়, কৃষকের ন্যায়ও নয়, সৈনিকের ন্যায়ও নয়। মানুষের সহিত তাহার সৌসাদৃশ্য কিছুই নাই। যেন একটি প্রেতাত্মা নর-শোণিত-মাংস-গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া নরক ছাড়িয়া জগতে আসিয়াছে। যুদ্ধে হত বা আহতদিগের বসন-ভূষণ অপহরণই যেন তাহার ব্যবসায়। তাহার পরিধানে একটি ঢিলা ব্লাউজ, অনেকটা গাউনের মত দেখিতে। তাহার চলন-ভঙ্গী যেন একটু শঙ্কিত, অথচ ঘোর দুঃসাহসব্যঞ্জক। এ লোকটি কে? সম্ভবতঃ রহস্যময়ী নিশা তাহার একটু আধটু পরিচয় দিতে পারেন। সে দিনের আলোয় কখনও বাহির হয় না। তাহার নিকট ব্যাগ নাই; কিন্তু তাহার ব্লাউজের বড় বড় পকেট-গুলি লুণ্ঠিত দ্রব্যজাতে ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। শ্মশান-জাত আলেয়ার মত লোকটি সমর-ক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এই নৈশ-ভ্রমণকারী এক একবার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া যেন সেই বিভীষিকাপূর্ণ রণস্থলীর চারিদিক্ বেশ করিয়া দেখিয়া লইতে লাগিল। তাহার পদদ্বয় আগুল্ফ শোণিত-রঞ্জিত। সহসা বিদ্যুৎ চমকিত

হইল। সেই চকিতালোকে লোকটি কি যেন দেখিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। আবার বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইলে দেখিল যে, একরাশি মৃতের মধ্য হইতে একখানি হস্ত বাহির হইয়া রহিয়াছে। তাহারই একটি অঙ্গুলিতে কি যেন চক্‌চক্ করিতেছে। লুণ্ঠনকারী যেমন অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় খুলিতে যাইবে, অমনি কে যেন ভীষণ জোরে তাহার কব্জী চাপিয়া ধরিল। অন্য লোক হইলে সে তখনই ভয়ে কাঁপিয়া উঠিত; কিন্তু সে বিকট উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল, "কি বাবা মড়া! তুমি দেখছি, মরেও আঁকড়ান স্বভাব ছাড়ছ না।" মৃত যেন জীবিতের পরিহাস বুঝিল। সে লুণ্ঠনকারীকে অব্যাহতি দিল। লুণ্ঠনকারী গতিক কিছু না বুঝিতে পারিয়া একটু ভাল করিয়া দেখিবার ইচ্ছা করিল। সে মৃতের স্তূপ আস্তে আস্তে সরাইয়া সেই আহত সৈনিকপুরুষটিকে বাহির করিল। সৈনিক কিছু উচ্চপদস্থ। কারণ, তাহার বক্ষঃস্থলে অনেকগুলি সুবর্ণ-নির্ম্মিত পদক ও একখানি হীরকখচিত সুবর্ণ-ক্রুশ ঝলমল করিতেছিল। তাহার নেত্র নিমীলিত। সৈনিক হয় মৃত—না হয় মূর্চ্ছিত। লুণ্ঠনকারী ক্ষিপ্র-হস্তে সৈনিকের অঙ্গে যাহা কিছু মূল্যবান্ ছিল, খুলিয়া লইয়া আপনার সুবৃহৎ পকেট-মধ্যে রাখিল এবং প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। এমন সময়ে যেন সৈনিকের সংজ্ঞা একটু ফিরিয়া আসিল। অতি ক্ষীণস্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "যুদ্ধে কাহাদের জয় হইয়াছে?" লুণ্ঠনকারী কহিল, "ইংরাজের।" সৈনিকপুরুষ একটি বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "আমার পকেট খুঁজিয়া দেখ। একটি সোনার ঘড়ী ও চেন আছে; তুমি তাহা লও।" এই আদেশ পাইবার বহুক্ষণ পূর্ব্বেই লুণ্ঠনকারী তাহা আপনার পকেটজাত করিয়াছিল। সে একবার সৈনিকের পকেট একটু হাতড়াইয়া কহিল, "কিছুই নাই।" সৈনিকপুরুষ যেন একটু দুঃখিতভাবে কহিল, "কি করিব? তুমি আমাকে বাঁচাইলে। উহা তোমারই প্রাপ্য। কিন্তু দেখিতেছি, পূর্ব্বেই কোন্ চোরে তাহা লইয়াছে।" এই সময়ে দূরে পদশব্দ শ্রুত হওয়ায় লুণ্ঠনকারী পলাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং কহিল, "কে আসিতেছে! ইংরাজের পক্ষের লোক হইলে আমাকে ধরিবে।" সৈনিকপুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি কার্য্য কর?" লুণ্ঠনকারী উত্তর করিল, "আমি ফরাসী সৈন্যদলের এক জন সারজেণ্ট।"

"তোমার নাম?"

"থেনার্ডিয়ার।"

সৈনিকপুরুষ কহিল, "আমি বাঁচিয়া থাকিলে তোমার নাম ভুলিব না। তুমিও আমার নাম মনে রাখিও। আমার নাম পণ্টমারসি।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

—:o:—

বালিকা কসেট রাক্ষসীর হাতে।

ওয়াটারলু ক্ষেত্রে লুণ্ঠিত অর্থ ও দ্রব্যজাত লইয়া থেনার্ডিয়ার মণ্টফারমিলে একটি হোটেল ও দোকান খুলিল। থেনার্ডিয়ার-দম্পতির যৌথ-বুদ্ধিতে এই হোটেল পরিচালিত হইতে লাগিল। পাঠকের স্মরণ আছে, প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে অভাগিনী ফ্যাণ্টাইন এই রাক্ষস-দম্পতির হস্তে তাহার নয়নের মণি কসেটকে রাখিয়া যায়। তাহার পরে সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। হতভাগিনী জননী মরণের শান্তিময় অঙ্কে নিদ্রা যাইতেছে। মাতৃহীনা বালিকা কুক্কুরের পরিত্যক্ত, পর্য্যুষিত অন্নে কোন রকমে জীবন ধারণ করিতেছে। থেনার্ডিয়ার-দম্পতি সেই কদন্নের পরিবর্ত্তে তাহাকে ভারবাহী পশুর মত খাটাইয়া লইতেছে। মণ্টফারমিল পর্ব্বতের ঢালু-গাত্রে অবস্থিত। সেখানে শীত অত্যন্ত প্রখর। হোটেল হইতে জলের প্রস্রবণ প্রায় এক মাইল রাস্তা। হোটেলে যত পানীয় জল খরচ হয়, তাহা কসেটকেই আনিতে হয়। কারণ, থেনার্ডিয়ারের হোটেলে সে ভিন্ন দাস-দাসী আর কেহই নাই।

এবার খ্রীষ্টমাসে মণ্টফারমিলে একটি মেলা হইতেছে, খুব ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। থেনার্ডিয়ারের হোটেলেও খুব ভিড় হইয়াছে। কসেটের পানীয় সরবরাহের কার্য্যও অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে।

আজ খ্রীষ্টমাস সন্ধ্যা। থেনার্ডিয়ারের হোটেল ও পানাগার অভ্যাগতে ভরিয়া গিয়াছে। রাত্রি আটটার সময় চারি জন নূতন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইল। কসেটের অন্তরাত্মা ভয়ে শিহরিয়া

উঠিল। পানীয় জল কম পড়িয়া গেলে সেই রাত্রেই তাহাকে ঝরণা হইতে জল আনিতে হইবে। কসেট যাহা ভাবিতেছিল. ঠিক তাহাই হইল। আগন্তুকেরা আসিয়াই অশ্বের জন্য পানীয় জল চাহিল। ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার কসেটকে জল দিতে আদেশ করিল। কসেট ভয়ে জড়সড় হইয়া কহিল, "ম্যাডাম! জল বেশী নাই।" লাঙ্গুলাবমৃষ্টা সর্পীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার কহিল, "কেন নাই? দিন থাকিতে কেন সবগুলি পিপা জলে ভরিয়া রাখ নাই? এখন যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। যাও, এই অন্ধকারে যাইয়া ঝরণা হইতে জল লইয়া আইস। তাহা না হইলে তোমার রক্ষা নাই।" ভিত্তিগাত্রে একটি ক্যাটোনাইন-টেল চাবুক ঝুলিতেছিল। ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার একবার সেই দিকে আর একবার ভয়ে মুহ্যমানা অপরাধিনী হতভাগিনী কসেটের মুখের দিকে কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কসেটের বুঝিতে বাকী রহিল না। নিকটে একটি টেবিলে এক জন মাতাল বসিয়া কাদম্বরী সেবা করিতেছিল। তাহার মদিরা-বিভ্রান্ত হৃদয়েও বালিকা কসেটের উপর ম্যাডাম থেনার্ডিয়ারের এই পাশবিক ব্যবহার যেন একটু আঘাত দিল। কসেট ভয়ে যাইয়া টেবিলের তলায় আশ্রয় লইল। বজ্রের ন্যায় কঠোর নিনাদে ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার কহিল, "হতভাগি! পোড়ারমুখি! যদি ভাল চাস্ তো এখনি ওখান থেকে বেরিয়ে আয়, আর এখনি গিয়ে ঝরণা থেকে এক বালতি জল ধ'রে নিয়ে আয়।" থেনার্ডিয়ারের আদেশ অমান্য করার ফল কসেট বেশ জানিত। কি করিবে? মরুক আর বাঁচুক, কসেটকে সে আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেই হইবে। তাহার অনাহারক্লেশে কোটরগত চক্ষু ফাটিয়া টস্ টস্ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। কসেটকে কাঁদিতে দেখিয়া রাক্ষসী থেনার্ডিয়ার আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না, বাঘিনীর মত এক লম্ফে গিয়া কসেটের গলা টিপিয়া ধরিল, হিড় হিড় করিয়া টেবিলের নীচ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিল এবং প্রকাণ্ড একটি শূন্য বালতি তাহার হাতে দিয়া এক ধাক্কায় তাহাকে দরজার বাহিরে রাস্তায় বাহির করিয়া দিয়া কহিল, "যা—শীঘ্র গিয়া এক বালতি জল নিয়ে আয়, আর আসিবার সময় রুটীওয়ালার দোকান থেকে একখানা ভাল রুটি নিয়ে আসিস্।" এই কথা বলিয়া পোনের স্যু-মুদ্রা কসেটের হাতে দিয়া ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার সদর-দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

কসেট যন্ত্রণায় কাঁদিতে কাঁদিতে, শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া মুদ্রাটি তাহার জীর্ণ অঙ্গরাখার বুকের পকেটে রাখিয়া ধীরে ধীরে প্রস্রবণ-অভিমুখে চলিয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

প্রথম সাক্ষাতে।

কারাগারে গবাক্ষের গরাদে ভাঙ্গিয়া, পুলিস ও প্রহরীদের চক্ষে ধূলি দিয়া ভলজীন পলাইল। জ্যাভার্ট-প্রমুখ প্রসিদ্ধ পুলিস-কর্ম্মচারিগণ শত চেষ্টাতেও তাহাকে আর ধরিতে পারিল না। ভলজীন পলাইল বটে, কিন্তু সে তাহার নিজের জন্য নহে। আজ তাহার শিরে এক অতি মহান্ কর্ত্তব্যের গুরু-ভার ন্যস্ত। অভাগিনী ফ্যান্টাইনের মৃত্যুকালীন বাসনা পূর্ণ করিতে ভলজীন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই ছদ্মবেশে কয়েক মাস এখানে ওখানে ঘুরিয়া ভলজীন যখন বুঝিল যে, পুলিস এক্ষণে তাহাকে ধৃত করা সম্বন্ধে অনেকটা হতাশ ও গতানুরাগ হইয়া আসিয়াছে, তখন সে আসিয়া আস্তে আস্তে মণ্টফারমিলে উপস্থিত হইল।

নিয়তির অটুট অলঙ্ঘ্য নিয়মে মণ্টফারমিলে প্রবেশ করিয়াই ভলজীন বিনা আয়াসে সর্ব্বপ্রথমেই এক অতি অভাবনীয়ভাবে তাহার সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান পাইল।

ঝরণা হইতে জল ভরিয়া, কসেট অতি কষ্টে সেই গুরুভার বালতি লইয়া অন্ধকার রাস্তা বাহিয়া কোন প্রকারে হোটেলের দিকে যাইতে লাগিল। বালিকা কতকদূর বালতিটি লইয়া যায়, যখন আর চলিতে না পারে, তখন বালতিটিকে নামাইয়া একটু বিশ্রাম করিয়া লয়, আবার চলিতে আরম্ভ করে। ভলজীন তাহার পশ্চাতে থাকিয়া বালিকার এই কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। শেষে আর না থাকিতে পারিয়া পশ্চাৎ হইতে আসিয়া অতি সন্তর্পণে বালতির হাতল ধরিয়া কসেটের

সহিত চলিতে লাগিলেন। সহসা ভার লাঘব হওয়ায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কসেট ফিরিয়া দেখিল, কিন্তু সে ভয় পাইল না। ভলজীন অতি মৃদুস্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণি! এই জল সমেত বাল্‌তিটি অত্যন্ত ভারী! না?" কসেট উত্তর করিল, "হাঁ মহাশয়!" ভলজীন বলিলেন, "তুমি ওটি আমাকে দাও। আমি লইয়া যাইতেছি।" কসেট বাল্‌তিটির হাতল ছাড়িয়া দিল এবং ভলজীনের সহিত পাশাপাশি হইয়া চলিতে লাগিল। ভলজীন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালিকা! তোমার বয়স কত?"

"আট বৎসর।"

"তোমাদের বাড়ী এখান থেকে কত দূর?"

"প্রায় পোনর মিনিটের রাস্তা।

"তোমার মা-বাপ নাই?"

"আমি জানি না। অন্য মেয়েদের মা-বাপ আছে দেখিতে পাই। আমার কিন্তু মা-বাপ কিছুই নাই। বোধ হয়, কখন ছিলও না।" বালিকা সরলভাবে এই উত্তর করিল। ভলজীন বালিকার সরলতায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কি এক অনির্ব্বাচ্য স্নেহরসে ভলজীনের কুলিশ-কঠোর হৃদয় যেন আর্দ্র হইয়া আসিল। তিনি বাল্‌তিটিকে ভূমিতলে নামাইয়া দুই হাতে বালিকার মুখখানি তুলিয়া রজনীর অস্পষ্টালোকে একবার সেই মুখখানিকে ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণি! তোমার নাম কি?" বালিকা বলিল, "কসেট।" ভলজীনের হৃদয়-তন্ত্রীতে এক বিষম ঝঙ্কার দিল। তিনি বাল্‌তি তুলিয়া লইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। কসেট তাঁহার পাশে পাশে চলিতে লাগিল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া ভলজীন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণি! তোমাকে জল লইবার জন্য কে পাঠাইয়াছে?" কসেট বলিল, "ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার।"

"সে কে?"

"আমার মনিব। এই গ্রামে তাঁহার হোটেল আছে।"

"ওঃ—সে হোটেলে আজ রাত্রি আমি থাকিতে পারি?"

"অবশ্য।"

"তবে আমাকে রাস্তা দেখাইয়া চল।"

"আমরা সেইখানেই যাইতেছি।"

আবার দুই জনে কিছুক্ষণ নীরবে যাইতে যাইতে ভলজীন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ম্যাডাম থেনার্ডিয়ারের কি চাকর-বাকর নাই? তুমি ছাড়া আর কেহ কি সেখানে থাকে না?"

"হাঁ, থাকে বই কি।"

"কাহারা থাকে?"

"ইপোনাইন থাকে,—আজেলমা থাকে।"

"কে তাহারা?"

"ম্যাডাম থেনার্ডিয়ারের মেয়ে।"

"তাহারা কি করে?"

"তাহারা কি করিবে? খায়-দায় এবং সমস্ত দিন খেলিয়া বেড়ায়। তাহাদের কেমন সুন্দর সুন্দর পুতুল আছে।"

"আর তুমি?"

"আমি সমস্ত দিন কাজ করি।"

"সমস্ত দিন?"

বালিকা মুখ তুলিল। তাহার অক্ষিকোণে মুক্তাফলের ন্যায় দুই ফোঁটা জল। সে মৃদুস্বরে কহিল, "হাঁ মহাশয়! আমাকে সমস্ত দিনই কাজ করিতে হয়। তবে সন্ধ্যার পর, কোন কোন দিন, সব কাজ সারা হইলে আমি একটু-আধটু খেলিতে পাই। আর আমি কি লইয়াই বা খেলিব? ইপোনাইন, আজেলমা তাহাদের পুতুল লইয়া আমায় খেলিতে দেয় না। আমার খেলনার মধ্যে কেবল একখানি কড়ে আঙুলের মত ছোটো সীসার তরোয়াল আছে। আমি তাই নিয়ে খেলি।" এই বলিয়া বালিকা তাহার চম্পককোরক-সদৃশ কনিষ্ঠাঙ্গুলি দেখাইল। ভলজীনের হৃদয় স্নেহ-রসে আপ্লুত হইল।

এইরূপ গল্প করিতে করিতে তাহারা প্রায় হোটেলের নিকট আসিল। তখন কসেট কহিল, "মহাশয়! এইবার আমরা হোটেলের কাছে আসিয়াছি, বাল্‌তিটি এখন আমাকে দিন। তাহা না হইলে ম্যাডাম চটিয়া যাইবে।"

ভলজীন বুঝিলেন। তিনি বাল্‌তি কসেটের হাতে দিলেন। ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার কসেটের আসিতে বিলম্ব হওয়ায় একেবারে উগ্রচণ্ডা-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। কসেট প্রবেশ করিবামাত্র তাহাকে গালি দিয়া কহিল, "হতভাগী! এক বাল্‌তি জল আন্‌তে এত দেরী! বোধ হয়, রাস্তায়

কোন খেলুনী জুটিয়াছিল; তাহার সঙ্গে খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলি!" ম্যাডাম থেনাডিয়ারের দুর্ব্বলতা কোথায়, তাহা কসেটের জানা ছিল। সে তাড়াতাড়ি কহিল, "ম্যাডাম! এই ভদ্রলোকটি আজ রাত্রিতে থাকিবার জন্য বাসা খুঁজিতেছেন।" অগ্নিতে বারি নিক্ষিপ্ত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে ম্যাডাম থেনাডিয়ারের মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। রাগ-রক্ত অক্ষিকোণে কাষ্ঠ-হাসির বিকৃত ছায়া ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু আগন্তুকের বেশ-ভূষার পারিপাট্য এবং চেহারা দেখিয়াই আবার বিদ্যুতের মত চকিত হইয়া তাহা মিলাইয়া গেল। পাকা হোটেলওয়ালীর চালে সে আগন্তুককে কহিল, "ভিতরে এস।" এক বার ইঙ্গিতে অপরের অলক্ষিতে, স্বামী থেনার্ডিয়রকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি করা যাইবে?' স্বামীও ইঙ্গিতে জানাইল, 'শীকার সুবিধা নহে—ভাগাইয়া দাও।' ম্যাডাম থেনাডিয়ার আগন্তুককে কহিল, "কর্ত্তা! আমার হোটেলে ঘর খালি নাই, অন্যত্র চেষ্টা কর।" ভলজীন কহিলেন, "আমাকে আস্তাবলে কিংবা ছাদের উপর যেখানে হউক, একটু জায়গা দাও; আমি শয়ন-ঘরের যাহা ভাড়া, তাহাই দিব।" ম্যাডাম থেনাডিয়ার একটা আজগুবি রকমের দাম হাঁকিল 'চল্লিশ সু।' ভলজীন বলিলেন, "তাহাই দিব।" এই কথা বলিয়াই ভলজীন ঘরের কোণে তাঁহার যষ্টি এবং ঝুলি রাখিলেন এবং একখানি টুল টেবিলের নিকট লইয়া উপবেশন করিলেন। হোটেল-স্বামীর আজ্ঞাক্রমে কসেট আসিয়া এক বোতল মদ্য ও একটি গেলাস তাঁহার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিল। ভলজীনের সে দিকে লক্ষ্য নাই। তিনি একদৃষ্টে কেবল কসেটের মুখের পানে দেখিতেছিলেন। সহসা ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার কসেটকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কই—রুটী কই?' কসেট ভলজীনের সহিত কথোপকথনে রুটীর কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিল। এখন হঠাৎ কি জবাব দিবে, ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। কাজেই যাহা মুখে আসিল, তাহা সে বলিয়া দিল। সেটি মিথ্যা কথা। কসেট বলিল, 'রুটীর দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।'

থেনার্ডিয়ার-পত্নী কহিল,'কড়া নাড় নাই কেন?'

"নাড়িয়াছিলাম—কেহ সাড়া দিল না।"

থেনার্ডিয়ার-পত্নীর সে কথায় বিশ্বাস হইল না। সে কহিল, "আচ্ছা—কাল সকালে আমি রুটীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিব। যদি মিথ্যা কথা হয়, তবে মজা টের পাইবে। এখন আমার পোনর সু আমাকে ফিরাইয়া দাও।" কসেট রক্ষা পাইল—সে তাড়াতাড়ি বুকের পকেটে হাত দিল। পকেটে হাত দিয়াই বালিকার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ভয়ে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। মুদ্রাটি তাহার পকেট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। কসেট যে সময় ঝরণা হইতে জল ধরিতেছিল, সেই সময় বার বার বালতি পূর্ণ হইয়াছে কি না উবুড় হইয়া তাহাই দেখিতেছিল। সেই সময়ে কখন টুপ করিয়া মুদ্রাটি তাহার পকেট হইতে পড়িয়া গিয়াছে, সে তাহা আদবে লক্ষ্য করে নাই। কসেটের সেই অবস্থা দেখিয়া ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার রাগে গর্জ্জিয়া উঠিল এবং চীৎকার করিয়া কহিল, "ও—শেষে চোর হয়ে দাঁড়িয়েছিস দেখ্‌ছি।" বালিকা অধোমুখে রোদন করিতে লাগিল। এবার ম্যাডাম থেনার্ডিয়ারের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত হইল। সে ভিত্তিগাত্রে বিলম্বিত চাবুক লইয়া কসেটকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। কসেট ভয়ে এতটুকু হইয়া চিমনীর কোণে গিয়া আশ্রয় লইল। এমন সময় ভলজীন উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কহিলেন, "ম্যাডাম! একটু অপেক্ষা করুন—আমি কি একটা মুদ্রার ন্যায় জিনিস মেয়েটির পকেট হইতে পড়িতে দেখিলাম।" এই বলিয়া তিনি মেজের চারিধারে খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন; কিছুক্ষণ পরে কুড়ি সু মুদ্রা কুড়াইয়া পাইবার ভাণ করিয়া কহিলেন, "হাঁ—এই যে—দেখুন ত, এইটি না কি?" বিনা আয়াসে অতি অল্পসময়ের মধ্যে পাঁচটি সু লাভ হইল দেখিয়া ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার আসল কথা একেবারে চাপিয়া গেল, আর কোন উচ্চবাচ্য করিল না; কেবল কসেটের পানে রোষ-কষায়িত লোচনে চাহিয়া বলিল, "খবরদার!—আর এমন কাজ করিও না।" কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ-নয়নে কসেট একবার তাহার উপকারকের মুখপানে চাহিয়া ধীরে ধীরে তাহার নিরূপিত কোণে যাইয়া আসন গ্রহণ করিল এবং থেনার্ডিয়ার-তনয়ার জন্য পশমের মোজা বোনার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিল এবং এক একবার মুখ তুলিয়া ভলজীনের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। থেনার্ডিয়ার-দম্পতিও আড়-চোখে ভলজীনের এই সকল কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। ম্যাডাম থেনাডিয়ার দুই একবার

কসেটকে এইরূপ অন্যমনস্ক হইতে দেখিয়া একেবারে হাতে হাতে ধরিয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "মিস্! আমি তোমাকে এবার ধরিয়াছি। এই রকম কাজ করিলে আমাকে চাবুক দিয়া তোমার নিকট কাজ আদায় করিতে হইবে।" আগন্তুক ম্যাডাম থেনার্ডিয়ারকে কহিলেন, "ম্যাডাম! মেয়েটিকে একটু খেলিতে দিন না।" কোন বড়লোক আগন্তুক এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অবশ্য ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার তাহাকে আপ্যায়িত করিতে দ্বিধা বোধ করিত না; কিন্তু সেই ছিন্ন-কোট-পরিহিত ভগ্নহ্যাট-শোভিত-শির দরিদ্র আগন্তুকের এই অন্যায্য আব্দার গ্রাহ্য করিতে সে আপনাকে ন্যায়ধর্ম্মতঃ অশক্ত মনে করিয়া ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিল, "সে কাজ করিবে না তো খাইবে কি? আমি তাহাকে এমনি খাইতে দিতে পারি না।"

"এখন সে কি করিতেছে?"

"আমার মেয়ের জন্য মোজা বুনিতেছে।"

"ঐ মোজাজোড়া কবে বোনা শেষ হইবে?"

"ও মেয়েটা যে রকম কুড়ে, তাহাতে অন্ততঃ তাহার চার পাঁচ দিন লাগিবে।"

"মোজাজোড়া বোনা শেষ হইলে তাহার দাম কত হইতে পারিবে?"

"অন্ততঃ ত্রিশ সু।"

"আমি ঐ মোজাজোড়াটার দাম পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক দিতেছি; আমার নিকট উহা বিক্রয় করুন।"

স্বামী থেনার্ডিয়ার যদিও তাহার নিদাঘ-বান্ধবগণের সহিত মদ্য-পানে ও হাস্য-পরিহাসে নিযুক্ত ছিল, তথাপি সে এই বৃদ্ধ আগন্তুকের প্রতি ক্ষুদ্র কার্য্যকলাপ ও অঙ্গভঙ্গী সতৃষ্ণ-নয়নে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। আগন্তুকের মোজা-ক্রয় বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়া সে বলিল, "নগদ দাম পাইলে, অতিথির সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করিতে আমরা বাধ্য। আপনি পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক দিয়া মোজাজোড়া কিনিতে পারেন।" ভলজীন পকেট হইতে একটি পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক মুদ্রা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন এবং ম্যাডাম থেনার্ডিয়ারকে বলিলেন, "এই লউন মোজার দাম" এবং কসেটকে বলিলেন, "বালিকা! তোমার পরিশ্রম আমি কিনিয়া লইয়াছি, তুমি এখন স্বচ্ছন্দে খেলিতে পার।" থেনার্ডিয়ার এতক্ষণে তাহার আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিল; আস্তে আস্তে মুদ্রাটি আপনার পকেটে ফেলিল। থেনার্ডিয়ার-পত্নী অবাক্ হইয়া রহিল! কসেট ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ম্যাডাম থেনার্ডিয়ারকে জিজ্ঞাসা করিল, "ম্যাডাম, সত্য সত্যই কি আমি খেলিতে পারি?" রাগে গর-গর করিতে করিতে ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার কহিল, "যাও– খেল গিয়া।"

স্বামী থেনার্ডিয়ার আস্তে আস্তে গিয়া আপন আসনে উপবেশন করিয়া মদ্যপান আরম্ভ করিল। থেনার্ডিয়ার-পত্নীও গিয়া তাহার গা ঘেঁসিয়া বসিল, স্বামীর কানে কানে চুপে চুপে বলিল. "এ লোকটা কে?" থেনার্ডিয়ার বিজ্ঞের ন্যায় আস্তে আস্তে বলিল, "আমি অনেক ক্রোরপতিকে দেখিয়াছি. তাহাদের সাজ-সজ্জা চলন-বলন এই রকম গরিবানী। কিন্তু তাহাদের ধুকুড়ির ভিতরে খাসা চাল।"

কসেট তাহার বুনিবার কাঁটা ও পশম প্রভৃতি সরাইয়া রাখিয়া একটি ছোট কাঠের বাক্স বাহির করিল। তাহার মধ্যে কতকগুলি ছিন্ন মলিন নেকড়া ও তাহার পূর্ব্ব-বর্ণিত অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ সেই সীসার তরোয়ালখানি। তাহাই লইয়া বালিকা আপন মনে খেলিতে লাগিল। ভলজীন একভাবে একই আসনে বসিয়া সরলা বালিকার কার্য্য-কলাপ দেখিতে লাগিলেন। থেনার্ডিয়ার-দম্পতি এই স্বল্প মাল-মশালায় একটি বিরাট রহস্যস্তূপ সৃজনের নিষ্ফল প্রয়াসে নিয়োজিত রহিল।

গৃহের অপর এক অংশে থেনার্ডিয়ার-কন্যা ইপোনাইন ও আজেলমা একটি বিড়াল ধরিয়া আনিয়া তাহাকেই নানা প্রকার পোষাকে সাজাইতেছিল এবং তাহাই লইয়া খেলিতে ব্যস্ত ছিল। তাহাদের খেলিবার একটি পুতুল মেজের উপর গড়াগড়ি যাইতেছিল! কসেট দেখিল, সকলেই গল্প, আমোদ ও খেলায় নিযুক্ত। কেহ তাহাকে দেখিতেছে না। এই অবসরে ঐ পুতুলটি লইয়া একটু খেলিবার বাসনা তাহার হৃদয়ে অত্যন্ত বলবতী হইল। সে আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়া গিয়া পুতুলটিকে তুলিয়া লইয়া সস্নেহে তাহাকে বার বার চুম্বন করিল। দশ মিনিট-কাল কেহই তাহা লক্ষ্য করিল না। সহসা আজেল-মার নজর সেই দিকে পড়িল। সে ভগ্নী ইপো-নাইনকে বলিল, "দিদি! দেখ—"

দুই ভগ্নীই কসেটের কার্য্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। কসেট তাহাদের পুতুল লইয়া খেলিতেছে!

তাহার এত সাহস হইয়াছে! ইপোনাইন আস্তে আস্তে উঠিয়া তাহার মায়ের নিকটে গিয়া. তাহার কানে কানে কহিল,"দেখ মা, কসেটের কাণ্ড দেখ!" বজ্র-গম্ভীর-নিনাদে ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার হাঁকিল, "কসেট!" বালিকা শিহরিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি পুতুলটিকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া অবনত-বদনে তাহার দারুণ দুষ্কর্ম্মের ফল দুই চারিটি চড়-চাপড়ের জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিতে লাগিল। ভলজীন হোটেল-স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি? কি হইয়াছে?" ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার কহিল, "দেখুন মহাশয়! ছুঁড়ীর সাহস দেখুন একবার! আমার মেয়েদের খেলিবার পুতুল লইয়া খেলিবার সাহস উহার হইয়াছে!"

ভলজীন আর কিছু না বলিয়া সটান উঠিয়া সদর দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সেই সুযোগে ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার কসেটকে বেশ দুই চারি ঘা প্রহার করিল। কসেট চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অতি অল্পক্ষণ পরেই ভলজীন ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার হাতে রেশমী পরিচ্ছদে সজ্জিত একটি সুন্দর বড় পুতুল। পুতুলটি আনিয়া তিনি কসেটের সম্মুখে সেটিকে বসাইয়া দিয়া বলিলেন,"এটি তুমি লও।" কসেট কি করিবে, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। সে একবার ভলজীনের মুখের দিকে চাহে, আবার পুতুলটির দিকে চাহে। সেই সুন্দর পুতুলটি স্পর্শ করিতে তাহার সাহসেই কুলাইল না। সে আস্তে আস্তে আপনার চিরাভ্যস্ত গৃহকোণে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার মনে মনে আগন্তুকের উপর বিষম চটিয়া গেল। রাগে ও ঈর্ষ্যায় তাহার শিরায় শিরায় গরল প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে তখনই নিজ কন্যাদিগকে শয়নাগারে পাঠাইয়া দিল। "দিনের বেলা খাটুনি বেশী হইয়াছে"—এই অজুহাত দেখাইয়া কসেটকেও যাইয়া শয়ন করিতে আদেশ দিল। কসেট ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তখন ভলজীন বলিলেন, "ও:—তোমার পুতুলটি লইয়া যাও,শয়ন কর গিয়া!" এবার আশ্বস্ত হইয়া বালিকা তাহার জীবনের তৃপ্তসাধ—সেই সুন্দর পুতুলটিকে কোলে লইয়া শয়ন করিতে গেল। যাইবার সময় একবার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে ভলজীনের মুখের দিকে চাহিয়া বালিকা চলিয়া গেল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। খরিদ্দারগণ সকলেই চলিয়া গেল। ভলজীন একই ভাবে টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া বসিয়া আছেন। স্বামী থেনার্ডিয়ার পত্নীকে একপার্শ্বে লইয়া গিয়া তাহার কানে কানে বলিল, "দেখিতেছ না? লোকটা ক্রোরপতি, উহাকে মুখে খুব খাতির কর। বেশ দু পয়সা রোজগার করিয়া লওয়া যাইবে। বিশেষ আমি ইহার মধ্যে একটি বিশাল রহস্যের আভাস পাইতেছি। অর্থশালী লোকের রহস্য গলিত-সুবর্ণ-পরিপূর্ণ স্পঞ্জের ন্যায়। যখনই চাপ দিবে, তখনই তাহা হইতে দু পয়সা বাহির হইবে।"

স্বামীর এই পরামর্শ পত্নীর নিকট বেশ সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। সে ধীরে ধীরে আগন্তুকের নিকট গিয়া বলিল, "মহাশয়! রাত্রি অনেক হইয়াছে। শয়ন করিবেন না?" ভলজীন বলিলেন. "বেশ! আমাকে শয়নের স্থান দেখাইয়া দিন।" থেনার্ডিয়ার-দম্পতি অগ্রে অগ্রে চলিলেন, পশ্চাতে ভলজীন। হোটেলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শয়ন-কক্ষে ভলজীনকে লইয়া গিয়া থেনার্ডিয়ার কহিল. "আমার হোটেলের মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও সুসজ্জিত শয়ন-কক্ষ। আপনাদিগের ন্যায় বিশিষ্ট ভদ্রলোক না পাইলে এই কক্ষ কদাচ ব্যবহৃত হয় না। আপনি বিশ্রাম করুন—আমরা আসি। আবার কালি প্রাতে দেখা হইবে।" থেনার্ডিয়ার-দম্পতি প্রস্থান করিল। ভলজীন একখানি আসন টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন এবং চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

—:•:—

কসেটের উদ্ধার।

সমস্ত রাত্রি ভলজীনের নিদ্রা হইল না। কি উপায়ে তিনি কসেটকে এই রাক্ষস-দম্পতির হস্ত হইতে উদ্ধার করিবেন—এই চিন্তাতেই রজনী কাটিয়া গেল।

ভলজীন অতি প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার যষ্টি ও ঝুলি লইয়া নিম্নতলে গেলেন। ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার ইহার অনেক পূর্ব্বেই উঠিয়া গৃহসম্মার্জ্জনে

ও অঙ্গনাদি পরিষ্করণে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ভলজীনকে এত প্রত্যূষেই নিম্নতলে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে যথারীতি অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, "কি মহাশয়! আপনি এত সকালেই চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন না কি?" ভলজীন উত্তর করিলেন, "হাঁ, আপনাকে কল্য রাত্রি-বাসের জন্য কত দিতে হইবে?" ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার স্বামীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, তথা হইতে একখানি বিস্তৃত বিল প্রস্তুত করিয়া আনিয়া ভলজীনের হস্তে দিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "তেইশ ফ্র্যাঙ্ক।" ভলজীনের দৃষ্টি বিলের অঙ্কের উপর ছিল না। তাঁহার মন তখন অন্য প্রকার চিন্তায় ব্যাপৃত ছিল। অন্যমনস্ক-ভাবে ভলজীন কহিলেন, "এখানে আপনাদের ব্যবসায় বোধ হয় বেশ চলে?" হোটেলস্বামিনী উত্তর করিল, "এক রকম মন্দ চলে না। তবে আপনার ন্যায় ধনশালী খরিদ্দার খুব অল্পই জুটে, হীন অবস্থার লোকই বেশী। একে জিনিসপত্র সমস্তই মহার্ঘ্য, তাহাতে আবার ঐ ছোট মেয়েটির ভরণ-পোষণ করিতে আমাদের বহু ব্যয় হয়।"

"কোন্ মেয়েটি?"

"কেন, কসেট!"

ভলজীন একটু অন্যমনস্কতার ভাণ করিয়া কহিলেন, "যদি উহার ভার হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া দেওয়া যায়?"

হোটেল-স্বামিনীর বারুণী-সেবন রাগরক্ত মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "বেশ তো, আপনি উহাকে লইয়া যান। আমরা তাহা হইলে বাঁচি। লইয়া যাইবেন না কি?"

"হাঁ।"

"এখনই!"

"বেশ ত, এখনই।"

"মেয়েটিকে তাহা হইলে ডাকিব না কি?"

"অবশ্য।"

ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার চীৎকার করিয়া ডাকিল, "কসেট।"

ভলজীন পকেট হইতে পাঁচটি পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক মুদ্রা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন, "এই লউন, আপনার বিলের টাকা—তেইশ ফ্র্যাঙ্ক। আর দুই ফ্র্যাঙ্ক চাকর বাকরদিগের বকসিস্। এইবার আপনি গিয়া মেয়েটিকে লইয়া আসুন।"

ঠিক এই সময়ে স্বামী থেনার্ডিয়ার আসিয়া কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া পত্নীকে বলিলেন, "না গৃহিণি! এই ভদ্রলোকের বিল তেইশ ফ্র্যাঙ্ক নহে, ছাব্বিশ সু মাত্র।" ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "কি! মোটে ছাব্বিশ সু!" স্বামী থেনার্ডিয়ার কহিল, হাঁ, "কুড়ি সু—ঘরভাড়া ও ছয় সু—খাবারের দাম। আর এই বালিকাটির সম্বন্ধে আমি একটু এই ভদ্রলোকের সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিতে চাই।" স্বামীর ব্যবসাদারী চালের উপর স্ত্রীর অগাধ বিশ্বাস ছিল। সে আস্তে আস্তে গৃহের বাহিরে চলিয়া গেল। ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার চলিয়া গেলে, স্বামী থেনার্ডিয়ার একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া ভলজীনকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল—নিজে দাঁড়াইয়া রহিল। ভলজীন উপবেশন করিলে পর থেনার্ডিয়ার কহিল, "মহাশয়! সত্য কথা বলিতে কি,—এই বালিকাটিকে আমরা প্রাণের সহিত ভালবাসি।"

ভলজীন স্থির দৃষ্টিতে থেনার্ডিয়ারের মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন, "কোন্ মেয়েটি?"

'কেন, আমাদের কসেট! আপনি তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন না? স্পষ্ট বলিতেছি যে, আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিব না। আমরা তাহাকে এতটুকু বেলা হইতে মানুষ করিয়াছি। নিজের মেয়ের মত আমরা তাহাকে ভালবাসি। সে চলিয়া গেলে আমাদের গৃহ শূন্য হইয়া যাইবে।"

ভলজীনের দৃষ্টি অচঞ্চলভাবে থেনার্ডিয়ারের মুখের দিকে নিবদ্ধ!

থেনার্ডিয়ার কহিল, "মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু মেয়েটিকে আমি কি করিয়া এক জন অপরিচিতের হস্তে দিব? যদিই বা দিই, তাহা হইলে আমার জানা আবশ্যক যে, যাহার নিকটে আমি মেয়েটিকে দিতেছি, সে কে,—কি করে—কোথায় থাকে? আমি আপনার নাম পর্য্যন্ত জানি না।"

ভলজীন অবিচলিত-কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "মসিও থেনার্ডিয়ার! আমার পরিচয় আপনাকে দিব না এবং আমি যে কোথায় থাকি - কি করি—কিছুই আপনার নিকট বলিব না। যদি কসেটকে আপনি দেন, তাহা হইলে এই সর্ত্তে আমায় দিতে হইবে যে,

আপনি আর কখনও কসেটকে দেখিতে পাইবেন না। যদি এই সর্ত্তে কসেটকে আমায় দেন, তাহা হইলে দিতে পারেন, অন্যথা প্রয়োজন নাই।”

থেনার্ডিয়ার ধূর্ত্ত। সে এক মুহূর্ত্তেই অবস্থা বুঝিয়া লইল। সিংহকে উত্তেজিত করিবার সাহস তাহার হইল না। তাহাতে কাজও হইবে না। ভলজীন যে প্রকৃতির লোক, তাহাতে তাঁহার সহিত শঠতা চলিবে না; বরং খোলা কথায় কাজ হইবে। সে ঘোরফের ছাড়িয়া দিয়া একেবারে বলিয়া ফেলিল, “মহাশয়! আমাকে দেড় হাজার ফ্র্যাঙ্ক দিতে হইবে।”

আগন্তুক তাঁহার পকেট হইতে একটি পুরাতন ময়লা চামড়ার নোটকেস বাহির করিয়া তাহা হইতে এক একখানি পাঁচ শত ফ্র্যাঙ্কের ব্যাঙ্কনোট তিনখানি বাহির করিয়া তাহা থেনার্ডিয়ারের সম্মুখে টেবিলে রাখিয়া বলিলেন, “যাও—এখন কসেটকে লইয়া এস।”

স্বামীর আজ্ঞাক্রমে ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার অবিলম্বে যাইয়া কসেটকে সেই গৃহে লইয়া আসিল। আগন্তুক তাহার পুঁটুলির মধ্য হইতে একটি সুন্দর কাল রঙের মখমলের পোষাক বাহির করিয়া কসেটের হাতে দিয়া বলিলেন, “যাও সোনা! তোমার ময়লা কাপড় ছাড়িয়া শীঘ্র এই পোষাকটি পরিয়া আইস।”

প্রভাত হইয়াছে। রাস্তায় দুই চারি জন লোক চলাফেরা করিতেছে। নবপরিচ্ছদে সজ্জিত একটি আট বৎসরের বালিকা, জীর্ণ-পরিচ্ছদধারী পঞ্চাশদ্‌-বর্ষীয় এক জন বৃদ্ধের হাত ধরিয়া বরাবর পারিসের রাস্তা বাহিয়া যাইতেছে। বালিকার কোলে একটি বড় পুতুল। বৃদ্ধের হস্তে একখানি স্থূল যষ্টি।

চতুর্বিবংশ পরিচ্ছেদ

—•—

থেনার্ডিয়ারের ধৃষ্টতা।

একসঙ্গে এত টাকার ব্যাঙ্কনোট থেনার্ডিয়ার পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। অত্যধিক আনন্দে সে নোটগুলিকে ফিরাইয়া ঘুরাইয়া উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া বার বার দেখিতে লাগিল। যতবার দেখে, তাহার আর তৃপ্তি হয় না। প্রায় এইরূপ ভাবে অর্দ্ধঘণ্টা কাটিয়া গেল। সে তখন ম্যাডাম থেনার্ডিয়ারকে ডাকিল; পার্শ্বের আসনে বসিতে বলিয়া, সে তাহার কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, “এই দেখ গিন্নি! দেড় হাজার ফ্র্যাঙ্ক আদায় করিয়াছি. তিন কেতা পাঁচ শত ফ্র্যাঙ্কের নোট।”

ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার বলিল, “মোটে দেড় হাজার!”

বিবাহের পরে এই প্রথম ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার তাহার স্বামীর কার্য্য সমালোচনা করিতে সাহসী হইল। কিন্তু এ আঘাত বড়ই সাংঘাতিক, এ আঘাত বাস্তবিকই থেনার্ডিয়ারের মর্ম্মস্পর্শ করিল। সে পত্নীকে কহিল, “ঠিক বলিয়াছ। আমি গর্দ্দভ—অতটা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। শীঘ্র আমার টুপী দাও, আমি দেখি, যদি অপরিচিতের নাগাল ধরিতে পারি।”

থেনার্ডিয়ার নোট তিনখানি পকেটের ভিতর ফেলিয়া একলম্ফে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। রাস্তায় পথিকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া, যে পথে ভলজীন কসেটকে লইয়া যাইতেছিলেন, সেই পথ স্থির করিয়া থেনার্ডিয়ার ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। এবং মনে মনে আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আপনাকে সহস্র গালি দিতে লাগিল। ছুটিতে ছুটিতে থেনার্ডিয়ার গ্রাম ছাড়িয়া মাঠের নিকট গিয়া পড়িল। রাস্তার পার্শ্বেই একটি ক্ষুদ্র ঝোপ। সেই ঝোপের অপরপার্শ্বে একটি টুপী দেখিয়া থেনার্ডিয়ার কিছু আশ্বস্ত হইল। বাস্তবিক ভলজীন কসেটকে লইয়া সেইখানে বসিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছিলেন। থেনার্ডিয়ার একেবারে তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়া পকেট হইতে নোট তিনখানি বাহির করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, “মহাশয়! এই লউন,—আপনার নোট ফিরাইয়া লউন।” ভলজীন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, “কেন?” এ সকলের তাৎপর্য্য কি?” থেনার্ডিয়ার কহিল, “ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমি কসেটকে ফিরাইয়া লইয়া যাইব।” কসেট এই কথা শুনিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল,. সে একেবারে ভলজীনকে আঁকড়াইয়া ধরিল। ভলজীন স্থিরদৃষ্টিতে থেনার্ডিয়ারের মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন, “কি! তুমি কসেটকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে।” ভলজীনের কণ্ঠস্বর স্থির, গম্ভীর অথচ বিদ্রূপাত্মক। থেনার্ডিয়ার কহিল, “হাঁ মহাশয়!

আমি এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিলাম। সত্যকথা বলিতে কি, এই বালিকাকে দিবার আমার কোন ক্ষমতা নাই। এই বালিকা আমার কন্যা নহে। ইহার মাতা আমার নিকটে ইহাকে গচ্ছিত রাখিয়াছে মাত্র। সে আসিয়া ইহাকে ফিরাইয়া চাহিলে আমি কি উত্তর দিব? আপনি বলিতে পারেন যে, ইহার মা মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার মাতার অনুমতিজ্ঞাপক কোন পত্র কিংবা নিদর্শন ব্যতিরেকে আমি কেমন করিয়া ইহাকে ছাড়িয়া দিই?"

অপরিচিত এই কথার কোন উত্তর দিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে আপনার পকেটে হাত দিয়া সেই পুরাতন মণিব্যাগটি বাহির করিলেন। আশার আশ্বাসে লোভী থেনার্ডিয়ারের হৃদয় এতখানি হইয়া ফুলিয়া উঠিল। থেনার্ডিয়ার মনে করিল—ঔষধ ঠিক ধরিয়াছে।

কিন্তু এবার আর ব্যাঙ্কনোট বাহির হইল না। বাহির হইল একখানি কাগজের টুকরা।

অপরিচিত সেইখান থেনার্ডিয়ারের হস্তে দিলেন এবং তাহাকে পাঠ করিতে কহিলেন। থেনার্ডিয়ার পত্রখানি লইয়া পাঠ করিল। তাহাতে লেখা ছিল:—

"এম-সুর-এম
মার্চ্চ ২৫, ১৮২৩

মসিও থেনার্ডিয়ার!

আপনি পত্রবাহকের নিকট কসেটকে দিবেন। খরচাদি বাবদ আপনাকে যাহা দিতে হইবে, তিনিই তাহা দিবেন।

অনুগত
ফ্যাণ্টাইন্।"

সাপের মাথায় ধূলাপড়া পড়িল। থেনার্ডিয়ার আস্তে আস্তে পত্রখানি ভাঁজ করিয়া, ভলজানকে সেটি ফিরাইয়া দিতে দিতে কহিলেন, "সহিটি জাল। যাহা হউক, এখনও ফ্যাণ্টাইনের নিকট আমার অনেক টাকা পাওনা আছে।" অপরিচিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন, জামার আস্তিনটি আস্তে আস্তে ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিলেন, "মসিও থেনার্ডিয়ার, গত জানুয়ারী মাসে বালিকার মাতা হিসাব করিয়াছিলেন যে, তিনি আপনার নিকট ১২০ ফ্র্যাঙ্ক ধারেন। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে তিনি আপনাকে ১৫৫ ফ্র্যাঙ্ক পাঠাইয়াছেন। ঐ মাসের শেষে আপনাকে ১০০ ফ্র্যাঙ্ক পাঠাইয়াছেন। মার্চ্চ মাসের প্রারম্ভে আর ১০০ ফ্র্যাঙ্ক আপনাকে দেওয়া হইয়াছে। তাহার পরে নয় মাস গত হইয়াছে। প্রতি মাসে ১৫ ফ্র্যাঙ্ক হিসাবে আপনার ১৩৫ ফ্র্যাঙ্ক পাওনা হয়। আপনি সে হিসাবে ১০০ ফ্র্যাঙ্ক বেশী পাইয়াছেন। আর আমি এখনই আপনাকে ১৫০০ ফ্র্যাঙ্ক দিয়াছি।"

থেনার্ডিয়ার আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিল। ব্যাঘ্র শীকারীর লৌহময় পিঞ্জরে প্রবেশ করিলে তাহার যে দশা হয়, থেনার্ডিয়ারেরও সেই দশা হইল। পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া সে কহিল, "মসিও! আমি আপনার নাম জানি না, আপনাকে চিনি না। আপনি যদি ৩০০০ ফ্র্যাঙ্ক আমাকে দিতে পারেন, ভাল। তাহা না হইলে, আমি কসেটকে ফিরাইয়া লইয়া যাইব।"

অপরিচিত স্থিরভাবে কসেটের হাত ধরিয়া বলিলেন, "এস কসেট!" এবং তাঁহার স্থূল যষ্টিখানি তুলিয়া লইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। সেই যষ্টির স্থূলতা, অপরিচিতের পেশীবহুল দৃঢ় হস্ত এবং রাস্তার জনশূন্যতা যুগপৎ স্মরণ করিয়া থেনার্ডিয়ার চুপ করিয়া রহিল।

ভলজীন কসেটকে লইয়া অবাধে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

কসেট ভলজীনের আলয়ে।

সন্ধ্যার কিছু পরেই ভলজীন পারিসে প্রবেশ করিলেন। একখানি ঠিকা গাড়ী ভাড়া করিয়া এস্‌প্লানেডের নিকট গিয়া অবতরণ করিলেন। সেখান হইতে কিছু দূরে একটা ক্ষুদ্র গলীর মধ্যে একখানি ত্রিতল বাটীর তৃতীয় তলে একটি ঘর তিনি ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। কসেটকে লইয়া ভলজীন সেই বাটীতে গেলেন। ইহা একটি বহুলোকপূর্ণ সাধারণ ভাড়াটীয়া বাসাবাটী। কসেট গাড়ীর মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ভলজীন আর তাহাকে জাগাইলেন না। ঘুমন্ত অবস্থাতেই তাহাকে কোলে

করিয়া লইয়া বাসায় গেলেন। ভলজীনের কক্ষে আসবাবপত্র নাই বলিলেও হয়। যাহা আছে, তাহাও অতি গরিবানী ধরণের। মেজেতে একখানি জীর্ণ সতরঞ্চ পাতা। একটি টেবিল—তাহার চারি-পাশে খানকয়েক কেদারা। একপার্শ্বে একটি ষ্টোভ এবং এক কোণে একটি কমদামী ল্যাম্প! ভলজীন কসেটকে বিছানার উপর শোয়াইয়া দিলেন। ল্যাম্প জ্বালিয়া তাহারই ক্ষীণ আলোকে বালিকার সুন্দর মুখখানি দেখিতে লাগিলেন। বালিকা তখন গাঢ় নিদ্রাভিভূতা। সে কিছুই জানিতে পারিতেছিল না যে, সে কোথায় আছে এবং কাহার দ্বারা কি জন্য তথায় আনীত হইয়াছে। জন্ ভলজীন সস্নেহে বালি-কার নিদ্রার ঘোরে অবসন্ন ক্ষুদ্র হস্তখানি লইয়া চুম্বন করিলেন। নয়মাস পূর্ব্বে ঠিক এমনই সময় চির-নিদ্রায় অভিভূতা এই বালিকার মাতার হস্ত ভলজীন ঠিক এইরূপ আদরে চুম্বন করিয়াছিলেন। সেই বিষাদময়ী স্মৃতি আজ ভলজীনকে বৃশ্চিকের মত দংশন করিল। তিনি নয়মাস পূর্ব্বে ফ্যা'টাইনের শয্যাপার্শ্বে জানু পাতিয়া যেমন প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন, আজ কসেটের শয্যাপার্শ্বে বসিয়াও সেইরূপ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে ভলজীন শয্যা পরিত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া জানালা খুলিয়া দিলেন। সেই মুক্ত বাতায়ন-পথে ভলজীন পারিস রাজবর্ত্মে প্রবহমান বিচিত্র অনন্ত জনস্রোত দেখিতে লাগিলেন। কসেট এখনও নিদ্রা যাইতেছে। ডিসেম্বর সূর্য্যের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণরাশি সেই মুক্ত বাতায়ন-পথে আসিয়া কসেটের নিদ্রালস মুখে ও বুকে পড়িয়াছে। সহসা ময়লাবাহী শকটের ভীষণ ঝণৎকারে সেই বাড়ীটি কাঁপিয়া উঠিল, কসেটের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে সহসা জাগিয়া, নিদ্রাবিজড়িত চক্ষেই উঠিয়া দাঁড়াইল। অভ্যাসমত জড়িত কণ্ঠে কহিল, "হাঁ ম্যাডাম! আমি উঠিয়াছি, এখনই যাইতেছি। কৈ, আমার ঝাঁটা কোথায় গেল?" পরক্ষণেই চক্ষু মেলিয়া কসেট ভলজীনকে সম্মুখে দেখিল। পূর্ব্বদিনের সব কথা তাহার মনে পড়িল; একটু অপ্রস্তুত হইয়া সে কহিল, "ও—আমি সব ভুলিয়া গিয়াছিলাম। মহাশয়! গুডমর্ণিং।"

শৈশবে আনন্দ ও প্রফুল্লতা বড় সহজে আসে। কারণ, শিশুরাই মূর্ত্তিমান্ আনন্দ, মূর্ত্তিমতী প্রফুল্লতা; কসেট তাহার পুতুলটিকে কোলে লইয়া সহস্র চুম্বন করিতে লাগিল এবং ভলজীনকে সহস্র অনাবশ্যক প্রশ্নে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। সহসা কসেট আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিল, "এই স্থানটি কি রমণীয়!"

বাস্তবিক পক্ষে সে স্থানের রমণীয়ত্ব বিশেষ ছিল না। তবে বিহঙ্গিনী আজ বন্ধনমুক্তা—আজ সে স্বাধীনা; তাই তাহার আনন্দ!

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

ভলজীনের বিপদ্।

পারিসে আসিয়া কয়েক সপ্তাহ ভলজীন ও কসেটের খুব আনন্দে কাটিল। ভলজীন সমস্ত দিন ঘরেই থাকিতেন; কসেটকে লিখিতে ও পড়িতে শিখাইতেন এবং সময়ে খেলিতে দিতেন। সন্ধ্যার পর দুই জনে বাহির হইয়া একটু বায়ু-সেবন করিয়া আসিতেন। কসেট তাঁহাকে "বাবা" বলিয়া ডাকিত, "বাবা" ছাড়া তাহার যে আবার অন্য বাবা আছে, তাহা সে জানিত না। ভলজীনও মায়ার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া গেলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার জীবন একটি লোভনীয় ও উপভোগের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইল।

সংসারের কি নিয়ম—মানুষ মানুষের সুখ দেখিতে পারে না। ভলজীন কসেটকে লইয়া সুখে আছে। পাশের ঘরের ভাড়াটীয়াগণের ঈর্ষায় চক্ষু ব্যথিত হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে বৃদ্ধা পরিচারিকার নিকট হইতে তাহারা ভলজীনের জীবনের রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস পাইতে লাগিল। লোকটার চলে কি করিয়া? বৃদ্ধা বাড়ীওয়ালী এই সন্ধানকারিণী-গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা। সে এক দিন জানালার ছিদ্র দিয়া দেখিল, ভলজীন গভীর নিশায় আলোক জ্বালিয়া কাঁচি, ছুঁচ ও সূতা লইয়া তাহার আঙ্গরাখার লাইনিং খুলিয়া ফেলিয়া একখানি হরিদ্রারঙের কাগজ বাহির করিয়া আবার সেই ছিন্নস্থান সেলাই করিয়া রাখিল। সেই রাত্রে অনুসন্ধানকারিণীগণের মধ্যে মহা একটা কল্পনা-জল্পনা আরম্ভ হইল। ঈর্ষা ঘৃণায় পরিণত হইল। ভলজীন বুঝিলেন, আর এখানে থাকা শ্রেয়স্কর নহে।

ঠিক এই সময়ে একটি ভিক্ষুক আসিয়া এই বাসা-বাড়ীর দ্বারের সম্মুখে আস্তানা গাড়িল। ভলজীনও সন্ধ্যার পরে বাহির হইবার সময় এই ভিক্ষুকের হস্তে দুই চারিটি করিয়া সু দিতেন। এক দিন ভলজীন সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বেই বাটী হইতে বাহির হইয়াছেন। তখনও দিবালোক বেশ রহিয়াছে। ভিক্ষুক তাঁহার নিকট কিছু যাচ্ঞা করিল। ভলজীন যেমন দুইটি সু লইয়া ভিক্ষুককে দিতে যাইবেন, সে অমনি একবার তীব্র-দৃষ্টিতে যেন ভলজীনের অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেখিবার প্রয়াস করিল। ভলজীনেরও অন্তরাত্মা কি এক অনির্ব্বচনীয় ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন যে, এই মুখ অপরিচিত ভিক্ষুকের মুখ নহে—এই মুখ তাঁহার খুব পরিচিত এক জন পুলিস-কর্ম্মচারীর মুখ। ভলজীন ভাবিতে লাগিলেন, "তবে কি জ্যাভার্ট তাঁহাকে ধরিবার জন্য এই ভিক্ষুক সাজিয়া তাঁহার পিছনে লাগিয়াছে? আর যদি এই ভিক্ষুক জ্যাভার্ট হয়, তবে সে কি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে?"

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে, এক দিন গভীর রাত্রে ভলজীন তাঁহার ঘরের বাহিরে বহুলোকের পদধ্বনি ও চুপি চুপি কথোপকথনের শব্দ শুনিতে পাইলেন। ঘটনা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। নিশ্চয়ই জ্যাভার্ট তাহার পুলিশের দলবল লইয়া তাঁহাকেই ধরিতে আসিয়াছে। তিনি আস্তে আস্তে আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া দিলেন। একখানি রজ্জুর মই বাক্স হইতে বাহির করিয়া সেখানি বাহিরের জানালায় আট্‌কাইয়া ঝুলাইয়া দিলেন, ভাগ্যক্রমে সে দিকে পুলিশের লোক কেহই ছিল না। নিদ্রিত কসেটকে কাঁধের উপর ফেলিয়া লইয়া তিনি সেই দড়ির সিঁড়ি দিয়া রাস্তায় নামিলেন। কিছু দূর যাইতে না যাইতেই জ্যাভার্ট দলবল লইয়া তাহারই পশ্চাদ্ধাবন করিল। অনেকক্ষণ এ গলি ও গলি ঘুরিয়া ভলজীন ভুলক্রমে একটা বন্ধ গলির মধ্যে গিয়া পড়িলেন। মূষিক কলে পড়িয়া গেল। আপৎসঙ্কুল অবস্থা হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় আছে, হতাশ ভলজীন সেই উপায়ই অবলম্বন করিলেন। ভলজীন নিমেষে পকেট হইতে একটি সূক্ষ্মাগ্র লৌহফলক ও একটি হাতুড়ি বাহির করিয়া দেয়ালের গায়ে সেইটি ঠুকিয়া বসাইলেন। কেমন কৌশলে একটু এধার ওধারে চাপ দিয়া একখানি প্রস্তর খুলিয়া ফেলিলেন। প্রস্তরচ্যুতিজনিত ফাঁক-টুকুর মধ্যে পা দিয়া, পূর্ব্বকথিত প্রক্রিয়ায় আর একখানি প্রস্তর খুলিলেন। সেইখানে পা দিয়া প্রাচীরের শীর্ষদেশে উঠিলেন। পূর্ব্বেই কসেটের কটিতে একখণ্ড রজ্জু সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন। সেই রজ্জু ধরিয়া টানিয়া কসেটকে তুলিয়া তিনি ভিত্তিসংলগ্ন একটি বৃক্ষকাণ্ড-সাহায্যে অক্লেশে প্রাচীরের অপর পার্শ্বস্থ উদ্যানের মধ্যে গিয়া নামিলেন। জ্যাভার্ট ও তাহার দলবল অনেকক্ষণ নিষ্ফল অনুসন্ধানের পর হতাশভাবে চলিয়া গেল। ভলজীন যে অত উচ্চ প্রাচীর এত অল্পসময়ের মধ্যে উল্লঙ্ঘন করিয়া পলাইতে পারিবে, ইহা তাহাদের কল্পনারও অতীত।

———

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

ফক্‌লেভেণ্টের কৃতজ্ঞতা।

ভলজীন বাগানে নামিয়া দেখিলেন যে, উদ্যানটি নিতান্ত অযত্ন-রক্ষিত, চারিদিক্ কেবল আগাছা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কসেটকে বুকে লইয়া, কোন প্রকারে আগাছা ঠেলিয়া ও লতাগুল্ম ছিন্ন করিয়া ভলজীন একটু পরিষ্কৃত স্থানে গিয়া কসেটকে ঘাসের উপর শোয়াইয়া দিয়া মৃদুস্বরে ডাকিলেন, "কসেট!" কসেটের কোন উত্তর পাইলেন না। কসেটের হাত-পা, শরীর সমস্ত বরফের মত হিম হইয়া গিয়াছে। বালিকা জীবিত আছে তো? ভলজীনের মনে বিষম ভয় হইল। কি করিয়া বালিকাকে একটু উত্তপ্ত করা যাইবে? একটু আগুন কোথায় পাওয়া যাইবে?

ভলজীন দেখিলেন, বাগানে দূরে এক জন লোক বেড়াইতেছে। সে লোকটি মুখ নীচু করিয়া বেড়াইতেছিল সুতরাং ভলজীনকে সে লক্ষ্য করে নাই। ভলজীন সেই লোকটির সম্মুখে গিয়া পকেট হইতে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিলেন এবং কাতরভাবে বলিলেন, "আপনি যে হউন, আজি রাত্রির মত আমাদিগকে আশ্রয় দিন এবং তাহার বিনিময়ে এই স্বর্ণমুদ্রা কয়টি লউন।"

এই সময় চন্দ্রের কিরণ ভলজীনের মুখে পড়িয়া

তাঁহার মুখখানিকে আলোকিত করিয়াছিল। লোকটি তাঁহাকে চিনিল। চিনিয়াই একেবারে তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কহিল, "ফাদার ম্যাডিলিন! আপনি!—আপনি কোথা হইতে এখানে আসিলেন?"

এই অন্ধকার নিশায় কে তাঁহাকে চিনিল? কে তাঁহাকে সেই পুরাতন পরিত্যক্ত নামে আহ্বান করিল? ভলজীন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? কাহার এই বাটী?"

"কি বিপদ্! ফাদার ম্যাডিলিন! আপনি আমায় চিনিতে পারিলেন না? আমি যে ফক্লেভেণ্ট। আপনি গাড়ীর চাকার নীচে হইতে তুলিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।" এতক্ষণে ভলজীন বৃদ্ধ ফক্লেভেণ্টকে চিনিলেন। ফক্লেভেণ্ট বলিল, "আপনি আমাকে এখানে উদ্যান-রক্ষকের চাকুরী যোগাড় করিয়া দিলেন। আপনি সব বিস্মৃত হইয়াছেন, ফাদার ম্যাডিলিন?"

ভলজীন বলিলেন, "আর বলিতে হইবে না। এখন আমি তোমাকে ঠিক চিনিতে পারিয়াছি। তুমি এ সময়ে এখানে কি করিতেছিলে?"

"আমি তরমুজের ক্ষেতে তরমুজ ঢাকা দিতেছিলাম।"

"তোমার হাঁটুতে ঘণ্টা বাঁধা কেন?"

"ও—ওই ঘণ্টা! ওই ঘণ্টার আওয়াজ শুনিলে তাহারা পলাইতে পারিবে বলিয়া—"

"সে কি? কাহারা পলাইবে?"

"এখানে যে কেবল মেয়েমানুষের দল। পুরুষমানুষ দেখিলে তাহারা ভয় পায় না। সেই জন্য আমার হাঁটুতে এই ঘণ্টা বাঁধিয়া দিয়াছে।"

"এ বাটীতে কাহারা থাকে?"

"আপনি জানেন না মসিও ম্যাডিলিন? এ যে চিরকুমারী-ব্রতধারিণীদিগের আশ্রম। কিন্তু ফাদার ম্যাডিলিন! আমায় বলুন তো, আপনি এখানে কি করিয়া আসিলেন? এখানে তো পুরুষের প্রবেশ নিষেধ!"

"এই যে তুমি রয়েছ?"

"আমি ছাড়া।"

ভলজীন উদ্যান-রক্ষকের কাছে সরিয়া গেলেন, অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ফক্লেভেণ্ট! আমি তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছি। তোমার জন্য আমি যাহা করিয়াছি, এখন আমার জন্য তুমি তাহাই কর। আমাকে বাঁচাও।"

"ফাদার ম্যাডিলিন! আমি আপনার কি উপকার করিব? আমার জীবন দিয়াও যদি আপনার কোন কাজ করিতে পারি, তাহা হইলে আমি আপনাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিব। আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি,—আমি আপনার কি উপকার করিব, ফাদার ম্যাডিলিন?"

"আমি সব ঘটনা তোমায় বলিতেছি। তোমার থাকিবার কি আলাহিদা ঘর আছে?"

"ওই দূরে—বাগানের কোণে, জঙ্গলের মধ্যে আমার—একখানি কুঁড়ে আছে।"

"ভাল—কিন্তু তোমাকে দুইটি বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে। প্রথমতঃ তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না যে, আমি কেমন করিয়া এখানে আসিলাম। দ্বিতীয়তঃ, তুমি যে আমাকে জান, এ কথা কাহারও নিকট বলিতে পারিবে না।

"ভাল, তাহাই হইবে। ফাদার ম্যাডিলিন! আমি ঠিক জানি যে, আপনি কখন সৎ ছাড়া অসৎ উদ্দেশ্যে কোন কাজ করেন না।"

"বেশ—তবে আমার সঙ্গে এস, একটি ছোট মেয়ে আছে, তাহাকে গিয়া লইয়া আসি।"

ফক্লেভেণ্ট বলিল, "ওঃ, একটি মেয়ে আছে।"

সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ভলজীনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

অল্পকালমধ্যেই ভলজীন কোলে করিয়া কসেটকে বৃদ্ধ ফক্লেভেণ্টের কুটীরে লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিল। ঘরের মধ্যে, অগ্নির উত্তাপ পাইয়া কসেট সম্পূর্ণরূপে সুস্থভাবে ঘুমাইয়া পড়িল।

বহুকাল পরে, এক অতি অভাবনীয় ও অপ্রত্যাশিতভাবে উপকারকের সাক্ষাৎ পাইয়া বৃদ্ধ ফক্লেভেণ্ট আনন্দে আটখানা হইল। আলমারী হইতে এক বোতল মদ্য বাহির করিয়া দুই জনে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পান-ভোজন করিলেন। মদের ঝোঁকে কৃতজ্ঞতা-বিগলিত হৃদয়ের অদম্য উচ্ছ্বাসে বৃদ্ধ ফক্লেভেণ্ট কহিল, "ফাদার ম্যাডিলিন! আপনি আমায় প্রথম সাক্ষাতেই চিনিতে পারিলেন না! এ বড়ই অন্যায় কথা। আপনি লোকের জীবন

রক্ষা করেন। পরে আর তাহাদের কথা মনে থাকে না, ইহা বড়ই অকৃতজ্ঞতা!"

জন্ ভলজীন বৃদ্ধের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা দেখিয়া ঈষদ্ধাস্য করিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

ভলজীন কুমারী-আশ্রমে।

প্রত্যূষে চক্ষু মেলিয়াই ফকৃলেভেণ্ট দেখিল যে, মসিও ম্যাডিলিন বসিয়া নিদ্রিত কসেটের মুখের পানে তাকাইয়া আছেন। তাঁহার হৃদয় চিন্তাকুলিত। ফক্লেভেণ্ট উঠিয়া বসিলেন এবং ভলজীনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ম্যাডিলিন! এখন যখন এখানে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন আপনাকে বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা করিতে হইবে।" ভলজীনও সেই একই সমস্যা পূরণ করিবার জন্য এত চিন্তিত। ফকৃলেভেণ্ট কহিল, "প্রথমতঃ, আপনি কিংবা এই বালিকা এই কুটীরের বাহিরে পদার্পণ করিবেন না। আপনাদিগকে বাগানের মধ্যে দেখিতে পাইলেই আমরা সকলেই মারা পড়িব।"

ফাদার ম্যাডিলিন কহিলেন, "তাহা সত্য!"

"মসিও ম্যাডিলিন! আপনারা বেশ সময়ে এখানে আসিয়াছেন। এক জন ব্রতধারিণী সাংঘাতিক পীড়িতা। অন্যান্য ব্রতধারিণীগণ দিবারাত্রি তাঁহারই সেবায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের আর বাহির হইবার সময় নাই। আজিকার দিনের মত আমরা এখানে নিরাপদ। কালিকার কথা বলিতে পারি না।"

এই সময় একবার গভীর-নিক্কণে ঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হইল। ফকৃলেভেণ্ট কহিল, "পীড়িতার মৃত্যু হইয়াছে! ঐ শুনুন, মৃত্যুজ্ঞাপক ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে।"

ভলজীনের সে দিকে কান ছিল না। তিনি চিন্তা করিতেছিলেন, কি উপায়ে তিনি এই চির-কুমারী-আশ্রমে নিজে থাকিতে পারিবেন, কসেটকে রাখিতে পারিবেন। এ স্থানে পুলিসের গতিবিধি নাই, এই স্থানই তাঁহার বাসের উপযুক্ত স্থান।

এই সময়ে আর একবার অন্য প্রকারের ঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হইল। ফকৃলেভেণ্ট তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিল, "ফাদার ম্যাডিলিন! আপনি একটু অপেক্ষা করুন; আমি তাড়াতাড়ি শুনিয়া আসি, আমার মনিব কি জন্য আমায় ডাকিতেছেন।" এই বলিয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

বৃদ্ধ ফকৃলেভেণ্ট যাইয়া প্রধানা কুমারীর দ্বারে মৃদু আঘাত করিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। প্রধানা একাকিনী বসিয়া ফকৃলেভেণ্টের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ফকৃলেভেণ্ট তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইল। প্রধানা মালা জপিতে জপিতে মুখ তুলিয়া ফকৃলেভেণ্টের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ফাদার ফকৃলেভেণ্ট! আমি তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। তোমাকে একটি কথা বলিতে চাই।" ফকৃলেভেণ্ট উত্তর করিল, "মা! আমিও আপনার নিকট একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।" বৃদ্ধের অন্তরাত্মা তখন গুরগুর করিয়া কাঁপিতেছে। প্রধানা কহিলেন, "ওঃ—তোমার কিছু বক্তব্য আছে?"। ফকৃলেভেণ্ট কহিল, "না মা! আমার একটি অনুরোধ আছে।" প্রধানা কহিলেন, "কি অনুরোধ? বল।"

ফাদার ফকৃলেভেণ্ট প্রথমে বিস্তৃত ভূমিকা করিয়া লইলেন। তাহার পর নিজের বার্দ্ধক্যের বিষয় বলিলেন এবং তাঁহার কার্য্য অনেক বেশী হইয়া পড়িয়াছে, তিনি একলা আর পারিয়া উঠেন না। তাঁহার একটি ছোট ভাই আছে। অনুমতি হইলে সে আসিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে পারে। সেই ভাইয়ের একটি কন্যা আছে। তাহাকেও সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইত্যাদি প্রকার অনেক কথা বলিলেন। তাঁহার বক্তব্য সমাপ্ত হইলে প্রধানা কহিলেন, "ফাদার ফকৃলেভেণ্ট! তুমি কি আজ রাত্রিতেই একটি সাবল সংগ্রহ করিয়া আনিতে পার?"

"সাবল কিসের জন্য বলুন?"

"যাহা দ্বারা লেভারের অর্থাৎ কোন ভারী জিনিস চাড় দিয়া তুলিবার কাজ করা চলে।"

"হাঁ মাতা! পারি।"

"ফাদার ফকৃলেভেণ্ট! তুমি কি প্রভুর মন্দির জান?"

"হাঁ মা।"

"সেইখানে মেজের একখানি প্রস্তর চাড় দিয়া তুলিতে হইবে।"

"এ কার্য্য আমার একলার দ্বারা সম্ভব নয়। দুই জন লোক হইলে সুবিধা হয়।"

"মাদার আসেন্‌সন্ পুরুষের ন্যায় বলশালিনী। তিনি তোমার সাহায্য করিবেন।"

"মা! স্ত্রীলোকে পুরুষে অনেক তফাৎ। আমার ভ্রাতা খুব শক্তিশালী।"

প্রধানা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "ফাদার ফক্‌লেভেণ্ট! তুমি কি জান না যে, এক জন চিরকুমারী আজ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন?"

"না।"

"তুমি কি মরণ-সূচক ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাও নাই?"

"আমি একটু কানে খাটো, এমন কি, আমার নিজের পায়ে বাঁধা ঘণ্টার ধ্বনিও আমি মাঝে মাঝে শুনিতে পাই না। তাহাতে আবার আমার কুটীর অনেক দূরে। সেখান হইতে কিছুই শুনা যায় না।"

"মাদার ক্রুসিফিক্‌সন্ আর ইহলোকে নাই! কুমারীগণ তাঁহাকে মৃত সৎকার-মন্দিরে লইয়া গিয়াছেন। সেখানে তুমি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের প্রবেশের অধিকার নাই। ফাদার ফক্‌লেভেণ্ট! মাতা ক্রুসিফিক্‌সন্ বড়ই সুন্দর মরণ মরিয়াছেন। জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান অটুট অবস্থায় ছিল।"

ফক্‌লেভেণ্ট মনে করিতেছিল যে, প্রধানা বুঝি উপাসনা করিতেছেন। তাই তাঁহার কথা শেষ হইলেই বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল, "আসেন।" প্রধানা কহিলেন "ফাদার ফক্‌লেভেণ্ট! এমন ঐশ্বরিকী আত্মার শেষ অভিলাষ পূর্ণ করা কি আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য নয়?"

"অবশ্য।"

"ফাদার ফক্‌লেভেণ্ট! তাঁহার মরণকালীন আদেশ যে, যে কফিনে তিনি কুড়ি বৎসর ধরিয়া নিদ্রা গিয়াছেন, সেই কফিনে যেন তাঁহার শেষশয্যা রচিত হয়।"

"তাহা হইলে আমাকে সেই কফিনেই তাঁহাকে বন্ধ করিতে হইবে?"

"হাঁ।"

"তাহা হইলে সরকারী কফিনটি কি হইবে?"

"ফাদার ফক্‌লেভেণ্ট! ঠিক ধরিয়াছ।"

"মা! আমি আপনাদের চিরাশ্রিত। আপনারা যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, আমি সেইরূপ করিতেই প্রস্তুত আছি।"

"চারিজন শক্তিশালিনী কুমারী তোমাকে সাহায্য করিবে।"

"কফিন বন্ধ করিবার জন্য? সে কাজ আমি একাই পারিব।"

"না। কফিনটিকে মন্দিরের নিম্নতলে নামাইবার জন্য।"

ফক্‌লেভেণ্ট চমকিয়া উঠিল।

"মিউনিসিপালিটী যদি জানিতে পারে?"

"আমরা মৃতার মরণকালীন অনুরোধ অবজ্ঞা করিতে পারি না।"

"কিন্তু ইহা যে বে-আইনী?"

"মনুষ্য-প্রণীত আইনে বে-আইনী, ঈশ্বরের প্রণীত আইনে নহে।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রধানা কহিলেন, "কেমন ফাদার ফক্‌লেভেণ্ট! তোমার কথার উপর নির্ভর করিতে পারি তো?"

"নিশ্চয়ই।"

"ফাদার ফক্‌লেভেণ্ট! আমি তোমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। মাতা ক্রুসিফিক্‌সনের ঐহিক দেহ সমাহিত হইয়া গেলে কালই তোমার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। মনে থাকে যেন, ঠিক রাত্রি একটার সময়ে সাবল লইয়া এখানে উপস্থিত হইবে।"

"যে আজ্ঞা!"

বৃদ্ধ ফক্‌লেভেণ্ট ফাদার ম্যাডিলিন ও কসেটকে আশ্রমে আনিবার ও তাহাদিগকে স্থায়িভাবে তথায় রাখিবার এই অদ্ভুত উপায় বাহির করিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিল। সে কুটীরে যাইয়া ম্যাডিলিনের নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। কসেটকে সে ঝুলির মধ্যে করিয়া পৃষ্ঠে ফেলিয়া বাহিরে লইয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু ম্যাডিলিনকে কেমন করিয়া বাহিরে পাঠান যাইতে পারে, এই দুর্ভাবনায় তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিয়ৎকাল পরে ভলজীন কহিলেন, "সমাধিস্থান তো আশ্রমের বাহিরে। সরকার

হইতে যে কফিন্ আসিবে, তাহা সমাধিস্থানে খালি পাঠাইয়া দিলে বাহকদিগের নিকট লঘু বোধ হইলে তাহাদের সন্দেহ হইবে। ফকৃলেভেণ্ট, তাহার কি?" ফকৃলেভেণ্ট কহিল, "তাহার মধ্যে মাটী পুরিয়া ভারী করিয়া দেওয়া যাইবে, তাহা হইলে সন্দেহের কোন কারণ থাকিবে না।" ভলজীন্ কহিলেন, "আমার পলায়নের এই এক পথ আছে। ঐ কফিনমধ্যে মৃত মনুষ্যদেহের পরিবর্তে জীবন্ত মনুষ্য দিলে কেমন হয়?"

ফকৃলেভেণ্ট বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকে?'

"কেন? আমাকে।"

বৃদ্ধ ফকৃলেভেণ্ট অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিল, "আপনি তামাসা করিতেছেন।"

ভলজীন কহিলেন, "না, আমি ঠিক বলিতেছি। আমার এখান হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার এই এক বেশ সুবিধা! রাত্রি দুইটার সময়ে তুমি আমায় কফিনের মধ্যে বন্ধ করিবে। যেখানে আমার নাসিকা থাকিবে, সেই স্থানে কফিন্‌টিতে দুই চারিটি ছোট ছিদ্র করিয়া দিলে, শ্বাস-প্রশ্বাস লইবার কোন অসুবিধা হইবে না এবং কফিনের ডালা তত জোরে আঁটিবে না। কিন্তু কবর হইতে বাহির হইব কি করিয়া?" একটু চিন্তা করিয়া ভলজীন কহিলেন, "আচ্ছা, সে তখন ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে, এখন এখান হইতে তো বাহির হওয়া যাউক।"

ফকৃলেভেণ্ট একটু হাসিয়া কহিল, "সে জন্য ঠেকিবে না। আমার এক জন বন্ধুই সেখানকার কর্তা। ফাদার মেষ্টিয়েন খুব ইয়ার লোক। আমি তাহাকে লইয়া একটু মদ খাইতে বসিয়া যাইব। আপনি সেই অবসরে পলাইবেন। কেমন?"

মৎলব স্থির হইয়া গেল। কার্য্যও সেই মত হইল। গভীর রাত্রে বৃদ্ধ ফকৃলেভেণ্ট মৃত শরীরের পরিবর্তে জীবন্ত মানুষকে কফিনে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। পরদিন যথাসময়ে কফিন্ সমাধি-ক্ষেত্রে নীত হইল। মৃতের অন্তিম ক্রিয়া চলিতে লাগিল। ফাদার ফকৃলেভেণ্ট সমাধি-রক্ষকের গৃহে বসিয়া তাঁহার সহিত মদ্যপান আরম্ভ করিয়া দিলেন। ফাদার মেষ্টিয়েন খুব মাতাল হইয়া পড়িল। সেই সুযোগে ভলজীন কফিন্ হইতে বাহির হইলেন। ফকৃলেভেণ্ট পূর্ব্বাহ্ণেই একটি নিরাপদ স্থান স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। কসেট সেইখানেই ছিল। ফকৃলেভেণ্ট শূন্য কফিন্ সমাধিস্থ করিয়া আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন। বিনা গোলযোগে এই ব্যাপারটি সংঘটিত হইল। এই কার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ ভলজীন ও কসেট স্থায়িভাবে আশ্রমে আশ্রয় লাভ করিলেন। পরদিন হইতে এক বৃদ্ধ ফকৃলেভেণ্টের স্থানে দুই জন ফকৃলেভেণ্ট কুমারী-আশ্রমের উদ্যান-রক্ষকের কার্য্য করিতে লাগিলেন। কসেট আশ্রমে ছাত্র-নিবাসে স্থান পাইল এবং লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

মসিও মেরিয়াস্ ও জনড্রেট-পরিবার।

এই ভাবে আট নয় বৎসর কাটিয়া গেল। কসেট এখন কৈশোরের সীমা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। বর্ষাগমে নদীর মত তাহার সর্ব্বাঙ্গে রূপ উছলিয়া পড়িতেছে।

এই সময়ে পারিসের "স্যাটো-ডি-ইউ" মহল্লার একাদশ দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক একটি বালককে প্রায়ই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে দেখা যাইত। বালকের পরিধানে একটি পুরুষের পরিধেয় পায়জামা। বোধ হয়, সেটি তাহার পিতা একদিন পরিতেন। এখন পুত্রের অধিকারে সেটি আসিয়াছে। তাহার গায়ে একটি স্ত্রীলোকের কোর্ত্তা। কোন দয়াবতী রমণী বোধ হয় সেটি তাহাকে ভিক্ষা দিয়াছেন। তাহার পরিধেয় ছিন্ন ও মলিন। বোধ হয়, সমস্তই ভিক্ষালব্ধ। এই বালকের পিতা ও মাতা দুই-ই বর্ত্তমান। কিন্তু পিতা পুত্রের খোঁজ লয় না। মাতা পুত্রকে ভালবাসে না। বালক পথে পথেই ঘুরিয়া বেড়ায়। সে যতক্ষণ পথে থাকে, ততক্ষণই ভাল থাকে। কারণ, রাস্তায় বিছান পাথরের খোয়াটিও তাহার মায়ের অন্তঃকরণ হইতে নরম বলিয়াই বালকের ধারণা। বালক পথে পথেই হাসিয়া খেলিয়া, গান গাহিয়া, নানা রকম দুষ্টামী করিয়া বেড়ায়। রাস্তার লোক তাহাকে 'দুষ্টু' বলিলে সে হাসিয়া

উড়াইয়া দেয়, 'চোর' বলিলে তাহার সহিত হাতা-হাতি না করিয়া ছাড়ে না। তাহার চাল নাই, চুলা নাই, রাত্রে মাথা গুঁজিয়া থাকিবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত তাহার নাই। সে কিন্তু সর্ব্বদাই প্রফুল্ল; কারণ, সে মুক্ত—সে বাতাসের মত স্বাধীন। যদিও পিতা-মাতা তাহাকে হৃদয় হইতে অন্তর করিয়াছিল, সে একেবারে তাহাদিগকে বিস্মৃত হয় নাই। প্রাণের টানে বালক প্রত্যেক মাসে একবার দুইবার করিয়া জনক-জননীকে দেখিতে যাইত। পারিসের উপকণ্ঠে একটি দরিদ্র-বস্তীতে একখানি জীর্ণ কুটীরে তাহারা থাকিত। বালক মাঝে মাঝে যাইয়া সেখানে উপস্থিত হইত। পিতা-মাতা ছাড়া বালকের আর দুই জন আপনার লোক ছিল; সে দুইটি তাহার সহোদরা। দুই ভগ্নীই যুবতী। দুইজনেই অবিবাহিতা। এই দরিদ্র পরিবারটি যখন আসিয়া এই কুটীর ভাড়া লয়, সেই সময় তাহাদের নাম "জনড্রেট" বলিয়া পরিচয় দেয়। আশে পাশের লোকে তাহাদিগকে "জনড্রেট" পরিবার বলিয়াই জানে। পারিসের রাস্তায় বালক 'গাভরোক্' বলিয়া পরিচিত।

জনড্রেট-পরিবার যে কুটীরে বাস করে, তাহার পার্শ্বেই আর একটি কুটীর আছে। মসিও মেরিয়াস নামে একটি দরিদ্র যুবক এই কুটীরখানি ভাড়া লইয়া বাস করেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

মসিও মেরিয়াস কে ?

যুগান্তকারী ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময় যে সকল বীরপুরুষ "বিক্রমকেশরী নেপোলিয়নের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতালাঞ্ছিত বিশ্ববিজয়িনী বৈজয়ন্তীতলে সমবেত হন—যাঁহাদের অমর কীর্ত্তি ওয়াটারলুর শোণিত-সিক্ত ইতিহাসের পত্রে আজিও জলন্ত অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে, শত্রুপক্ষীয়গণ যাঁহাদিগকে "দস্যু" "রাজদ্রোহী" এই কলঙ্কিত আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন, মসিও পণ্টমারসি তাঁহাদেরই অন্যতম। মসিও পণ্টমারসি দরিদ্রগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া অসাধারণ অধ্যবসায়, স্বাবলম্বন ও সততায় উচ্চতম সৈনিক কর্ম্মচারীর পদ লাভ করিলেন। মুক্ত অসি হস্তে অরিন্দম গার্ড সৈন্যদলের অগ্রে থাকিয়া তিনি মিলিত প্রুসিয়ান ও ইংরাজ-ব্যূহের ভীষণ আক্রমণ ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। অরাতির অস্ত্রচিহ্নে পণ্টমারসির সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত হইল। এম্পারার নেপোলিয়ন উন্মুক্ত কৃপাণ-কর চারি পাঁচ জন শত্রুবর্ত্তৃক একসঙ্গে আক্রান্ত হইলেন। মসিও পণ্টমারসি ক্ষিপ্র-করে তরবারি সঞ্চালন করিয়া তাহাদের দুই জনকে নিপাতিত করিলেন। এমন সময় অরাতির খড়্গাঘাতে তাঁহার তরবারি ভগ্ন হইয়া গেল। সেই অবসরে আর এক জন সজোরে তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া এক আঘাত করিল। সেই গুরু আঘাতে পণ্টমারসি অশ্ব হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। এমপারার উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "কর্ণেল পণ্টমারসি! আপনি আজ হইতে ব্যারণ হইলেন এবং 'লিজন্ অফ অনার' নামক গৌরবান্বিত পদবীতে ভূষিত হইলেন।" মৃতকল্প পণ্টমারসি ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "সায়ার! (পিতা) আমার বিধবা পত্নীর পক্ষ হইতে আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি।" তাহার পরে লুণ্ঠনকারী থেনার্ডিয়ারের সাহায্যে যেরূপে সে যাত্রা তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

সম্রাট্ নেপোলিয়ন মসিও পণ্টমারসিকে গৌরবান্বিত পদবীতে ভূষিত করিলেন বটে, কিন্তু তাহা ভোগ করা আর তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সম্রাট্ নেপোলিয়ন বিজিত ও কারারুদ্ধ হইলেন। আবার ফ্রান্সের সিংহাসনে বুর্‌বন-বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। মসিও পণ্টমারসি সৈনিকের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ক্ষুদ্র ভার্ণন্ নগরীতে যাইয়া একটি উদ্যান-বাটিকা ক্রয় করিলেন। তাঁহার অবশিষ্ট জীবন সেইখানেই কাটিয়া গেল।

মসিও পণ্টমারসির সহিত তাঁহার শ্বশুর মসিও জিল-নরম্যাণ্ডের রাজনৈতিক মতদ্বৈধ প্রথম হইতেই ছিল। ক্রমে মসিও পণ্টমারসি যতই বিপ্লববাদীদিগের মত সমর্থন করিতে লাগিলেন, মসিও জিল-নরম্যাণ্ড ততই তাঁহার উপর চটিতে লাগিলেন। অবশেষে মসিও পণ্টমারসি যখন গিয়া নেপোলিয়নের সৈন্যদলভুক্ত হইলেন, বৃদ্ধ জিল-নরম্যাণ্ড একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন যে,

তাঁহার অগাধ সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও পণ্টমারসি পাইবেন না। পণ্টমারসির পত্নী জিল-নরম্যাণ্ডের কন্যা ইতিপূর্ব্বেই একটি শিশুপুত্র রাখিয়া, মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। মসিও জিল-নরম্যাণ্ড আরও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পণ্টমারসি যদি তাঁহার পুত্রকে তাঁহার সহিত লইয়া যান কিংবা তাঁহার সহিত কোন-রূপ সম্বন্ধ রাখেন, তাহা হইলে তাঁহার দৌহিত্রও তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে। পিতা পুত্রের ভবিষ্যতের মুখের দিকে চাহিয়া অপত্য-স্নেহকে হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। মেরিয়াস পণ্টমারসি মাতুলালয়ে মাতামহের শাসনাধীনে ও কর্তৃত্বে পরিপালিত ও শিক্ষিত হইতে লাগিলেন। পিতা জীবিত থাকিয়া, পাছে পুত্রের কোন অনিষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় তাহার কোন সংবাদ লইতে পারিতেন না, পুত্র ইচ্ছা সত্ত্বেও পাছে মাতামহ কুপিত হন, এই ভয়ে পিতার নিকট পত্রাদি লিখিতে পারিতেন না। ১৮২৭ সালে মেরিয়াস সপ্তদশ বৎ-সরে পদার্পণ করিলেন। তখন তিনি আইন-বিদ্যা-লয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন। এক দিন সন্ধ্যার সময় স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার মাতামহ একখানি পত্র হস্তে লইয়া আসিয়া কহিলেন, "মেরিয়াস, কালি প্রাতেই তুমি ভার্ণন্ অভিমুখে যাত্রা করিবে।" মেরিয়াস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"তোমার পিতাকে দেখিবার জন্য।"

মেরিয়াস শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মাতামহ যে নিজ হইতে কোন দিন তাঁহাকে তাঁহার পিতার সহিত যাইয়া সাক্ষাৎ করিতে বলিবেন, ইহা স্বপ্নেরও অতীত।

মসিও জিল-নরম্যাণ্ড কহিলেন, "বোধ হয়, তোমার পিতার কঠিন পীড়া হইয়াছে। তাই তোমাকে একবার দেখিতে তাঁহার ইচ্ছা। ভোর ছয়টার সময় ভার্ণনের দিকে একখানি ডাকগাড়ী ছাড়ে। তুমি কল্য প্রাতের সেই গাড়ীতেই যাইবে।" এই বলিয়া বৃদ্ধ জিল-নরম্যাণ্ড পত্রখানি মুড়িয়া মুড়িয়া আবার পকেটমধ্যে ফেলিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। পিতাকে দেখিবার জন্য মেরিয়া-সের হৃদয় যৎপরোনাস্তি উৎসুক হইয়া উঠিল। মাতামহের অনুমতি পাইলে, তিনি রাত্রির গাড়ীতেই চলিয়া যাইতে পারিতেন। পরদিন প্রাতে গিয়া পিতাকে দেখিতে পাইতেন।

পরদিন সন্ধ্যার সময় মেরিয়াস ভার্ণনে উপস্থিত হইলেন। রাস্তার লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে করিতে যাইয়া মসিও পণ্টমারসির বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি সবলে দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন। একটি স্ত্রীলোক আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। মেরিয়াস কহিলেন, "মসিও পণ্টমারসি কি বাড়ীতে আছেন?" স্ত্রীলোকটি সে কথায় কোনও উত্তর দিল না। মেরিয়াস আবার বলিলেন, "এটি কি তাঁহারই বাড়ী?" এইবার স্ত্রীলোকটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হাঁ।"

"আমি কি তাঁহার সহিত একটু কথা কহিতে পারি না?"

"না?"

"কেন? আমি তাঁহার পুত্র। তিনি আমাকে দেখা করিবার জন্য চিঠি লিখিয়াছেন। তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"

"তিনি আর আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন না।"

মেরিয়াস দেখিলেন, স্ত্রীলোকটি রোদন করি-তেছে। সে মেরিয়াসকে ভিতরে প্রবেশ করিতে বলিল। মেরিয়াস কক্ষে প্রবেশ করিয়া যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল।

কক্ষে ম্যাণ্টেল-পিসের উপর বাতীদানে একটি বাতী জ্বলিতেছে। গৃহে তিন জন পুরুষ রহিয়াছেন। এক জন জানু পাতিয়া বসিয়া প্রার্থনা করিতেছেন। অপর ব্যক্তি ঘরের মেজেয় শুইয়া আছেন। যিনি শুইয়া আছেন, তিনিই কর্ণেল পণ্টমারসি। অন্য দুই জনের এক জন ডাক্তার, অপর ব্যক্তি পাদরী।

তিন চারি দিন পূর্ব্বে পণ্টমারসি সহসা জ্বর-বিকারে আক্রান্ত হন। গতিক খারাপ বুঝিয়া তিনি পুত্রকে একবার শেষ দেখা দেখিবার ইচ্ছা করেন; এই তিন দিন তিনি উৎসুকভাবে কেবল তাঁহারই অপেক্ষা করিয়াছেন। আজ প্রাতে বিকারের ঘোরে তাঁহাকে কিছুতেই বিছানায় শোয়াইয়া রাখিতে পারা গেল না। তিনি উঠিয়া বসিলেন; বলিলেন, "আমার পুত্র এখনও আসিল না, যাই, আমিই তাহার সঙ্গে গিয়া দেখা করিয়া আসি।" এই বলিয়া যেমন শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়াছেন, অমনি ভূমিতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে। সন্তান-বৎসল পিতার অক্ষিকোণে

দুই ফোঁটা অশ্রু এখনও শুকায় নাই। সেই মরণ-পাণ্ডুর বদনমণ্ডলে দুই বিন্দু অবিকৃত অশ্রু এখনও তাঁহার সন্তান-বাৎসল্যের শেষ সাক্ষ্য দিতেছে, বীরত্বের প্রতিমূর্ত্তি পিতার মৃতদেহপানে মেরিয়াস বাষ্পাকুলিত-নয়নে যতই চাহিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এমন পিতা!—ইঁহারই স্নেহ হইতে তিনি আজীবন বঞ্চিত। আর তাঁহার মাতামহই ইহার মূল!

পণ্টমারসির সম্পত্তি বড় কিছুই ছিল না। তাহার অস্থাবর যাহা কিছু ছিল, বিক্রয় করিয়া কোন-মতে অন্ত্যেষ্টির খরচ নির্ব্বাহিত হইল। দাসী শয্যারচনা করিতে করিতে মৃতের উপধানতলে এক টুক্‌রা কাগজ পাইয়াছিল, সে মেরিয়াসকে তাহাই আনিয়া দিল। সেই কাগজখানিতে লেখা ছিল, আমার পুত্রের জন্য"—ওয়াটারলুর সমর-ক্ষেত্রে সম্রাট্ আমাকে ব্যারণ উপাধি দিয়াছেন। বুরবন-রাজগণ আমার সে পদবী স্বীকার করিতে চাহেন না। আমি হৃদয়ের শোণিত বিনিময়ে সেই সম্মান ক্রয় করিয়াছিলাম, আমার পুত্র তাহা ভোগ করিবে। সে অবশ্য সেই সম্মানের উপযুক্ত হইবে।" অপর পৃষ্ঠে লেখা ছিল, "এই ওয়াটারলু রণক্ষেত্রেই এক জন সারজেণ্ট আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার নাম থেনার্ডিয়ার। শুনিতে পাই—তিনি পারিসের নিকটবর্ত্তী মণ্টফারমিল বা কাছাকাছি কোন স্থানে একটি হোটেল খুলিয়াছেন। যদি আমার পুত্র কখনও তাঁহার দেখা পায়, তবে সে তাঁহাকে সাহায্য করিবে।"

মেরিয়াস দুই দিন ভার্ণনে থাকিলেন। পিতার মৃতদেহের সৎকার করিয়া তৃতীয় দিনে আবার পারিসে ফিরিয়া আসিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

মেরিয়াস সংসার-অর্ণবে একা।

এই সময় হইতেই মেরিয়াসের কার্য্যকলাপে একটা বিষম ভাবান্তর লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি স্কুলে যাওয়া এক প্রকার ছাড়িয়া দিলেন। বিষণ্ণ-মনে সর্ব্বদাই পাঠাগারে বসিয়া থাকিতেন। আইনের পুস্তক বড় একটা পড়িতেন না। রাত-দিন তাঁহাকে ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের ইতিহাস পড়িতে দেখা যাইত। সহস্র কার্য্য থাকিলেও মাসে দুইবার তিনবার তিনি ভার্ণনে ছুটিয়া যাইতেন এবং মৃত পিতার সমাধির পার্শ্বে দুই ফোঁটা বিষাদের অশ্রু ফেলিয়া আসিতেন। এই ভাবান্তর মসিও জিল-নরম্যাণ্ডের চক্ষু এড়াইল না। তিনি ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

এক দিন মেরিয়াস মাতামহের নিকট দুই দিনের বিদায় লইয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। কোথায় যাইবেন, তাহা কিছুই বলিয়া গেলেন না। যাইবার সময় তাড়াতাড়িতে তাঁহার পকেট হইতে একখানি কাগজ সিঁড়িতে পড়িয়া গিয়াছিল। বৃদ্ধা দাসী সোপান সম্মার্জ্জন করিতে করিতে সেখানি কুড়াইয়া পাইয়া আসিয়া বৃদ্ধ জিল-নরম্যাণ্ডের হাতে দিল। বৃদ্ধ চশমা চোখে দিয়া সেখানি পড়িতে লাগিলেন। তাহাতে লেখা ছিল, "আমার পুত্রের জন্য—ওয়াটার-লুর সমরক্ষেত্রে সম্রাট্ আমাকে ব্যারণ উপাধি দিয়াছিলেন। বুরবন্-রাজগণ আমার সে পদবী স্বীকার করিতে চাহেন না। আমি হৃদয়ের শোণিত-বিনিময়ে এই সম্মান ক্রয় করিয়াছিলাম। আমার পুত্র তাহা ভোগ করিবে। সে অবশ্য এই সম্মানের উপযুক্ত হইবে।" জিল-নরম্যাণ্ডের বার্দ্ধক্য-জড় হৃদয়ে, শিরায় উপশিরায় যেন তীব্র গরল ঢালিয়া দিল। বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া কহিয়া উঠিলেন, "এ সেই নর-ঘাতকেরই হস্তাক্ষর বটে!" তখনই ভৃত্যকে কহিলেন, "এখনই এই কাগজখানি এ স্থান হইতে সরাইয়া ফেল।" বৃদ্ধ তীব্র বিষধর সর্পজ্ঞানে কাগজের টুকরাটিকে কক্ষতলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

দুই দিন পরে মেরিয়াস্ বাটীতে ফিরিয়া আসিবামাত্র বৃদ্ধ জিল-নরম্যাণ্ড তাহাকে আপনার কক্ষে ডাকাইয়া আনিলেন। অত্যন্ত পরুষ-স্বরে দৌহিত্রকে কহিলেন, "মেরিয়াস! না—না—আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম—তুমি যে এখন ব্যারণ, ভিক্ষুকের পুত্র—ব্যারণ!—এ সমস্ত কি?" মৃত পিতাকে এই ভাবে অভিহিত করায় মেরিয়াস্ মর্ম্মাহত হইয়া কহিলেন, "মাতামহ! ক্ষমা করিবেন। আমার পিতা ভিক্ষুক ছিলেন না। তিনি বীরপুরুষ ছিলেন এবং তিনি বরাবর বীরের ন্যায় ফ্রান্স প্রজাতন্ত্রের

সেবা করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার কোনই অপরাধ ছিল না। তাঁহার অপরাধের মধ্যে তিনি প্রজাতন্ত্রকে পরমমঙ্গলময় দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন—তিনি আমাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসিতেন।" এই স্পষ্ট উত্তর পাইয়া জিল-নরম্যাণ্ড বজ্রাহত হইলেন। তিনি কহিলেন, "মেরিয়াস! তোমার পিতা কি ছিলেন, আমি জানি না, জানিতে ইচ্ছাও করি না। তবে তুমি এইটুকু জানিয়া রাখ যে, তুমি যেমন ব্যারণ, আমার ঐ চটি জুতাজোড়াও সেই রকম ব্যারণ। আর যাহারা রোবস্পিয়ার কিংবা বুয়োনাপার্টির চেলা, তাহারা রাজদ্রোহী পিশাচ—তাহারা কাপুরুষ, ওয়াটারলু ক্ষেত্রে তাহারা প্রুসীয়দিগের ও ভয়ে ইংরাজের ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া বাঁচিয়াছে। যদি তোমার পিতা সেই দলের এক জন হন, তবে তিনিও তাই।"

মেরিয়াসের সর্ব্বশরীর রাগে কাঁপিতে লাগিল। তিনি কি করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে আগুনের হল্কা ছুটিতেছিল। তাঁহার সমক্ষে তাঁহার স্বর্গগত পিতার নিন্দা! কিন্তু কি করিবেন? কাহার উপর প্রতিশোধ লইবেন? এক দিকে মৃত পিতা—অন্যদিকে বৃদ্ধ মাতামহ। এক দিকে পুণ্যময় সমাধি—অন্য দিকে শুভ্রকেশ। তিনি উন্মত্তের মত টলিতে টলিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ক্রোধোন্মত্ত বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া বলিল, "তুমি এখনই আমার বাড়ী হইতে দূর হও। তোমার ন্যায় ব্যারণ ও আমার ন্যায় দরিদ্র এক গৃহে বাস করা অসম্ভব।" মেরিয়াস সেই অবস্থাতেই রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পকেটে ত্রিশ ফ্রাঙ্ক এবং ঘড়ি ও চেন ভিন্ন আর কিছুই নাই। রাস্তায় বাহির হইয়া মেরিয়াস ঘণ্টা হিসাবে একখানি ক্যাব ভাড়া লইলেন এবং "পেজ্ লাটিন" অভিমুখে গাড়ী হাঁকাইতে কোচ্‌ম্যানকে আদেশ দিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—:•:—

কে এই সুন্দরী?

মেরিয়াস পণ্টমারসি দারুণ ক্রোধে ও অভিমানে মাতামহের আলয় পরিত্যাগ করিলেন বটে; কিন্তু কোথায় যাইবেন, তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া পারিসের এ মহাল্লায় ও মহাল্লায় বাসা খুঁজিয়া বেড়াইয়া শেষে নগরের উপকণ্ঠে একটি জীর্ণ ভাড়াটিয়া বাসা-বাটীর একটি কক্ষ ভাড়া করিলেন। ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ের উপর তাঁহার অনুরাগ বড় ছিল না। তিনি ইংরাজী, জার্ম্মাণ প্রভৃতি অনেকগুলি বৈদেশিক ভাষা জানিতেন। সমপাঠী বন্ধুগণের সাহায্যে এবং নিজ যত্নে তিনি দুই চারি জন পুস্তক-প্রকাশকের সহিত আলাপ করিয়া লইলেন এবং তাঁহাদের জন্য পুস্তক রচনা করিয়া যে পারিশ্রমিক অর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তাহাতেই কোন প্রকারে তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহ হইতে লাগিল।

মেরিয়াস যে কক্ষে থাকিতেন, ঠিক তাহার পার্শ্বের কুঠুরীতেই দরিদ্র জনড্রেট্-পরিবার বাস করিত। এই দুঃস্থ পরিবারের দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়া মেরিয়াস এক এক দিন কাঁদিয়া ফেলিতেন এবং বাড়ীওয়ালীর হাত দিয়া তাঁহার শক্তিতে যাহা কুলাইত, সেইরূপ সাহায্যদানে তিনি কখনও পরাঙ্মুখ হইতেন না। মেরিয়াস এই দরিদ্র পরিবারের কোন দিন ধন্যবাদের প্রত্যাশা করিতেন না। এই দরিদ্র পরিবারের সকলেই মেরিয়াসের নাম জানিত এবং তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ ছিল। মেরিয়াস এই জনড্রেট্-পরিবারের সকলেরই মুখ চিনিতেন। কিন্তু জনড্রেট্ পরিবারের কেহই মেরিয়াসের সহিত সাক্ষাৎ-ভাবে আলাপ করিতে সাহসী হইত না; মেরিয়াস্‌ও অনাবশ্যক জ্ঞানে তাহাদের কাহারও সহিত কথাটি পর্য্যন্ত কহিতেন না।

দিবাভাগে সমস্তক্ষণ মেরিয়াস্ আপনার কক্ষে বসিয়া লেখাপড়া করিতেন। সন্ধ্যার সময় প্রায় প্রতিদিনই তিনি লকসেমবার্গ উদ্যানে ভ্রমণ করিতেন।

এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে, মেরিয়াস এই উদ্যানমধ্যে একখানি গার্ডেন-সিটের একাংশে বসিয়া

আছেন, এমন সময় এক জন ষষ্টিবর্ষীয় বৃদ্ধ একটি রূপসী ষোড়শীর হাত ধরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বস্থ আসনে উপবেশন করিয়া বায়ুসেবন করিতে আরম্ভ করিলেন। মেরিয়াসের সহিত ষোড়শীর চারিচক্ষে মিলন হইবামাত্রই কি যেন এক অভূতপূর্ব্ব ভাবাবেশে মেরিয়াসের হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। তিনি যতক্ষণ পর্য্যন্ত রমণীকে দেখা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যাকুলভাবে সেই সৌন্দর্য্য-প্রতিমা-খানিকে দেখিতে লাগিলেন। রমণীও এক একবার তাঁহার বসোরা-গোলাপের মত লজ্জারুণ মুখখানি তুলিয়া বঙ্কিমদৃষ্টিতে মেরিয়াসকে দেখিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পরেই বৃদ্ধ ও ষোড়শী হাত ধরাধরি করিয়া উদ্যান হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে, মেরিয়াস কিছুক্ষণ উদ্যানমধ্যে উন্মত্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া, শেষে রাত্রি একটু অধিক হইলে, বাসায় ফিরিয়া গেলেন। পরদিন মেরিয়াস সন্ধ্যার বহু :পূর্ব্বে যাইয়াই লকসেমবার্গ উদ্যানে তাঁহার নিরূপিত আসনে উপবেশনপূর্ব্বক উদ্‌গ্রীব হইয়া রমণীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার ঠিক পরেই বৃদ্ধ ও ষোড়শী আসিয়া তাঁহাদের সেই আসনে উপবেশন করিলেন। এইরূপে প্রায় মাসাবধি কাটিয়া গেল, কেবল চোখের মিলন ভিন্ন প্রণয়ি-যুগল আর যেন অধিক অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। এই যুবক-যুবতী যে পরস্পর পরস্পরের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, বৃদ্ধ যেন তাহা বুঝিয়া লইল। এখন আর তাঁহারা প্রতিদিন সান্ধ্য-ভ্রমণে আসিতেন না। কিছুদিন পরে একেবারেই তাঁহাদিগকে আর লকসেমবার্গ উদ্যানে দেখা গেল না। মেরিয়াসও নিষ্ফল আশায় প্রতিদিন সন্ধ্যা-কালে উদ্যানে আসিয়া বসিতেন। কিন্তু শেষে হতাশ হইয়া একেবারে উদ্যান-ভ্রমণ বন্ধ করিয়া দিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

ভিখারিণী ইপোনাইন্।

মেরিয়াস এখন আর বড় একটা বাড়ীর বাহির হন না। মানসিক অশান্তিতে তাঁহার শরীর বড়ই খিন্ন হইতে লাগিল। এক দিন সন্ধ্যাকালে তিনি তাঁহার কুটীর-সম্মুখে পথে পাইচারী করিতেছেন, এমন সময় দুইটি যুবতী ছুটিয়া আসিতে আসিতে তাঁহার গায়ে ধাক্কা লাগিল। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে মেরিয়াস দেখিলেন যে, যুবতীদ্বয়ের মুখ পাণ্ডুবর্ণ, মস্তকে টুপী নাই, চুলগুলি আলুথালু, পরিধানের বসন ছিন্ন ও মলিন, পদদ্বয় নগ্ন। দৌড়িয়া পলাইতে পলাইতে এক জন আর এক জনকে বলিতেছিল, "আর একটু হ'লেই পাহারাওয়ালা আমা-দিগকে ধরেছিল আর কি!" যুবতীদ্বয় পলাইয়া গিয়া ঝোঁপের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মেরিয়াস্ তাঁহার নিজের চিন্তায়ই ব্যস্ত; সুতরাং অন্য অপ্রাসঙ্গিক বিষয় তাঁহার লক্ষ্যই হইল না। তিনি পূর্ব্ববৎ রাস্তায় পাইচারী করিতে লাগিলেন। সহসা একটি পুলিন্দা তাঁহার চক্ষে পড়িল। তিনি সেটি কুড়াইয়া লইয়া ভাবিলেন যে—হয় ত এটি সেই পলায়নপরা যুবতীদিগের পকেট হইতে পড়িয়া গিয়াছে। তিনি প্যাকেটটি লইয়া আপন কুটীরে প্রবেশ করিলেন, আলোক জ্বালিয়া প্যাকেটটি খুলিলেন। তাঁহার ধারণা যে, প্যাকেটের মধ্যে কোন কাগজ-পত্র থাকিতে পারে, যদ্দ্বারা ইহার মালিকের সন্ধান সম্ভবপর হইতে পারে। প্যাকেটটি খুলিয়া মেরিয়াস্ দেখিলেন যে, তাহাতে চারিখানি খোলা এন্‌ভেলাপে ভরা চারি খানি পত্র।

প্রথম পত্রখানি এই :—

"ম্যাডাম্ লা মারকুইস্!

দরিদ্রের প্রতি দয়া এবং তাহাদের অভাব-পূরণই সংসারে প্রকৃত ধর্ম্ম। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই হতভাগ্য স্পানীয়ার্ডের উপর একটু করুণা করুন। সে সমাজের উন্নতি-কল্পে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া এক্ষণে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে তাহার পক্ষে স্ত্রী পুত্র লইয়া দিন গুজরানও কষ্টকর। তাহার প্রার্থনা বোধ হয় অপূর্ণ যাইবে না।

একান্ত অনুগত—ডন অ্যালভারেজ,
স্পেনীয় অশ্বারোহী সেনাদলের কাপ্তেন।

পুনঃ—আমি দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়া পথ খরচের অভাবে ফ্রান্সে আটকাইয়া বসিয়া আছি।"

এই পত্রখানিতে প্রেরকের স্বাক্ষর পাইলেন বটে, কিন্তু তাহার ঠিকানা পাইলেন না। দ্বিতীয় পত্রখানিতে ঠিকানা পাইবার আশা করিয়া সেখানি খুলিয়া পড়িলেন। সেখানি এইরূপ :—

"ম্যাডাম লা কমটেস্ ডি মণ্টস্তারনেট্, ৯ নং রু কাসেট।

মহোদয়া!

আমি ছয়টি সন্তানের অনাথিনী জননী। আমার সকলের ছোট ছেলেটি এই আট মাসের। এই আট মাস হইতেই আমার স্বামী আমায় পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছেন। আমার নিজের এবং এই কয়টি বালক-বালিকার ভরণ-পোষণোপযোগী কিছুই আমার নাই। আপনি সাহায্য না করিলে আমরা অনশনে মারা পড়িব। ঈশ্বর আপনাকে সুখী করিবেন।

আপনাদের চিরাশ্রিতা
আনটাইনেট্ বেলিজ্যার্ড।"

মেরিয়াস তৃতীয় পত্রখানি খুলিয়া পড়িলেন। তাহা এই :—

"মসিও প্যাকুরগো
ইলেক্টর, পাইকারী টুপী-বিক্রেতা।
রু সেট ডেনিস।

মহাশয়!

সাহিত্যসেবিগণের আপনি পরম বন্ধু ও তাহাদের সাহায্য-কল্পে আপনি চিরদিনই মুক্তহস্ত। তাই এই দরিদ্র নাট্যকার আজ ভিখারীভাবে আপনার দ্বারে সমুপস্থিত। আমি একখানি সুন্দর ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়া তাহা অভিনয়ের জন্য "থিয়েটার ফ্রান্সেতে' পাঠাইয়াছি। থিয়েটারের অধ্যক্ষও আগ্রহের সহিত তাহা তাঁহার থিয়েটারে অভিনয় করিবেন বলিয়াছেন। নিয়তির দুর্ব্বোধ নিয়মে সরস্বতীর সহিত লক্ষ্মীর বিবাদ, প্রবাদেও প্রচলিত আছে। আমিও নিতান্ত দরিদ্র।

মসিও প্যাকুরগো! আপনার নাম শুনিয়া আমার কন্যাকে এই পত্রবাহিকারূপে আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম, যৎকিঞ্চিৎ সাহায্যদানে কৃতার্থ করিবেন।

চিরানুগত—জেনফ্লো
সাহিত্যসেবী।"

মেরিয়াস চতুর্থ পত্রখানিও খুলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

"সেণ্ট জ্যাকেস চার্চ্চের মহানুভব ভদ্রলোক!

মহানুভব!

আমি আপনার নাম অবগত নহি। কিন্তু দানে আপনার মুক্তহস্ত্ সর্ব্বজন-বিদিত। আপনি যদি একবার আমার কন্যার সহিত এই দরিদ্রের কুটীরে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা কি ভাবে আছি। নিয়তি কাহারও উপর মুক্তহস্ত, কাহারও উপর খড়্গহস্ত। আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ। তিন চারটি বালক-বালিকা লইয়া আমরা স্ত্রী-পুরুষে অনাহারে মরিতেছি। দরিদ্রের বন্ধু! একবার আসিয়া এই দীন-পরিবারের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া যাইবেন।

অনুগত পি ফ্যাবাণ্টে
নাট্যকার।"

চিঠি চারিখানি পড়িয়া মেরিয়াস তাহার লেখকের কোন পরিচয়ই পাইলেন না। লেখকের ঠিকানাও কোনখানেই নাই। তবে হস্তাক্ষর, লিখন ভঙ্গী ইত্যাদি দেখিয়া মেরিয়াস ঠিক বুঝিলেন যে, ডন্ অ্যালভারেজ, ম্যাডাম বেলিজ্যার্ড, কবি জেনফ্লো ও নাট্যকার ফ্যাবাণ্টো এই চারি ব্যক্তিই এক। কে এই পত্র-চতুষ্টয়ের লেখক, সেই রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস মেরিয়াস নিষ্ফল ও অনর্থক সময়-ক্ষতিকর মনে করিয়া, তিনি পত্রগুলি টেবিলের এক পার্শ্বে রাখিয়া গিয়া শয়ন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া প্রাতরাশ সমাপন-পূর্ব্বক মেরিয়াস লিখন-পঠনের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় কে আসিয়া তাঁহার দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল। মেরিয়াস কহিলেন, "দ্বার খোলা আছে,—ভিতরে আসুন।" তাঁহার অনুমতি পাইয়া এক জন যুবতী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। যুবতীর দেহ শীর্ণ ও অনাহার-ক্লিষ্ট, তাহার পরিধানে একটি জীর্ণ শেমীজ ও ছিন্ন পেটিকোট। যুবতী শীতে ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। দেখিবামাত্র মেরিয়াস চিনিলেন যে,—সে জনড্রেট্-দুহিতা। তিনি যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি চান মিস?" যুবতী কহিল, "আপনার নামে একখানি চিঠি আছে। এই লউন—মসিও মেরিয়াস!" মেরিয়াস চিঠিখানি লইয়া পড়িলেন। তাহাতে লেখা আছে :—

"মহানুভব যুবক!

আমাদের এই দরিদ্র পরিবারের উপর আপনার যে অকৃত্রিম দয়া আছে, তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি। সেই জন্য পরমেশ্বরের নিকট আমরা স্ত্রী-পুরুষে নিয়ত আপনার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়া

থাকি। মহাশয়! আজ দুই দিন হইতে আমরা সপরিবারে অনাহারে কাটাইতেছি। আমার কন্যার মুখে সমস্ত শুনিবেন, এবং দয়া করিয়া যৎকিঞ্চিৎ দানে আমাদিগকে অনাহার-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবেন।

চিরানুগত

জনড্রেট্।"

গত রজনীতে প্রাপ্ত চিঠিগুলি-সম্পর্কীয় রহস্য উদ্ঘাটনকল্পে এই পত্রখানি উজ্জ্বল আলোকবর্ত্তির কার্য্য করিল। এই পত্রের হস্তাক্ষর যাহার, অপর চারিখানি পত্রের হস্তাক্ষরও তাহারই। এই পাঁচখানি পত্রের লেখক সেই একই ব্যক্তি—মেরিয়াসের পার্শ্বের ঘরের ভাড়াটিয়া জনড্রেট। তবে জন্‌ড্রেটও তাহার প্রকৃত নাম কি না, তাহা বিষম সন্দেহের বিষয়।

মেরিয়াস যে সময়ে সেই রহস্যময় পত্রখানি পাঠ করিতেছিলেন, সেই সময়ে যুবতী মেরিয়াসের কক্ষস্থিত সমস্ত জিনিসপত্র উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া দেখিতেছিল এবং তাঁহার কোটের পকেট হাতড়াইয়া দেখিতেছিল। মেরিয়াস তখন চিন্তামগ্ন। জন্‌ড্রেট-দুহিতা কি করিতেছে, দেখিবার অবসর তাঁহার ছিল না।

মেরিয়াসের টেবিলের উপর একখানি পুস্তক খোলা ছিল। জন্‌ড্রেট-কন্যা সহসা টেবিলের নিকট গিয়া সেইখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল।

"জেনারল বোঁদুইন্ আদেশ পাইলেন যে, পাঁচ দল সৈন্য লইয়া তুমি এখনই ওরাটারলু ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে স্থিত স্যাটো অব-হুগোমণ্ট যাইয়া দখল কর।" ওয়াটারলুর নাম পড়িয়াই যুবতী বলিল, "মসিও মেরিয়াস! আমি ওয়াটারলুর যুদ্ধের কথা সব জানি। আমার পিতা সেই যুদ্ধে ফরাসী-সৈন্যদলে সারজেণ্টের কার্য্য করিতেন। আমরা বোনাপার্টির দলের লোক।" যুবতী পুস্তক বন্ধ করিয়া রাখিয়া একখানি সাদা কাগজ টানিয়া লইল এবং লিখিল, "পুলিসের লোকজন এখানে আসিয়াছে।" লিখিয়া কাগজখানি মেরিয়াসকে দিয়া যুবতী বলিল, "দেখুন মসিও মেরিয়াস! আমার হস্তাক্ষর কেমন সুন্দর ও নির্ভুল। আমরা দুই ভগ্নীই বাল্যকালে লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম। আমাদের অবস্থা আগে এমন ছিল না।" যুবতী এই বলিয়া চুপ করিল। তাহার কাচের মত জ্যোতিহীন চক্ষু মেরিয়াসের মুখের দিকে নিবদ্ধ করিয়া আবদার ও যন্ত্রণা-মিশ্রিত স্বরে যুবতী কহিল, "মসিও মেরিয়াস! আপনি জানেন কি—আপনি দেখিতে খুব সুন্দর!" মেরিয়াস যুবতীর সে প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না, বুঝিবার চেষ্টাও করিলেন না। তিনি কহিলেন, "মিস! ঐ দেখ-টেবিলের উপর একটি প্যাকেট রহিয়াছে, ওটি বোধ হয় তোমাদের। কাল রাত্রিতে আমি ওট রাস্তায় কুড়াইয়া পাইয়াছি।" প্যাকেটটি দেখিয়াই যুবতী একেবারে আনন্দে করতালি দিয়া কহিল, "কাল রাত্রে তাড়াতাড়িতে আমরা ঐ প্যাকেটটি হারাইয়াছিলাম। কিছুতেই খুঁজিয়া পাই নাই। তাহা হইলে, মসিও মেরিয়াস! কা'ল আপনারই গায়ে ধাক্কা লাগিয়াছিল।" এই কথা বলিয়া সে সেণ্ট জ্যাকেস চার্চ্চের ভদ্রলোকের নামের যে চিঠিখানি ছিল, সেইখানি খুলিয়া বলিল, "ঠিক কথা—এখন গেলেই বুড়োর সঙ্গে ঠিক দেখা হবে। কিছু আদায় করা যাবে।" আবার একগাল হাসি হাসিয়া যুবতী কহিল, "বুঝিতে পারিলেন কি মসিও মেরিয়াস!—আমি সকালেই কি জন্য আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি।" মসিও মেরিয়াস্ ঠিকই বুঝিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার এ পকেট ও পকেট খুঁজিয়া পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক ও ষোল সু পাইলেন। ইহাই মাত্র তাঁহার সম্বল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, ষোল সুতে আমার আজিকার খরচ চলিবে। কল্যের বন্দোবস্ত কল্য নিজেই করিব। মেরিয়াস ষোল সু রাখিয়া পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক যুবতীকে দান করিলেন। যুবতী আহ্লাদে আটখানা হইয়া কহিল, "পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক!—মেরিয়াস্! তুমি বেশ লোক! আমরা আজ খুব পেট ভরিয়া খাইব!" যুবতী তাহার ছিন্ন শেমীজ টানিয়া গলার উপর উঠাইয়া দিয়া মেরিয়াসকে একটি দীর্ঘ সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিতে বলিতে গেল, "যাই—এখনই গিয়া বুড়ো সওদাগরকে পাকড়াও করিতে হইবে।"

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

জনড্রেটের ফাঁদ।

জনড্রেট-দুহিতা চলিয়া গেল। মেরিয়াসের কুটীর ও জনড্রেটের কুটীরের মধ্যে ব্যবধানমাত্র একটি পাতলা কাঠের বেড়া, উপরে পলস্তরা করা। জনড্রেটের অবস্থা এতদিন মেরিয়াস্ মোটেই লক্ষ্য করেন নাই। আজ তাহা জানিবার জন্য কি জানি কেন তাঁহার কৌতূহল জন্মিল। বেড়ার উপরে একস্থানে পলস্তরা খসিয়া গিয়া একটি ছিদ্র হইয়াছে, মেরিয়াস্ চেয়ারের উপর পা দিয়া, দেরাজের উপর উঠিয়া, সেই ছিদ্রপথে জনড্রেটের কক্ষ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মেরিয়াস্ও অর্থশালী ছিলেন না। তাঁহার গৃহও দারিদ্র্য-সূচক, কিন্তু জনড্রেটের কক্ষ দারিদ্র্য-জনিত কদর্য্যতার শেষ সীমা, ধূলি ও আবর্জ্জনা-পূর্ণ, অন্ধকার, পূতিগন্ধময়, বায়ুচলাচল-বিহীন ও অপরিচ্ছন্ন। কক্ষের আসবাবও তদনুরূপ, একখানি ছিন্নাসন চেয়ার, একটি ভগ্নপদ টেবিল, কয়েকখানি মলিন চীনামাটীর বাসন, দুইখানি জীর্ণ খট্টা। দেয়ালে কাল রঙের ফ্রেমে আঁটা একখানি ছবি। ছবিখানি এইরূপ;—একটি সুন্দর সুপ্ত শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া একটি সুন্দরী নিদ্রা যাইতেছে। আকাশে একটি ঈগল পক্ষী উড়িতেছে। তাহার চঞ্চুতে একটি রাজমুকুট। ছবির পশ্চাদ্দেশে নেপোলিয়ান। তাঁহার মস্তকের চতুর্দ্দিকে স্বর্গীয় জ্যোতি! ছবির নিম্নে লেখা আছে:—

ম্যারিন্‌গো
অষ্টারিট্‌স্
জেনা
ওয়াগ্‌র্যাম
এলট্

খট্টার উপর একটি লোক বসিয়া আছে। লোকটির বয়স প্রায় ষাট বৎসর। তাহার পরিধানে একটি স্ত্রীলোকের শেমীজ। লোকটি কৃশ, পাণ্ডুবর্ণ দেখিলেই বোধ হয়, নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর-প্রকৃতি। তাহার মুখে একটি পাইপ। ঘরে রুটীর টুকরাটি নাই বটে, কিন্তু তাম্রকূটের অভাব বা অস্বচ্ছলতা নাই। প্রায় চত্বারিংশদ্বর্ষ-বয়স্কা একটি স্থূলাকার রমণী কক্ষমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ইনিই জনড্রেটের সহধর্ম্মিণী। মেরিয়াস্ এই দৃশ্য দেখিয়া নামিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে পাঠকের পূর্ব্বপরিচিতা জনড্রেট-দুহিতা ছুটিতে ছুটিতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল এবং পিতাকে কহিল, "বাবা, তিনি আসিতেছেন।"

পিতা কহিল, "কে? সেণ্ট জ্যাকেস্ চার্চ্চের সেই বুড়ো লোকটি?"

"হাঁ,—তিনি এখনি আস্‌বেন। ভাড়া গাড়ী ক'রে তিনি আস্‌ছেন।"

"সে গাড়ী ক'রে আস্‌ছে বল্‌ছিস্—তা হ'লে তুই তার আগে এসে পৌছুলি কি ক'রে? যা হ'ক—তাকে আমাদের ঠিকানা বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছিস তো? ব'লে দিয়েছিস্ তো যে, একবারে শেষের দরজা?"

"আমি সব ঠিক ব'লে দিয়েছি গো কর্ত্তা!—ঠিক ব'লে দিয়েছি—আমাকে আর তোমার শিখাতে হবে না। ঐ শোন আমাদের দরজায়ই গাড়ী এসে লাগ্‌ল।

জনড্রেট তাড়াতাড়ি কহিল, "গিন্নি, গিন্নি, চিমনীর আগুনটা নিবিয়ে ফেল—আর তুমি গিয়ে বিছানায় শুয়ে প'ড়ে কোঁকাতে আরম্ভ কর। যাও, শীগ্‌গির যাও।" জনড্রেট-পত্নী হতভম্ভ হইয়া গেল। জনড্রেট তাড়াতাড়ি উঠিয়া কলসী হইতে খানিকটা জল লইয়া চিমনীতে ঢালিয়া দিল। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। জনড্রেট তাহার জ্যেষ্ঠা দুহিতাকে কহিল, "শীগ্‌গির চেয়ারে বস্‌বার জায়গাটা ছিড়ে ফেল্।" জনড্রেট-কন্যা পিতার আদেশের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিল না দেখিয়া, জনড্রেট নিজেই উঠিয়া এক লাথিতে চেয়ারের বেতের আসনটি ছিন্ন করিয়া ফেলিল।

এই সময়ে কক্ষের দ্বারে মৃদু করাঘাত-শব্দ শ্রুত হইল। এক জন বৃদ্ধ ও একটি ষোড়শী যুবতী আসিয়া কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মেরিয়াস্ তখনও সেই একভাবেই একই স্থানে দাঁড়াইয়া ছিদ্রপথে সমস্ত দেখিতেছিলেন। তিনি এক্ষণে যাহা দেখিলেন, বুঝিতে পারিলেন না যে, তাহা সত্য না স্বপ্ন।

সেই লক্‌সেমবার্গ উদ্যানে, প্রথম দর্শনেই মেরিয়াস্ যাঁহার প্রায় কায়-মন-প্রাণ বিকাইয়াছেন,

যাঁহাকে দর্শন-মাত্র মেরিয়াসের হৃদয় ভাবরসে গলিয়া যায়, যাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি ফুল্লসরোরুহের ন্যায় সদা হাস্যময়—মেরিয়াসের সাধনার ধন —কি তাঁহার হৃদয়ের আকুল ক্রন্দন শুনিতে পাইয়াছেন? তাই আজ তাঁহার পদার্পণে দরিদ্রের কুটীর পবিত্র করিতে আসিয়াছেন?

বৃদ্ধ কুটীরে প্রবেশ করিয়াই গম্ভীর অথচ সহাস্য বদনে জনড্রেটকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ঐ পার্শ্বেলটি আপনাদের জন্যই আনিয়াছি। উহার মধ্যে নূতন পরিধেয়, পশমী মোজা ও কম্বল আছে।"

জনড্রেট কহিল, "আপনি নিশ্চয় স্বর্গের দেবতা।"

জনড্রেট আস্তে আস্তে তাহার কন্যার কানের কাছে মুখ লইয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বৃদ্ধের নিকট কি নাম স্বাক্ষর করা চিঠিখানা দিয়েছিলি?" কন্যা পিতার কানে কানে চুপি চুপি কহিল, "ফ্যাবান্‌টো।" ভাগ্যক্রমে ঠিক সময়েই জনড্রেট সেটি জানিয়া লইয়াছিল। কারণ, পর মুহূর্ত্তেই বৃদ্ধ আগন্তুক কহিল, আমি দেখিতেছি, বাস্তবিকই আপনাব অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় মসিও —"জনড্রেট টপ করিয়া আগন্তুকেব কথা পূরণ করিয়া দিল," ফ্যাবান্‌টো "আগন্তুক কহিল," মসিও ফ্যাবান্‌টোহাঁ! ঠিক-তাই বটে, আপনার নাম আমার মনে আছে।

জনড্রেট কহিল, "এক সময়ে আমি এক জন খুব বড় অভিনেতা ছিলাম। আমি ট্যালমার ছাত্র। ভাগ্যলক্ষ্মী এক সময়ে আমাব উপর খুব প্রসন্না ছিলেন। এখন তিনি তেমনই বিরূপা হইয়াছেন। দেখুন—হে আমার উপকারক বন্ধু! একবার চাহিয়া দেখুন—আমার গৃহে এক টুকরা রুটী নাই, এক স্ফুলিঙ্গ অগ্নি নাই। এই ঘোর দুর্দ্দিনে আমার শিশুগণ অনাহারে মরিতেছে, শীতে কাঁপিতেছে। ঐ দেখুন—আমার স্ত্রী ভয়ানক জ্বরে ভুগিতেছে। আমার দুর্দ্দশার কথা কত বলিব? দেখুন—এই দারুণ শীতে আমি আমার স্ত্রীর পরিত্যক্ত একটি ছিন্ন শেমীজ পরিয়া বসিয়া আছি। আমার একটি কোট নাই যে, পরিয়া বাহির হই, ভদ্রলোকের সহিত দেখাশুনা করি। দুঃখের উপরে দুঃখের কথা,—আমার বাড়ীওয়ালীর এক বৎসরের ভাড়া দিতে পারি নাই। আজিই ষাট ফ্র্যাঙ্ক না দিতে পারিলে আমাদিগকে গলা ধাক্কা দিয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া দিবে। মহানুভব! এই রাত্রিতে অপোগণ্ড শিশু কয়টি ও তাহাদের রুগ্না জননীকে লইয়া আমাদিগকে পথে পড়িয়া মরিতে হইবে—দেখিতেছি, আমাদের অন্য গতি নাই।'

বৃদ্ধ তাঁহার পকেট হইতে একটি পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক মুদ্রা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ী ভাড়া আপনাকে কখন দিতে হইবে?" জনড্রেট কহিল, "কাল রাত্রি আটটার মধ্যে।" বৃদ্ধ কহিলেন, "আমি ছয়টার সময় টাকা লইয়া আসিব।" জনড্রেট কহিল, 'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।" বৃদ্ধ ষোড়শীর হাত ধরিয়া বাহির হইয়া যাইতেছেন, এমন সময় জনড্রেট-দুহিতা কহিল, মহাশয়! আপনি আপনাব ওভারকোটটি ফেলিয়া যাইতেছেন। জনড্রেট চক্ষু টিপিয়া ইসারায় সে কথা বলিতে মানা করিল। বৃদ্ধ আগন্তুক যাইতে যাইতে মুখ ফিরইয়া বলিলেন, "আমি কোট ভুলিয়া যাই নাই। ওটি তোমার পিতার ব্যবহারের জন্য ইচ্ছা করিয়া রাখিয়া গেলাম।" বৃদ্ধ এই বলিয়া যুবতীর হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। কোচম্যান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

ষড়্‌যন্ত্র।

মেরিয়াস দেওয়ালের ছিদ্রপথে এই ব্যাপারের আনুপূর্ব্বিক সমস্তই দেখিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার কিছুই দেখিবার অবসর তাঁহার ছিল না। কি যেন এক অভূতপূর্ব্ব ভাবাবেশে মুগ্ধ হইয়া মেরিয়াস তাঁহার প্রণয়-প্রতিমার মুখ-চন্দ্রমা অনিমিষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান শূন্য। আতস প্রস্তর যেমন তদুপরি পতিত সমস্ত সূর্য্যরশ্মিকে টানিয়া লইয়া একটিমাত্র ক্ষুদ্র বিন্দুতে একটি অত্যুজ্জল মিলিত আলোক রচনা করে, মেরিয়াসেরও যাবতীয় বহিরিন্দ্রিয়গুলি সেইরূপ চক্ষুতে যাইয়া এক লক্ষীভূত হইল।

রমণীও প্রস্থান করিলেন—মেরিয়াসের স্বপ্নও ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া

উঠিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া দেখিতে গেলেন যে, তাঁহাদের গাড়ী কত দূর গিয়াছে। ভাড়াটিয়া গাড়ী—তখনও বেশী দূর যাইতে পারে নাই। মেরিয়াসের আর চিন্তার অবসর নাই। তিনি যেমন অবস্থায় ছিলেন, সেইরূপ অবস্থায়ই বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সার্টের একদিকের প্লেট ছিন্ন, আস্তিনে বোতাম নাই। তাহারই উপর একটি কোট চড়াইয়া মেরিয়াস রাস্তায় বাহির হইলেন। একখানি খালি গাড়ী খুব দ্রুত যাইতেছিল; তাহাকে থামাইয়া বলিলেন, ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া যাইবে?" মেরিয়াসের পরিচ্ছদের অবস্থা দেখিয়া কোচম্যান্ সসন্দেহে হাত বাড়াইয়া বলিল, "যাইব—এক ঘণ্টার ভাড়া চল্লিশ স্যু আগে দিন।" মেরিয়াস পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন, তাঁহার মোটে ষোলটি স্যু আছে। তিনি কোচম্যানকে কহিলেন, "ভাড়া ফিরিয়া আসিয়া দিব। কোচম্যান্ অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া অশ্ব-পৃষ্ঠে সবলে কশাঘাত করিল। মেরিয়াস কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাসায় ফিরিয়া গেলেন।

বাসায় ফিরিয়া গিয়া মেরিয়াস আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি বিছানায় শুইয়া সাত পাঁচ চিন্তা করিতে লাগিলেন। জনড্রেট-দম্পতি তাহাদের কুটীরে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কি কথা-বার্ত্তা কহিতেছিল; দুই একবার বৃদ্ধ ও যুবতীর কথা অস্ফুটভাবে মেরিয়াসের কানে গেল। তাহা-দেরই সম্পর্কে মেরিয়াস-দম্পতি কোন পরামর্শ করিতেছে,এই ধারণায় মেরিয়াস তাঁহার নিজ কক্ষের প্রবেশ-দ্বারে অর্গল রুদ্ধ করিয়া দিলেন এবং সেই পূর্ব্ব-বর্ণিত ছিদ্রপথে তাহাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।

জনড্রেট-পত্নী গালে হাত দিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে বলিল, "তুমি ঠিক চিনিতে পারি-য়াছ? সে-ই ঠিক তো?"

"গিন্নি! আট বৎসরের কথা তো সে দিনকার কথা। আমি দেখিবামাত্রই তাহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছি। আমি আশ্চর্য্য হইতেছি যে, তুমি চিনিতে পারিলে না। লোকটার পরিবর্ত্তনের মধ্যে দেখিলাম যে, আজ তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ একটু ভাল। বুড়ো বদমায়েস্! এইবার তোমায় আমি হাতে পাইয়াছি!" একটু স্বর নিম্ন করিয়া জনড্রেট আবার বলিতে লাগিল, "গিন্নি! ঐ মেয়েটা কে? —তা চিন্‌লে না?"

"ওটি সেই"—জনড্রেট স্ত্রীর কানের নিকট মুখ লইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিল।

সর্পদষ্টের ন্যায় শিহরিয়া উঠিয়া জনড্রেট-পত্নী কহিল, "কি? সেই ঘুঁটেকুড়ুনির মেয়ে এমন হয়েছে?"

রহস্যের উপর রহস্য আসিয়া মেরিয়াসকে পাগল করিয়া তুলিল। তাহা হইলে এই বৃদ্ধ ও যুবতী জনড্রেট-দম্পতির পূর্ব্ব-পরিচিত? মেরিয়াস নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া তাহাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।

জনড্রেট কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে থাকিয়া কহিল, "গিন্নি! এইবার আমাদের সময় ফিরিবে।"

"তুমি কি ক্ষেপলে না কি? কি বল্‌ছ?"

"ক্ষেপি নি—ক্ষেপি নি গিন্নি! আমি যা বল্‌ছি, ঠিক। আর আমাদিগকে শুকিয়ে মর্‌তে হবে না। আমরা এবার ক্রোরপতি না হয়ে আর যাচ্ছি নি।"

তুমি কি বল্‌ছ?—খুলে বল না শুনি।"

"খুলে বল্‌ব—তবে—শুন্‌বে?—আমার কাছে স'রে এস—শোন।"

জনড্রেট একবার ঘরের চারিদিক্ দেখিয়া লইল, যেন তাহার ভয় হইল যে, আড়ালে লুকাইয়া কেহ তাহাদের কথোপকথন শুনিতেছে। তাহার পর অনুচ্চস্বরে কহিল, "গিন্নি! বুড়োকে যাগাইবার জন্য ফাঁদ আমি প্রস্তুত করিয়াছি। আজ যখন সন্ধ্যার সময় বুড়ো আমাদিগকে টাকা দিতে আসিবে, তখন বেশ নিরিবিলি। বুঝলে তো গিন্নি! পাশের ঘরের ভাড়াটিয়া ছোকরা সে সময় সান্ধ্য-ভোজন করিতে বাহির হইয়া যায়। সে এগারটার আগে বাড়ী ফিরে না। বাড়ী ওয়ালীও ঘরে চাবী দিয়া বাহির হইয়া যায়। দুপুর রাত্রির এদিকে সে-ও ফিরে না। আমাদের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া তাহার মধ্যে বন্দু-কের আওয়াজ করিলেও বাহির হইতে কাহারও শুনিবার সাধ্য নাই। বুড়ো এসে ঢুক্‌লেই আমি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিব। আমি গুণ্ডার সর্দ্দার পেট্রন মিনেটকে চারি জন গুণ্ডা ঠিক ক'রে সেই সময়ে এখানে হাজির হ'তে বলে এসেছি। বুড়ো যদি সহজে না স্বীকার হয়, তাহা হইলে, বলপ্রয়োগ

ক'রেও আমাদের কার্য্য হাসিল করিতে হইবে, সব জোগাড় ঠিক করিয়া রাখিয়াছি।" সয়তানের ক্রূর হাসি হাসিয়া জন্‌ড্রেট একটি আলমারী খুলিয়া একখানি শাণিত ছুরিকা বাহির করিল। দীপালোকে ছুরিকাখানি ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। ছুরিকাখানি আবার যথাস্থানে রাখিয়া জন্‌ড্রেট আলমারী বন্ধ করিয়া পত্নীকে কহিল, "ওঃ—আমি ভুলিয়া যাইতে ছিলাম। এই পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক মুদ্রাটি লও। ইহা ভাঙ্গাইয়া এক গামলা কাঠের কয়লা কিনিয়া আনিবে।"

"ত্রিশ স্যু'তেই এক গামলা কয়লা পাইব। বাকী দিয়া আমি কিছু খাবার কিনিয়া আনিব।"

"না—না—আমাকে আরও কয়েকটা জিনিস কিনিতে হইবে।"

"তোমার আর কত দরকার ?"

"আরও তিন ফ্র্যাঙ্ক।"

"তাহা হইলে খাবার কিনিবার পয়সা থাকিবে না।"

"খাবারের জন্য ব্যস্ত হইও না! কাজ হাসিল হইলে অনেক খাইতে পারিবে। আমি একটু ঘুরিয়া আসি।" জন্‌ড্রেট এই কথা বলিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

জন্‌ড্রেট-দম্পতির কথোপকথন শুনিয়া মেরিয়াসের হৃদয়ের শোণিত জমিয়া গেল। তিনি দেরাজের উপর হইতে নামিয়া অতি ত্রস্তভাবে পরিচ্ছদ পরিলেন এবং বরাবর পুলিস-ষ্টেশনে যাইয়া ইন্‌স্পেক্টারের সহিত দেখা করিতে চাহিলেন।

অনতিবিলম্বেই ইনস্পেক্টার মেরিয়াসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

"আপনার প্রয়োজন কি বলুন ?"

"আমি বুলভার্ড-ডি-লা হস্পিটাল বস্তিতে ৫০ নং বাড়ীর এক জন ভাড়াটিয়া। আমারই পার্শ্বের কক্ষে জন্‌ড্রেট নামে একটি পরিবার বাস করে। এই জন্‌ড্রেট আজ সন্ধ্যা ছয়টার সময় আমার পরিচিত একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের উপর রাহাজানি করার ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছে।"

"ঐ বাড়ীর একেবারে শেষের ঘরে জন্‌ড্রেট-পরিবার বাস করে ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"পেট্রন মিনেট বোধ হয় এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে।"

"পেট্রন মিনেট! হাঁ, আমিও জনড্রেটকে ঐ নামটি উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি।"

আপনি ঐ বাড়ীর কোন্ ঘরে থাকেন ?"

"ঠিক পাশের ঘরে। আমার ঘর ও জন্‌ড্রেটের ঘরের মধ্যে কেবল একটি পাতলা কাঠের দেওয়াল ব্যবধান।"

"আপনি কি এই গুণ্ডাদিগকে দেখিয়া ভয় পাইবেন ?"

"কিছুমাত্র নয়।"

"ঐ বাটীতে প্রবেশ করিবার ল্যাচ-কি,বোধ হয়, একটি করিয়া প্রত্যেক ভাড়াটিয়ার নিকটই থাকে। আপনার নিকট যদি থাকে, তবে সেটি কি আমায় দিতে পারেন ?"

"অবশ্য,—এই লউন।"

মেরিয়াস্ পকেট হইতে একটি চাবি বাহির করিয়া ইন্‌স্পেক্টারের হস্তে দিলেন।

ইন্‌স্পেক্টার তাঁহার সুবৃহৎ গ্রেট-কোটের পকেট হইতে দুইটি পিস্তল বাহির করিয়া মেরিয়াসের হস্তে দিয়া কহিলেন, "আপনি এই দুইটি লইয়া যান। আস্তে আস্তে গিয়া আপনার দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যেই থাকুন। যেন জন্‌ড্রেট-পরিবারের কেহই না জানিতে পারে যে, আপনি ঘরে লুকাইয়া বসিয়া আছেন। দুইটি পিস্তলই ভরা আছে। গুণ্ডার দল আসিয়া কার্য্যে কিছু দূর অগ্রসর হইলে, যখন বুঝিবেন যে, ব্যাপার বেশ পাকিয়া আসিয়াছে, সেই সময় পিস্তলটির আওয়াজ করিবেন। আপনাকে আর কিছুই করিতে হইবে না।"

"বেশ! আপনি যেরূপ বলিলেন, সেইরূপই করিব।"

মেরিয়াস কক্ষ হইতে বাহির হইবেন উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় ইন্‌স্পেক্টার কহিলেন, এখন তিনটা বাজিয়াছে। আরও তিন ঘণ্টা সময় আছে। যদি বিশেষ দরকার হয়, তাহা হইলে এইখানে আসিয়া ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব বলিলেই আমার দেখা পাইবেন।"

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া মেরিয়াস আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া, ভিতর হইতে চাবী বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে কেহই দেখিল না।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

থেনার্ডিয়ারই জনড্রেট।

ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় মেরিয়াস দেরাজের উপর আরোহণ করিয়া ছিদ্র-পথে পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করিলেন। জ্যাভার্ট-দত্ত পিস্তল দুইটি তাঁহার হাতের কাছে রাখিয়া দিলেন। জনড্রেট-দম্পতি ষড়যন্ত্রোপযোগী উপকরণাদি সংগ্রহে বিশেষ ব্যস্ত। ঘরের চিমনীতে খুব লাল করিয়া কয়লার আগুন জ্বালান হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটি বড় বাটালি গরম করা হইতেছে। সেটিও টক্‌টকে লাল হইয়াছে। একপার্শ্বে এক বোঝা ছোট বড় দড়ি রাখা হইয়াছে এক কোণে গোটা কয়েক সাবল, গাঁইতি ইত্যাদি একখানি ছিন্ন মলিন বস্ত্রখণ্ড দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে। কয়লার ধূমে গৃহটি নরকের আকার ধারণ করিয়াছে।

সেণ্ট মেডার্ড গীর্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ছয়টা বাজিয়া গেল। মেরিয়াস্ নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া রন্ধ্রপথে দেখিতে লাগিলেন। অত্যল্পকালমধ্যেই বৃদ্ধ আসিয়া জনড্রেটের দ্বারে করাঘাত করিলেন। মেরিয়াস দেখিলেন, বৃদ্ধ তাঁহার কন্যাকে লইয়া আসেন নাই—একাকী আসিয়াছেন। তিনি অনেকটা সুস্থ বোধ করিলেন; হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

জনড্রেট পত্নী সাগ্রহে কহিল, "মহাশয়! ভিতরে আসুন।"

জনড্রেট কহিল, "হে আমার উপকারক বন্ধু! আমরা আপনারই অপেক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া আছি।"

বৃদ্ধ চারিটি লুইস (সুবর্ণমুদ্রা) টেবিলের উপর রাখিয়া কহিলেন, "মসিও ফ্যাবাণ্টো! এই লউন—আপনার বাড়ীভাড়ার জন্য টাকা। এখনকার মত বাড়ীভাড়া শোধ করিয়া আপনার হাতে কিছু থাকিবে। পরে আবার দেখা যাইবে।"

জনড্রেট কৃতজ্ঞতার ভাণ করিয়া কহিল, "এই সময়োচিত উপকারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ঈশ্বর আপনাকে সুখী করুন।"

বৃদ্ধ দ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া ছিলেন। সেই জন্য তিনি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। যে সময়ে তিনি জনড্রেট্-দম্পতির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, সেই সময়ে একটি লোক ধীরে ধীরে আসিয়া কক্ষের একপার্শ্বে একখানি টুলে উপবেশন করিল। লোকটির গায়ে একখানি ছিন্ন কীট-দষ্ট নীলরঙের জ্যাকেট্; গলা একেবারে খালি; নগ্ন বাহুর সমস্ত স্থানই উল্‌কি চিহ্নিত; মুখখানি কালিমা-লিপ্ত।

বৃদ্ধ তাহার মূর্ত্তি দেখিয়াই আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "ইনি কে?"

জনড্রেট্ কহিল, "ইনি আমাদের পাড়ার এক জন ভদ্রলোক। উনি চিমনী-পরিষ্কারকের কাজ করেন, সেই জন্য উঁহার মুখে কালিঝুলি মাখা। আপনি ওদিকে মনোযোগ করিবেন না।"

এই অসম্ভব কৈফিয়তে অন্য কেহ সন্তুষ্ট হইত কি না, জানি না—কিন্তু বৃদ্ধ তাহা নিতান্ত সরলভাবেই বুঝিয়া লইলেন। তাঁহার মুখের একটি পেশীও নড়িল না। তিনি কেবল কহিলেন, "মসিও ফ্যাবাণ্টো! এই অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক প্রশ্নের জন্য আমায় মাপ করিবেন।" কালসর্পের ন্যায় উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি বাহির করিয়া জনড্রেট কহিল, "আমার প্রিয় উপকারী বন্ধু! দৈন্যের দায়ে আমাদিগকে আসবাবপত্র সমস্তই বিক্রয় করিতে হইয়াছে। ঐ তৈলচিত্রখানি মাত্র অবশিষ্ট আছে।"

এই সময় আর এক জন লোক আস্তে আস্তে দরজা ঠেলিয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক পূর্ব্বাগত ব্যক্তির পার্শ্বে যাইয়া আসন গ্রহণ করিল।

জনড্রেট্ কহিল, "বন্ধু! ও সব পাড়ার লোক—আপনাকে দেখিতে আসিয়াছে। হাঁ—ঐ তৈলচিত্রখানির কথা বলিতেছিলাম। ওখানি এক জন খ্যাতনামা শিল্পীর তুলিকা-প্রসূত। ইহার সহিত আমার জীবনের অনেকগুলি সুখময়ী স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। সেই জন্য সহস্র অভাবেও আমি ওখানিকে বিক্রয় করি নাই। কিন্তু আর পারি না। মহানুভব! ওখানি আপনি ক্রয় করিলে, আমি এক হাজার ক্রাউনে উহা ছাড়িয়া দিতে পারি।" একে একে চারি জন গুণ্ডা আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। বৃদ্ধ একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া কক্ষের চারিদিক্ দেখিয়া লইলেন। অবস্থা বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না। গুণ্ডাচতুষ্টয় নিশ্চলভাবে দরজা আগুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জনড্রেট বৃদ্ধের আরও

একটু কাছে সরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিল, "মহাশয়! যদি আপনি আমার এই ছবিখানি ক্রয় না করেন, তাহা হইলে নদীতে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করা ভিন্ন আমার অন্য কোন উপায় নাই।"

সহসা জনড্রেটের মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। বিকট পৈশাচিক হাসি হাসিয়া সে বজ্রগম্ভীর কঠোর স্বরে কহিল, "বৃদ্ধ! চিনিয়াছ আমি কে?"

বৃদ্ধ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "না।"

জনড্রেট টেবিলের উপর হইতে বাতীদানটি লইয়া নিজের মুখের সম্মুখে ধরিয়া কহিল, "ভাল করিয়া দেখ দেখি—আমায় চিনিতে পার কি না?"

বৃদ্ধ ভাল করিয়া দেখিলেন, বলিলেন, 'না—চিনিতে পারিলাম না।'

কুপিত সর্প যেমন ফণা আস্ফালন করিয়া দংশন করিতে যায়, সেইরূপ ভাবে জনড্রেট কহিল, "বৃদ্ধ আমার নাম ফ্যাবান্টোও নহে, জনড্রেটও নহে। আমার নাম থেনার্ডিয়ার। আমি সেই মণ্টফার-মিলের হোটেলওয়ালা থেনার্ডিয়ার! এখন আমায় চিনিতে পারিলে কি?"

পূর্ব্ববৎ অবিচলিতভাবে বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, "পূর্ব্বেও যেমন, আপনার আসল নাম শুনিয়াও তাহা অপেক্ষা আপনাকে বেশী চিনিতে পারিলাম না।"

জনড্রেটের কথায় বৃদ্ধ কি উত্তর দিলেন, মেরিয়াস তাহা শুনিতে পাইলেন না। জনড্রেট কর্ত্তৃক উচ্চারিত 'আমার নাম থেনার্ডিয়ার' এই কথাটি মেরিয়াসের হৃদয়ে বজ্রের মত আঘাত করিল। তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। সঙ্কেত-সূচক পিস্তল আওয়াজ করিবার জন্য তিনি দক্ষিণ হস্তে পিস্তল উঠাইলেন। পিস্তলটি তাঁহার অবশ হস্ত হইতে চ্যুত হইয়া গেল।

এই নামই না তিনি তাঁহার পিতার পুণ্যময়স্মৃতির সহিত বিজড়িত রাখিয়া, প্রতিদিন উপাসনার সময়, প্রতি ঘণ্টায় প্রতি মুহূর্ত্তে উচ্চারণ করেন। তাহার পিতার জীবনরক্ষা-কর্ত্তা এক জন ডাকাত—বদমায়েস্—গুণ্ডার সর্দ্দার! মেরিয়াস্ আবার ভাবিলেন—হউক থেনার্ডিয়ার ডাকাত, হউক সে গুণ্ডা, কিন্তু আমার পিতার চরম আজ্ঞায়, তাঁহার জীবন রক্ষার জন্য, আমি থেনার্ডিয়ারের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ। সেই ঋণের শোধ কি তাহাকে পুলিস-হস্তে ধরাইয়া দেওয়া এবং হয় ত তাহাকে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলান?" মেরিয়াস ভাবিতে ভাবিতে উন্মত্তের মত হইয়া উঠিলেন।

ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় কক্ষ-মধ্যে পাদচারণ করিতে করিতে থেনার্ডিয়ার বলিতে লাগিল, "আমার দান-শীল বন্ধু! ছিন্ন-কোট পরিহিত ক্রোরপতি! আশ্চর্য্যের কথা—আমায় এত শীঘ্র ভুলিয়া গেলে? আট বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টমাস-রজনীতে তুমিই না মণ্টফারমিলে, আমার হোটেলে বাসা লইয়াছিলে? তুমিই না পরদিন প্রাতঃকালে আমাকে ফাঁকি দিয়া কসেটকে লইয়া চলিয়া আসিয়াছিলে? তুমি আমাকে সে দিন বড় বোকা বানাইয়া আসিয়াছিলে। সে দিন তোমার সেই স্থূল যষ্টির ভয়ে, গায়ের রাগ গায়ে মিলাইয়া আমি হতাশভাবে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আজ আমার দিন আসিয়াছে। আমি আজ তাহার প্রতিশোধ লইব।" বৃদ্ধ পূর্ব্ববৎ স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন—আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কাহাকে আপনি ক্রোরপতি বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন? আমি গরীব গৃহস্থ। আপনি আমার সম্পর্কে বিষম ভুল করিয়াছেন। আমাকে অন্য লোক বলিয়া ঠাওরাইয়াছেন।"

থেনার্ডিয়ার কর্কশকণ্ঠে কহিল, "ও সব চালাকী আর চলিতেছে না। যদি ভাল চাও, তাহা হইলে আমি যেরূপ বলিব, সেইরূপ কার্য্য কর। তাহা না করিলে এখনই তোমার হস্ত-পদ বদ্ধ করা হইবে।" এই কথা বলিয়া থেনার্ডিয়ার আবার কক্ষমধ্যে পাদ-চারণা করিতে আরম্ভ করিল। বৃদ্ধ সেই অবসরে ভাল করিয়া একবার কক্ষটির চারিধার দেখিয়া লইলেন; দেখিলেন—প্রবেশদ্বার আগুলিয়া চারি জন গুণ্ডা দাঁড়াইয়া আছে। সে দিক্ দিয়া পলায়ন অসম্ভব। তিনি মুক্ত বাতায়নপথে লম্ফপ্রদান করিয়া পলাইবার উদ্দেশে যেমন দৌড়িয়া জানালার দিকে যাইতেছেন, অমনি গুণ্ডা চারিজন ও থেনার্ডিয়ার-পত্নী তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল।

মেরিয়াস আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি পিস্তল উঠাইয়া লইয়া, স্বর্গগত পিতাকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, মনে মনে কহিলেন, "পিতা আমায় ক্ষমা করুন!" তাঁহার অঙ্গুলি পিস্তলের ঘোড়ায় লাগাইলেন। ঘোড়া টিপিতে যাইবেন, এমন সময় থেনার্ডিয়ারের কণ্ঠস্বর তাঁহার কানে গেল।

থেনার্ডিয়ার বলিতেছে, 'খবরদার! বৃদ্ধের গায়ে যেন কোন চোট না লাগে।

ঠিক এই সময়ে এক জন সশস্ত্র পুলিস-কর্ম্মচারী কয়েকজন কনষ্টেবল লইয়া মুক্ত দ্বার-পথে থেনার্ডিয়ারের কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে দেখিবামাত্রই গুণ্ডার দল হাতের কাছে সাবল, লাঠি, গাঁইতি যে যাহা পাইল, তাহাই লইয়া আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিল। যে পুলিস-কর্ম্মচারী সর্ব্বাগ্রে কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনি কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "বন্ধুগণ! ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্টের হাত ছিনাইয়া পলাইবে, এমন লোক এখনও পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করে নাই। অনর্থক রক্তপাত করা আমার ইচ্ছা নয়। এই কক্ষ হইতে পলাইবার চেষ্টা কেহই করিও না।

জ্যাভার্টের নামে গুণ্ডাদিগের সকলেরই হৃৎকম্প আরম্ভ হইল। সকলেই অস্ত্র-শস্ত্র ফেলিয়া জ্যাভার্টের শরণাপন্ন হইল।

ভলজীন সেই অবসরে সকলের অলক্ষিতে জানালার মধ্য দিয়া পলাইয়া গেলেন। পুলিসের লোকজন নিষ্প্রয়োজনবোধে কেহই জানালার দিকে লক্ষ্য রাখে নাই।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

ইপোনাইনের এ পরিবর্ত্তন কিসে হইল?

পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই মেরিয়াস্ বাসা তুলিয়া দিলেন এবং গাড়ী করিয়া তাঁহার জিনিস-পত্র লইয়া করফেয়ার নামক তাঁহার এক বন্ধুর বাটীতে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

তাঁহার হৃদয় দারুণ নিরাশা-প্রপীড়িত। সেই নিরাশার ঘনান্ধকারের মধ্যে একবার মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার প্রণয়-প্রতিমার দেখা পাইয়াছিলেন। আবার একটু চোখের পিপাসা মিটিতে না মিটিতেই সেই আশাটি বুদ্‌বুদের মত মিলাইয়া গেল।

সে দিন থেনার্ডিয়ারের মুখে বালিকার নাম শুনিয়াছিলেন—কসেট। সেই মধুর নামই মেরিয়াসের জপমালা হইয়া দাঁড়াইল। মেরিয়াস দিনরাত্রি সহরের প্রত্যেক অলিতে-গলিতে তাঁহার উপাস্যা দেবীর সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে সারাদিন অনুসন্ধানের পর মেরিয়াস হতাশহৃদয়ে গৃহে ফিরিতেছেন, পথে এক জন যুবতী আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "মসিও মেরিয়াস্! আমি গত ছয় সপ্তাহ ধরিয়া আপনার খোঁজ করিতেছি। আপনার দেখা পাই নাই। আপনি বুঝি আর আগের বাসায় থাকেন না?"

প্রশ্নকারিণী জনড্রেট ওরফে থেনার্ডিয়ার-দুহিতা ইপোনাইন। মেরিয়াস ইপোনাইনের কথায় কোন উত্তর দিলেন না দেখিয়া ইপোনাইন্ কহিল, "মসিও মেরিয়াস! আপনাকে দুঃখিত দেখিলে বাস্তবিকই আমার বড় কষ্ট হয়। যদি আমি পারিতাম, তাহা হইলে আমি আপনাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিতাম।" মেরিয়াস জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার অর্থ?" ইপোনাইন আড়চোখে মেরিয়াসের দিকে চাহিয়া বলিল, "মসিও মেরিয়াস! আমি তাহার ঠিকানা জানি।" মেরিয়াসের হৃদয় আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল। তিনি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসিলেন, "কাহার ঠিকানা?" ইপোনাইন্ কহিল, "আপনার হৃদয়ের উপাস্যা দেবীর।" আনন্দ-উৎফুল্ল হৃদয়ে মেরিয়াস একেবারে ইপোনাইনের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "ইপোনাইন্! আমি তোমার কাছে চিরদিনের জন্য কেনা হইয়া থাকিব। আমাকে ঠিকানাটা বলিয়া দেও।" ইপোনাইন্ বলিল, "আমার সঙ্গে আসুন—আমি নিজে গিয়া আপনাকে সেই বাড়ী দেখাইয়া দিতেছি।" ইপোনাইন্ মেরিয়াসকে সঙ্গে লইয়া পারিসের অপর প্রান্তে একটি উদ্যান-বাটীর নিকটে লইয়া গিয়া বলিল, "মসিও মেরিয়াস! ঐ বাড়ী—এখন আপনি আমাকে কি পুরস্কার দিবেন?—দিন।" মেরিয়াসের পকেটে একটি পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক মুদ্রা ছিল; তিনি সেই মুদ্রাটি ইপোনাইনের হাতে গুঁজিয়া দিলেন। যে ইপোনাইন্ এক দিন একটি সু ভিক্ষা করিয়া পাইলে আনন্দে গলিয়া যাইত, আজ সে পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক আনায়াসে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ইপোনাইনের এ পরিবর্ত্তন কিসে হইল?

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

সম্মিলনে।

মেরিয়াস তাঁহার হৃদয়-দেবীকে একটিবারমাত্র চোখের দেখা দেখিবার জন্য প্রতিদিন তাহার বাটীর নিকটস্থ রাস্তায় ঘুরিতেন ফিরিতেন। পাছে কসেটের পিতা তাঁহাকে দেখিতে পান, পাছে বৃদ্ধ আবার পূর্ব্বের মত কসেটকে তাঁহার নয়নের পথ হইতে সরাইয়া লন, এই ভয়ে মেরিয়াস দিনে বড় একটা সে দিকে যাইতেন না, রজনীতে যাইয়া উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিতেন; কসেটের শয়ন-কক্ষের বাতায়ন-পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন। এইরূপে কিছু-দিন অতিবাহিত হইল। এক দিন ভলজীন কোন অজানিত কারণে স্থানান্তরে গেলেন। কসেট সেই দিন সন্ধ্যার কিছু পরে উদ্যানমধ্যে ভ্রমণ করিতেছে, এমন সময়ে মনে হইল—কে যেন তাহার পাছে পাছে আসিতেছে। কসেট মুখ ফিরাইয়া দেখিল—দেখিবামাত্রই চিনিল—এ যে তাহারই হৃদয়-চোর, সেই পুরুষ-রত্ন। মেরিয়াসের মস্তকে টুপী নাই, তাঁহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ, শরীর শীর্ণ। তিনি কহিলেন, "দেবি! আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা কর। প্রেমময়ি! আমি তোমার প্রেমে উন্মত্ত। আমি মরিতে বসিয়াছি। যে দিন লক্‌সেম্‌বার্গ-উদ্যানে তোমায় আমি দেখিয়াছি, সেই দিনই ঐ পুণ্যময়ী মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছে। আর সে ছবি বিলুপ্ত হইবার নহে। আমি তোমারই স্বপ্নে বিভোর হইয়া আছি। আমি পাগল! কসেট, তুমি কি আমায় ভালবাস?"

কসেট কহিল, "সখা! সে কথা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমার হৃদয় তোমাকে না টানিলে তুমি এখানে আসিলে কেমন করিয়া? নাথ! স্বামিন্! জীবনে মরণে তুমিই আমার হৃদয়ের উপাস্য দেবতা! তুমিই আমার সব।"

প্রণয়ি-যুগলের সুখ-সম্মিলনে প্রহর মুহূর্ত্তের মত কাটিয়া গেল।

এইরূপ নৈশ-সম্মিলনে আমোদে আহ্লাদে তাহাদের দিন বেশ কাটিতে লাগিল।

ক্রমে কসেটের আলাপে ব্যবহারে ভলজীন বুঝিলেন যে, কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে। কসেট সেই অপরিচিত যুবকের করে আপনার প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে? এখন কসেটকে দূরে না সরাইলে শেষে বিপদ্ ঘটিতে পারে। ভলজীন ফ্রান্স ছাড়িয়া কিছুদিনের জন্য ইংলণ্ডে প্রবাসে যাইবেন স্থির করিলেন এবং কসেটের নিকট তাহা প্রকাশও করিলেন।

কসেটের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মেরিয়াসের নিরাশা।

মাতামহের মত হইলে, মেরিয়াস কসেটকেই বিবাহ করিবেন স্থির করিলেন। তাঁহার মত গ্রহণ করিবার জন্য এক দিন মেরিয়াস মাতামহভবনে উপস্থিত হইলেন।

বহু দিন পরে হারাণ মাণিক হাতে পাইয়া বৃদ্ধ জিল-নরম্যাণ্ড অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। মেরিয়াস মাতামহের সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনার নিকট আমার একটি ভিক্ষা আছে।"

"কি ভিক্ষা? তুমি তোমার দোষ বুঝিতে পারিয়াছ? তাই কি ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছ?"

"মহাশয়! আমার উপর কৃপা করুন।

"কি জন্য—তুমি কি চাও?"

"মহাশয়! আমি জানি যে, আমার এখানে আসাতে আপনি সন্তুষ্ট নহেন। আমি আপনার নিকট ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি। আপনার মত পাইলেই আমি চলিয়া যাইব!"

"কে তোমাকে চলিয়া যাইতে বলিতেছে? ভাল—তুমি কি চাও বল, শুনি?"

"মহাশয়! আমি বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি এবং সেই বিষয়ে আপনার সম্মতি চাই।"

"বিবাহ! এই একুশ বৎসর বয়সে বিবাহ! সম্বন্ধ সব ঠিকঠাক করিয়াছ? এখন আমার সম্মতির অপেক্ষা? আচ্ছা—বসো। আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—তুমি কি ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছ? কিংবা দু-পয়সা সঞ্চয় করিয়াছ?"

"কিছুই নয়।"

"তবে যে যুবতীর সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়াছ, তাহার কি সম্পত্তি বা নগদ টাকা-কড়ি আছে ?"

"এক কপর্দ্দকও না—সে গরীবের মেয়ে।"

"তা হ'লে, কথাটা হচ্চে এই—তুমি অর্থহীন নিষ্কর্ম্মা একুশ-বৎসর-বয়স্ক যুবক—একটি ভিক্ষুকের কন্যাকে গলায় বাঁধিয়া, সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে চাও। তাহা কখনও হইতে পারে না।"

"দাদা !"

'দাদা' সম্বোধনে বৃদ্ধ মাতামহের হৃদয় গলিয়া গেল।

মেরিয়াস করুণ স্বরে আবার কহিলেন, "দাদা ! আমি এই বালিকাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসি। ইহার সহিত বিবাহ না হইলে আমি বাঁচিব না। তাহা হইলে আর আপনারা আমাকে দেখিতে পাইবেন না।" স্নেহার্দ্র-হৃদয়ে মাতামহ কহিলেন, "আরে শালা ! সে ছুঁড়ীর উপরে তোর যদি এত মন থাকে, তবে তাকে রাখ না। বিয়ে ক'রে একটা বোঝা ঘাড়ে নেবার কি দরকার আছে ?"

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া মেরিয়াসের মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হইয়া গেল। তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "মহাশয় ! আপনি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমার মৃত পিতার পবিত্র স্মৃতিকে দুই পদে দলিত করিয়াছিলেন। আজ আপনি আমার ভাবী স্ত্রীকেও সেইরূপ অবমানিত করিলেন। আমার আর কিছুই বলিবার নাই। আমি জন্মের মত আপনাদের নিকট হইতে বিদায় হইলাম।

মেরিয়াস অতি দ্রুতপদে মাতামহের বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বৃদ্ধ জিল-নরম্যাণ্ড "মেরিয়াস ! মেরিয়াস !" বলিয়া ছুটিতে ছুটিতে সিঁড়ি পর্য্যন্ত আসিলেন।

মেরিয়াস্ তখন ফটক পার হইয়া বহু দূরে চলিয়া গিয়াছেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

—•—

বিপ্লববাদীদিগের দলে।

হতাশ-হৃদয়ে ভগ্নপ্রাণে মেরিয়াস্ চলিতে লাগিলেন। যতই নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, মেরিয়াস্ দেখিতে পাইলেন যে, প্রতি পথসঙ্গমে অনেক লোক জমা হইয়াছে। এই জনতার মুখে প্রজাতন্ত্রের জয়ধ্বনি ও উল্লাসের হাস্য। বিপ্লববাদী-দল আজ স্বাধীনতা-মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সাম্য ও মৈত্রীর গৈরিক পতাকা-তলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বদ্ধ-পরিকর। এই বিপ্লববাদী দলের নেতা কুরফেরাক, বস্ওয়ে, এন্জোল্রাস্ ও মেরিয়াসের অপরাপর বন্ধুগণ। এই বিপ্লববাদীদিগকে নগর হইতে দূরীভূত অথবা বন্দীকৃত করিবার জন্য ইন্স্পেক্টার জ্যাভার্ট একদল সৈন্য লইয়া রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। জ্যাভার্ট একটি মদ্য-বিক্রেতার দোকানে দাঁড়াইয়া বিপ্লববাদীদিগের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। বিদ্রোহী দলের অন্যতম নেতা এন্জোলরাস কয়েকজন বিপ্লববাদীর সঙ্গে যাইয়া সেই দোকানে প্রবেশ করিলেন। জ্যাভার্টকে দেখিয়াই তাঁহার সন্দেহ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

"আমি এক জন পুলিস কর্ম্মচারী।"

"তোমার নাম ?"

"জ্যাভার্ট।"

এন্জোলরাস্ ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহার সঙ্গিগণ তৎক্ষণাৎ জ্যাভার্টের হস্তপদ রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া একটি খুঁটীর গায়ে খাড়া করিয়া তাহাকে বেশ করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল।

মেরিয়াস্ও রাস্তায় আসিতে আসিতে এই বিপ্লববাদিগণের দলে মিশিয়া পুলিসের লোকের হাত হইতে বন্দুক-তরবারি ছিনাইয়া লইয়া খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি মরিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন; মরিবার সুযোগও তাঁহার বেশ মিলিয়া গেল। তিনি দলের নেতা হইয়া তাহাদিগকে চালাইতে লাগিলেন। প্রেমের মহাযজ্ঞানলে আপনার অকিঞ্চিৎকর জীবনকে আহুতি দিতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইলেও মেরিয়াস্ কি জানি কি এক মোহে, কি এক অজানিত আকর্ষণে,

দুই একবার জগতের পানে আকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন! কি জানি—কসেটের মুখখানি মনে পড়ায়, মুহূর্ত্তের জন্য বুঝি তাঁহার বাঁচিবার ইচ্ছা হইল। মেরিয়াস পকেট-বুক হইতে একখানি কাগজ ছিঁড়িয়া লইয়া পেন্সিল দ্বারা লিখিলেন :—

"সোনা আমার!

আমাদের বিবাহ হওয়া অসম্ভব। আমি এই বিবাহে আমার মাতামহের সম্মতি চাহিয়াছিলাম। তিনি কিছুতেই মত দিলেন না। যখন তোমাকে পাইলাম না—তখন আর আমার এ সংসারে না থাকাই ভাল। আমি মরিতে চলিলাম। সুন্দরি! আমি তোমাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসি। যখন তুমি এই পত্রখানি পাইবে, তখন মেরিয়াস আর ইহলোকে থাকিবে না।"

পত্রখানি ভাঁজ করিয়া তাহার উপর শিরোনামা লিখিলেন—"ম্যাডামইজিল কসেট ফক্লেভেণ্ট, মসিও ভকলেভেণ্টের বাটী, ৭ নং রু-দে লা হোম আরম্।"

মেরিয়াস্ পকেট হইতে পকেটবুকখানি বাহির করিয়া তাহার একটী অলিখিত পত্রে পেন্সিলে লিখিলেন :—

"আমার নাম মেরিয়াস পণ্টমারসি। আমার মৃতদেহ ৬ নং রু-দে ফিলে ডু-ক্যাভারিতে, আমার মাতামহ মসিও জিল-নরম্যাণ্ডের নিকট পৌছাইবে।"

এই বিপ্লববাদী দলের মধ্যে ডানপিটে গ্যাভরোকও আসিয়া খুব সরফরাজি করিতেছিল। দলপতি মেরিয়াসের সঙ্গে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার খুব ভাব হইয়া গেল। মেরিয়াস সেই আলাপের ছুতা লইয়া গ্যাভরোকের দ্বারা নিজের একটু কাজ করিয়া লইবার ইচ্ছা করিলেন। গ্যাভরোক্ সাহসী, বিশ্বাসী। মেরিয়াস ডাকিবামাত্র গ্যাভরোক তাঁহার নিকটে আসিল। মেরিয়াস কহিলেন, "বালক! আমার একটু কাজ করিতে পার?"

"নিশ্চয়!—কি করিতে হইবে, বলুন?"

"এই চিঠিখানি, শিরোনামা-লিখিত ঠিকানায় দিয়া আসিতে পার?"

"কেন পারিব না?—দিন, এখনই দিয়া আসিতেছি।"

মেরিয়াস পত্রখানি গ্যাভরোকের হস্তে দিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে বালক জনতা ঠেলিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

মেরিয়াস মুক্ত অসি-হস্তে অরাতি-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সমর-ক্ষেত্রে।

গ্যাভরোক্ মেরিয়াসের চিঠি লইয়া তাহার শিরোনামার লিখিত ঠিকানায় পৌঁছিয়া দেখিল যে, একটি বৃদ্ধ বাটীর সম্মুখে উদ্যান-মধ্যে কাষ্ঠাসনে বসিয়া আছেন। তিনি বালককে বাটীর সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালক! তুমি কাহাকে খুঁজিতেছ?"

অম্লানবদনে বালক উত্তর দিল, "কাহাকেও না, আপনি কি এই ষ্ট্রীটে থাকেন?"

"হাঁ।"

"বলিতে পারেন কি? ৭ নং বাড়ী কোন্‌টি?"

"এইটিই সাত নম্বরের বাড়ী।"

বালক একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল দেখিয়া ভলজীন কহিলেন, "আমি একখানি পত্রের অপেক্ষায় এখানে বসিয়া আছি।"

"আপনি!—আপনি তো মেয়ে-মানুষ না?"

"আমি ত মেয়ে-মানুষের নামের পত্রের জন্যই অপেক্ষা করিতেছি। তুমি যে পত্রখানি আনিয়াছ, তাহা কি ম্যাডাম ইজিল কসেটের নামের?"

"বোধ হয়, সেই নামেরই।"

নাম ঠিক বলায় গ্যাভরোকের আর সন্দেহের কোন কারণ রহিল না।

ভলজীন কহিলেন, "পত্রখানি আমার কাছে দাও।"

গ্যাভরোক পত্রখানি ভলজীনের হস্তে দিয়া বলিল, "বিশেষ জরুরি চিঠি। আমাদের দলপতি মসিও মেরিয়াস এখানি পাঠাইয়াছেন। তিনি বিপ্লববাদীদিগের নেতা এবং এখন যুদ্ধক্ষেত্রে রহিয়াছেন।"

এই বলিয়া গ্যাভারোক চলিয়া গেল।

ভলজীন পত্র পাঠ করিয়াই কিছুক্ষণ চিন্তান্বিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া মতলব ঠাওরাইয়া চিঠিখানি মুড়িয়া সুড়িয়া নিজের পকেটমধ্যে রাখিয়া ভলজীন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মেরিয়াসের পত্রের শেষ ছত্রটি— "তুমি এই পত্রখানি যখন পাইবে, তখন মেরিয়াস্ আর ইহলোকে থাকিবে না"—ভলজীনের মস্তিষ্কে বিষম এক গোলযোগ বাধাইয়া দিল।

এক ঘণ্টা পরেই ভলজীন বেশপরিবর্ত্তন করিয়া বাটী হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার পরিধানে বহু ষ্টার ও গার্টারাদি-সুশোভিত ন্যাশনাল গার্ড নামক সৈন্যদলের ইউনিফরম্ পরিচ্ছদ। ভলজীনের কটি-তটে খড়্গাবিধান, হস্তে সঙ্গীন-শীর্ষ বন্দুক।

যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ভলজীন প্রথমেই সেই শোণিতাক্ত জনতার মধ্য হইতে মেরিয়াসকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জীবনে হতাশ, মরণের জন্য প্রস্তুত, যুবক মেরিয়াস্ উল্কা-পিণ্ডের মত একবার যুদ্ধক্ষেত্রের এখানে, আবার ওখানে দেখা দিতেছিল।

ভলজীন মেরিয়াসকে খুঁজিতে খুঁজিতে যাইয়া, যে মদ্যবিক্রেতার দোকানে বিদ্রোহীদল জ্যাভার্টকে হস্ত-পদ বন্ধন করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিবামাত্র ভলজীন জ্যাভার্টকে চিনিলেন, জ্যাভার্টও ভলজীনকে চিনিল। জ্যাভার্ট মনে করিল—আর আমার রক্ষা নাই। আমি যে জীবন ব্যাপিয়া ইহাকে নির্য্যাতিত করিয়াছি, আজ ভলজীন তাহার প্রতিশোধ লইবে। ভলজীনের গুলীতে আজ নিশ্চয়ই আমার মস্তিষ্ক উড়িয়া যাইবে! জ্যাভার্ট জানিত না যে, ভলজীন এত নীচ কাপুরুষ নহে যে, সে পতিত শত্রুর উপর যাইয়া প্রতিশোধ লইবে।

ভলজীন আস্তে আস্তে গিয়া জ্যাভার্টের বন্ধন-রজ্জুগুলি কাটিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্ট! বোধ হয়, আপনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন। আমিই সেই জন্ ভলজীন। আমার বোধ হয় না যে, আমি এই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিব। তবে যদি অদৃষ্টক্রমে বাঁচি, তাহা হইলে ৭ নং রু-দে-লা হোম-আরম ষ্ট্রীটে, ফক্‌লেভেণ্ট নাম করিলেই আমাকে পাইবেন।"

এই কথা বলিয়া ভলজীন আবার যাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। জ্যাভার্ট বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া, যতক্ষণ ভলজীনকে দেখিতে পাওয়া যায়, একদৃষ্টে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল

এই দেবোপম মানব, যিনি তাঁহার আজন্ম-শত্রুকে হাতে পাইয়া তাহার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিলেন, সহস্র সহস্র সৎকার্য্যে যাঁহার বিচিত্র জীবন পূর্ণ—আমি কর্ত্তব্যের অনুরোধে, চাকরীর খাতিরে তাঁহাকেই সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া নির্য্যাতিত করিতেছি! ধিক্ আমার জীবনে!

এই চিন্তা করিতে করিতে জ্যাভার্ট তথা হইতে প্রস্থান করিল।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

ইপোনাইনের আত্মবলিদান।

নগ্ন অসি-হস্তে শোণিতাক্ত-কলেবর মেরিয়াস রণক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে উল্কাপিণ্ডের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। সেই পুঞ্জীভূত আহত, মৃত ও মরণোন্মুখ জনসংঘমধ্যে কে যেন পুরাতন পরিচিত স্বরে ডাকিল, "মেরিয়াস!"

মেরিয়াস চমকিত হইয়া উঠিলেন।

আবার সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর—"মসিও মেরিয়াস!"

মেরিয়াস একবার সেই শব-পরিপূর্ণ রণক্ষেত্রের চারি'দকে চাহিয়া দেখিলেন। কে তাঁহাকে ডাকিল, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

আবার সেই ক্ষীণ কণ্ঠের স্বর, "মেরিয়াস!—তোমার পদতলে।"

মেরিয়াস নীচু হইয়া দেখিলেন, একটি পাণ্ডুবর্ণ কচি মুখ মরণ-ক্ষীণ দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া বলিতেছে, "আমাকে চিনিতে পারিলে না মসিও মেরিয়াস?" বাস্তবিকই মেরিয়াস তাহাকে চিনিতে পারে নাই।

তিনি বলিলেন, "না।"

"আমি ইপোনাইন।"

মেরিয়াস এবার খুব কাছে গিয়া ভাল করিয়া দেখিলেন, এতক্ষণে চিনিলেন। বাস্তবিকই হতভাগিনী ইপোনাইন—পুরুষের বেশে।

প্রেমের কি বিচিত্র লীলা। প্রেম পাত্রাপাত্র কালাকাল মানে না। হৃদয়ের বাঁধ একবার ভাঙ্গিয়া গেলে, প্রেমের খরস্রোতে তটবর্ত্তী নগর, উদ্যান, এমন কি, দৃঢ়মূল গিরি পর্য্যন্ত সে প্লাবনের বেগ-সহনে অসমর্থ হয়। মেরিয়াসকে দেখিবামাত্রই ইপোনাইন ভালবাসিয়াছে। ভালবাসা অমৃত—আবার সময়ে তাহা তীব্র কালকূট হইতেও ভয়ঙ্কর। ইপোনাইনের অদৃষ্টে ভালবাসা কালকূটেরই কাজ করিয়াছে; তাহার হৃদয় জর্জ্জরিত করিয়াছে। ইপোনাইন যে বিপ্লববাদী দলের সহিত মিশিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিবে, এ কথা মেরিয়াস কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তাই কহিলেন, "ইপোনাইন! তুমি এখানে আসিলে কেন? এখানে কি করিতেছ?"

"আমি এখানে আসিলাম কেন?—পতঙ্গ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেয় কেন, মেরিয়াস?—আর এখানে আমি কি করিতেছি?—শুনিবে মেরিয়াস! আমি মরিতেছি।"

ইপোনাইনের কথা শুনিয়া মেরিয়াস শিহরিয়া উঠিলেন।

তিনি ব্যস্তভাবে কহিলেন, "ইপোনাইন! তুমি আহত হইয়াছ। এস—আমি তোমাকে কোলে করিয়া ঐ মদের দোকানে লইয়া যাই, সেখানে গিয়া তোমার ক্ষতগুলি বাঁধিয়া দিই। সারিয়া যাইবে।"

এই বলিয়া মেরিয়াস ইপোনাইনকে হাত ধরিয়া তুলিতে গেলেন। ইপোনাইন যেন ব্যথা পাইয়া তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া লইল।

মেরিয়াস কহিলেন, "কেন ইপোনাইন! আমি তোমাকে ব্যথা দিলাম না কি? তোমার হাতে লাগিয়াছে না কি?"

"আমার হাতের ভিতর দিয়া গুলী এপার ওপার হইয়া গিয়াছে।"

"কি করিয়া?"

"তোমাকে বাঁচাইতে গিয়া আমি দেখিলাম, এক জন সৈন্য তোমার দিকে লক্ষ্য করিতেছে। আর এক মুহূর্ত্ত হইলেই তোমার বক্ষঃস্থলের মধ্য দিয়া গুলী যায়! কি করি! আমি আততায়ীর বন্দুকের মুখ চাপিয়া ধরিলাম। গুলী আমার হস্ত ভেদ করিয়া গেল।"

"এ পাগলামী কেন করিলে ইপোনাইন! যাহা হউক, যাহা হইয়াছে—হইয়াছে। বল,—এখন তোমায় লইয়া যাই।"

"মেরিয়াস, বৃথা চেষ্টা—গুলী আমার হস্ত ভেদ করিয়া, হৃদয় বিদ্ধ করিয়া পিঠ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। আমাকে এখান হইতে তুলিবার চেষ্টা করিও না। চিকিৎসক আমার যাহা করিতে পারে, ইচ্ছা করিলে তুমি আমাকে তদপেক্ষা অধিকতর সুখী করিতে পার; তাহা করিবে কি মেরিয়াস? তুমি আমার কাছে আসিয়া এই শিলাখণ্ডের উপরে বস। আমি তোমার কোলে মাথা রাখিয়া মরি। জীবনে যে সাধ মিটাইতে পারিলাম না, মরণে আমার সেই সাধটুকু মিটুক।"

মরণোন্মুখী ইপোনাইনের মৃত্যুকালীন সাধ মেরিয়াস অপূর্ণ রাখিলেন না। ইপোনাইনের নিকট শিলাতলে উপবেশন করিয়া তিনি তাহার মস্তক আপনার কোলে তুলিয়া লইলেন। মরণের অতি তীব্র যাতনার মধ্যেও ইপোনাইন স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিল; মেরিয়াসের স্পর্শ তাহার মরণ-জড় হৃদয়ে যেন চন্দন-রস ঢালিয়া দিল। অত্যধিক আবেগে ইপোনাইন তাহার শোণিত-লিপ্ত বিক্ষত হস্তে মেরিয়াসের হস্ত সজোরে চাপিয়া ধরিল। তখন সে কিছুই বেদনা অনুভব করিল না। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ইপোনাইন কহিল, "মেরিয়াস! হতভাগিনীর একটি সাধ কি পুরাইবে না? আমার হাত ধরিয়া শপথ কর,—পুরাইবে। আমি তাহা হইলে বড় সুখে মরিব।"

ভাবিয়া উত্তর দেন, সে অবসর মেরিয়াসের ছিল না। তিনি কহিলেন, 'পুরাইব।"

ক্ষীণকণ্ঠে জড়িত স্বরে ইপোনাইন কহিল, "মেরিয়াস! আমি মরিয়া গেলে, আমার ললাটে একটি চুম্বন করিও—আমি মরিয়াও সে চুম্বনে স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিব।"

ইপোনাইনের অনশন-ক্ষীণ দেহ অজস্র রক্তমোক্ষণে অচিরে হীনবল হইয়া আসিল। মরণের স্পর্শে নেত্র নিমীলিত হইয়া আসিল। তাহার মৃদু কম্পিত অধরকোণে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া নিমেষেই আবার তাহা মিলাইয়া গেল।

দীপ নিভিল!

মেরিয়াস তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভুলিলেন না। ইপোনাইনের মরণ-হিম স্বেদ-সিক্ত ললাটে একটি

বিষাদোষ্ঠ চুম্বন করিলেন। জানি না, সে চুম্বনে তিনি কসেটের নিকট অবিশ্বাসী হইলেন কি না। কিন্তু একটি অশান্ত আত্মা যে সেই শেষ চুম্বনে একটু শান্তি পাইল, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

মেরিয়াসের উদ্ধার।

আজিকার যুদ্ধে মেরিয়াসই নেতা। তিনি আজ শত্রুদলের সকলেরই বন্দুকের লক্ষ্য-স্থল। অরাতির তীব্র তরবারির আঘাতে তাঁহার শরীর ক্ষত-বিক্ষত। জন্ ভলজীন কোন পক্ষের হইয়াই লড়াই করিতেছেন না। তিনি কেবল মেরিয়াসকে যতদূর সম্ভব বাঁচাইয়া যাইতেছেন। তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদাই মেরিয়াসের উপর রহিয়াছে। সহসা মেরিয়াসের বুকে আসিয়া একটি গুলী লাগিল। মেরিয়াস মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভলজীন ব্যাঘ্রের ন্যায় এক-লম্ফে যাইয়া মেরিয়াসকে কাঁধের উপর ফেলিয়া বিবদমান জনতার মধ্য হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভলজীন একবার চারিদিকে দেখিলেন। যে দিকে চাহেন, কেবল মারামারি, কাটাকাটি ও ধ্বংসের ছবি। মেরিয়াসকে লইয়া কেমন করিয়া এই শোণিত-রাজ্য হইতে বাহির হইবেন, তাহাই ভাবিয়া ভলজীন ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সেই নরশোণিত-পানোন্মত্ত জনতা ভেদ করিয়া অপরের অজ্ঞাতসারে অক্ষত-শরীরে পলায়ন ভলজীন একেবারেই অসম্ভব বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার বহুবর্ষব্যাপী কয়েদী জীবনে পলায়নের অনেক উপায় উদ্ভাবন ও তৎসম্বন্ধে বেশ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অভিজ্ঞতা এখন কাজে আসিল। যেখানে যুদ্ধ হইতেছিল, সেই স্থান হইতে কিছু দূরে রাস্তার উপরে একটি বড় রকমের নর্দ্দমার ঝাঁঝরি দেখিতে পাইলেন। ভলজীন অতি কষ্টে জনতার মধ্য হইতে বাহির হইয়া সেই ঝাঁঝরির নিকটে গিয়া ঝাঁঝরিখানি উঠাইয়া ফেলিলেন। ঝাঁঝরি উঠাইয়া ফেলায় এক জন মানুষ গলিতে পারে, এমন একটি গর্ত্ত বাহির হইল। যাহারা নর্দ্দমা পরিষ্কার করে, তাহারা এই রাস্তা দিয়াই প্রবেশ করে এবং বাহির হয়। ভলজীন মৃতকল্প মেরিয়াসকে স্কন্ধের উপর ফেলিয়া এই গর্ত্ত দিয়া ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে অবলীলাক্রমে নামিয়া গেলেন। অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে কোন প্রকারে দিক ঠিক করিয়া নর্দ্দমার মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নর্দ্দমার দুর্গন্ধময় কর্দ্দমে তাঁহার সমস্ত শরীর লিপ্ত, আবর্জ্জনার জলে তাঁহার পরিচ্ছদ সিক্ত। অন্ধকারে আন্দাজে পা টিপিয়া টিপিয়া যে দিকে নর্দ্দমার গড়ান, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভলজীন নর্দ্দমার মুখ পাইবার আশায় চলিতে লাগিলেন। তাঁহার স্কন্ধের উপর অর্দ্ধমৃত অবস্থায় মেরিয়াস। সহসা দূরে আলোকের ন্যায় দেখিয়া ভলজীনের আশার সঞ্চার হইল। ভলজীন ভাবিলেন, "তবে বুঝি ঈশ্বরের অনুগ্রহে নর্দ্দমার মুখে আসিয়া পৌছিলাম।"

ভলজীনের অনুমান ঠিকই। ভলজীন নর্দ্দমার মুখে আসিয়া পৌছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নর্দ্দমা হইতে বাহির হইবার উপায় নাই। একটি বৃহৎ লৌহময় ঝাঁঝরির দ্বারা নর্দ্দমার মুখ বন্ধ। সেই ঝাঁঝরিটি আবার একটি সুবৃহৎ জেলখানায় ব্যবহৃত তালার দ্বারা আটকান। বহুদিন ধরিয়া জল ও বায়ুর ক্রিয়ায় তালাটি একখানি প্রকাণ্ড ইষ্টকের আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু তাহার চাবীর ছিদ্রটি স্পষ্ট-ভাবে দেখা যাইতেছে। ভলজীন ভাবিলেন, "শেষে কি এই পূতিগন্ধময় নর্দ্দমার মধ্যে, কলে পতিত মূষিকের মত মরিতে হইবে?"

নর্দ্দমার বাহিরেই মুক্ত বাতাস, চন্দ্রের আলোক, অনন্ত দিগ্‌বলয়, অপ্রমেয় স্বাধীনতা। নর্দ্দমার এক পার্শ্বে একটু স্থান পরিষ্কার করিয়া লইয়া ভলজীন সেই স্থানে মেরিয়াসকে শোয়াইয়া দিলেন। দুই হাতে শরীরের সমস্ত জোর দিয়া সেই লৌহময় কবাট ঠেলিতে লাগিলেন। নিষ্ফল প্রয়াস! তাঁহার এত পরিশ্রম, এত কষ্ট সব বুঝি ব্যর্থ হইতে চলিল। তালা খুলিয়া ফেলা ভিন্ন পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় নাই। যে সকল অস্ত্র-শস্ত্র তাহার জন্য প্রয়োজন, সে সমস্ত সর্ব্বদাই প্রায় ভলজীনের পকেটেই থাকিত। কিন্তু সে দিন যখন পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করেন, তখন তাড়াতাড়িতে সেগুলি তাঁহার ইউনিফর্মের পকেটে

হইতে ভলজীন ভুলিয়া গিয়াছিলেন। জলে নিমজ্জমান ব্যক্তি ভাসমান তৃণখণ্ডকেও আশ্রয়-জ্ঞানে আঁকড়িয়া ধরে। ভলজীন মেরিয়াসের পকেট হাতড়াইয়া দেখিলেন, যদি কিছু খুঁজিয়া পান। কয়েকটি মুদ্রা ও একখানি পকেটবই ছাড়া তাঁহার পকেটে অন্য কিছুই পাইলেন না। ভলজীন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িলেন। গভীর চিন্তার সময় অনেক স্থলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হস্তপদের ক্রিয়া চলে। ভলজীন মেরিয়াসের পকেটবুকখানি আনমনে খুলিতে ও বন্ধ করিতে লাগিলেন। সহসা একটি লিখনের উপর তাঁহার নজর পড়িল। পকেটবুকের একটি পত্রে লেখা রহিয়াছে, "আমার নাম মেরিয়াস পণ্টমারসি। আমার মৃতদেহ ৬নং রু-দে-ফিলে দু-ক্যাভারিতে, আমার মাতামহ মসিও জিলনরম্যাণ্ডের নিকট পৌঁছাইবে।"

ভলজীন একদৃষ্টে বাহিরের আলোকপানে চাহিয়া পরিত্রাণের উপায়পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতেছেন—এমন সময় কে যেন পশ্চাৎ হইতে আসিয়া অতি সন্তর্পণে অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহার স্কন্ধ স্পর্শ করিল এবং অতি মৃদুস্বরে কহিল, "আধাআধি বখরা।"

ভলজীন প্রথমে মনে করিলেন যে, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন। এমনি নিঃশব্দপদসঞ্চারে আগন্তুক আসিয়াছিল যে, তিনি তাহার পায়ের শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পান নাই। ইহা কি সম্ভব? এই পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে মনুষ্যসমাগম কল্পনারও অতীত। লোকটির গায়ে একটি ব্লাউজ, পায়ে জুতা নাই। কিন্তু দেখিবামাত্র ভলজীন তাহাকে চিনিলেন—সে সেই থেনার্ডিয়ার। এইরূপ আকস্মিকভাবে সেই নরপিশাচকে এই অসম্ভব প্রদেশে উপস্থিত হইতে দেখিয়া ভলজীন এক মুহূর্ত্তের জন্য যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার বৈচিত্র্যময় জীবনে তিনি বহুবার ইহা অপেক্ষাও জটিলতর রহস্যের মধ্যে নিপতিত হইয়াছেন এবং সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের কৃপায় অক্ষতশরীরে তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই তাঁহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া নিশ্চল ভাববিহীন প্রস্তর-ফলকের আকার ধারণ করিল। ভলজীন দেখিবামাত্র থেনার্ডিয়ারকে চিনিলেন। কিন্তু থেনার্ডিয়ার বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াও ভলজীনকে চিনিতে পারিল না। ভলজীনের মুখ শোণিত-কর্দ্দম-লিপ্ত—এবং সম্পূর্ণভাবে বিকৃত।

এই স্থানে পাঠকের জানিয়া রাখা দরকার যে, থেনার্ডিয়ার ও তাহার সঙ্গী গুণ্ডাগণ অধিক দিন জেলে ছিল না। জেলের গবাক্ষের গরাদে ভাঙ্গিয়া তাহারা সকলেই পলায়ন করিয়াছিল। পাছে পুলিস কর্ত্তৃক আবার ধৃত হয়, এই ভয়ে থেনার্ডিয়ার আসিয়া এই নর্দ্দমার মধ্যে তাহার বাসা লইয়াছে। হিংস্র শ্বাপদ যেমন দিনের বেলা তাহাদের অন্ধকারময় গহ্বরে লুকাইয়া থাকে, রাত্রিতে শীকারের সন্ধানে বাহির হয়, শ্বাপদ প্রকৃতি থেনার্ডিয়ারেরও কার্য্য সেইরূপ ছিল।

ভলজীনকে দেখিয়া থেনার্ডিয়ার মনে করিল যে, সে-ও তাহার সমব্যবসায়ী এক জন নিশাচর। সে এই লোকটিকে হত্যা করিয়া তাহার কাছে যাহা কিছু ছিল, তাহা লুঠিয়া লইয়া মৃতদেহটিকে সীন্ নদীতে ফেলিয়া দিবার জন্য যাইতেছে। তাই সে ভলজীনের সহিত প্রথম সাক্ষাতেই আধাআধি বখরার বন্দোবস্ত করিতেছিল।

থেনার্ডিয়ার কহিল, "বন্ধু! এখন এই খাঁচা হইতে বাহির হইবে কি করিয়া?"

"তাই ত।"

"তালা ভাঙ্গা অসম্ভব!"

"কি করি?—তাই ত ভাবিতেছি!"

"তাহা হইলে আমার সঙ্গে আধাআধি বন্দোবস্ত কর। বাহির হইবার উপায় বলিয়া দিতেছি।"

"তুমি কি বলিতেছ—আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"মিনষে ন্যাকা আর কি! আমি বলিতেছি—যে, তুমি লোকটিকে খুন করিয়াছ তো টাকা-কড়ির জন্য। বিনামূল্যে তো এ কাজ কর নাই। এস—লুণ্ঠিত অর্থ আমরা আধাআধি ভাগ করিয়া লই। তুমি খুন করিয়াছ, বেশ, তার জন্য অর্দ্ধেক লও। আমি পলাইবার উপায় করিয়া দিতেছি, আমাকে অর্দ্ধেক দাও। এই দেখ—আমার নিকট এই তালারই চাবী রহিয়াছে।"

সমস্ত ঘটনাই ভলজীনের নিকট স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ভলজীনের মনে হইল, যেন সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে বিপন্মুক্ত করিবার জন্যই ভীষণ নরঘাতক দস্যুর মূর্ত্তিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন! চাবীটি আবার অতি সাবধানে ব্লাউজের ভিতর দিকের পকেটে রাখিয়া

থেনার্ডিয়ার কহিল, "দেখিলে ত বন্ধু! এখন বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া লও। আমি খাঁচার দ্বার খুলিয়া তোমায় বাহির করিয়া দিই। আমি তোমাকে এখান হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়- চাবী দেখাইলাম। তুমি এখন আমাকে কি দিবে, বাহির কর।"

ভলজীন তাঁহার পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন। তাঁহার পকেটে সর্ব্বদা দুই চারি শত ফ্র্যাঙ্ক থাকিত। তাঁহার অন্ধকারময় বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন ব্যাপিয়া লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে সর্ব্বাদাই অর্থ নিকটে রাখ', ভলজীন একটি নিয়ম করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজি তাঁহার সঙ্গে টাকা-কড়ি বেশী নাই। তিনি যখন সৈনিকগণের ইউনিফর্ম্ পরিধান করেন, সেই সময়ে তাড়াতাড়িতে তাঁহার পকেট বুকখানি পুরাতন কোটেই থাকিয়া যায়। কয়েকটি মুদ্রামাত্র তাঁহার ওয়েষ্ট কোটের পকেটে ছিল। তিনি তাহাই বাহির করিয়া থেনার্ডিয়ারকে দিলেন। থেনার্ডিয়ার একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, "তা হ'লে দেখছি, ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করেছ, বন্ধু!" তাহার কিন্তু বিশ্বাস হইল না। সে একবার নিজে ভলজীনের পকেটগুলি বেশ করিয়া অনুসন্ধান করিল, মেরিয়াসের পকেটগুলিও তল্লাস করিল। সেখানেও দুই চারিটিমাত্র মুদ্রা পাইল। পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত আধাআধি বখরার কথা ভুলিয়া গিয়া থেনার্ডিয়ার সব মুদ্রা কয়টিই আত্মসাৎ করিয়া ভলজীনকে কহিল,"বন্ধু, এইবার স'রে পড়। আমি দরজা খুলিয়া দিতেছি।"

ভলজীন সংজ্ঞাহীন মেরিয়াসকে স্কন্ধে উঠাইয়া লইলেন। থেনার্ডিয়ার পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া তালা খুলিয়া, ঝাঁঝরিটি এমন একটুখানি ফাঁক করিয়া দিল যে, এক জন লোক অতি কষ্টে তাহার মধ্য দিয়া বাহির হইতে পারে। ভলজীন রক্ষা পাইলেন। তিনি নর্দ্দমার মধ্য হইতে সীন্ নদীর তীরে মুক্তবাতাসে বাহির হইয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

ভলজীন বাহির হইয়াই সংজ্ঞাশূন্য মেরিয়াসকে সীন্ নদীর চন্দ্রালোকিত সৈকত-শয্যায় শোয়াইয়া দিলেন। অঞ্জলিপুটে নদী হইতে জল তুলিয়া আনিয়া তাঁহার মুখে চোখে শীতল জলের ঝাঁপটা দিলেন। তখনও মেরিয়াস্ পূর্ব্ববৎ সংজ্ঞাহীন, কিন্তু তাঁহার মুখ এবং নাসিকা দিয়া অতি ক্ষীণভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতেছিল। ভলজীন আবার এক অঞ্জলি জল তুলিতেছেন, এমন সময় কে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে হাতদিল। ভলজীন ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন যে, এক জন দীর্ঘকায় পুলিসের পরিচ্ছদধারী ব্যক্তি। ভলজীন দেখিবামাত্র চিনিলেন—সে ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্ট। জ্যাভার্ট গুপ্তচর-মুখে সংবাদ পাইয়াছিল যে, থেনার্ডিয়ার-প্রমুখ কয়েক জন নিশাবিহারী গুণ্ডা ঐ প্রদেশে পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে বাস্ করিতেছে। তাই তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার অভিপ্রায়ে জ্যাভার্ট সুড়ঙ্গের মুখে ঘুরিতেছিল।

এক বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইতে না হইতেই ভলজীন আর এক বিপদের মধ্যে পড়িলেন। অতিকষ্টে থেনার্ডিয়ারের হাত হইতে মুক্ত হইয়া, হাঁফ ছাড়িতে না ছাড়িতেই, ভলজীন জ্যাভার্টের হস্তে পতিত হইলেন। বিপদ্ ভলজীনের সঙ্গের সাথী। বিপদ্ তাঁহার সহোদর ভ্রাতার মত। বিশেষ ভলজীনের চেহারা দেখিয়া এখন আর তাঁহাকে ভলজীন বলিয়া চেনা দুঃসাধ্য। শ্যেন-দৃষ্টি জ্যাভার্টও তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। এক জন অপরিচিত নূতন নিশাচরজ্ঞানে জ্যাভার্ট কহিল, "কে তুমি?"

"আমি জন্ ভলজীন।"

"ভলজীন" এই নাম শুনিয়া জ্যাভার্ট একবার ভলজীনের মুখের নিকট আলোক লইয়া বেশ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এতক্ষণে জ্যাভার্ট চিনিল। ভলজীন বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্ট! এক্ষণে আমি আপনার বন্দী। সন্ধ্যার সময় যুদ্ধক্ষেত্রেই আমি আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছি। তাহা না হইলে আমি আপনাকে আমার ঠিকানা দিতাম না। আমি আত্মসমর্পণ করিতে কৃতনিশ্চয়। কিন্তু আমাকে একটিমাত্র ভিক্ষা দেন।"

জ্যাভার্ট ভলজীনের কথা কিছুই যেন শুনিতে পাইল না। তাহাকে দারুণ চিন্তামগ্ন বলিয়া বোধ হইল। সে অনিমিষ-নয়নে ভলজীনের মুখের পানে দেখিতে লাগিল। এইভাব জ্যাভার্টের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নূতন। এতক্ষণে যেন জ্যাভার্টের চমক ভাঙ্গিল। সে কহিল, "তুমি এখানে কি করিতেছ? এ লোকটিই বা কে?" জন্ ভলজীন কহিলেন,"এই লোকটির

সম্বন্ধেই একটি কথা আমি আপনাকে বলিতে চাই। আপনি আমাকে যাহা অভিরুচি হয় করিবেন, কিন্তু এই লোকটিকে ইহার বাড়ী পৌছাইয়া দিতে যে সময় লাগে, কেবল সেই সময়টুকু আমাকে অব্যাহতি দেন। আপনি আমার সহিত আসুন। ইঁহাকে পৌছাইয়া দিয়া আমি ধরা দিব।"

জ্যাভার্ট কহিল, "এ লোকটাকে আজই যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয়। ইহাকেই বিপ্লবকারিগণ সকলে 'মেরিয়াস' বলিয়া সম্বোধন করিতেছিল।"

ভলজীন কহিলেন, "হাঁ,—আপনি ঠিক বলিয়াছেন। আমি ইহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতেই আনিয়াছি। লোকটি বিষম আহত হইয়াছে।"

জ্যাভার্ট কহিল, "আহত, কি কি!—লোকটি ত দেখিতেছি মরিয়াছে।"

ভলজীন কহিলেন, "না, এখনও মরে নাই। ইহার বাড়ী ৬ নং-রু-দে-ফিলেস্-ডু-ক্যাভারি। ইহার ঠাকুরদাদার নাম জিল-নরম্যাণ্ড।"

অদূরে একখানি ভাড়াটিয়া ক্যাব দাঁড়াইয়া ছিল। জ্যাভার্ট হাঁকিল—'কোচম্যান্!' কোচম্যান্ ক্যাব লইয়া নিকটে আসিল। ভলজীন ও জ্যাভার্ট দুই জনে ধারাধরি করিয়া মেরিয়াসকে গাড়ীতে তুলিয়া তাঁহাকে এক দিকের আসনে শোয়াইয়া দিলেন। অপরদিকের আসনে দুইজনে বসিলেন। জ্যাভার্ট কোচম্যানকে আদেশ দিল, "৬ নং রু-দে-ফিলেস্-ডু-ক্যাভারি!" ঘড়-ঘড় শব্দে গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

গাড়ী যখন মসিঁও জিল-নরম্যাণ্ডের বাটীতে গিয়া পৌছিল, তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। বাড়ীর সকলেই তখন নিদ্রিত। জ্যাভার্ট গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া বাটীর বহির্দ্বারের 'নকারে' সজোরে আঘাত করিতে লাগিলেন। এক জন দ্বারবান্ চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল! জ্যাভার্ট দ্বারবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বাটী কি মসিঁও জিল-নরম্যাণ্ডের?"

দ্বারবান্। হাঁ মহাশয়! আপনার প্রয়োজন?

জ্যাভার্ট। আমরা তাঁহার দৌহিত্রকে লইয়া আসিয়াছি।

দ্বারবান্‌টি নূতন লোক। তাহার প্রভু যে পুত্র-কলত্র-শূন্য, ইহাই তাহার ধারণা ছিল। সে একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁহার দৌহিত্র!" জ্যাভার্ট কহিলেন, "হাঁ—তিনি বিপ্লবকারীদিগের দলে মিশিয়া যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি মৃতপ্রায়, ঐ গাড়ীর মধ্যে মূর্চ্ছিত অবস্থায় আছেন।" দ্বারবান্ আর বেশী গোলযোগ না করিয়া ধীরে ধীরে যাইয়া পুরাতন ভৃত্য নিকোলেট ও বাস্ককে জাগাইয়া সকল কথা বলিল। নিকোলেট ও বাস্ক জিল-নরম্যাণ্ড ও মেরিয়াস-সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় অবগত ছিল। সেই জন্য এত রাত্রে জিল-নরম্যাণ্ডের ঘুম ভাঙ্গাইতে তাহারা সাহস করিল না। সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া তাহারা মেরিয়াসকে উপরে লইয়া গিয়া একটি শয়নকক্ষে শোয়াইয়া দিল এবং এক জন শীঘ্র ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল।

ভলজীন ও জ্যাভার্ট নীচে আসিয়া গাড়ীতে উঠিতে যাইবেন, এমন সময় ভলজীন কহিলেন, "ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্ট! যখন এতই অনুগ্রহ করিলেন, তবে আমার আর একটিমাত্র অনুরোধ রক্ষা করুন। আমাকে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য একবার বাড়ীতে যাইতে দিন। তাহার পরে আপনার যাহা অভিরুচি হয়, সেইরূপ করিবেন।"

জ্যাভার্ট কিছুক্ষণ নীরবভাবে অধোমুখে কি চিন্তা করিল—পরে কোচম্যানকে কহিল, "কোচম্যান! ৭ নং রু-দে-লা-হোম-আরম্।" গাড়ী ভলজীনের বাটীর দিকে চলিল। গাড়ীতে ভলজীন কিংবা জ্যাভার্ট কেহই কোন কথা কহিলেন না। উভয়েই নীরব ও চিন্তামগ্ন। ভলজীন চিন্তা করিতেছিলেন যে, যখন ধরা দেওয়াই তাঁহার মত স্থির করিয়াছেন, তখন কসেটকে একবার শেষ দেখা দেখিয়া লইবেন, মেরিয়াসের ঠিকানা এবং অবস্থার বিষয় তাহাকে বিজ্ঞাপিত করিবেন এবং তাঁহার ভবিষ্যৎসম্বন্ধে একটু আধটু বন্দোবস্ত যাহা বাকী আছে, তাহা সারিয়া লইবেন। আর জ্যাভার্ট কি চিন্তা করিতেছিলেন—তাহা জ্যাভার্ট ভিন্ন অন্য কেহই বলিতে পারে না।

যে গলিতে ভলজীন বাস করিতেন, সেই গলিটি সরু এবং তাহার মধ্যে গাড়ী প্রবেশ করিতে পারে না। গাড়ী গিয়া গলির মুখে থামিল। জ্যাভার্ট ও ভলজীন অবতরণ করিলেন। জ্যাভার্ট কোচম্যানকে কহিলেন, "তোমার কয় ঘণ্টা হইয়াছে? কত ভাড়া দিব?"

কোচম্যান্ কহিল, "মিষ্টার ইন্‌স্পেক্টার! আপনার আজ্ঞানুসারে আমি সাত ঘণ্টা ও এক কোয়ার্টার হাজির আছি। আর ঐ মৃত ব্যক্তির রক্তে আমার গদীটি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

জ্যাভার্ট কহিল, "তুমি সর্ব্বশুদ্ধ কত চাও?"

"আশী ফ্র্যাঙ্ক মিষ্টার ইন্‌পেক্টার।"

জ্যাভার্ট পকেট হইতে চারিটি নেপোলিয়ন বাহির করিয়া কোচম্যানকে দিলেন। কোচম্যান্ সেলাম করিয়া বিদায় হইল। গাড়ী বিদায় দেওয়াতে ভলজীন মনে করিলেন যে, জ্যাভার্ট হয় ত পুলিশ-ষ্টেশন পর্য্যন্ত তাঁহাকে পদব্রজে লইয়া যাইবেন।

ভলজীন তাঁহার বাটী অভিমুখে চলিতে লাগিলেন, পশ্চাৎ পশ্চাৎ জ্যাভার্ট। ৭নং বাটীতে পৌঁছিয়া ভলজীন দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন। দ্বারবান্ আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। ভলজীন একবার জ্যাভার্টের মুখের পানে চাহিলেন। তাঁহার মনের ভাব এই যে, জ্যাভার্ট ইচ্ছা করিলে তাঁহার সহিত বাড়ীর মধ্যে যাইতে পারেন।

জ্যাভার্ট কহিল, "অপনি উপরে যান। আমি এইখানেই আপনার জন্য অপেক্ষা করি।"

ভলজীন বিস্মিত হইয়া জ্যাভার্টের মুখের পানে চাহিলেন। আসামীকে স্বাভাবিকভাবে চলিতে ফিরিতে দেওয়া জ্যাভার্টের কোষ্ঠীতে কখনও লিখে নাই। বিশেষ ভলজীনের মত আসামী—যে কতবার জেল ভাঙ্গিয়া পলাইয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই, যে পুলিসের চক্ষে ধূলি দিয়া তাহাদেরই বিচারক-রূপে কত বৎসর কাটাইয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই।

কসেটের নিকট কেমন করিয়া এই সকল কথা বলিবেন, তাহার ভবিষ্যৎসম্বন্ধে কিরূপ বন্দোবস্ত করিবেন—এই সকল গুরু চিন্তার ভারে নিপীড়িত জন্ ভলজীন আস্তে আস্তে দ্বিতলের সোপান বহিয়া উঠিতে লাগিলেন। সিঁড়ির একটি জানালায় দাঁড়াইয়া ভলজীন একটু মুক্তবায়ু সেবন করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি ফটকের নিকট গেল। কই, জ্যাভার্ট তো সেখানে নাই! জ্যাভার্ট কোথায় গেল?

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

জ্যাভার্টের পরিণাম।

জন্ ভলজীন উপরে চলিয়া গেলেন। জ্যাভার্ট কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র তথায় চিন্তাকুলিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে রু-দে-লা-হোম্-আরম্ রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। জীবনে এই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে চিন্তাভারে অবনতমুখ হইতে দেখা গেল। জীবনে এই প্রথমে তাঁহার হস্তদ্বয় পশ্চাদ্দিকে আবদ্ধ থাকিতে দেখা গেল। নেপোলিয়নের দুইটি-মাত্র চলন-ভঙ্গী ছিল; যখন তিনি কোন বিষয়ে স্থিরসঙ্কল্প ও কৃত-নিশ্চয় হইতেন, তখন তাঁহার হস্তদ্বয় বক্ষের উপরে আড়াআড়িভাবে আবদ্ধ থাকিত। যখন তিনি বিশেষ চিন্তান্বিত হইতেন, তখন তাঁহার দুই হস্ত পশ্চাদ্দিকে আবদ্ধ থাকিত। জ্যাভার্টকে সকলেই নেপোলিয়নের চলন-ভঙ্গীর মধ্যে প্রথমোক্তটির অনুকরণ করিতে দেখিত। আজ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার এই শেষোক্ত চলন-ভঙ্গী দেখা গেল। আজ জ্যাভার্টের সমস্ত শরীরের মধ্যেই যেন এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাঁহার মুখের ভাব এত দিন গম্ভীর ও দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক ছিল; আজ যেন কে তাহার উপরে চিন্তার ছাপ লাগাইয়া দিয়াছে। জ্যাভার্টের বদন আজ প্রাবৃটের বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত কালিমাচ্ছায়াঙ্কিত।

জ্যাভার্টের অবস্থা অবর্ণনীয়। রাজদ্বারে দণ্ডিত এক জন নরঘাতক দস্যু তাঁহার মুক্তিদাতা—তাঁহার জীবনরক্ষক! তিনি এক জন দস্যুর নিকট তাঁহার জীবনের জন্য ঋণী—এবং সেই ঋণের বিনিময়ে আজ তাঁহাকে কর্ত্তব্য ভুলিয়া জানিয়া শুনিয়া বাধ্য হইয়া সেই অপরাধীকে ছাড়িয়া দিতে হইতেছে! ন্যায়ের চক্ষে আজ জ্যাভার্ট দস্যু জন্ ভলজীনের সহিত একই সমতলে অবস্থিত।

একটি বিষয় আজ জ্যাভার্টকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছে। তাহা এই যে, জন্ ভলজীন তাঁহার চিরশত্রু জ্যাভার্টকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিল, তাহার জীবন রক্ষা করিল। অপর একটি বিষয়ও অল্প বিস্ময়কর নহে, তাহা এই যে, জ্যাভার্টকে বাধ্য হইয়া জীবনের বিনিময়ে জীবন দিতে হইল—হাতে

পাইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত দস্যু জন্ ভলজীনকে ছাড়িয়া দিতে হইল।

সমস্ত চিন্তার মধ্যে একটি চিন্তা জ্যাভার্টকে একেবারে অপ্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিল। সেটি এই —জ্যাভার্ট আজ একটি গুরুতর কর্ত্তব্যের অবহেলা করিয়াছে। কারামুক্ত কয়েদী জন্ ভলজীন মুক্ত অবস্থায় গুরুতর অপরাধ করিয়া দণ্ডার্হ হইয়াছে; কিন্তু তাহা জানিয়া শুনিয়াও তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইতেছে। আজ জ্যাভার্টকে বাধ্য হইয়া আইনের কবল হইতে তাহার ন্যায্য গ্রাস কাড়িয়া লইতে হইতেছে। যে কার্য্য করিতে হইবে বলিয়া তিনি স্বপ্নেও কখনও কল্পনা করেন নাই, আজ তাঁহাকে অম্লানবদনে তাহাই করিতে হইতেছে। কর্ত্তব্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে এতদিন তাঁহার জীবন প্রতিষ্ঠিত ছিল। আজ সেই ভিত্তি বিচূর্ণিত হইয়াছে। জ্যাভার্টের জীবিত-প্রয়োজন পর্য্যবসিত হইয়াছে।

এই নিদারুণ অপমান অসহনীয়। এইরূপ জীবন জ্যাভার্টের পক্ষে নিতান্তই দুর্ব্বহনীয়। জ্যাভার্ট মনে করিল, "না—এই তুমুল ঝটিকা হইতে উদ্ধারলাভের দুটইমাত্র উপায় আছে। প্রথম অবিচলিতভাবে যাইয়া ভলজীনকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করা। দ্বিতীয়—* * ।"

রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। চারিদিক্ কুজ্ঝটিকা ও অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত। মাঝে মাঝে পথিপার্শ্বস্থ গ্যাসালোকগুলি চৈত্য আলোকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। জগৎ সুষুপ্ত। নৈশ প্রকৃতির মুখখানি অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত। ঊর্দ্ধে কালমেঘের চন্দ্রাতপ নক্ষত্রলোককে আবরিয়া রাখিয়াছে। রাজপথ জনশূন্য ও নীরব। নটরডেম্ ও পালেস্-অব-জষ্টিস নামক বিচারালয়ের অট্টালিকাদ্বয় সেই অন্ধকারের মধ্যে মাথা জাগাইয়া বিকট দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। একটিমাত্র তীব্র লোহিত আলোক জ্যোতিষ্কের ন্যায় সীন্ নদীর পুলের উপরে জ্বলিতেছে। জ্যাভার্ট যাইয়া পুলের উপর দাঁড়াইল, মস্তক হইতে টুপী খুলিয়া লইল। জ্যাভার্ট তাহার মস্তকের মধ্যে দুঃসহ বেদনা অনুভব করিতেছিল। মনে করিল, বুঝি নিশীথের শীতল সমীরণ-স্পর্শে সে বেদনা নিরাকৃত হইবে। কিন্তু সে আশা তাহার নিষ্ফল হইল, যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। সে তাহার মস্তিষ্কে সহস্র-বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল।

বর্ষাসমাগমে সীন্ আজ কূলে কূলে পূর্ণা। জ্যাভার্ট পুলের যে স্থানে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছিল, ঠিক তাহার নীচেই সীন্ নদীর দেশ-বিখ্যাত অতল-স্পর্শ দহ। বর্ষাগমে নদীর পূর্ণতা ও সলিল-স্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে এই দহের মধ্যে অনেকগুলি পাক পড়িয়াছে। জ্যাভার্ট রেলিঙের উপর ভর দিয়া সীনের এই উন্মাদ উচ্ছ্বাস দেখিতেছিল এবং কি চিন্তা করিতেছিল। রজনী অন্ধকারময়ী। বিশাল সীন্ নদীর তরঙ্গ-ভঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। নৈশ প্রকৃতি নিস্তব্ধ। জল-কল্লোল ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না। চুম্বক যেমন লৌহকে টানিয়া লয়—আজ এই সাক্ষাৎ ধ্বংস-রূপিণী তটিনী কি জানি কি এক বিষম অজানিত আকর্ষণে জ্যাভার্টকে টানিতে লাগিল। জ্যাভার্ট কয়েক মুহূর্ত্ত প্রস্তর-গঠিত মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। সহসা তাহার মুখে একটি স্থির প্রতিজ্ঞার চিহ্ন লক্ষিত হইল। কি এক স্বর্গীয় ভাবে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে টুপীটি লইয়া পুলের উপর রাখিল। একবার করযোড়ে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া জ্যাভার্ট নদীবক্ষে ঝম্প প্রদান করিল। ঝপ্ করিয়া একটি শব্দ হইল। বীচিবিক্ষোভ-বিহ্বলা রাক্ষসী সীন্ যেন একটি বিকট হাসি হাসিয়া জ্যাভার্টকে মুহূর্ত্তমধ্যে কবলিত করিয়া ফেলিল।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

মেরিয়াস মাতামহের গৃহে।

যখন মেরিয়াস আহত ও মৃতকল্প অবস্থায় তাঁহার মাতামহ জিল-নরম্যাণ্ডের আবাসে আনীত হইলেন, তখন রাত্রি গভীর। বৃদ্ধ জিল-নরম্যাণ্ড তখন তাঁহার শয়নকক্ষে নিদ্রাভিভূত। আজ দুই দিন ধরিয়া তাঁহার দিনগুলি অতিমাত্র উত্তেজনায় ও রাত্রিগুলি যৎপরোনাস্তি ঔৎসুক্যে ও উৎকণ্ঠায় কাটিতেছিল। জিল-নরম্যাণ্ড এক জন গোঁড়া রাজভক্ত এবং সর্ব্ববিষয়ে শাসন ও নিয়মের অধীন। বিপ্লববাদী দলের

এই আকস্মিক অভ্যুত্থান ও নারকীয় শোণিতলিপ্সা তিনি নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন এবং তাহাদের জয়োল্লাসজনিত আনন্দোচ্ছ্বাস নিদ্রিত অবস্থায়ও তাঁহাকে সন্ত্রাসিত করিতেছিল। তাঁহার ভৃত্যগণ সকলেই তাঁহার এই মানসিক অবস্থার বিষয় অবগত ছিল। কেহই সে রাত্রিকালে তাঁহাকে নিদ্রোত্থিত করিতে সাহস পাইল না।

পরদিন প্রভাতে মসিও জিল-নরম্যাণ্ড শয্যা ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বারান্দায় পদ চারণ ও বায়ু-সেবন করিতেছেন, এমন সময়ে ডাক্তারের গাড়ী আসিয়া তাঁহার ফটকে লাগিল। এই অসময়ে ডাক্তারকে আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধ একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। বাড়ীতে অসুখ কাহার? তিনি নিজে ত বেশ সুস্থই আছেন। তবে কি তাঁহার কোন ভৃত্য অসুস্থ হইয়াছে?

ডাক্তার আসিয়াই যে কক্ষে মেরিয়াস ছিলেন, সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া শয্যোপরি শায়িত, সর্ব্ব-অঙ্গে অস্ত্রলেখা-বিমণ্ডিত, নিমীলিতাক্ষিযুগ, লুপ্তসংজ্ঞ মেরিয়াসকে দেখিয়া তিনি ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। পলিত-কেশ বৃদ্ধ জিল-নরম্যাণ্ড কক্ষতলের ঠিক মধ্য-স্থলে বজ্রাহতের ন্যায় দণ্ডায়মান। তাঁহার দৃষ্টি স্থির-ভাবে মেরিয়াসের দিকে আবদ্ধ। তাঁহার মস্তক ঈষৎ ডানদিকে হেলিয়া রহিয়াছে এবং আবেগভরে অল্প অল্প কম্পিত হইতেছে। মলিনতার লেশমাত্র-শূন্য একটি সাদা ধবধবে ওভারকোটে তাঁহার সমস্ত শরীর ঢাকা। সেই কোটের কোনখানে একটি দাগ বা ভাঁজ নাই। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন, একটি মৃতদেহকে তুষার-শুভ্র চৈত্যবসনে আচ্ছাদিত করিয়া খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে। তিনি বিস্ময়-বিমুগ্ধ—ঠিক যেন অন্তিম-সজ্জায় সজ্জিত একটি পরলোকগত মানবের ছায়াময় কায়াখানি মায়ার আকর্ষণে আবার তাহার পুরাতন পরিত্যক্ত আবাসে আসিয়া সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

বৃদ্ধ একদৃষ্টে দেখিতেছিলেন—সুকোমল শয্যো-পরি শায়িত হতচেতন তাঁহারই হৃদয়ের ধন মেরিয়াস! অজস্র রক্ত-মোক্ষণে মেরিয়াসের দেহ সম্পূর্ণ রক্তহীন—মোমের মত সাদা। সেই ধবল দেহে অগণ্য ক্ষত-চিহ্ন। তাহা হইতে এখনও অল্প অল্প রক্ত পড়িতেছে, তাহার চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত; বদন মরণচ্ছায়াঙ্কিত। বৃদ্ধ মাতামহ একবার ভাল করিয়া দৌহিত্রের আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন। তাঁহার বার্দ্ধক্য জড় নয়নদ্বয় এখন একেবারেই স্থির। চক্ষু দুইটি ঠিক যেন স্ফটিকের গড়া, মুখখানি মাংস-শূন্য অস্থিমাত্রে পর্য্যবসিত নরকঙ্কালের মত। তাঁহার হাত দুইটি ঝুলিয়া পড়িয়াছে, যেন হস্তের পেশীগুলি খুলিয়া লওয়া হইয়াছে।

আবেগরুদ্ধ কম্পিতকণ্ঠে বৃদ্ধ জিল-নরম্যাণ্ড কহিলেন, "মেরিয়াস।"

ভৃত্য বাস্‌ক হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে একটু অগ্রসর হইয়া নিবেদন করিল, "হুজুর। এখনি উনি এখানে আনীত হইয়াছেন। উনি যুদ্ধক্ষেত্রে এইরূপ আহত হইয়াছেন।"

বৃদ্ধ জিল নরম্যাণ্ড বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "তাহা অনেকক্ষণ বুঝিয়াছি। বাস্‌ক! আমার নিকটে গোপন করিও না। নিষ্ঠুর যাহা বলিয়াছে, ঠিক তাহাই করিয়াছে। সে জীবিত অবস্থায় আমার বাড়ীতে ফিরে নাই। বড় অভিমানে আমার সোনার বাছা আমায় ছাড়িয়া গিয়াছিল! মূর্খ আমি—তখন তাহার মূল্য বুঝি নাই। সেই অনা-দর, সেই প্রত্যাখ্যানের বেশ প্রতিশোধ আততায়ী লইয়াছে। আমারই দোষে সে বিপ্লবপন্থীদিগের দলে মিশিয়া রণক্ষেত্রে তাহার জীবন উৎসর্গীকৃত করিয়াছে।"

বৃদ্ধ কাঁপিতে কাঁপিতে মেরিয়াসের শয্যাপার্শ্বে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, একদৃষ্টে দৌহিত্রের মুখের দিকে দেখিতে লাগিলেন। মেরিয়াস তখনও অচে-তন। তাহার দেহ স্থির—শ্বাস-প্রশ্বাস অতি মৃদু—চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত—বক্ষঃস্থল প্রায় স্পন্দন-রহিত। মেরিয়াসের সেই অবস্থা দেখিয়া আবেগে বৃদ্ধের অধ-রোষ্ঠ যেন ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। অস্ফুটস্বরে বৃদ্ধ জিল-নরম্যাণ্ড কহিলেন, "হৃদয়হীন! নিষ্ঠুর! তোমার মনে শেষে এই ছিল?" বৃদ্ধের হৃদয়মধ্যে আবেগের প্রবল ঝটিকা উঠিল। তাঁহার কথার দুয়ার রুদ্ধ হইয়া আসিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর কম্পিত, জড়িত, ঠিক যেন মরণের পরপার হইতে আসিতে আসিতে দূরতায় মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। চক্ষুজল মুছিয়া বৃদ্ধ আবার কহিতে লাগিলেন, "আমার সমস্ত সাধ মিটিয়াছে। আমার জীবিত-প্রয়োজন পর্য্যবসিত

হইয়াছে। নির্ম্মম, তুমি যখন তোমার নিজের জীবনের উপর এতাদৃশ মমতা-বিহীন, তখন এ বৃদ্ধের উপর আর কি তোমার মমতা থাকিবে? নরহন্তা! তুমি এত সামান্য কারণে, এত অল্প উত্তেজনায়, নিজের জীবনটিকে তোমার প্রবৃত্তির মন্দিরে বলি দিলে! এই বৃদ্ধের নিরাশা-পীড়িত দুর্ব্বহ-ভার জীবনের উপরে আর তোমার কি মায়া থাকিবে?"

ঠিক এই সময়ে যেন মেরিয়াসের সংজ্ঞা একটু ফিরিয়া আসিল। তাঁহার অক্ষিপল্লব যেন ঈষৎ নড়িয়া উঠিল। মেরিয়াস ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলিত করিলেন। মেরিয়াসের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া বৃদ্ধ মাতামহের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। তিনি চীৎকার করিয়া কহিলেন, "মেরিয়াস, আমার অন্ধকার গৃহের একমাত্র আলোকবর্ত্তিকা মেরিয়াস, তুমি চক্ষু মেলিয়াছ! তুমি বাঁচিয়া আছ! পরমেশ্বর ধন্য!"

অতিমাত্র আনন্দের আবেগ বৃদ্ধ ভূমিতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনেক দিন এই ভাবেই কাটিয়া গেল। মেরিয়াস মৃতও নহে, জীবিতও নহে। কয়েক সপ্তাহ তাঁহার খুব জ্বর হইল। সেই প্রবল জ্বরের মধ্যে মেরিয়াস ক্রমাগত প্রলাপ বকিতেন। যে সকল প্রসঙ্গ তিনি সেই জ্বরের ঘোরে উত্থাপিত করিতেন, তাহার প্রায় সকলগুলিই চিত্তবৃত্তির বিকারজনিত অসংবদ্ধ প্রলাপ মাত্র। কিন্তু একটি চিন্তা—একটি বিষয়ের আন্দোলনে রোগীর বিশেষ অসংলগ্নতা পরিলক্ষিত হইত না—সে চিন্তা, সে আন্দোলন—কসেটের সম্পর্কে।

পরিপাটী পরিচ্ছদে সজ্জিত এক জন পককেশ বৃদ্ধ প্রত্যহই আসিয়া দ্বারবান্ কিংবা চাকর-বাকরের নিকট রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে খবরবার্ত্তা লইয়া যাইতেন। জীবনমরণের এই ভীষণ সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া মেরিয়াসের চারিমাস অতিবাহিত হইল। এইবার ডাক্তার তাঁহার রোগীর জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আশা দিতে সমর্থ হইলেন। সুচিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে অল্পদিনের মধ্যেই মেরিয়াস তাঁহার পুরাতন স্বাস্থ্য ফিরাইয়া পাইতে লাগিলেন।

এই সকল চিকিৎসা, শুশ্রূষা, আদর-যত্ন, আশা-আশ্বাস, আনন্দ-উৎফুল্লতার মধ্যে মেরিয়াসের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত আশা, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা একটিমাত্র ক্ষুদ্র কেন্দ্রে আবদ্ধ—সে কসেট। জ্বরের মধ্যে বিকারের ঘোরে মেরিয়াস বহুবার তাঁহার প্রণয়িনীর নামোচ্চারণ করিয়া কত কি প্রলাপ বকিয়াছেন। কিন্তু সংজ্ঞা ফিরাইয়া পাওয়ার পরে আর মেরিয়াস কসেটের নাম মুখেও আনেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া পাঠক মনে করিবেন না যে, তিনি কসেটকে ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি মুখে কসেটের নাম উচ্চারণ করিতেন না, তাহার কারণ—তাঁহার হৃদয় রাতদিন কসেটের পদতলেই পড়িয়া থাকিত। কসেট কোথায় কি ভাবে আছে,—তাহা কিছুই জানিতেন না। বিপ্লববাদী দলের সেই সমরাভিনয় মাঝে মাঝে তাঁহার স্মৃতির পটে বিষণ্ণ ঘন-কৃষ্ণ মেঘখণ্ডের মত ফুটিয়া উঠিত। সেই মেঘ-মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্রোদ্দীপ্ত ধূম-পটলান্তরালে মেরিয়াস স্বপ্নাবিষ্টের মত মাঝে মাঝে দেখিতে পাইতেন—গ্যাভ্রোকের প্রফুল্ল কিশোর মুখ, মাবুফ ও বস্ওয়ে প্রভৃতি বিপ্লব-পন্থিগণের বিকট তাণ্ডব, আর হিমসমাগমে বিগত-শ্রী কমলিনীর ন্যায় দারিদ্র্য প্রপীড়িতা অভাগিনী ইপোনাইন। মসিও ফক্লেভেণ্টের ধীর-গম্ভীর মূর্ত্তিটিকেও সেই রণস্থলের ছবির মধ্য দিয়া উল্কাপিণ্ডের মত চলিয়া যাইতে মেরিয়াস দেখিতে পাইতেন। আর এক সমস্যা ফক্লেভেণ্ট কি অভিপ্রায়ে কিরূপে যাইয়া বিপ্লববাদী দলের সহিত মিশিলেন?—আর সেই ভীষণ সঙ্কটাপন্ন সমরক্ষেত্র হইতে সাংঘাতিকরূপে আহত তাঁহার নিজের জীবনই বা কাহার দ্বারা কিরূপে রক্ষিত হইল?—রহস্যের উপরে রহস্যের আবরণ পড়িয়া ব্যাপারটিকে একেবারে জটিল করিয়া তুলিল। কিন্তু এই প্রহেলিকার কুজ্ঝটিকার মধ্যে, নৈশ-গগনে ধ্রুবতারার ন্যায় একটি স্থির অচঞ্চল আলোক-লক্ষ্যে মেরিয়াসের দৃষ্টি নিরন্তর আবদ্ধ—সে কসেট।

মেরিয়াসের স্থির-প্রতিজ্ঞা—কসেটকে কোন প্রকারে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

মেরিয়াসের আরোগ্যলাভ।

কিছু দিন মধ্যেই মেরিয়াস সম্পূর্ণ আবোগ্যলাভ করিলেন। তাঁহার শারীরিক সামর্থ্য ও সৌন্দর্য্য ফিরিয়া আসিল। বৃদ্ধ মাতামহের হৃদয়ও এখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

এক দিন প্রাতঃকালে মেরিয়াস শয্যোপরি উপবিষ্ট আছেন। অদূরে শয্যাপার্শ্বে একখানি ইজিচেয়ারে 'বসিয়া বৃদ্ধ জিল-নবম্যাণ্ড একদৃষ্টে করুণার্দ্র-হৃদয়ে দৌহিত্রের মুখেব পানে চাহিয়া আছেন। দুই জনেই নীরব—কিন্তু সে নীরবতাটুকু ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণ। আকাশে মেঘের সঞ্চাব হইলে, প্রকৃতির আস্যে যেমন হাস্য ও ক্রন্দন, আলো ও ছায়ার একটি বিচিত্র বিকট সম্মিলন পরিলক্ষিত হয়, এই বিভিন্ন ভাবরাশি, যেমন বঙ্গালয়ে দৃশ্যপরিবর্ত্তনের মত, একের পর অপরটি, এক অজানিত উপায়ে দর্শকদিগের নয়ন-সমক্ষে প্রকটিত হইয়া উঠে, মেরিয়াসের মুখের ভাবেরও সেইরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছিল। স্নেহ-প্রবণ-হৃদয় বৃদ্ধ মাতামহের কিন্তু মেরিয়াসেব মুখশ্রীব এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করার শক্তিও ছিল না এবং ইচ্ছা বা অবসরও ছিল না। কারণ, বৃদ্ধ একরূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, আর তিনি তাঁহার দৌহিত্রের বাসনার পথে কণ্টক হইবেন না।

সহসা মেরিয়াসের মুখখানি যেন গম্ভীর হইয়া উঠিল। তাঁহার হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ, চাহনি উদ্‌ভ্রান্তের মত। স্থির-দৃষ্টিতে মাতামহের মুখের দিকে চাহিয়া মেরিয়াস কহিলেন, "দাদা! আমি আপনাকে একটি কথা বলিতে চাহি।"

ভাব-গদ্‌গদ-কণ্ঠে হাস্যোৎফুল্ল-মুখে বৃদ্ধ মাতামহ উত্তর করিলেন, "আমার সঙ্গে আবার তোর কি কথা রে শালা?"

"তবে দাদা মহাশয়! আমার কথা শুনবে না?"

"তাই আমি বল্‌ছি নাকি? আমি বল্‌ছি যে, আমি বুড়ো হয়েছি। বুড়োর সঙ্গে ছোকরার আবার কি কোন কথা থাকৃতে পারে? তা যাক্—যখন বল্‌বি বল্‌ছিস্, কথাটা বলেই ফেল্।"

"দাদা! আমি বিয়ে কর্‌তে চাই।"

"এই কথা, তার জন্য ভাবনা কি? একটা ক'নে-টনে দেখে পছন্দ কর্।"

"না দাদামশাই, কসেটকে না পেলে আমি বাঁচবো না।"

"তাই খুলে বল্ না দাদা! পাবি দাদা পাবি। আমি দরওয়ানের কাছে সব খবর পেয়েছি। আমার সোনার কসেট একটি বৃদ্ধের মূর্ত্তি ধ'রে রোজই প্রাতে সন্ধ্যায় এসে তোর খবর নিয়ে যায়। আরও খবর পেয়েছি—সে এখনও সেই ৭নং রু-দে-লা-হোম-আরমের বাড়ীতেই আছে। কা'ল তাকে আন্‌তে পাঠাব।"

"না দাদামশায়! কা'ল নয়—আজই।"

"কেন দাদা! আজ যে তুই আমাকে দশবার 'দাদামশাই' ব'লে ডেকেছিস্—তাতেই ত আজকার পুরা দাম উঠে গেছে। সত্য কথা বল্‌তে কি মেরিয়াস—আমিও মনে মনে এত দিন ধ'রে একটা মৎলব আঁট্‌ছিলাম। আমি মনে করলাম যে—এ শালা তো দেখ্‌ছি বুড়োকে কিছুতেই ধরা দিতে চায় না—দাঁড়াও—শালা যেমন শিকলি-কাটা, তেমনি এমন একটি সোনার শিকল দিয়ে একে বাঁধতে হবে যে, যেন সে কিছুতেই সেই শিকল না কাট্‌তে পারে। মেরিয়াস! ভাইটি আমার! তুই মনে করেছিলি যে, তোর দাদামশাই বুঝি এবারও তোর প্রণয়ের পথে কণ্টক হবে। না ভাই! আমি এত দিনে বুঝতে পেরেছি যে, জগতে যদি কোন মহান্ আকর্ষণ থাকে—তবে সে প্রেম। মেরিয়াস! তুমি কসেটকে ভালবাসিয়াছ। কসেটকেই তুমি পত্নীরূপে পাইবে।"

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

আবার মিলনে।

পর দিন মেরিয়াস অতি প্রত্যুষেই শয্যা পরিত্যাগ করিয়া একখানি ইজিচেয়ারে উপবেশন করিয়া আছেন। আজ তাঁহার মন বড়ই প্রফুল্ল।

ফকুলেভেণ্ট আজ কসেটকে লইয়া মেরিয়াসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। বৃদ্ধ জিল-নরম্যাণ্ডও আজ সকাল সকাল উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া মেরিয়াসের কক্ষে আসিয়া বসিয়াছেন। বাস্ক্, নিকোলেট ও অন্যান্য ভৃত্যগণও মেরিয়াসের কক্ষের আশে-পাশে ঘুরিতেছে।

ঘড়ীতে নয়টা বাজিয়া গেল। স্মিত-মুখ বৃদ্ধ ফকুলেভেণ্ট ফুল্লারবিন্দাননা কসেটের হাত ধরিয়া আসিয়া সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ফকুলেভেণ্ট ওরফে ভলজীনের বেশভূষা আজ বেশ পরিচ্ছন্ন। তাঁহার পরিধানে একটি সুন্দর কাল-রঙের সার্জ্জের মূল্যবান্ সুট। গলায় ধব্ধবে সাদা গলাবন্ধ। বাদামী রঙের কাগজে জড়ান পুস্তকা-কারের একটি প্যাকেট তাঁহার বগলে।

মেরিয়াসের বিধবা মাতৃষ্বসা আজ মেরিয়াসকে দেখিতে আসিয়াছেন। ইস্কুলের ছাত্রের মত, ভল-জীনের বগলে বই দেখিয়া তিনি যেন একটু বিস্মিত হইলেন; পিতার কানের নিকট মুখ লইয়া তিনি মৃদুস্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই লোকটি কি সকল সময়ই এইরূপ বই বগলে করিয়া ফিরেন না কি?"

বৃদ্ধ জিল-নরম্যাণ্ড উত্তর করিলেন, "লোকটি খুব পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। পণ্ডিতেরা কখনও বই ছাড়া রাস্তা চলেন না।" তাহার পরে তিনি আগন্তুককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মসিও ট্র্যাক্লেভেণ্ট!"

মসিও জিল-নরম্যাণ্ড ইচ্ছা করিয়া ফকুলেভেণ্টের নাম ঐরূপ বিকৃত করেন নাই। নাম সম্বন্ধে একটা অমনোযোগ ও বিস্মৃতি জিল-নরম্যাণ্ডের একটা বড়-মানষি কায়দা—একটা আমীরী চাল।

বেশী কিছু ভূমিকা বা আড়ম্বর না করিয়াই জিল-নরম্যাণ্ড কহিলেন, "মসিও ট্রাক্লেভেণ্ট! আমি আমার দৌহিত্র মসিও লি-ব্যারণ মেরিয়াস পণ্টমারসির সহিত আপনার কন্যা কসেটের বিবাহের প্রস্তাব করিতেছি। আপনি এ সম্বন্ধে সম্মত আছেন কি?"

ভলজীন কহিলেন, "ইহা ত খুব আনন্দের বিষয়।"

জিল-নরম্যাণ্ড এক বার মেরিয়াসের দিকে ও তৎপরে কসেটের দিকে অর্থপূর্ণ অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "এখন তোমরা স্বচ্ছন্দে এবং অবাধে আলাপ করিতে পার।"

প্রণয়ি-যুগল এই অনুমতির কিছুমাত্র অপেক্ষা করেন নাই। দীর্ঘ বিরহের পরে পরস্পর সাক্ষাতের প্রথম মুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহারা নীরব ভাষায় আপন আপন ব্যথিত ক্লিষ্ট হৃদয়ের ভাবগুলি প্রকাশ করিতেছিলেন। সে ভাষা প্রেমিক-প্রেমিকা ভিন্ন অন্যের নিকট দুর্ব্বোধ্য!

কসেট মেরিয়াসের কানের কাছে মুখ লইয়া অভিমানভরে আবেগ-জড়িত স্বরে কহিল, "নিষ্ঠুর! এম্নি করিয়া বুঝি আপনাকে বলি দিতে হয়?"

মেরিয়াস কহিলেন, "সোনা আমার! যখন তোমাকে পাওয়া সম্বন্ধে আমি হতাশ হইলাম—তখন আর আমার বাঁচিয়া থাকায় ফল কি?"

কসেট কহিল, "আর আমি তোমাকে চক্ষের অন্তরাল করিতেছি না।"

মেরিয়াস কহিলেন, "দেবি! তোমাকে ছাড়িয়া আমি স্বর্গেও যাইতে চাহি না।"

যখন প্রণয়িযুগলের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন চলিতেছিল, বৃদ্ধ জিল-নরম্যাণ্ড তখন ভলজীনের সহিত আলাপনে ব্যস্ত। আণ্ট জিল নরম্যাণ্ড এই পুরাতন বিষাদময় অন্ধকার গৃহে চারিদিকে সহসা আশা, আনন্দ ও আলোকের উৎস ছুটিতে দেখিয়া যেন একটু ঈর্ষান্বিত ও হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। মনে মনে যে একটু কুপিতও না হইলেন, তাহা বোধ হয় না। কারণ, তিনি মেরিয়াসের আপন মাসী। মেরিয়াস মাতৃহীন। মেরিয়াসের বিবাহে তাঁহার মতামত একেবারে লওয়া হইল না। এ উপেক্ষা তাঁহার হৃদয়ে বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় আঘাত করিল। মেরিয়াসের উপর তাঁহার রাগ তত নয়। তিনি অত্যন্ত কুপিত হইলেন তাঁহার বৃদ্ধ পিতার উপর।

আনন্দোৎফুল্ল-হৃদয় বৃদ্ধ জিল-নরম্যাণ্ড তাঁহার কন্যাকে কহিলেন, "এত দিনে আমাদের অন্ধকার গৃহ আলোকিত হইল। কেমন চাঁদপানা বউ! আমার মনে হয় যে, ব্যারণের গৃহিণী হওয়াটা তাহার গৌরবের হানিকর। রাণী হইবার জন্যই যেন তাহার জন্ম। রাণী হইলেই তাহাকে মানাইত ভাল। কি সুন্দর চোখ, নাক, কান, ঠোঁট! এমন নিখুঁত সুন্দরী ত নজরে পড়ে না!"

মেরিয়াস ও কসেটের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ কহিলেন, "বৎসগণ! এমনি করিয়া, জন্মজন্মান্তর ধরিয়া, অন্ধের ন্যায়, নির্ব্বোধের ন্যায়, পাগলের ন্যায়, পরস্পরকে ভালবাস। কারণ, প্রেম মানবের চক্ষে নির্ব্বুদ্ধিতা; কিন্তু ঈশ্বরের চক্ষে পরমার্থ-জ্ঞানের চরম বিকাশ। এখন আমার দুঃখ হইতেছে যে, আগে আমি কেন এ কথাটা বুঝি নাই? আমি যে আমার সম্পত্তির বেশী ভাগ দান করিয়া ফেলিয়াছি।"

ভলজীনের দিকে মুখ ফিরাইয়া বৃদ্ধ জিল-নরম্যাণ্ড কহিলেন, "মসিও ট্রাকুলেভেণ্ট! আমার এখন হাত কামড়াইতে ইচ্ছা করিতেছে যে, কেন আমি এত সম্পত্তি দান করিয়া ফেলিলাম? আমি যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, তত দিন অবশ্য আমার সমস্ত সম্পত্তির উপস্বত্বই আমার মেরিয়াস ও কসেটের। কিন্তু আমি আর কয়দিন? বড় জোর আর বিশ বৎসর বই ত না। তাহার পরে ম্যাডামলা ব্যারণকে সামান্য গৃহস্থের মেয়ের মত সঙ্কীর্ণভাবে চলিতে হইবে না কি?—ইহাই আমার বিষম ভাবনা!"

ভলজীন এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথাই কহেন নাই। এক্ষণে গম্ভীরভাবে কহিলেন, "মসিও জিল-নরম্যাণ্ড! আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না। ম্যাডাইজিল ইউফ্রেজি ফকুলেভেণ্টের নিজের ছয় লক্ষ ফ্রাঙ্ক নগদ টাকা রহিয়াছে।"

বৃদ্ধ জিল-নরম্যাণ্ড একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন, কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া থাকিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় কহিলেন,—"কে সে?—কে এই ম্যাডাইজিল ইউফ্রেজি?"

কসেট কহিল, "আমার নামই ইউফ্রেজি ফকুলেভেণ্ট।"

জিল-নরম্যাণ্ড অন্যমনস্কভাবে কহিলেন, "ছয় লক্ষ ফ্রাঙ্ক!"

ভলজীন কহিলেন, "কসেটের এক জন পরলোকগত আত্মীয় আমার হস্তে ছয় লক্ষ ফ্রাঙ্ক গচ্ছিত রাখিয়া এই আদেশ দিয়া যান যে, কসেটের ভরণপোষণ ও শিক্ষার্থে যে ব্যয় হইবে, তাহা খরচ করিয়া অবশিষ্ট সমস্ত টাকা কসেটের বিবাহের যৌতুক-স্বরূপ দিতে হইবে। মসিও জিল-নরম্যাণ্ড, কসেটের ভরণপোষণ ও শিক্ষার্থে ষোল হাজার আন্দাজ ফ্র্যাঙ্ক ব্যয় হইয়াছে। অবশিষ্ট সমস্ত টাকাই আমার নিকট আছে।"

এই কথা বলিয়া ভলজীন বাদামী কাগজে পুস্তকাকারে জড়ান সেই প্যাকেটটি ধীরে ধীরে খুলিলেন। তাহার মধ্যে তাড়া তাড়া ব্যাঙ্ক নোট। দশ সহস্র ফ্রাঙ্ক মূল্যের, এক একখানি করিয়া গ্রথিত হইয়া, তাহারই ছয় তাড়ায় ছয় লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক মূল্যের এই বিচিত্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

মসিও জিল-নরম্যাণ্ড চীৎকার করিয়া কহিলেন, "অতি সুন্দর কেতাব তো!"

কক্ষের সকলেই এই ব্যাপারে বিস্মিত; কিন্তু মেরিয়াস ও কসেটের সে দিকে মনোযোগ নাই। তাঁহারা তখন পরস্পর আলাপনেই ব্যস্ত।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

ভলজীনের সতর্কতা।

বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। চিকিৎসক মত প্রকাশ করিলেন যে, আর দুই মাসমধ্যেই মেরিয়াস সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিবেন। এটি ডিসেম্বর মাস। ফেব্রুয়ারীর প্রারম্ভেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে। এখন হইতেই তাহার আয়োজন আরম্ভ হইয়া গেল। আনন্দের দিন বড় শীঘ্র কাটে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ জলের মত চলিয়া যাইতে লাগিল। মেরিয়াস কিংবা কসেট তাহা কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না। তাঁহারা কেবল এইটুকু পরিবর্ত্তন বেশ স্পষ্ট বুঝিলেন যে, তাঁহারা সহসা মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে নীত হইলেন। কেমন করিয়া, কোন্ রাস্তায়, কাহার যত্নে যে তাঁহাদের জীবনে এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, তাহা স্থির করিতে তাঁহারা কেহই সমর্থ হইলেন না।

এক দিন কথা-প্রসঙ্গে মেরিয়াস তাঁহার হৃদয়রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কসেট! এ সমস্ত ব্যাপার কি?"

সরলা মধুর হাসিয়া কহিল, "সব ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ।"

উপস্থিত ক্ষেত্রে যাহা কর্ত্তব্য, যাহা আবশ্যক, তাহা সমস্তই ভলজীন করিতে লাগিলেন। তিনি বহুদিন ধরিয়া মেয়রের কার্য্য করিয়া আইন কানুন সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। অজ্ঞাতকুলশীলা কসেটের সহিত ফ্রান্সের একটি প্রাচীন অভিজাতকুলের একমাত্র বংশধরের এই যৌন-সম্বন্ধ-স্থাপন যাহাতে আইনতঃ কোন অংশে দুষ্ট বা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত না হয়—তাহার উপায় উদ্ভাবন-কল্পে, তীক্ষ্ণ ধীশালী অভিজ্ঞ ভলজীনের মস্তিষ্ককে বড় অধিক নিপীড়িত করিতে হইল না। তিনি অতি সহজেই এই ব্যাপারের একটা মীমংসা করিয়া ফেলিলেন। কসেটের প্রকৃত পরিচয় দিলে এ বিবাহ আইনের চক্ষে অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সেই জন্য ভলজীন পরিচয় দিলেন যে, কসেট তাঁহার নিজের কন্যা নহে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফকলেভেণ্টের একমাত্র কন্যা। তাঁহার পিতা-মাতা উভয়েই পরলোক-গত। কসেটের ভাই, ভগ্নী কিংবা অন্য কোন আত্মীয় কেহই জীবিত নাই। সুতরাং কসেটের সম্বন্ধে কোনরূপ অনুসন্ধান লওয়া নিষ্প্রয়োজন। দুই জন ফকলেভেণ্ট সেইণ্ট এণ্টোয়াইনের চিরকুমারী-আশ্রমে উদ্যান-রক্ষকের কার্য্য করিত। কসেট এই ফকলেভেণ্টদ্বয়ের মধ্যে যে এক জনের দুহিতা, এই মর্ম্মে কুমারী-আশ্রমের প্রধানা এবং অন্যান্য কুমারীগণ স্পষ্ট সাক্ষ্য দিলেন। আদালতও তাঁহাদের সাক্ষ্য নিঃসংশয়িতভাবে প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য করিয়া লইলেন। সুচতুর ব্যবহারাজীবের মস্তিষ্ক হইতে একখানি বিশদ দলীল প্রস্তুত হইল। আইনের চক্ষে, কসেট—ম্যাডাইজিল ইউফ্রেজি ফকলেভেণ্ট নামে পরিচিত হইলেন।

ভলজীন যে কসেটের পিতা নহে, এই রহস্য-প্রকাশে আইন ও সমাজ সন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু কসেট তাহার হৃদয়ে এক দারুণ বেদনা অনুভব করিল। সে যখন শুনিল যে, ভলজীন তাহার পিতা নহে, সে তাহার খুল্লতাতমাত্র, তখন সে মনে বড়ই কষ্ট পাইল। কিন্তু সে কষ্ট বড় বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। শরতের মেঘখণ্ডের মত অতি অল্পকালের জন্য আকাশে দেখা দিয়া তখনই আবার মিলাইয়া গেল। চারিদিকে হাসির আলোকরেখা ফুটিয়া উঠিল। কসেট যে এখন মেরিয়াসকেই পাইয়াছে! বৃদ্ধ ভলজীন রঙ্গমঞ্চ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যুবক মেরিয়াস আসিয়া সেই শূন্য স্থান দখল করিয়া লইল। জগৎই এইরূপ! সংসারেরই এই গতি! তাহার উপরে আবার কসেট তাহার শৈশবকাল হইতেই এই রহস্য-জালের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ-ভাবে জড়িত দেখিয়া আসিতেছে। এই অজানিত-পূর্ব্ব তত্ত্ব-প্রকাশে সে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইল না। কিন্তু সে ভলজীনকেই পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে বিরত হইল না।

ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

—:*:—

মেরিয়াসের উদ্বেগ।

বিবাহের দিন নিকটে আসিতে লাগিল। প্রণয়ি-যুগলের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইতে লাগিল। কসেট ভলজীনকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যহই দুইবার একবার করিয়া জিল-নরম্যাণ্ড ভবনে মেরিয়াসের সহিত দেখা করিতে আসিতেন। মেরিয়াসও ফকলে-ভেণ্টের জীবনে একটা রহস্যের আভাস পাইলেন। কিন্তু বৃদ্ধের সস্মিত মুখ, সরল আলাপন ও কসেটের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ—এই সকল বিষয় যুগপৎ স্মরণ-পথে পতিত হইয়া মেরিয়াসকে ফকলেভেণ্ট সম্বন্ধীয় রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস হইতে বিরত করিত।

যুদ্ধক্ষেত্রে মেরিয়াস কি বাস্তবিক ফকলে-ভেণ্টকেই দেখিয়াছিলেন?—না, এই দীর্ঘকাল-ব্যাপী পীড়ার যন্ত্রণায় তাঁহার মানসিক বিকৃতি ঘটিয়াছে এবং তজ্জনিত তাঁহার স্মৃতিতে একটা আংশিক শূন্যতা আনয়ন করিয়াছে?

কখনও কখনও মেরিয়াস দুই হাতে মুখ চাপিয়া তাঁহার স্মৃতির সমস্ত আলোক-রেখাগুলি এক কেন্দ্রীভূত করিয়া সেই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রের অতীত ঘটনানিবহ তাঁহার মানস-পটে যথাযথভাবে চিত্রিত করিবার জন্য বহুল চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রয়াসই নিষ্ফল হইত।

একদিন মেরিয়াস কৌশলে ফকলেভেণ্টের নিকট

হইতে জেরায় দুই চারিটা কথা বাহির করিয়া লইয়া এই বিষয়ের একটা মীমাংসা করিবার ইচ্ছা করিলেন। বিপ্লবকারীদিগের খণ্ডযুদ্ধের স্থান ছিল পারিস সহরের রু-দে-লা-সান-ভ্রেরি নামক রাজপথ। মেরিয়াস তাঁহার দলবল লইয়া এই ষ্ট্রীটের মুখে যুদ্ধ করিতেছিলেন এবং সেই স্থানেই তিনি আহত হইয়াছিলেন।

একদিন কথায় কথায় মেরিয়াস হঠাৎ ফকলেভেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি রু-দে-লা সান্-ভ্রেরি ষ্ট্রীটটি বেশ ভালরকম চিনেন?"

"ঐ ষ্ট্রীট চেনা ত দূরের কথা, তাহার নাম আমি সর্ব্বপ্রথমে তোমার কাছে শুনিলাম।"

মেরিয়াসের আর ঐ প্রসঙ্গে অধিকদূর অগ্রসর হইবার অবসর হইল না। তিনি ভাবিলেন—নিশ্চয় আমারই ভ্রম। আমি যে মস্তিষ্কে ভীষণ আঘাত পাইয়াছিলাম, তাহা হইতেই আমার স্মৃতিশক্তি এইরূপ বিকৃত হইয়াছে!

সুখময় ভবিষ্যৎ-কল্পনায় মেরিয়াসের দিনগুলি বেশ আনন্দে কাটিতে লাগিল। যতই দিন নিকট হইতে লাগিল, বিবাহের আয়োজন ততই আগ্রহ, ঔৎসুক্য ও আড়ম্বরের সহিত হইতে লাগিল। কবে সেই সুখময় দিন আসিবে, মেরিয়াস উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহারই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তবে যে মেরিয়াস এই রমণীয় ভবিষ্যৎ কল্পনায় সুদূর অতীতের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি দুই জন লোকের নিকট কৃতজ্ঞতার অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ; ইহার প্রথম থেনার্ডিয়ার—যিনি তাঁহার পিতার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। দ্বিতীয়—সেই অজ্ঞাতনামা নিঃস্বার্থপর বীর, যাঁহার অনুকম্পায় মেরিয়াস এখনও জীবিত রহিয়াছেন। এই দুই জন দেবোপম মানবকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য মেরিয়াস ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সমাজের চক্ষে পৃথিবীর আর সকলের নিকট দস্যু নরঘাতক থেনার্ডিয়ার ঘৃণিত হইলেও মেরিয়াসের নিকট সে দেবতার ন্যায় বরেণ্য—কারণ, সে তাঁহার পিতার জীবন-দাতা। থেনার্ডিয়ারকে খুঁজিয়া বাহির করিতে মেরিয়াস চেষ্টার ক্রটি করিলেন না বটে; কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা কোনমতেই ফলবতী হইল না। থেনার্ডিয়ারের অনুসন্ধানকল্পে অতি সূক্ষ্ম সূত্র-মাত্রও পাওয়া গেল না মেরিয়াসের নিজের জীবন যে মহানুভবের অনুগ্রহে রক্ষিত হইয়াছে—সে যে কে,—তাহা সহস্র চেষ্টাতেও স্থিরীকৃত হইল না। মেরিয়াস এই দুই জনকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

—:*:—

বিবাহ।

আজ ১৬ই অক্টোবর—মেরিয়াস ও কসেটের বিবাহ-রজনী।

সমস্ত দিন টিপ্-টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সন্ধ্যার পরই বৃষ্টি ধরিয়াছে। আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়াছে।

সংসারে অবিচ্ছিন্ন সুখ কোথায়? এই নব-দম্পতীর শিরে পরমেশ্বরের অজস্র আশীর্ব্বাদরাশি-বর্ষণ সত্ত্বেও তাঁহারা যেন তাঁহাদের জীবন-আকাশে একখণ্ড কাল মেঘের ছায়া দেখিয়া একটু শঙ্কিত হইলেন।

বিবাহ-আসরে এবং বিবাহ-ভোজে ভলজীনকে কেহই দেখিতে পাইল না। বর-কন্যার হৃদয় আজ আনন্দে পূর্ণ! ভলজীনের অনুপস্থিতি যে বড় একটা কেহ অনুভব করিল, তাহা বোধ হয় না। বিশেষ ভলজীন খবর পাঠাইয়াছেন যে, তাঁহার দক্ষিণ-হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে দরজার চাপ লাগিয়া, তিনি একটু আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই আঘাতটি এখন অতিরিক্তমাত্রায় যন্ত্রণা-দায়ক হইয়াছে এবং চিকিৎসক সেই আঘাত-প্রাপ্ত অঙ্গুলি লইয়া চলাফেরা করিতে নিষেধ করায়, তিনি এই শুভ-কার্য্যে যোগদান করিতে পারিলেন না।

একদিকে যখন মহাসমারোহে এই বিবাহ-ব্যাপার সংঘটিত হইতেছিল—তখন ভলজীন কি করিতেছিলেন?

ভলজীনের হৃদয় আজি ঘন কৃষ্ণ মেঘাচ্ছন্ন! তিনি আজ একটু অন্য দিনের অপেক্ষা অধিক চিন্তিত।

ভলজীনের কক্ষের দ্বার অর্গলবদ্ধ। তাঁহার টেবিলের উপর সামাদানে একটিমাত্র প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা কক্ষটিকে অস্পষ্টভাবে আলোকিত করিতেছে। ভলজীন করতলে কপোলবিন্যাসপূর্ব্বক উপবিষ্ট। তাঁহার ললাট কুঞ্চিত, মুখশ্রী চিন্তারেখাঙ্কিত।

সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ভলজীন সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পকেট হইতে একটি চাবীর গুচ্ছ বাহির করিয়া, তাহার একটির সাহায্যে কাপড়ের আলমারী খুলিলেন এবং তাহার মধ্য হইতে কতকগুলি ছিন্ন জীর্ণ পুরাতন বালিকার পরিচ্ছদ বাহির করিলেন—একটি কাল মখমলের ফ্রক্, একটি মলিন লিনেনের 'এপ্রণ্', একজোড়া তলা-পুরু শক্ত ভারী জুতা, একজোড়া ছিন্ন মোজা, একখানি রুমাল। দশ বৎসর পূর্ব্বে, যে দিন ভলজীন মটফারমিল হোটেলের রাক্ষস থেনার্ডিয়ারের হস্ত হইতে কসেটকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসেন, সেই দিন তিনি কসেটকে যে পোষাকে সজ্জিত করিয়া লইয়া আসেন—এইগুলি সেই পরিচ্ছদ। পরিচ্ছদগুলি সমস্তই বিবর্ণ, মলিন ও ব্যবহার-জীর্ণ; কিন্তু ভলজীন সেগুলিকে মূল্যবান্ দ্রব্যের ন্যায় অতি সাবধানে আলমারীতে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন।

পোষাকগুলিকে বাহির করিয়া ভলজীন ফ্রক্টিকে সস্নেহে বার বার চুম্বন করিলেন এবং সেগুলিকে বিছানার উপর সাজাইয়া নির্নিমেষ নয়নে সেগুলিকে দেখিতে লাগিলেন!

দশ বৎসর পূর্ব্বের সেই লুপ্ত স্মৃতি ভলজীনের নিকট বর্ত্তমানের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল, এই মুহূর্ত্তে বুঝি তিনি সেই অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা কসেটের হাত ধরিয়া মটফারমিল হইতে পারিসের পথে পদব্রজে চলিতেছেন—কসেটের মুখখানি স্বাধীনতা-জনিত আনন্দে উৎফুল্ল, তাহার কক্ষে একটি বড় পুতুল—তাহার পকেটে ভলজীন-দত্ত একটি সুবর্ণমুদ্রা। বালিকা হাস্যমুখী।

পলিত-কেশ বৃদ্ধ ভলজীন বিছানায় পড়িয়া, বালিসে মুখ লুকাইয়া বালকের ন্যায় ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ভলজীন তাঁহার হৃদয়ের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু আজিকার সংগ্রামই তাঁহার শেষ সংগ্রাম। সর্ব্বপ্রথমেই ভলজীনের মনে এক অতি জটিল প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। কসেটের সুখই তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। মেরিয়াসের সহিত পরিণয়ে আজ কসেট সৌভাগ্যাকাশের উচ্চতর স্তরে অধিরূঢ়া। ভলজীনের হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে যে কামনার বীজ উপ্ত ছিল, আজ তাহা অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত। ভলজীনের নৈরাশ্য-তপ্ত নিশ্বাসে সেই মুঞ্জরিতা লতা কেন শুষ্ক হইয়া যাইবে?

কসেট মেরিয়াসকে চাহিয়াছে—সে তাহাকে পাইয়াছে। মেরিয়াস কসেটকে ভালবাসিয়াছে—কসেট সে ভালবাসার প্রতিদান মেরিয়াসকে দিয়াছে। তাহাদের উভয়েরই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। অধিকন্তু তাহারা প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছে। ভলজীনের কর্ত্তব্য পালিত হইয়াছে। এই অনন্ত সুখ ও এই অনির্ব্বাচ্য শান্তির রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছে কে?—ভলজীন। কিন্তু সে রাজ্যে বাস করিবার অধিকার কি তাঁহার আছে?

কসেট এক দিন ভলজীনেরই ছিল—কিন্তু আজ সে মেরিয়াসের। ভলজীন তো নিজ হস্তেই তাঁহার বক্ষঃপঞ্জরের এই অস্থিখানি খুলিয়া মেরিয়াসকে দিয়াছেন, তবু এখনও কেন তিনি সেই পুরাতনী স্মৃতিটুকুকে আঁকড়িয়া ধরিবার নিষ্ফল-চেষ্টা করিতেছেন?

ভলজীন পুলিস কর্ত্তৃক অন্বেষিত, পশ্চাদ্ধাবিত, কারাদণ্ডে দণ্ডিত, সমাজের চক্ষে ঘৃণিত, পতিত কয়েদী—আর এই দুইটি যুবক-যুবতী সংসারানভিজ্ঞ, সরল-হৃদয়, প্রাণময়, পবিত্রতাময়। কেন ভলজীন তাঁহার কালিমাময় ভাগ্য ইঁহাদের উজ্জ্বল ভাস্বর সৌভাগ্যের সহিত একসূত্রে গ্রথিত করিয়া দিবেন? এই নবপরিণীত দম্পতীর শুভ্র নির্ম্মল হস্ত কেন তিনি তাঁহার পঙ্কিল হস্তে টানিয়া লইবেন?

ভলজীন দেখিলেন যে, দুইদিক্ রক্ষা হয় না। তাঁহাকে কসেটের মায়া কাটাইতে হইবে। আর আত্মগোপনের আবশ্যকতা নাই। আর প্রবঞ্চনার মুখোসের প্রয়োজনীয়তা নাই।

এই দুর্ব্বিষহ চিন্তার জ্বালায় ভলজীন সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন; তিনি সমস্ত রাত্রি বসিয়াই কাটাইলেন। তাঁহার চক্ষে নিদ্রার লেশমাত্র আসিল না। তিনি কসেটের সেই পরিত্যক্ত ছিন্ন পরিচ্ছদটিকে বার বার চুম্বন করিলেন।

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

আমি কসেটের কে ?

পরদিন বেলা দ্বি-প্রহরের পূর্ব্বে ভলজীন মসিও জিল-নরম্যাণ্ডের আলয়ে মেরিয়াসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। মেরিয়াস তখনও তাঁহার শয়নকক্ষ পরিত্যাগ করেন নাই।

ভৃত্য বাস্‌ক্ আসিয়া ভলজীনকে বৈঠকখানায় উপবেশন করিতে বলিয়া, ব্যারণ ও ব্যারণেস্ পণ্টমারসির নিকট মসিও ফক্‌লেভেণ্টের আগমন-বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিতে গেল। মেরিয়াস তাড়াতাড়ি চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া শ্বশুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

মেরিয়াস কহিলেন, "আসুন পিতা! কল্য সকলেই আমরা আপনার অনুপস্থিতির জন্য অত্যন্ত দুঃখিত ছিলাম। আপনার হাতের ব্যথাটা কেমন আছে? কমিয়াছে কি?"

ভলজীন একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন এবং মেরিয়াসকেও বসিতে অনুরোধ করিলেন।

মেরিয়াস একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "পিতা! আর আপনার কোন অজুহাতই আমরা শুনিব না—আপনাকে ঐ বাসা ছাড়িয়া দিয়া, আমাদের বাড়ীতেই আসিয়া থাকিতে হইবে। দাদা মহাশয় আপনাকে সঙ্গিরূপে পাইলে কত খুসী হইবেন। কসেটেরও আপনাকে ছাড়িয়া থাকিতে বড় কষ্ট হইবে। আপনাকে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া থাকিতেই হইবে।"

ভলজীন চিন্তাকুলিতভাবে কহিলেন, "ব্যারণ পণ্টমারসি! আপনি যে সম্মান আমাকে দিতে চাহিতেছেন, আমি তাহা পাইবার নিতান্ত অনুপযুক্ত—আমি এক জন কারা পলায়িত কয়েদী!"

বিশ্বাসের একটা সীমা আছে—মেরিয়াস তাঁহার শ্বশুরের এই খামখেয়ালি কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন।

জন্ ভলজীন যে রুমালের বন্ধনে তাঁহার দক্ষিণ-হস্ত কণ্ঠের সহিত ঝুলান ছিল, বাম-হস্তে ধীরে ধীরে সেই রুমালখানি খুলিলেন। তাঁহার অঙ্গুষ্ঠে যে নেকড়া জড়ান ছিল, তাহাও খুলিয়া ফেলিয়া মেরিয়াসকে কহিলেন, "দেখুন মসিও লি ব্যারণ! আমার অঙ্গুষ্ঠে আঘাতের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্য এই যে, আপনার বিবাহ-ভোজ হইতে আমি দূরে থাকিব। কারণ, আপনার বিবাহের দলীল-পত্রে আমার স্বাক্ষর থাকিলে তাহা অপ্রামাণিক-রূপে গণ্য হইবার সম্ভব এবং বিবাহও অসিদ্ধ বলিয়া ধার্য্য হইতে পারিত।"

মেরিয়াস হতবুদ্ধির ন্যায় কহিলেন, "এ সকলের অর্থ কি?"

ভলজীন কহিলেন, "এ সকলের অর্থ এই যে—আমি এক জন কারাদণ্ডে দণ্ডিত দাগী আসামী।"

এই কথা শুনিয়া মেরিয়াস শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

পূর্ব্ববৎ স্থিরস্বরে ভলজীন কহিলেন, "মসিও পণ্টমারসি! আমি উনিশ বৎসর জেল খাটিয়াছি। অধুনা আমি কারাপলায়িত কয়েদী।"

যদিও মেরিয়াস ভলজীনের কথাগুলি অবিশ্বাস্য বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন, যদিও তিনি ভলজীন কর্ত্তৃক উপস্থাপিত প্রমাণগুলিকে নিঃসংশয়িত বলিয়া গ্রাহ্য করিতে ইচ্ছা করিলেন না, তবুও তিনি সহসা এই কঠোর সত্যটির সম্মুখে পড়িয়া, মানুষ কালসর্পের সম্মুখীন হইলে যেমন চমকিয়া উঠে, সেইরূপ শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার নিজের ভবিষ্যজ্জীবনাকাশে একখণ্ড ক্ষুদ্র কাল মেঘের ছায়া তিনি দেখিতে পাইলেন। তিনি উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বলুন—যদি প্রকাশ করিলেন, তবে সমস্ত রহস্যটুকু ভাঙ্গিয়া বলুন। আপনি কি কসেটের পিতা?"

মেরিয়াস শিহরিয়া, দুই পা পিছাইয়া গেলেন।

ভলজীন তাঁহার দেহ-যষ্টি একটু উন্নত করিয়া ধীর-গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "মহাশয়! আমাদের শপথ আদালতে গ্রাহ্য হয় না। আমার কথা বিশ্বাস করিবেন কি না—জানি না। যদি বিশ্বাস করেন, তবে শুনুন। আমি পরমেশ্বরের দিব্য করিয়া বলিতেছি যে, আমি কসেটের পিতা নহি। ব্যারণ

পণ্টমারসি, কসেটের সহিত আমার কোন সম্বন্ধই নাই।"

জড়িত স্বরে মেরিয়াস কহিলেন, "তাহা প্রমাণ করিবে কে?"

ভলজীন কহিলেন, "আমি—আমার কথা কি আপনি বিশ্বাস করিতেছেন না?"

মেরিয়াস একবার স্থির-দৃষ্টিতে ভলজীনের আপাদ-মস্তক দেখিয়া লইলেন। ভলজীনের মুখের ভাব কঠোর-যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক; কিন্তু স্থির, গম্ভীর। তাহার মধ্যে মিথ্যা স্থান পাইতে পারে না।

মেরিয়াস কহিলেন, "আমি আপনার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

ভলজীন মেরিয়াসের কথায় যেন একটু তৃপ্ত, একটু আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, "আমি কসেটের কে? —সংসারের পথে ক্ষণিকের তরে মিলিত সহযাত্রী পথিক বই ত নয়! দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি তাহার অস্তিত্বই অবগত ছিলাম না। আমি তাহাকে ভাল-বাসি—সত্য। সে কিরূপ ভালবাসা? যাহারা পুত্র-কলত্রহীন বৃদ্ধ, জগতের সমস্ত শিশুকেই তাহারা আপনার পুত্রকন্যা-জ্ঞানে ভালবাসে। কসেটের প্রতি আমার ভালবাসাও ঠিক তাই। এই পিতৃমাতৃহীনা অনাথিনী বালিকাকে আমি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। জানি না, কোন্ আকর্ষণে, কোন্ মোহে, তাহাকে নিতান্ত আপনার জ্ঞানে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া লালন-পালন করিয়াছিলাম। কিছু কাল একসঙ্গে একই রাস্তায় চলিয়া আসিয়া এখন দেখিতেছি যে, আমাদের গন্তব্য স্থান ভিন্ন। আমার পথ এক—কসেটের পথ অন্য। এইখানেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হওয়া আবশ্যক। আজ হইতে কসেট ব্যারণেস পণ্ট-মারসি—আমি আজি হইতে সেই ভীষণ দস্যু জন্ ভলজীন।"

ভলজীন একটু থামিলেন এবং এক মুহূর্ত্তের জন্য একটু চিন্তা করিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "হাঁ—ঐ ছয়লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক,যাহা কসেট বিবাহের যৌতুক পাইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আপনাকে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। মসিও মেরিয়াস! ঐ প্রভূত ধনের এক কপর্দ্দকও অসদুপায়ে অর্জ্জিত নহে। কসেট কিংবা আপনি সে সম্বন্ধে তিলমাত্র দ্বিধা করিবেন না। আমার নিকট ঐ সম্পত্তি গচ্ছিত ছিল মাত্র। আজি আমি আমার উপর ন্যস্ত বিশ্বাসের সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছি বলিয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি। অপরদিকে, এতদিন আমার বিবেক এক অতি গুরুভারে নিষ্পেষিত হইতেছিল। আপনার নিকট আমার আসল নাম ব্যক্ত করায় যেন সে ভার অনেকটা লঘু হইয়াছে।"

ভলজীন একটু স্থির-দৃষ্টিতে মেরিয়াসের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার এই রহস্য-প্রকাশে মেরিয়াসের হৃদয়ে কিরূপ ভাবান্তর হয়, সেইটুকু লক্ষ্য করাই যেন তাঁহার উদ্দেশ্য। মেরিয়াস নির্ব্বাক্, হত-বুদ্ধি, স্তম্ভিত। সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া তিনি কহিলেন, "আমার নিকট এ সকল কথা কেন বলিতেছেন? আমি তো আপনার সম্বন্ধে কোন কথাই জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছি না। এ সকল রহস্য প্রকাশ করিবার কোন প্রয়োজনীয়-তাও আমি দেখিতেছি না পুলিস কিংবা গোয়েন্দা আপনার পিছনে লাগে নাই। কেহ আপনার এই সকল রহস্য প্রচার করিয়া আপনাকে অবমানিত করিবার চেষ্টা করিতেছে—এরূপও আমার বোধ হয় না। তবে কেন আপনি এই নিষ্প্রয়োজন প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া, আমাদের চক্ষে, জগতের নিকটে নিজেকে নামাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন?"

ভলজীন কহিলেন, "মসিও মেরিয়াস! পুলিস কিংবা গোয়েন্দা আমার জীবনকে বিড়ম্বিত করিতেছে না সত্য, কিন্তু আমার নিজের বিবেকই আমাকে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা দিতেছে, আমার জীবনকে দুর্ব্বহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। মনুষ্যের হস্ত মনুষ্যকে যত কঠোর-ভাবে শাস্তি দিতে পারে, বিবেক তাহা অপেক্ষা সহস্র-গুণে অধিকতর যন্ত্রণা-দায়ক শাস্তি নিজের উপর ব্যবস্থা করিয়া থাকে। বিবেকের শক্তি অপরিমেয়, কার্য্য অদ্ভুত। মসিও মেরিয়াস, আপনি যদি জীবনে সুখী হইতে চাহেন, তবে কর্ত্তব্য জিনিসটা কি,—তাহা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করি-বেন না। কারণ, যখনই আপনি সেই বহুরূপীর বেশধারী দেবতাকে তাঁহার আসল মূর্ত্তিতে দেখি-বেন, তখনই জানিবেন যে, তিনি আসিয়া আপনার হৃদয় জুড়িয়া বসিলেন। তখনই আপনি মানবের চক্ষে বড়ই অসুখী জীব বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে লাগি-লেন। কিন্তু না—বাস্তবিক তাহা নয়। আপনি যে মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্যকে চিনিবেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আপনাকে আত্মসুখ, আত্মাভিমান, এক কথায়,

স্বার্থকে বলি দিতে হইবে,—সত্য ; আপনাকে যন্ত্রণার অনন্ত নরককে নিক্ষিপ্ত হইতে হইবে—সত্য , কিন্তু মসিও মেরিয়াস ! সেই যন্ত্রণায় কত সুখ—কত আনন্দ ! আপনি ঈশ্বরের কোলে মাথা রাখিয়া সেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া থাকিতে পারিবেন।"

এই কথা বলিতে বলিতে ভলজীনের কণ্ঠ যেন শুষ্ক হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি ঢোক গিলিয়া লইয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "মসিও ! যখন আমারই অন্তর্নিহিত অন্তরাত্মা আমাকে এত কষ্ট দিতেছে, তখন কেন আমি আর আত্মগোপন করিয়া নিজে কষ্ট পাইব, আপনাদিগকে কষ্ট দিব ? ফকলেভেণ্ট তাহার নাম আমাকে কর্জ্জ দিয়াছে—কিন্তু সে ঋণ গ্রহণ করিবার শক্তি আমার কোথায় ? মসিও মেরিয়াস ! আমার বিবেচনায়, নামে এবং মানুষে কোন প্রভেদ নাই। নামই মানুষ—মানুষই নাম। সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া, প্রবঞ্চনার মুখোস পরিয়া জালমূর্ত্তিতে পরিচিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু লক্ষগুণে শ্রেয়স্কর। সমস্ত জীবন ধরিয়া একটি জীবন্ত মিথ্যাচারিরূপে তাহারই সাহায্যে চোরের মত নিঃশব্দে শঙ্কিত হস্তে সততার তালা খুলিয়া সৎলোকের মধ্যে মিশিতে যাওয়া, মানুষের মুখের দিকে বক্র-দৃষ্টিতে ছাড়া পূর্ণভাবে চাহিতে অসমর্থ হওয়া যে কষ্টকর, তাহা আপনাকে কি করিয়া বুঝাইব, মসিও মেরিয়াস ? না—না—তাহা অপেক্ষা অনন্ত নরকভোগও ভাল। তাহা অপেক্ষা নিজের নখ দিয়া নিজের মাংস ছিঁড়িয়া আনাও কম কষ্টকর। তাহা অপেক্ষা নিজের মাংস, অস্থি, মজ্জা, আত্মা, নিজ দন্তে চর্ব্বণ করাও অল্প যন্ত্রণা-দায়ক। মসিও মেরিয়াস ! সেই জন্য আপনার নিকট সাধিয়া আত্মনিবেদন করিতে আসিয়াছি।"

ভলজীন যেন অতি কষ্টে শ্বাস-প্রশ্বাস লইতেছিলেন। মেরিয়াস কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন।

ভলজীন আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "মসিও মেরিয়াস ! বোধ হয়, এখন আপনার বুঝিতে বাকী নাই যে—কেন আমি আপনার নিকট আমার রহস্য প্রকাশ করিলাম। আশীর্ব্বাদ করি—আপনারা সুখী হউন—যে মায়া আমাকে এতদিন জগতের সহিত কঠিন নাগপাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল —আজ আমার সেই পাশ ছিন্ন হইয়াছে। কসেট এখন ব্যারণ মেরিয়াসের গৃহিণী। সে এখন সুখী। যাহা হউক, মসিও মেরিয়াস ! আপনার নিকট আমার এই শেষ অনুরোধ—রক্ষা করিবেন কি ? কসেটের নিকট এই সকল কথা কিছুই প্রকাশ করিবেন না। কারণ, পুরুষের হৃদয় ভার-বহনে সমর্থ—নারীর হৃদয় কোমল ; অতি সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। বাস্তবিক মসিও মেরিয়াস ! এই মুহূর্ত্তে আমার প্রধান চিন্তাই এই যে—কসেট এই কথা জানিলে, তাহার মনে কি হইবে ? বালিকার হৃদয় কি সে আঘাত সহ্য করিতে পারিবে ?"

মেরিয়াস কহিলেন,—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কসেট কেন,—পৃথিবীর অন্য দ্বিতীয় ব্যক্তি এই কথা আমার নিকট হইতে জানিতে পারিবে না।"

ভলজীন কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমি সমস্ত কথাই এক রকম বলিয়াছি। একটি শেষ কথা—কসেটের সহিত আর এখন আমার সাক্ষাৎ হওয়া অভিলষণীয় নহে। চক্ষুই মানবের প্রধান শত্রু। সেই শত্রুকে যখন পরাজিত করিবার শক্তি আমার নাই, তখন প্রলোভনের নিকট হইতে পলায়নই মঙ্গল। আশীর্ব্বাদ করি, আপনারা সুখী হউন।"

ভলজীন আর কিছু না বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় টলিতে টলিতে বাটী হইতে বাহির হইলেন। মেরিয়াসও উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। ভলজীনের যথেচ্ছগমনে বাধা দিবার সাহস তাঁহার হইল না।

দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

—:*:—

মায়ার বন্ধন।

ভলজীন মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু তাহা পারিলেন কই ?

উল্লিখিত পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পরে ভলজীন আর জিল-নরম্যাণ্ডের বাটীতে পদার্পণ করিলেন না —কিন্তু কসেটকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে সামর্থ্য তাঁহার হইল না। নয়নের পথে যে সাধ তৃপ্ত হইল না, হৃদয়ের পথে তিনি সেই সাধ মিটাইতে

চেষ্টা করিলেন। কসেটের চিন্তায় ভলজীনের আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিতে হইল।

ভলজীন এক এক দিন মধ্যরাত্রিতে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া পাগলের ন্যায় ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইতেন। বরাবর জিল-নরম্যাণ্ডের আবাসের নিকট উপস্থিত হইয়া পথিপার্শ্বস্থ কোনও খোলা বোয়াকে বসিয়া একদৃষ্টে কসেটের শয়নকক্ষের বাতায়ন-পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন। মুক্ত বাতায়ন-পথে বেডরুম-ল্যাম্পের যে ক্ষীণালোকটুকু দৃষ্ট হইত, ভলজীন মুগ্ধনেত্রে উদাসভাবে তৃষিতের মত তাহাই দেখিতেন।

প্রভাতে, যখন রাস্তায় লোক-চলাচল আরম্ভ হইত, ভলজীন তখন চোরের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া প্রচ্ছন্নভাবে বাড়ী ফিরিতেন—যেন তিনি কি একটি ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন।

এ দিকে, কসেট তাহার আনন্দময় বর্ত্তমান ও অধিকতর সুখময় ভবিষ্যৎ-স্বপ্নের অগাধ সমুদ্রে পড়িয়া যেন ক্রমে ভলজীনের কথা ভুলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন।

মেরিয়াস কসেটকে লাভ করিয়া অবশ্য আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইলেন; কিন্তু সেই আনন্দের মধ্যে দুইটি চিন্তা তাঁহাকে একটু উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। প্রথম, থেনার্ডিয়ারের সন্ধান। দ্বিতীয় তাঁহার নিজের জীবনরক্ষা-কর্ত্তার অন্বেষণ।

ত্রিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

—:*:—

সন্ধান মিলিল।

এক দিন সন্ধ্যাকালে মেরিয়াস সবে-মাত্র সান্ধ্য-ভোজন সমাপন করিয়াছেন, এই সময়ে পরিচারক বাসক্ একখানি পত্র আনিয়া তাঁহার হস্তে দিয়া কহিলেন যে, পত্র-বাহক বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন এবং মসিও লি ব্যারণের আদেশ অপেক্ষা করিতেছেন।

মেরিয়াস পত্রখানি হাতে লইবামাত্র—তাহা হইতে একটি উৎকৃষ্ট তাম্রকূট-গন্ধ তাঁহার নাসিকায় প্রবেশ করিল। সেই গন্ধের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি বিষাদময়ী স্মৃতি মেরিয়াসের হৃদয়ে জাগরূক হইল। মেরিয়াস শিরোনামটি পাঠ করিলেন। সেই হস্তাক্ষরও তাঁহার পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। স্মৃতির ঐন্দ্রজালিক দণ্ড-আন্দোলনে স্বপ্নের মত বিভীষিকা পরিপূর্ণ জনড্রেট-কক্ষ তাঁহার নয়ন-সমক্ষে বিশদরূপে প্রকটিত হইল।

মেরিয়াসের শরীরমধ্যে যেন তড়িৎ প্রবাহিত হইয়া গেল। যে দুইটি বিষয়ের সূত্রানুসন্ধানে মেরিয়াস এত উৎকণ্ঠিত, তাহার অন্যতরটি বুঝি ভগবান্ মিলাইয়া দিলেন। মেরিয়াস তাড়াতাড়ি খামখানি খুলিয়া পত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পত্রে লেখা ছিল:—

"মসিও লি ব্যারণ।

ঈশ্বরের বিচারে যদি ন্যায়পরতার লেশমাত্র থাকিত, তাহা হইলে আজ আমি 'ব্যারণ থেনার্ড'-রূপে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতাম। কিন্তু ভগবানের অবিচারে আমি পদগৌরব-হীন নগণ্য থেনার্ড মাত্র। যাহা হউক, আমি যে প্রয়োজনে অধুনা আপনার সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিতেছি, তাহা আমার এবং আপনার উভয়েরই মঙ্গলের জন্য। আমি একজনের বিষয়ে কতকগুলি রহস্য অবগত আছি। সে লোকটির সহিত আপনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়াছে। এই লোকটি সর্পের ন্যায় অতর্কিতভাবে আসিয়া আপনার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। সে একদিন সর্পের ন্যায় আপনাকে দংশন করিবে। সেইজন্য আপনাকে সাবধান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য-জ্ঞানে আপনার সহিত কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আলাপ করিতে চাই—ইতি,

বিনীত
থেনার্ড।"

পত্রখানি পাঠ করিয়া এবং লেখকের রহস্যময় লিখন-ভঙ্গী, ছন্দোবন্ধ ও ভাবভাষা দেখিয়া মেরিয়াস একটু সন্দেহাকুলিত হইলেন এবং ভৃত্যকে কহিলেন, "লোকটিকে ভিতরে লইয়া আইস

লোকটি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র মেরিয়াস যেন একটু নিরাশ ও বিস্মিত হইয়া গেলেন। তিনি যাহার কথা মনে করিতেছিলেন, এ তো সে লোক নহে। এ লোকটি যে মেরিয়াসের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। আগন্তুক বৃদ্ধ। তাহার কেশ পক্ব। নাসিকা অতিরিক্ত মাত্রায় উন্নত। চক্ষে একজোড়া

সবুজরঙের চশমা; তাহার উপর সবুজ-সিল্কের আচ্ছাদন। তাহার কেশগুলি অতি যত্নে "পেটো পাড়ান" এবং তদ্দ্বারা ললাটের উপরিভাগ ঢাকা। তাহার পরিধানে একটি কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদ। তাহার হস্তে একটি জীর্ণ মলিন ফেল্ট হ্যাট্‌। আগন্তুকের সুঠাম চেহারা এবং পরিচ্ছদ-পারিপাট্য দেখিয়াই মেরিয়াসের প্রথম সাক্ষাৎ-মুহূর্ত্তের সেই বিস্ময়ের-ভাবটুক্‌ অবজ্ঞায় পরিণত হইল। আগন্তুক কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া মেরিয়াসকে একটি প্রকাণ্ড সেলাম করিয়া সসম্ভ্রমে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। মেরিয়াস সেই সময় একবার তাহার আপাদমস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?"

আগন্তুক কহিল, "মসিও লি ব্যারণ! অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমার কথা কয়টি শুনুন। আমেরিকা ভূখণ্ডে পানামা যোজকের নিকটে লা-জয়া নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই গ্রামের সমগ্র অধি-বাসিগণ একসঙ্গে মিলিয়া একখানি বাটীতে বাস করে। এই গ্রামে একটির অধিক বাড়ী নাই। এই বাড়ীখানি ত্রিতল এবং ইষ্টক-নির্ম্মিত। বাড়ীটি সম-চতুষ্কোণ। এই চতুর্ভুজের প্রত্যেক বাহু পাঁচ-শত ফীট দীর্ঘ। এই বাড়ীতে প্রবেশের দ্বার কেবলমাত্র একটি। জানালা আদবেই নাই; ভিত্তিগাত্রে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র। এই সকল ছিদ্রপথে দিবারাত্রি বন্দুক লাগান থাকে। এই গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা আট শত। তাহারা সক-লেই অস্ত্র-ধারণে ও বন্দুক-চালনে সমর্থ ও অভ্যস্ত। তাহার কারণ কি? কারণ এই যে, এখানকার অসভ্যগণ নরমাংসভোজী এবং হিংস্র শ্বাপদের অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। তবে সেখানে লোক যায় কেন? মসিও লি ব্যারণ!—সেখানে লোক যায় এই জন্য—সেখানে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়।"

মেরিয়াস অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল কথা আমার নিকট অবতারণা করার অর্থ কি?"

আগন্তুক কহিল, "ইহার অর্থ এই যে—মসিও লি ব্যারণ! আমি এই ব্যাহ্য চাকচিক্যশালী রাংতা-মোড়া আধুনিক সভ্যতার উপর হাড়ে চটিয়া গিয়াছি।"

মেরিয়াস কহিলেন, "ভূমিকা ছাড়িয়া দিয়া আসল কথা বলুন!"

আগন্তুক কহিল, "আসল কথা এই যে—মসিও লি ব্যারণ! আমি এই লা-জয়াতে যাইয়া বাস করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। আমার স্ত্রী ও একটি সুন্দরী সুশীলা কন্যা আছে। ইহাদিগকে লইয়া যাইবার রাস্তা-খরচ অনেক টাকার দরকার।"

মেরিয়াস অন্যমনস্ক হইয়া কহিলেন, "তাহাতে আমার কি?"

আগন্তুক শকুনির ন্যায় একটু গলা বাড়াইয়া একটু হাসিয়া কহিল, "তাহা হইলে, বোধ হয়, মসিও লি ব্যারণ! আমার পত্রখানি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করেন নাই।"

বাস্তবিকও তাই। মেরিয়াস পত্রখানির উপর একবার চোখ বুলাইয়া গিয়াছিলেন মাত্র। তাহার মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিবার তিনি কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। আগন্তুক কর্ত্তৃক উচ্চারিত—"আমার স্ত্রী ও একটি সুন্দরী কন্যা আছে"—এই কথা কয়টি যেন মেরিয়াসের হৃদয় একটি ক্ষীণ আলোক-রশ্মি-পাতে উজ্জ্বলিত করিল। আগন্তুক কি তাহা হইলে থেনাডিয়ারই! মেরিয়াস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, পরে কহিলেন, "আপনার বক্তব্য যাহা থাকে, অল্প কথায় বলুন।"

আগন্তুক একটু সাহস পাইয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "যে আজ্ঞা—মসিও ব্যারণ! আমি সংক্ষেপেই সারিতেছি। আপনার এক জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সম্পর্কে একটি গূঢ় রহস্য আমি অবগত আছি। সে রহস্য প্রকাশ করিয়া দিলে, সেই লোকটি রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগকেও অবমানিত ও নিন্দার্হ হইতে হইবে! উপযুক্ত মূল্য পাইলে আমি রহস্যটি বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি।"

"আমার সহিত এই রহস্যের কি কোন সম্বন্ধ আছে?"

"আছে—কিন্তু তাহা অতি সামান্য।"

"বেশ!—রহস্যটি কি?—আপনি বলুন।"

"মহাশয়! আপনার বাড়ীতে এক জন দস্যু এবং নরঘাতক আছে। আপনি তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন।"

মেরিয়াস চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "আমার বাড়ীতে?—না।"

আগন্তুক অবিচলিতভাবে কহিল, "হাঁ মহাশয়! আপনার বাড়ীতেই! অন্যথা আমি এত বড় একটা মিথ্যাপবাদের কথা লইয়া আপনার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইতাম না। আমি যাহার কথা বলিতেছি, সে এক জন পুরাণ দাগী আসামী হইলেও তাহার কতকগুলি নূতন পাপ এবং কুক্রিয়া, যাহা জগতে আমি ভিন্ন অন্য কেহ জানে না, তৎসম্বন্ধে কিছু কথা আমি আপনাকে বলিতে আসিয়াছি। সে লোকটির নাম এখনই আপনাকে বলিতেছি এবং তজ্জন্য আমি আপনার নিকট টাকা-কড়ি কিছুই চাহি না।"

মেরিয়াস কহিলেন, "বেশ, বলুন। আমি শুনিতেছি।"

"সে লোকটির নাম—জন্ ভলজীন।"

"আমি তাহা জানি।"

"আপনি হয় ত তাহার নাম জানিতে পারেন, কিন্তু তাহার প্রকৃতি ও চরিত্র-সম্বন্ধে কিছুই জানেন না—। সে এক জন দস্যু ও কারামুক্ত কয়েদী—এক জন দাগী চোর।"

"তাহাও আমি জানি।"

মেরিয়াসের এই ঔদাসীন্য এবং গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ উত্তর শুনিয়া আগন্তুক একটু থতমত খাইয়া গেল এবং মনে মনে সে মেরিয়াসের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। তাহার অন্তরের এই দারুণ জিঘাংসা মুহূর্ত্তের জন্য বিজলীর ন্যায় তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। মেরিয়াসের দৃষ্টিপথ হইতেও তাহা এড়াইল না।

হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া, দস্তুরের হাসি হাসিয়া আগন্তুক আবার বলিতে লাগিল, "আমি আপনার কথায় প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করি না। এইমাত্র যে দুইটি রহস্যের কথা আপনার নিকট প্রকাশ করিলাম, তাহার সহিত আপনার কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই, কিন্তু তাহাই আমার শেষ নয়। আমার কাছে আরও কয়েকটি গুপ্ত সংবাদ পাইবেন, সেইগুলি আপনার জানা প্রয়োজন—সেগুলি ম্যাডাম-লা-ব্যারণ সম্বন্ধে।"

মেরিয়াস সর্প-দষ্টের ন্যায় যন্ত্রণায় শিহরিয়া উঠিলেন।

আগন্তুকের চক্ষু হইতে যেন তড়িতের ন্যায় একটি উজ্জ্বল আলোক বাহির হইয়া মেরিয়াসের ভবিষ্যজ্জীবনের সুখ-শান্তিটুকুকে মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মীভূত ও অঙ্গারে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইল।

আগন্তুক কহিল, "মসিও লি ব্যারণ! এই গুপ্ত রহস্যটির মূল্য আমি বিশ-সহস্র ফ্র্যাঙ্কমাত্র ধার্য্য করিয়াছি এবং সর্ব্বপ্রথমেই আপনাকে আসিয়া ইহার খরিদ্দার হইতে অনুরোধ করিতেছি! আপনি ইহা প্রার্থিত মূল্যে ক্রয় না করিলে তখন আমাকে অন্য ক্রেতার অন্বেষণ করিতে হইবে।"

মেরিয়াস কহিলেন, "তুমি যে কথা বলিবে, তাহা আমি জানি।"

আবার সেই ক্রূর হাসি হাসিয়া আগন্তুক কহিল, "মসিও লি ব্যারণ! আপনি সবই জানেন বলিলে আমরা বাঁচিব কি করিয়া? আপনি সব জানিতে পাবেন, কিন্তু আমি যে কথা বলিতেছি, তাহার বিন্দুবিসর্গ আমি ভিন্ন দ্বিতীয় লোক জানে না।"

মেরিয়াস একটু উদ্ধত-ভাবে কহিলেন, "ভলজীনের বিষয় যাহা তুমি বলিতে আসিয়াছিলে, তাহা যেমন আমার জানা আছে দেখিলে, ম্যাডাম-লা ব্যারণ সম্বন্ধে যাহা বলিতে চাহিতেছ, তাহাও আমি জানি। আরও শুন, দুর্ব্বৃত্ত, রহস্যব্যবসায়ী, হীনচেতা মানব'—তুমি যে কে, তাহাও আমি জানি।"

কিছুমাত্র অপ্রস্তুতের ভাব না দেখাইয়া আগন্তুক কহিল, "সেটা আর বিশেষ কঠিন কি, মসিও লি ব্যারণ? আমার নাম তো আমি পত্রেই স্বাক্ষর করিয়াছি। আমার নাম থেনার্ড।"

মেরিয়াস কহিলেন, "মিথ্যাবাদি! তোমার নাম থেনার্ড নহে—থেনার্ডিয়ার।"

বিপন্ন হইলে সজারুর দেহের কাঁটাগুলি সোজা হইয়া উঠে, গুবরে পোকা হাত-পা এলাইয়া দিয়া মৃত্যুর ভাণ করিয়া পড়িয়া রহে; আগন্তুক কিন্তু হাসিয়া উঠিল। অতি সপ্রস্তুতভাবে তাহার কোটের আস্তিনের উপর হইতে এককণা ধূলি ঝাড়িতে লাগিল।

মেরিয়াস কহিলেন, "শুধু তাহাই নহে—তুমিই সেই শ্রমজীবী জনড্রেট—তুমিই অভিনেতা ফ্যাবাণ্টো—তুমিই কবি জেনফ্লো তুমিই ম্যাডাম বেলিজার্ড—তুমিই সেই মণ্টফারমিলের হোটেলওয়ালা গুণ্ডার সর্দ্দার অকৃতজ্ঞ হৃদয়-হীন পশু থেনার্ডিয়ার।"

"আপনি ভুল ঠাওরাইয়াছেন।"

"জুয়াচোর! ঠক! আমি তোমাকে ঠিক চিনিয়াছি। চিনিয়াছি বলিয়াই আমার ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত হয় নাই। দুষ্ট! এই লও তোমার জুয়াচুরির তোমার গুণ্ডামীর—মূল্য।"

মেরিয়াস এই কথা বলিয়া একটি ছোট আলমারী খুলিলেন; তাহার মধ্য হইতে, হাতের কাছে যাহা পাইলেন—একখানি ব্যাঙ্ক নোট বাহির করিয়া, তাহা কত ফ্র্যাঙ্কের না দেখিয়াই আগন্তকের মুখের উপর সেখানি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। আগন্তক তাড়াতাড়ি সেখানি' উঠাইয়া লইয়া দেখিল যে, সেখানি পাঁচশত ফ্র্যাঙ্ক মূল্যের। নোটখানি ধীরে ধীরে পকেটের মধ্যে রাখিয়া থেনার্ডিয়ার মৃদুস্বরে কহিল, "মোটে পাঁচ শ' ফ্র্যাঙ্ক। যাহা হউক, মসিও লি ব্যারণ! আপনি অত চটিবেন না। আমার বক্তব্য আগে শ্রবণ করুন, পরে আমার সম্বন্ধে যাহা উচিত বিবেচনা হয়, করিবেন।"

এই কথা বলিয়া আগন্তক মর্কটের ন্যায় ক্ষিপ্রহস্তে তাহার ললাটের উপরের "পেটোপাড়া" কেশগুলি উঠাইয়া দিল; নাকের উপর হইতে চশমা যোড়া খুলিয়া লইয়া পকেটে রাখিল এবং মুখ হইতে মুখোসখানি খুলিয়া ফেলিল। আগন্তকের নিজমূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িল—তাহার চক্ষুর্দ্বয় কালসর্পের চক্ষুর ন্যায়, উজ্জ্বল, ললাট বিস্তৃত, নাসিকা খগচঞ্চুর ন্যায়, মুখের ভাব দারুণ নিষ্ঠুরতা ও দুঃসাহসিকতা-ব্যঞ্জক।

মেরিয়াস দেখিয়াই চিনিলেন যে—এই সেই গুণ্ডা জনড্রেট ওরফে থেনার্ডিয়ার।

থেনার্ডিয়ার বহুরূপি-বেশে ব্যারণ পণ্টমারসিকে ঠকাইয়া কিছু আদায় করিবার মতলবে আসিয়াছিল, কিন্তু আপনার চালে, আপনিই মাৎ হইল। সে ঠকাইতে আসিয়াছিল মেরিয়াসকে—ঠকিল নিজে। থেনার্ডিয়ার ঠকিল বটে, কিন্তু সে ঠকিয়াও আপনাকে লাভবান্ই মনে করিল। মেরিয়াসের নিকট পাঁচ শত ফ্র্যাঙ্কের ব্যাঙ্কনোট সে তাহার সেই নিরাশার ও হীনতার মূল্য ধরিয়া লইল। এইরূপ আকস্মিকভাবে ধরা পড়ায় থেনার্ডিয়ার একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে তো ব্যারণ পণ্টমারসিকে জন্মেও কখনও দেখে নাই। তবে ব্যারণ তাহাকে কি করিয়া চিনিলেন?—ইহাই থেনার্ডিয়ারের বিষম সমস্যা!

পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, থেনার্ডিয়ার ওরফে জনড্রেট-পরিবার যদিও বহুদিন মেরিয়াসের পার্শ্বের কক্ষে বাস করিয়াছিলেন, তবুও থেনার্ডিয়ার মেরিয়াসের মুখ পর্য্যন্ত চিনিত না—চিনিবার প্রয়োজনও তাহার হইত না। কারণ, সাহায্যের প্রয়োজন হইলে তাহার কন্যাদ্বয়ই মেরিয়াসের সহিত সাক্ষাৎ করিত। থেনার্ডিয়ার নিজে মেরিয়াসকে কখনও চক্ষেও দেখে নাই। মেরিয়াস ও ব্যারণ পণ্টমারসি যে একই লোক, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। ইহাই তাহার বিস্ময়ের কারণ।

থেনার্ডিয়াকে এইরূপ জব্দ করিয়া, মেরিয়াস বেশ একটু আনন্দ লাভ করিলেন। কিছুক্ষণ নীরবে এই আমোদটুকু উপভোগ করিয়া তিনি কহিলেন, "থেনার্ডিয়ার! আমি তোমার প্রকৃত নাম তোমাকে বলিলাম। এক্ষণে শুনিতে চাহ কি?—তুমি কি রহস্য বিক্রয়ের জন্য এখানে আসিয়াছ? তবে শুন। তুমি আমার নিকট জানাইতে আসিয়াছ যে, জন্ ভলজীন এক জন পাকা জুয়াচোর ও জালিয়াত—কারণ, সে মসিও ম্যাডিলিনের নাম জাল করিয়া লাফিটের ব্যাঙ্কে ম্যাডিলিনের গচ্ছিত প্রভুত অর্থ বাহির করিয়া লইয়া পলাইয়াছিল এবং বিগত ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবে সে বিপ্লববাদীদিগের দলে মিশিয়া ইন্স্পেক্টার জ্যাভার্টকে হত্যা করিয়াছে।"

একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া থেনার্ডিয়ার কহিল, "মসিও লি ব্যারণ! আপনার এই দুইটি সংবাদই মিথ্যা। আমি এখনই তাহা প্রমাণ করিয়া দিতে পারি। ভলজীন যত খারাপ লোকই হউক না কেন, সে জালিয়াত নহে। ম্যাডিলিনের নাম জাল করিয়া ভলজীন ব্যাঙ্ক হইতে টাকা বাহির করিয়া লইয়া পলাইয়াছে—এ কথা সত্য হওয়া অসম্ভব—কারণ, ভলজীনই মসিও ম্যাডিলিন্।"

"অসম্ভব।"

"আমি এখনই ইহার অকাট্য প্রমাণ দিতেছি। আপনার দ্বিতীয় সংবাদটিও অমূলক। ভলজীন জ্যাভার্টকে হত্যা করে নাই—কারণ, জ্যাভার্ট আত্মহত্যা করিয়াছে এবং তাহার আত্ম-হত্যার কথা আদালত-সমক্ষে নিঃসংশয়িত-ভাবে সপ্রমাণিত হইয়াছে।"

এই কথা বলিয়া থেনার্ডিয়ার তাহার কোটের সুবৃহৎ পকেটের মধ্য হইতে বাদামী রঙের কাগজে জড়ান একটি পুলিন্দা বাহির করিল। অতি সন্তর্পণে সেই পুলিন্দাটি খুলিয়া তাহা হইতে দুইখানি পুরাতন সংবাদপত্র বাহির করিল। এই সংবাদ-পত্র দুইখানি যে কতকাল ধরিয়া তাহার কোটের পকেটে অবস্থান করিতেছিল, তাহার নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে দুইখানি কাগজই মলিন, জীর্ণ ও তাম্রকূটের গন্ধে সুরভিত। এই সংবাদপত্র দুই-খানি ১৮২৩ সালের ২৫ শে জানুয়ারী তারিখের 'ড্যাপোত্র্যাঙ্ক' নামক সংবাদপত্র। ইহারই সংবাদ-স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে যে, কারাপলায়িত দাগী চোর ভলজীন এবং নকল চুণির আবিষ্কারক ক্রোর-পতি সওদাগর, এম-সুর এম নগরের মেয়র মসিও ম্যাডিলিন একই ব্যক্তি। দ্বিতীয় সংবাদপত্রখানি ১৮৩২ সালের ১৫ই জুন তারিখের 'মনিটিয়ার' ইহারই একটি স্তম্ভে জ্যাভার্টের আত্মহত্যার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

মেরিয়াস এতক্ষণে বুঝিলেন যে, আগন্তুক ঠিক বলিয়াছে। এই দুইটি বিষয়ে তাঁহার ধারণাই ভ্রান্ত। তাঁহার জীবন-কাহিনী মেরিয়াসের নিকট প্রকাশ করায়, তাঁহার চক্ষে যতদূর নামিয়া গিয়া-ছিলেন, এক্ষণে, এই রহস্য-প্রকাশে তিনি তাহার অনেক উর্দ্ধে আসন পাইলেন। মেরিয়াস চীৎকার করিয়া কহিলেন, "তাহা হইলে এই লোকটি বাস্ত-বিকই অদ্ভুত। কসেটের বিবাহের যৌতুক এই প্রভূত অর্থ, তাহা হইলে, তাঁহারই স্বোপার্জ্জিত! তিনিই ম্যাডিলিন—একটি ব্যবসায়ের সংস্কারক, দরিদ্রের বন্ধু, আর্ত্ত ও পীড়িতের আশ্রয়! এই বীরশ্রেষ্ঠই বিপ্লবকারীদিগের হাত হইতে জ্যাভার্টেরও প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন! তিনি বাস্তবিকই বীরপুরুষ! তিনি এক জন দেবতা।"

থেনার্ডিয়ার কহিল, "ভলজীন বীর পুরুষও নহে —দেবতাও নহে। সে এক জন নরঘাতক - সে এক জন পাকা দস্যু।"

মেরিয়াস কহিলেন, "চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, দরিদ্র জন্ ভলজীন পেটের দায়ে একখানি রুটী চুরি করিয়াছিলেন—আর সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া দুর্ব্ব-লের ও বিপন্নের রক্ষণে যে তিনি আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতেও কি তাঁহার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই?"

থেনার্ডিয়ার কহিল, "আমি সেই রুটীচুরির কথা বলিতেছি না, মসিও লি ব্যারণ! আমি যে ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, তাহা অতি অল্পদিনমাত্র পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছে। ভলজীনের হস্তের শোণিতকলঙ্ক-রেখা এখনও ভাল করিয়া শুকায় নাই এবং সেই অসদুপায়ে অর্জ্জিত কলুষিত সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও আজিও ব্যয়িত হয় নাই। পুলিস এই ঘটনার সূত্র ধরিতে পারে নাই। জগৎ এই পাপের কথা জানে না। জানে কেবল একটিমাত্র লোক— সে আমি। মসিও লি ব্যারণ! হত্যা কখনও চাপা থাকে না, পাপ কখনও ছাপা থাকে না। আজি হউক, কালি হউক, এই হত্যা-রহস্য প্রকাশিত হইবেই হইবে। মসিও লি ব্যারণ! তখন বুঝি-বেন যে, পাপী ভলজীন, যে অর্থের লোভ দেখাইয়া কৌশলে, ছলে আপনার এই সংসাররূপ শান্তিরাজ্যে প্রবেশ-লাভ করিয়াছে, সেই অর্থ ডাকাতী এবং নরহত্যার দ্বারা লব্ধ। মসিও লি ব্যারণ! আমি এতৎসম্বন্ধে যাহা জানি, তাহা সমস্তই যথাযথভাবে আপনার নিকট বর্ণনা করিতেছি। তজ্জন্য আমাকে পুরস্কৃত করা—না করা—সম্পূর্ণরূপে আপনার আয়ত্তা-ধীন। আপনি মহদাশয়—আমি স্থির জানি যে, আপনি কখনও আমাকে আমার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিবেন না। তবে, আপনি এ কথা বলিতে পারেন যে—এই রহস্য ভলজীনের সম্পর্কে। তুমি তাহারই নিকট কেন আবেদন করিলে না? তাহার অর্থ এই যে, ভলজীন তাহার যথাসর্ব্বস্ব আপনাদিগকে দান করিয়াছে। আমি প্রার্থিরূপে তাহার নিকটে গেলে, সে এক কথায়, আমি সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া ফেলিয়াছি—এই যুক্তিযুক্ত অজুহাতে আমাকে রিক্ত-হস্তে ফিরাইয়া দিবে, সেই জন্য আমি তাহার নিকট না গিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। মসিও লি ব্যারণ! আমার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল। আমি উপবেশন করিতে পারি কি?"

মেরিয়াস থেনার্ডিয়ারকে উপবেশন করিতে বলি-লেন, নিজেও একখানি আসন টানিয়া লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। থেনার্ডিয়ার গম্ভীরভাবে তাহার কাহিনী আরম্ভ করিয়া দিল। সে কহিতে লাগিল, "মসিও

লি ব্যারণ! ১৮৩২ সালের ৬ই জুনের কথা বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে। জগতের ইতিহাসে, যুগান্তকারী ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কথা অলন্ত অক্ষরে লেখা থাকিবে। ৬ই জুন রত্রিতে একটি দুর্ভাগ্য মানব পারিসের ভূগর্ভস্থ একটি পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।"

মেরিয়াস সহসা তাঁহার চেয়ারখানি থেনাডিয়ারের আসনের দিকে টানিয়া লইয়া মনোযোগের সহিত তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। থেনার্ডিয়ার তাহা লক্ষ্য করিল এবং ঠিক বুঝিল যে—গল্প বেশ জমিয়াছে। সুদক্ষ বক্তা যেমন মধ্যে মধ্যে একটু থামিয়া দেখিয়া লয় যে, শ্রোতৃগণ তাহার বক্তৃতার রসাস্বাদন ঠিক করিতেছে কি না, থেনার্ডিয়ারও সেইরূপ একবার মেরিয়াসের মুখের পানে চাহিয়া আবার আরম্ভ করিল, "মসিও লি ব্যারণ! এই হতভাগ্য মানব দুর্ভাগ্যের তীব্র কশাঘাতে লোকালয় ছাড়িয়া এই পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে তাহার আবাস-রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সুতরাং ইহা হইতে আগম-নির্গমের উপায়- দ্বারের চাবীটিও তাহার নিকট ছিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় এই লোকটি এক জন অপ্রত্যাশিত আগন্তুকের উপস্থিতিতে অত্যন্ত শঙ্কিত ও বিচলিত হইয়া উঠিল। এই আগন্তুকের সর্ব্বাঙ্গ শোণিত-লিপ্ত, তাহার পরিচ্ছদ সিক্ত ও কর্দ্দমলিপ্ত। তাহার স্কন্ধে একটি মৃতদেহ। মৃতদেহের সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্রচিহ্ন। মৃতের মুখখানি ক্ষত বিক্ষত হইলেও তাহার অভিজাত উদ্ভবের বেশ পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। যে লোকটি ঐ মৃতদেহটিকে বহন করিয়া আনিতেছিল, তাহার দেহ মৃতের ভারে ন্যুব্জ। সে অতি শঙ্কিত ও সতর্কভাবে পাদ-বিক্ষেপ করিতেছিল। পয়ঃপ্রণালী-অধিবাসী আগন্তুককে দেখিবামাত্র বুঝিল যে—সে অর্থলোভে এই নিষ্ঠুর হত্যাসাধন করিয়াছে, এবং তাহার এই দুষ্কার্য্যের সাক্ষ্য লোপ করিবার জন্য মৃতদেহটিকে সীন্ নদীতে নিক্ষেপ করিতে যাইতেছে।"

মেরিয়াস তাঁহার আসন থেনাডিয়ারের চেয়ারের আরও নিকটে সরাইয়া লইলেন এবং অধিকতর মনোযোগের সহিত তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন।

থেনার্ডিয়ার আবার বলিতে লাগিল, "মসিও লি ব্যারণ! বুঝেনই ত—রাস্তার নীচে নর্দ্দমা ত আর রাজপথ নহে যে, এক জন অপরের অলক্ষিতে গা ঢাকা দিয়া পলাইবে। দুই জনের চাক্ষুষ সাক্ষাৎ অপরিহার্য্য। আগন্তুক কহিল, 'আমার স্কন্ধের বোঝাব দিকে চাহিয়া দেখুন। আমাকে এই সুন্দর পিঞ্জর হইতে বাহির হইতেই হইবে। আপনার নিকট বোধ হয় ইহার দ্বারের চাবী আছে। অনুগ্রহ করিয়া আমায় বাহির করিয়া দিন।' মসিও! বক্তার খোসখৎ চেহারা দেখিয়াই পয়ঃপ্রণালীর অধিবাসী লোকটির অন্তরাত্মা শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। সে মনে করিল, ইহাকে চাবী না দিলে ত জোর করিয়াই লইবে; তবু লোকটির সহিত সে একটু টালবাহানা আরম্ভ করিয়া দিল এবং সেই অবসরে সে ঐ মৃতব্যক্তির গায়ের কোটের পশ্চাদ্দিকের একটি টুকরা ছিঁড়িয়া লইল। সে মনে করিল যে, সেই সূত্র ধরিয়াই হত্যাকারীকে আইনের কবলে নিক্ষেপ করা যাইবে। ধীরে ধীরে চাবী খুলিয়া সে লোকটিকে বাহির করিয়া দিল, আবার তালা বন্ধ করিয়া দিয়া সেও সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। মসিও লি ব্যারণ! সেই আগন্তুক আর কেহ নহে—জন্ ভলজীন। আর সেই পয়ঃপ্রণালীর অধিবাসী অধীন নিজে। এই দেখুন, এই সেই পরিচ্ছদের ছিন্নাংশ।"

এই কথা বলিয়া থেনাডিয়ার তাহার পকেট হইতে একখণ্ড কাল রঙের বনাতের টুকরা বাহির করিল। টুকরাটি মলিন ও তাহাতে অনেকগুলি কাল কাল দাগ। থেনার্ডিয়ার দুই হাতে করিয়া সেই ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড মেরিয়াসের চক্ষের সম্মুখে মেলিয়া ধরিল।

মেরিয়াস উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে। তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় রুদ্ধ। তাঁহার অক্ষিদ্বয় নির্নিমেষ-ভাবে থেনার্ডিয়ারধৃত সেই বস্ত্র-খণ্ডে সংবদ্ধ। একটিমাত্র কথাও উচ্চারণ না করিয়া তিনি স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় ধীরে ধীরে আসন হইতে উঠিয়া গিয়া একটি আলমারী খুলিলেন।

মেরিয়াসের এই আকস্মিক ভাব-পরিবর্ত্তনের কারণ কি, বুঝিতে না পারিয়া থেনাডিয়ার একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেল এবং মেরিয়াসের মনোযোগ-আকর্ষণ-কল্পে আবার নূতন উৎসাহে সেই গল্প ফাঁদিয়া দিল।

থেনার্ডিয়ার কহিল, "মসিও লি ব্যারণ! সেই নিহত ব্যক্তি যে এক জন প্রভূত ধনশালী বিদেশী, তাঁহার সঙ্গে যে প্রচুর অর্থ ছিল এবং ভলজীন যে সেই ধন অপহরণ করিবার জন্যই তাহাকে খুন করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

মেরিয়াস আলমারীর মধ্য হইতে একটি ছিন্ন কাল বনাতের কোট বাহির করিয়া, সেটিকে থেনার্ডিয়ারের সম্মুখে কক্ষতলে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "আমিই সেই যুবক—ভলজীন যাহাকে নিহত করিয়াছিলেন। এই দেখ সেই কোট,—যাহা আমার পরিধানে ছিল।"

মেরিয়াস ধীরে ধীরে যাইয়া থেনার্ডিয়ারের হস্ত হইতে বনাতের টুক্‌রাটি লইলেন; টেবিলের উপর কোটটিকে বিছাইয়া, তাহার ছিন্ন অংশে আস্তে আস্তে বনাতের টুক্‌রাটি বসাইয়া দিলেন। টুক্‌রাটি ঠিক মিলিয়া গেল। থেনার্ডিয়ার একেবারে বোকা বনিয়া গেল এবং সেখান হইতে অক্ষত-শরীরে প্রস্থান-সম্বন্ধে সন্দেহাকুলিত হইয়া তাহারই সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় ধীর-পাদবিক্ষেপে মেরিয়াস গিয়া আর একটি আলমারী খুলিলেন, তাহা হইতে দুই তাড়া ব্যাঙ্ক নোট লইয়া থেনার্ডিয়ারের মুখের উপর ছুড়িয়া দিয়া বলিলেন, "শঠ! প্রবঞ্চক! পর-নিন্দুক! তুমি যাহাকে দোষী সপ্রমাণিত করিতে আসিয়াছিলে, পরমেশ্বর তাঁহার দোষক্ষালন করিয়া দিলেন। তুমি ডাকাত—তুমি নরহন্তা—তুমি অকৃতজ্ঞ পশু! থেনার্ডিয়ার জনড্রেট! আমি তোমাকে বিলক্ষণ চিনি; তোমার সমস্ত কার্য্যকলাপ আমি জানি। আমি তোমার বিষয়ে যাহা জানি, তাহা প্রকাশ করিলে তোমাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়—এমন কি, হয় ত ফাঁসী-কাষ্ঠেও ঝুলিতে হয়। এই লও পাপী! অর্থের জন্য তুমি এত কুকার্য্য করিয়াছ। এই লও—অর্থ।"

মেরিয়াস আর একখানি হাজার ফ্র্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক-নোট লইয়া থেনার্ডিয়ারের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "থেনার্ডিয়ার জনড্রেট!—এততেও তোমার শিক্ষা হইল না। অর্থেই কি সুখ? অর্থেই কি শান্তি? তাহা নহে। সুখ মনে-শান্তি নির্ম্মল অকলুষিত বিবেকে। দুষ্ট রহস্যবিক্রেতা! এই লও আরও পাঁচ শত ফ্র্যাঙ্ক। ওয়াটারলুর পবিত্র স্মৃতি আজ তোমাকে রক্ষা করিল।"

থেনার্ডিয়ার চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "ওয়াটারলু!"

মেরিয়াস কহিলেন, "হাঁ—নরহন্তা! ওয়াটারলু যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি এক জন কর্ণেলের জীবন রক্ষা করিয়াছিলে।"

থেনার্ডিয়ার কহিল, "কর্ণেল্ নয়—জেনারেল।"

মেরিয়াস কহিলেন, "জেনারেল নয়—কর্ণেল। জেনারেল হইলে, একটি কাণাকড়ি দিয়াও আমি তোমাকে সাহায্য করিতাম না! দুর্ব্বৃত্ত! সংসারে যত প্রকারের কুকর্ম্ম আছে, তুমি সমস্তই করিয়াছ। এখন আবার নূতন জীবন আরম্ভ কর। এই লও আরও তিনি সহস্র ফ্র্যাঙ্ক। কল্য প্রাতেই তোমার কন্যাকে লইয়া আমেরিকায় যাও। মিথ্যাবাদী! তোমার স্ত্রী তো অনেক দিন হইল মরিয়াছে। পার যদি, সেখানে পাপের পথ ছাড়িয়া ভদ্রলোকের মত গিয়া বাস কর। আর তাহা যদি ভাল না লাগে, তবে সেইখানেই গিয়া ফাঁসী-কাষ্ঠে ঝোল। তুমি আমেরিকায় পৌছিয়াছ সংবাদ পাইলে, আমি আমার নিউইয়র্ক ব্যাঙ্কারকে আদেশ দিব—তিনি যেন তোমাকে বিশ হাজার ফ্র্যাঙ্ক দেন। যাও—হতভাগা!—আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।"

উৎপাটিত-বিষদন্ত ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধে গুমরিতে গুমরিতে থেনার্ডিয়ার মেরিয়াসকে অভিবাদন করিয়া কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

মেরিয়াস কসেটের অন্বেষণে ছুটিয়া গেলেন।

চতুঃপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

—:*:—

কেন আমাকে ভুলিলে?

আজ পূর্ণিমা-রজনী। কসেট সান্ধ্যভোজনান্তে চন্দ্রালোকিত উদ্যানমধ্যে পাদচারণা করিতেছে।

বাহিরে যেমন জ্যোৎস্না, গন্ধ, আনন্দ—কসেটের হৃদয়েও তাই। কসেট তাহার বাঞ্ছিতকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পাইয়াছে। আর তাহার কষ্ট কিসের—তাহার অভাব কি?

তাহার একমাত্র দুঃখ—ভলজীনের এই অলৌকিক পরিবর্ত্তন। কসেট ভাবিত যে, যে পিতা তিলমাত্র কন্যাকে নয়নের অন্তরাল করিতে চাহিতেন না,

আজ কেমন করিয়া তিনি সেই মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন ?

কসেট সময়ে সময়ে একান্তে বসিয়া এই কথা ভাবিত। ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষু আপনা আপনি জলে ভরিয়া আসিত।

পাছে স্বামী কিছু মনে করেন, সেই আশঙ্কায় সে এই একটি প্রসঙ্গে স্বামীর নিকটে তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিত না।

মেরিয়াস দৌড়িতে দৌড়িতে গিয়া কসেটের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার গোলাপের ন্যায় রক্তিম গণ্ডে একটি উষ্ণ চুম্বন অঙ্কিত করিয়া কহিলেন, "কসেট ! এত দিনে সন্ধান পাইয়াছি—কে সেই ভয়ঙ্কর রণক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর গ্রাস হইতে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন।"

কসেট সাগ্রহে জিজ্ঞাসিল, "কে তিনি ?"

মেরিয়াস কহিলেন, "তোমার পিতা ! কসেট, তিনি আমারও পিতা। তাঁহার অনুগ্রহে আমি জীবিত রহিয়াছি—তাঁহারই কৃপায়, সোনামণি ! আমি তোমাকে পাইয়াছি। আরও শোন কসেট ! তোমার বিবাহের যৌতুকের সমস্ত টাকাই তাঁহার স্বোপার্জ্জিত—তিনি সমস্তই তোমাকে দিয়া গিয়াছেন। এমন মহাপুরুষ কি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় আছে ? আর আমরা ?—আমরা সেই উপকারের জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, আমোদের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া একবার তাঁহার খবরও লই না। চল সোনা ! আমরা উভয়ে গিয়া এখনি তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করি।"

উদ্যান-পার্শ্বেই রাজপথ। একখানি ভাড়াটিয়া খালি গাড়ী সেই সময় সেই পথ দিয়া যাইতেছিল।

মেরিয়াস কোচম্যানকে গাড়ী থামাইতে বলিলেন —কসেটের হাত ধরিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীর মধ্যে উঠিয়াই বলিলেন,"৭নং রু-দে-লা-হোম-আরম্। শীঘ্র পৌঁছাইয়া দিলে দুনা-ভাড়া বক্‌শিশ্।"

গাড়ীতে বসিয়াই মেরিয়াস কসেটকে কহিলেন, "সোনা ! এতক্ষণে আমি সব বুঝিতে পারিতেছি। তুমি বলিয়াছ যে, গ্যাভরোক তোমাকে চিঠি দেয় নাই। সেই চিঠি নিশ্চয়ই তোমার পিতার হাতে পড়িয়াছিল। সেই চিঠি পড়িয়াই তিনি আমাকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। তিনি আমাকে মরণের গ্রাস হইতে ছিনাইয়া আনিয়াছেন। কি জন্য ? সোনা ! তোমাকে আমায় দিবার জন্য। একবার মনে ভাবিয়া দেখ—সেই দুর্গন্ধময় পয়ঃপ্রণালীর মধ্য দিয়া তিনি আমায় বহিয়া আনিয়াছেন। কসেট ! আর আমরা তাঁহার কোন কথাই শুনিব না। এবার আমরা উভয়ে গিয়া জোর করিয়া তাঁহাকে ঐ কদর্য্য বাসা হইতে আমাদের বাড়ীতে লইয়া আসিব। সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া আমরা উভয়ে আমাদের এই নিতান্ত আত্মীয়, এই পরমবন্ধুর পদসেবা করিব।"

গাড়ী আসিয়া ভলজীনের বাটীতে থামিল। মেরিয়াস কসেটকে লইয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ভৃত্যকে জিজ্ঞাসিলেন, "কর্ত্তা কোথায় ?" ভৃত্য কহিল, "উপরে—তাঁহার শয়নকক্ষেই আছেন। তিনি ভয়ানক দুর্ব্বল। আজ প্রায় মাসাবধি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন। বোধ হয়, আর বেশী দিন বাঁচিবেন না।"

ভৃত্যের কথা শুনিয়া কসেট শিহরিয়া উঠিল।

পঞ্চপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

—:*:—

ভলজীনের কাজ ফুরাইল।

মেরিয়াস ভলজীনের শয়ন-কক্ষের দ্বারে করাঘাত করিলেন।

ভিতর হইতে ক্ষীণকণ্ঠে ভলজীন কহিলেন, "কে ?—ভিতরে আসুন।"

দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া মেরিয়াস ও কসেট কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মেরিয়াস কক্ষতলে নির্ব্বাক্‌ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কসেট বালিকার ন্যায় দৌড়িয়া গিয়া ভলজীনের বুকের উপর পড়িল।

ভলজীন একখানি ইজিচেয়ারে অর্দ্ধ-উপবিষ্ট অর্দ্ধ-শয়ান অবস্থায় ছিলেন। তিনি উঠিয়া বসিবার জন্য একটু চেষ্টা করিলেন—কিন্তু পারিলেন না। ভলজীনের হস্তদ্বয় চেয়ারের বাহুর উপরে বিস্রস্ত ; শরীর ক্ষীণ, মুখ পাণ্ডুবর্ণ। কিন্তু তাঁহার চক্ষু হইতে আনন্দ যেন ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

ভলজীন কহিলেন, "কসেট ! আসিয়াছ—ঈশ্বর, তুমিই ধন্য !"

বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। প্লাবনের বেগে হৃদয়ের অর্গল টুটিল। কসেট্ ভলজীনের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

আর মেরিয়াস ?—

মেরিয়াস নিশ্চলভাবে কক্ষতলে দাঁড়াইয়া বালিকাহৃদয়ের এই উত্তাল উচ্ছ্বাস দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের হৃদয়ও বর্ষণোন্মুখ জলদের মত বাষ্প-নিপীড়িত।

বাষ্প-বিজড়িত-কণ্ঠে মেরিয়াস কহিলেন, "পিতা !"

ক্ষীণকণ্ঠে ভলজীন কহিলেন, "এস বৎস !—তোমরা দুই জনেই আসিয়াছ ! ভাল হইয়াছে। আর আমার কোন দুঃখ নাই।"

মেরিয়াস ভলজীনের পদপ্রান্তে বসিয়া ভাব-গদ্গদকণ্ঠে কহিলেন, "পিতা ! আমি ভয়ঙ্কর অপরাধী, আমাকে ক্ষমা করুন।"

ভলজীন কহিলেন, "মসিও লি ব্যারণ ! আমিই অপরাধী। তুমি যে আমায় দেখিতে আসিয়াছ, তাহাতেই আমি বুঝিয়াছি যে, তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়াছ।"

মেরিয়াস কহিলেন, "শুনিলে কসেট ! এই মহাপ্রাণ মানব-দেবতা আপনার প্রাণের মমতা ছাড়িয়া সেই বিপৎ-সঙ্কুল রণক্ষেত্র হইতে আমাকে বাঁচাইয়া আনিলেন—আমার হৃদয়ের চির-উপাসিতা তোমাকে আমায় দান করিলেন—তাঁহার সমগ্র জীবন ধরিয়া অর্জ্জিত এই প্রভূত অর্থ তোমাকে এবং আমাকে দান করিলেন—অপরাধ তাঁহার ! অকৃতজ্ঞ নরাধম আমরা, আমাদের নহে।"

ভলজীন কহিলেন, "মসিও লি ব্যারণ ! অমন কথা মুখেও আনিও না। আর, আমি যাহা তোমাদের জন্য করিয়াছি—সেটুক্ কোন্ পিতামাতা না সন্তানের জন্য করে ?"

মেরিয়াস কহিলেন,"আর আপনার কোন কথাই আমরা শুনিব না। আজই আমরা আপনাকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া যাইব। আপনি আর এ বাড়ীতে থাকিতে পাইবেন না।"

দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া, একটু মৃদু হাসিয়া, ভুলজীন কহিলেন, "আমি আজই এ বাড়ী বোধ হয় ছাড়িয়া দিতেছি। কিন্তু মসিও ! তাহা জন্মের মত—দুই এক দিনের জন্য নয়।"

কসেট একদৃষ্টে ভলজীনের মুখের পানে দেখিতেছিল এবং তাঁহার এই দ্ব্যর্থপূর্ণ কথার ভাব কিছুই না বুঝিতে পারিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। দুই বিন্দু অশ্রু ভলজীনের নয়ন-কোণে,—যেন তাঁহার সমস্ত প্রাণটি দ্রবীভূত হইয়া তাঁহার অক্ষিকোণে আসিয়া দুইটি শুভ্র উজ্জ্বল মুক্তাফল রচনা করিল।

ভলজীন কহিলেন,"পরমেশ্বর যে করুণার আধার—এই গভীর সত্যটি আজ আমি এই জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া সম্যক্ উপলব্ধি করিতেছি। মসিও, তোমরা যে সময়ে এই কক্ষে প্রবেশ করিলে, তাহার ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমার চেতনার সমস্ত রশ্মিগুলি এককেন্দ্রীভূত হইয়া একটি তীব্র উজ্জ্বল আলোক রচনা করিল—সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডলমাঝে দেখিলাম, দিব্য-কান্তি-শালিনী সুষমার অফুরন্ত অক্ষয় ভাণ্ডার—আমার সোনার কসেট !

মসিও পণ্টমারসি ! ব্যারণেস পণ্টমারসিকে তাহার পুরাতন 'কসেট' নামেই আমাকে ডাকিতে দিন—আমার সময় নিকট হইয়া আসিতেছে, আমি আর বেশীবার তাহাকে ডাকিব না।

কসেট ! আয়ুষ্মতি ! এস, তোমার শোভন ললাটে একটি চুম্বন দাও।"

কসেট তাহার সুন্দর সুগঠন ললাট ভলজীনের মুখের নিকট লইয়া গেল। ভলজীনের ওষ্ঠ তুষারের মত হিম।

কসেট চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "বাবা, তোমার ঠোঁট এত ঠাণ্ডা ? তোমার কি অসুখ করিতেছে ? তোমার শরীরের মধ্যে কি কিছু কষ্ট, কোন গ্লানি অনুভব করিতেছ ?"

ভলজীন কহিলেন, "কষ্ট !—কই ?—না। তবে—"

কসেট জিজ্ঞাসা করিল, "তবে—কি ?"

ভলজীন একটু মৃদুস্বরে কহিলেন, "তবে কি—শুনিবে কসেট—?—আমি মরিতেছি।"

কসেট ও মেরিয়াস শিহরিয়া উঠিলেন।

মেরিয়াস চীৎকার করিয়া কহিলেন, "মরিতেছেন !"

ভলজীন কহিলেন, "হাঁ, মেরিয়াস !—কিন্তু তাহাতে কষ্ট কি ?"

ভলজীন একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। বর্ষণোন্মুখ মেঘের কোলে তড়িল্লেখার ন্যায় তাঁহার

মুখে একটু হাসি নিমেষে ফুটিয়া উঠিয়া আবার তখনই মিলাইয়া গেল।

ভলজীন কহিলেন, "এরূপ মরণ কয়জন মরিতে পায়? এমন সুখ কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে? কসেট! তুমি আমার সহিত কথা কহিতেছ, আমার কর্ণে মন্দার-সুরভিত নন্দন-কাননে অপ্সরোকণ্ঠ-বিনিঃসৃত স্বর্গীয় গীতির ন্যায় বোধ হইতেছে। যতক্ষণ এই ক্ষীণ প্রাণটুকু দেহে থাকিবে, তোমার ঐ মধুমাখা স্বর আমায় শুনিতে দাও।"

মেরিয়াসের শরীর কণ্টকিত, তিনি ভয়ে স্তম্ভীভূত! চীৎকার করিয়া মেরিয়াস কহিলেন,"না পিতা, আপনি মরিবেন না। আপনি মরিতে পাইবেন না।"

একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া ভলজীন কহিলেন, "মরিতে কি আমার ইচ্ছা? যে মরিতেছে, তাহাকে বাঁধিয়া রাখা মানুষের সাধ্য আছে, মেরিয়াস?"

মেরিয়াস কহিলেন, "পিতা! এখনও আপনার দেহ সবল, স্মৃতি অটুট রহিয়াছে। এরূপ দেহে মরণ সম্ভব?"

জন্ ভলজীন তাঁহার মস্তক ঈষৎ উঠাইলেন, স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার মেরিয়াস ও কসেটের মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন, "মেরিয়াস! তুমি আমাকে মরিতে নিষেধ করিতেছ। কি জানি—মঙ্গলময়ের কি ইচ্ছা? জানি না—হয় ত—তোমার নিষেধ আমি শুনিতে পারি। তোমরা এই কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তেই আমার আত্মা জীবন-মরণের সন্ধিস্থানে দাঁড়াইয়াছিল। তোমাদের আগমনে সে যখন আবার জীবনের গণ্ডীর মধ্যে ফিরিয়া আসিল, তখন আমার মরা হইল না।"

মেরিয়াস কহিলেন, "পিতা! আমি নিশ্চয় বলিতেছি—আপনি মরিবেন না। আমি এখনই আপনাকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া যাইব। সেখানে কসেট ও আমি দিন-রাত আপনার কাছে বসিয়া থাকিব। আপনার সেবা করিব। শীঘ্রই আপনার অসুখ ভাল হইয়া যাইবে। পিতা! আমি আপনার চরণে অপরাধী। সমস্ত জীবন ধরিয়া আপনার সেবা করিয়া আমি সেই পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

জন্ ভলজীন একটু হাসিলেন।

তিনি হাসিয়া কহিলেন, "মসিও পণ্টমারসি! যদি তুমি এখন আমাকে তোমাদের বাড়ীতে লইয়া যাও, তাহা হইলেও কি আমাকে তুমি মরণের হাত হইতে ধরিয়া রাখিতে পারিবে?—না।—পরমেশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই হইবে। আমার এখন চলিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। আমার কথা শুন—অধীর হইও না। শত চেষ্টাতেও আর আমাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। আমি আমার নিজের মনে ঠিক বুঝিতেছি যে, আমার সময় হইয়াছে। কসেট! তোমার স্বামী অতি সুন্দর। আমার কাছে থাকিয়া তুমি যত সুখী ছিলে, তোমার স্বামীর গৃহে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী সুখী হইবে।"

ভলজীন কসেটকে বুকের উপর টানিয়া লইলেন।

ভলজীন আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "কসেট! মেরিয়াস! একটি কথা—তোমাদিগকে যে টাকা যৌতুক দেওয়া হইয়াছে অসদুপায়ে অর্জ্জিত বলিয়া সেই অর্থ স্পর্শ করিতে বোধ হয় তোমরা ইচ্ছা করিতেছ না। মসিও পণ্টমারসি! মরণের কূলে দাঁড়াইয়া তোমাদিগকে মিথ্যা বলিতেছি না। ঐ অর্থ সম্পূর্ণ সদুপায়ে অর্জ্জিত। তোমরা নিঃসন্দিগ্ধভাবে তাহা ব্যবহার করিতে পার।"

ভলজীনের পরিচারিকা বুঝিয়াছিল যে, তাহার প্রভু আর বাঁচিবেন না। সে প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁহার মরণের অপেক্ষা করিতেছিল। সে ধীরে ধীরে কবাট ঠেলিয়া ভলজীনের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, সে যাহা ভাবিতেছিল, তাহাই ঠিক। ভলজীনের অবস্থা ভাল নয়।

সে মৃদুস্বরে কহিল, "এক জন পাদরীকে সংবাদ দিব না কি?"

ভলজীন তর্জ্জনী-নির্দ্দেশে আপনার শিয়রের দিকে দেখাইয়া বলিলেন,"ঐ দেখ—আমার পাদরী অনেকক্ষণ হইতে ঐখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।"

ভলজীন ঠিক উপলব্ধি করিতেছিলেন যে, বিশপ মিরিয়েলের অন্তরাত্মা ছায়ামূর্ত্তিতে আসিয়া তাঁহাকে অমর ধামে লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

কসেট ও মেরিয়াস হতবুদ্ধির ন্যায় দণ্ডায়মান। যন্ত্রণায় তাঁহাদিগের বাক্যের দুয়ার রুদ্ধ। নিরাশায় তাঁহাদিগের সর্ব্বশরীর কম্পিত। এক এক মুহূর্ত্ত সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল—ভলজীনের জীবন প্রদীপ ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল; শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টকর হইয়া উঠিল; মরণের ছায়া আসিয়া তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ঝাঁপিয়া ফেলিল। এক

অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিতে ভলজীনের মুখমণ্ডল বিভাসিত হইয়া উঠিল।

ভলজীন কসেট ও মেরিয়াসকে তাঁহার নিকটে একটু সরিয়া আসিতে ইঙ্গিত করিলেন, ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "কসেট! মেরিয়াস! আমি তোমাদিগের দুই জনকেই প্রাণের ন্যায় ভালবাসি। কসেট! তুমিও আমাকে ভালবাস, আমি তাহা জানি। আমি মরিয়া গেলে, তুমি আমার জন্য কাঁদিবে?—না,—কাঁদিও না। আমি গেলাম বটে, কিন্তু তোমাকে যাহার নিকটে রাখিয়া গেলাম, সে তোমাকে সুখী করিবে। ব্যারণ পণ্টমারসি তোমাকে ভালবাসে। আমার যাহা কিছু ছিল, সব তোমাকে দিয়াছি—কারণ, তুমিই আমার জীবনের ধ্রুব-নক্ষত্র ছিলে। আশা করি, তুমি সেই অর্থের সদ্ব্যয় করিবে। কসেট! আমার শিয়রে ম্যাণ্টেলপিসের উপরে ঐ দেখ, দুইটি রৌপ্যনির্ম্মিত বাতীদান রহিয়াছে। তুমি নিজ হস্তে ঐ বাতীদান দুইটিতে দুইটি বাতী পরাইয়া জ্বালিয়া দাও। ঐ বাতীদান দুইটি রৌপ্য-নির্ম্মিত। কিন্তু আমার হিসাবে ঐ দুইটি স্বর্ণ-নির্ম্মিত। স্বর্ণ কেন—হীরক হইতেও অধিকতর মূল্যবান্। এই আলোকাধারে প্রজ্বালিত বর্ত্তিকা, দেবতার মন্দিরে প্রজ্বালিত হোম-শিখার ন্যায় পূত। আমি জানি না যে,—সেই দেবোপম মানব, যিনি ঐ দুইটি আমাকে দান করিয়াছিলেন—তিনি স্বর্গ হইতে এই মুহূর্ত্তে আমার উপর তাঁহার সানুকম্প দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন কি না; আমি জানি না যে—সেই মহানুভব আমার কার্য্যে আমার উপরে প্রীত আছেন কি না? কিন্তু আমার যাহা সাধ্য—আমি করিয়াছি। বৎসগণ! মনে রাখিও—আমি বড়ই দরিদ্র। আমার শেষ-শয্যার উপরে তোমরা মহার্ঘ্য মর্ম্মরময় স্মৃতিস্তম্ভ রচিত করিলে আমার পরলোকগত আত্মা অত্যন্ত কষ্ট পাইবে। কবরস্থানে, দরিদ্রের জন্য নিরূপিত প্রদেশে, যেন আমার শেষ-শয্যা রচিত হয়। একখানি স্বল্প-মূল্যের প্রস্তর-খণ্ডমাত্র যেন সেই স্থানটি নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। সেই প্রস্তর-ফলকের উপর আমার নাম ক্ষোদিত করিও না। যদি কসেট মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমার চরম-বিশ্রামস্থান দেখিয়া যায়, তাহা হইলেই আমার আত্মা পরম শান্তি পাইবে। আর তুমিও—মসিও পণ্টমারসি! এই শেষ-মুহূর্ত্তে আর কোন বিষয়ই তোমাদের নিকট গোপন করিব না। মসিও! আমি স্বীকার করিতেছি যে—তোমার সহিত প্রথম সাক্ষাতে আমি তোমাকে বড় ভাল চক্ষে দেখি নাই। কি জন্য—তাহাও আমি বলিতে পারি না। সেটি বোধ হয় সংস্কার! আমার মন বলিয়া দিতেছিল—ভলজীন! এই যুবকই তোমার বক্ষঃপঞ্জরের অস্থি খুলিয়া লইবে—তোমার কসেটকে কাড়িয়া লইবে। যাহা হউক, এক্ষণে কসেট ও তুমি, আমার চক্ষে এক। আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ। কারণ, তুমি কসেটকে সুখী করিয়াছ। মসিও পণ্টমারসি। তুমি বুঝিবে না—কসেটকে আমি কত ভালবাসিতাম! তাহার সুন্দর মুখখানিতে হাসির ছটা দেখিলে আমার হৃদয় আনন্দে গলিয়া যাইত। তাহার মুখখানি মলিন দেখিলে আমার নিকট পৃথিবী শূন্য বলিয়া বোধ হইত।

কসেট! ঐ দেরাজের মধ্যে একখানি পাঁচ শত ফ্র্যাঙ্কের নোট আছে। আমার অন্ত্যেষ্টির পরে সেইখানি ভাঙ্গাইয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিও!

কসেট! ঐ দেখ, আমার বিছানার উপরে একটি ছিন্ন পরিচ্ছদ রহিয়াছে। তুমি চিনিতে পার কি, ঐ পরিচ্ছদটি কাহার? তবুও মোটে দশ বৎসরের কথা! সময় কত শীঘ্র চলিয়া যায়।

সরলা! তোমার মায়ের কথা, বোধ হয়, তোমার কিছুই মনে পড়ে না। তাহার নামও বোধ হয়, তুমি জান না। তোমার মায়ের নাম 'ফ্যাণ্টাইন্।' যখনই এই নামটি তোমার মনে হইবে, তখনই ঈশ্বরের নিকট তোমার মাতার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করিও। কসেট! তোমার দুর্ভাগিনী জননী জীবনে কখনও সুখের মুখ দেখে নাই। কিন্তু সে তোমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসিত। তাহার ভাগ্যে চিরদুঃখ—তোমার ভাগ্যে সুখ। বিধির বিচিত্র বিধান।

কসেট! মেরিয়াস! আমি চলিলাম। তোমরা দুই জনে আসিয়া আমার দুই পাশে ব'স। আমার কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করিও। আরও একটু সরিয়া আইস। আমাকে তোমাদের মস্তকে হস্তস্পর্শ করিতে দাও। আশীর্ব্বাদ করি, চিরসুখী হও।"

কসেট ও মেরিয়াস দুই জনে জানু পাতিয়া ভলজীনের দুই পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, তাঁহার মরণ-হিম করতলে অজস্র চুম্বন করিতে লাগিলেন। সেই হস্তদ্বয় স্পন্দন-রহিত হইয়া আসিল। ভলজীনের মুখ স্বর্গীয় সুষমান্বিত, দিব্য-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উর্দ্ধে, ভগবানের পদপ্রান্তে সন্নদ্ধ।

ভলজীনের কার্য্যময়, দুঃখময়, বৈচিত্র্যময় জীবন-নাটকের অভিনয় সমাপ্ত হইল। তাঁহার আত্মা স্বর্গে —না নরকে ?

পিয়ারি ল্যাসের কবরস্থানের এক অনন্বেষিত অংশে একটি রোরুদ্যমান উইলো বৃক্ষের তলে নবজাত লতাপুষ্পে এবং হরিৎ তৃণে সমাচ্ছাদিত একটি কবরের ভগ্নাবশেষ আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই কবরটির স্মৃতি-স্তম্ভ একখানি অমার্জ্জিত প্রস্তর-ফলক। তাহাতে নাম পর্য্যন্ত ক্ষোদিত নাই।

অনেক—অনেক বৎসর পূর্ব্বে একটি অজানিত হস্ত পেন্সিল দ্বারা কয়েকটি ছত্র এই নগ্ন প্রস্তরফলকের উপরে লিখিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে সেই ছত্র কয়টি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, স্থলে স্থলে একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার যেটুকু বুঝা যায়, তাহা এই :—

"হেথা—মরণের কোলে, সুখ-সুপ্ত,
চির-অভিশপ্ত ছিল—জীবন তাঁহার।
জর্জ্জরিত অদৃষ্টের তীব্র কশাঘাতে।
তবু—কষিত সুবর্ণ সম উজ্জ্বল ভাস্বর
জন্ম তাঁর পর-হিত তরে।
কর্ম্ম শেষ হ'লে
কর্ম্মী বহিবে কেমনে গুরু জীবনের ভার ?
তাই চলি গেলা, খেলা সাঙ্গ করি, প্রকৃতি-নিয়মে—
নিশা যথা আসে দিবা চ'লে গেলে বিধি-বদ্ধ ক্রমে।"

সমাপ্ত।

লীলার স্বপ্ন

(উপন্যাস)

—

শ্রীমনোমোহন রায়

অবতরণিকা

এই আখ্যায়িকাটি একটি প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। পাটনের ভবানী-মন্দির হইতে উৎকীর্ণ শিলালিপি-পাঠে জানা যায় যে, ভাস্করাচার্য্য পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে সহ্যাদ্রির পাদদেশে অবস্থিত বিজ্জড়বিড নামক গ্রামে দৈবজ্ঞ-চূড়ামণি মহেশ্বরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিদ্ধান্ত-শিরোমণি, করণ-কুতূহল ও বাসনাভাষ্য প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত ভাস্করব্যবহার ও ভাস্কর-বিবাহপটল নামক দুইখানি জ্যোতিষ-গ্রন্থও তাঁহার রচিত। বিদুষী লীলাবতী এই ভাস্করাচার্য্যেরই পত্নী। ভাস্করাচার্য্য পরম তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ছিলেন। লীলাবতীর জীবনের কাহিনী অবলম্বনেই এই উপন্যাসখানি লেখা হইয়াছে।

গ্রন্থকার।

লীলার স্বপ্ন

প্রথম পরিচ্ছেদ

—:*:—

অভিনয় দর্শনে।

উজ্জয়িনী নগরে নির্ম্মলতোয়া কলনাদিনী সিপ্রা-তটে মর্ম্মরময় বিশাল রঙ্গালয়। আজ এখানে মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের প্রথম অভিনয়। নটরাণী অনুপম-সৌন্দর্য্যশালিনী বাসবদত্তা শকুন্তলার ভূমিকায় রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহার অসামান্য অভিনয়-চটুলতায় দর্শকবৃন্দ মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। শকুন্তলা তপোবনের বৃক্ষ-বাটিকায় উদ্যান-বৃক্ষের আলবালে জলসেচন করিতেছেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা তাঁহার ঘট সলিলপূর্ণ করিয়া দিতেছে। সখীগণের মধ্যে পরস্পর বিশ্রম্ভালাপ ও পরিহাস রসিকতার কথা শুনিয়া দর্শকমণ্ডলী কৌতূহল পূর্ণ নেত্রে রঙ্গালয়ের দিকে বদ্ধদৃষ্টি রহিয়াছে।

সহসা রঙ্গালয়ের সর্ব্ব-সম্মুখস্থ আসনের প্রবেশদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। এক জন দর্শক ধীরে ধীরে সেই পথে রঙ্গগৃহে প্রবেশ করিয়া একখানি আসন গ্রহণ করিল। আগন্তুকের আকৃতি দীর্ঘ, বাহু আজানুলম্বিত, বক্ষ বিশাল, ললাট প্রশস্ত, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। তাহার কেশ দীর্ঘ, কুঞ্চিত ও গুচ্ছিত। তাহার গায়ে আগুল্‌ফলম্বিত একটি দীর্ঘ ঢিলা গৈরিক অঙ্গরাখা। আগন্তুকের দেহে যৌবনের মসৃণতা, বদনে শৈশবের সরলতা, হাবভাবে বার্দ্ধক্যের গাম্ভীর্য্য। তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিই পূর্ণ ও সুন্দর। তাহার মধ্যে আবার তাহার চক্ষু দুইটি একটু বিশেষত্ব-ব্যঞ্জক ;—আয়ত পদ্মদলের ন্যায় সুগঠন ও সান্ধ্যতারার ন্যায় উজ্জ্বল ও অন্তরানুসন্ধায়ী। তাহাতে কঠোরতার লেশমাত্র নাই। আগন্তুক আসন গ্রহণ করিয়াই একবার পার্শ্বস্থ আসনে উপবিষ্ট দর্শকদিগকে দেখিয়া লইলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি অনতিদূরস্থিত একখানি আসনে উপবিষ্ট একটি ষোড়শী যুবতীর দিকে আবদ্ধ হইল। দুইটি বিভিন্ন প্রকারের তড়িচ্ছক্তি যেমন পরস্পর সন্নিকটে আসিলে একটি অত্যুৎকট জ্বালা উৎপাদিত করে, যুবতীর দৃষ্টিও আগন্তুকের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে প্রতিহত হইয়া তাহার হৃদয়ে যেন বিষম একটি আঘাত করিল। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল, "ও লোকটার চাহনি কি কঠোর, যেন খেয়ে ফেল্‌তে আসছে।" যুবতীর বর্ষীয়সী মাতা তাহার কাছেই বসিয়াছিলেন। তিনি কন্যাকে তাড়নার ছলে কহিলেন, "মানুষের পানে অমন ড্যাব-ড্যাব ক'রে না চাইলেই হয়।" কন্যা মাতার উপদেশ গ্রহণ করিয়াই হউক, অথবা। নিজের ইচ্ছামতই হউক, আর সে দিকে মুখ ফিরাইল না।

এ দিকে নাটকের এক অঙ্ক শেষ হইয়া গেল। নটনটীগণ দ্বিতীয় অঙ্কের জন্য বেশ পরিবর্ত্তন করিতে নেপথ্যাভিমুখে গেল। দর্শকগণও ক্ষণকালের জন্য বিরাম লাভ করিলেন ; পরস্পর আলাপচারি করিতে লাগিলেন।

আগন্তুককে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া, এক জন যুবক জনতা ঠেলিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "এ কি! ভগবান্ ভাস্করাচার্য্য এখানে! আমার ধারণা ছিল যে, আপনি বোধ হয় এ সকল ছেব্‌লামি ব্যাপারে নাই।"

ভাস্করা। কালিদাসের শকুন্তলা কি ছেব্‌লামি?

যুবক। ছেব্‌লামি না হলেও একটু আদিরস-ঘটিত।

ভাস্করা। অর্থাৎ নবরসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস। সকল রসের প্রধান বলিয়াই ইহার নাম আদি-রস।

যুবক। হ'তে পারে। তবে আমি ততটা

নাটকের পক্ষপাতী নহি। আমার কাছে নাচগান খুব ভাল লাগে।

ভাস্করা। নাটক যদি ভাল না-ই লাগে, তবে এখানে আসার প্রয়োজন?

যুবক। খাতিরে।

ভাস্করা। না! খাতিরে নয়। নিয়তির আকর্ষণে। মিহিরগুপ্ত, ঐ দেখ! আমার আসন হইতে সপ্তম আসনখানিতে উপবিষ্ট ঐ যে যুবতী দেখিতে পাইতেছ, উহাকে তুমি চেন?

যুবক। না, আমি উহাকে আর কখনও দেখি নাই। আজ এখনই প্রথম দেখিতেছি।

ভাস্করা। ঐ রমণী তক্ষশিলা নগরীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী ধনপতির একমাত্র কন্যা ও তাহার অগাধ সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী।

যুবক। তাহাতে আমার কি?

ভাস্করা। ঐ রমণীই তোমার ভাবী পত্নী। মিহিরগুপ্ত! উহাকে বিবাহ কর। উহার পিতার বহুকষ্টে সঞ্চিত অর্থে তোমার ঋণজাল হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লও।

যুবক। ভাস্করাচার্য্য! তোমার গণনাশক্তি অসামান্য, জ্যোতিষে তোমার অধিকার অমানুষিক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তোমার এই ভবিষ্যৎবাণীটিকে মিথ্যা সপ্রমাণিত করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আমি কিছুতেই ঐ শ্রেষ্ঠী-কন্যাকে বিবাহ করব না। বিবাহ করা দূরে থাক্, আমি তার সঙ্গে আলাপ পর্য্যন্তও করব না। দেখি, কেমন ক'রে তোমার গণনা ঠিক হয়?

ভাস্করাচার্য্য ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "বিবাহ তোমাকে করিতেই হইবে। আজ রাত্রেই তুমি উহার সহিত পরিচিত হইবে।"

ঠিক এই সময়েই পট উত্তোলিত হইল। ভাস্করাচার্য্য রঙ্গালয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া অভিনয় দেখিতে লাগিলেন। মিহিরগুপ্তও আপন আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। কিন্তু, তিনি আর অভিনয়ে মনঃ-সংযোগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে একমাত্র চিন্তা "সত্য সত্যই কি এই শ্রেষ্ঠি-দুহিতা তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী হইবে! ভবিষ্যতে যাহা হয় হউক! কিন্তু আজ রাত্রে আমি কিছুতেই এই রমণীর সহিত পরিচিত হইব না। ভাস্করাচার্য্যের এই ভবিষ্যদ্বাণীটি অন্ততঃ সম্পূর্ণরূপ নিষ্ফল করবো।"

নাটকের তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত হইলেই ভাস্করাচার্য্য প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। মিহিরগুপ্তও উঠিয়া আসিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রঙ্গালয়ের বহিঃপ্রাঙ্গণে আসিলেন। উভয়েরই যান অশ্ব সংযোজিত হইতেছিল। সেই অবসরে তাঁহারা উভয়ে একটু কথোপকথন করিতেছিলেন। ভাস্করাচার্য্যের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইতে বসিয়াছে,শ্রেষ্ঠি-কন্যার সহিত আজ রাত্রেই তাঁহার যে আলাপের সম্ভাবনা একান্ত অসম্ভাবিত হইয়া আসিতেছে, এই মনে করিয়া তিনি মনে মনে একটু হৃষ্টও হইতেছিলেন।

মিহির। অভিনয় কেমন দেখলেন, ভাস্করাচার্য্য?

ভাস্করা। বেশ, সুন্দর। তোমার কাছে কেমন লাগ্‌লো?

মিহির। অতি জঘন্য। রাত-দিন বিরহের ফোঁস্‌ফোঁস্ দীর্ঘশ্বাস আর প্যান্‌প্যান্ কান্না কি ভাল লাগে?

ভাস্করা। সেই জন্যই বুঝি পালা শেষ না হ'তে হ'তেই উঠে পালাচ্ছ?

মিহির। অবশ্য একটা কারণ তাই বটে। তবে আরও একটা গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।

ভাস্করাচার্য্য ও মিহিরগুপ্তে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে এক জন যুবক ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া আসিয়াই নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় মিহিরগুপ্তের পৃষ্ঠে একটি ক্ষুদ্র চাপড় দিয়া কহিলেন, "বেশ তো! তুমি কখন্ এখানে এলে? তোমাকে তো এতক্ষণ দেখতে পাইনি! আজ দুই তিন দিন থেকে তোমাকে খুঁজে খুঁজে আমরা হাল্লাক্।"

মিহির। কেন? ব্যাপার কি?

অমর। ভয়ে বল্‌বো, না নির্ভয়ে বল্‌বো?

মিহির। কেন, আমি বাঘ না ভালুক যে, ভয়?

অমর। বাঘও নও, ভালুকও নও! কুনো ব্যাং। যা' হক! তোমাকে আমার এই বিশিষ্টা রমণী বন্ধুদ্বয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। ইনি তক্ষশিলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বণিক্ ধনপতির একমাত্র কন্যা চিত্রা। আর উনি ইঁহার জননী।

এক মুহূর্ত্তের জন্য মিহিরগুপ্ত বজ্রাহতের ন্যায় নীরব হইয়া রহিলেন। পরমুহূর্ত্তে যেন যন্ত্র-চালিতের ন্যায় পুনরায় পূর্ব্বস্মৃতি লাভ করিলেন ও যন্ত্র-চালিতের ন্যায় কহিলেন, "আপনাদের সহিত পরিচিত

হইয়া আমি আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি। চিত্রার মাতা কহিলেন, "আপনার স্বর্গগত পিতার সহিত চিত্রার পিতার বিশেষ আলাপ ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে কার্য্যোপলক্ষে যখন তক্ষশিলায় যেতেন, তখন আমাদের ওখানেই গিয়ে থাক্তেন। চিত্রাকে তাঁর পুত্রবধূ কর্বেন বড়ই সাধ ছিল।"

এই কথা শুনিয়া চিত্রা লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন।

মিহিরগুপ্ত কয়েক মুহূর্ত্ত পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াই ভাস্করাচার্য্যের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা এরূপ অপ্রত্যাশিত আকস্মিকভাবে সপ্রাণিত হইতে দেখিয়া, বিস্মিতভাবে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া ভাস্করাচার্য্যের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, ভাস্করাচার্য্য তখন কোথায়? তিনি তখন তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন।

চিত্রা সলজ্জ দৃষ্টিতে মিহিরগুপ্তের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল, "যাহার সঙ্গে আপনি কথা কহিতেছিলেন, সেই লোকটি কে? লোকটির চেহারা যেমন অসাধারণ, তেমনই ভয়ঙ্কর—বিশেষতঃ চোখ দুটি।"

চিত্রার কথা শুনিয়া মিহিরগুপ্ত ঈষৎ হাসিলেন।

অমরগুপ্ত কহিলেন, "কে! ভাস্করাচার্য্য! বাস্তবিকই লোকটি অসাধারণ! কি আশ্চর্য্য! আমাদের সঙ্গে এত দিনের আলাপ, তবু যাবার সময় একটু বলেও গেল না।"

মিহিরগুপ্ত বলিলেন, "লোকটা রাতদিন নিজের খেয়ালেই চলে।"

উৎসুকভাবে চিত্রা কহিল, "লোকটা কে, তা আপনারা কিছুতেই ভেঙ্গে বল্বেন না। কেবল বল্ছেন—লোকটা অসাধারণ, লোকটা এক রকম।"

মিহিরগুপ্ত কহিলেন, "লোকটির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জান্লে ত বল্বো। আমি এইটুকুমাত্র জানি যে, উনি এক জন সংসার-বিরাগী যোগী। ওঁর ধর্ম্মমত নিরীশ্বরবাদ। উনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ও তার্কিক। উঁহার জ্যোতিষের জ্ঞান অদ্ভুত। মুখ দেখিয়াই উনি লোকের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান বলিয়া দিতে পারেন।"

চিত্রার মাতা কহিলেন, "ওঃ—তা হ'লে লোকটা গণৎকার।"

মিহির। না। ঠিক ব্যবসায়ী গণৎকারও নন্।

চিত্রা। হাত দেখে আমিও অমন দু-চারটে গণনা ক'রে দিতে পারি।

মিহির। ভাস্করাচার্য্য কেবল চেহারা দেখেই এমনভাবে ভবিষ্যৎ ব'লে দিতে পারেন, যার অনেক কথা একেবারে ঠিক্‌ঠাক মেলে।

চিত্রা। বেশ, একবার দেখা হ'লে আমি আমার ভবিষ্যৎটা ওঁর কাছে থেকে গণিয়ে নেব। কিন্তু লোকটার যে কড়া চাহনি! ওঁর চোখ দেখ্‌লেই ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠে।

চিত্রার মাতা। চিত্রার আমাদের ঐ এক কেমন মিছে ভয়। কেন, লোকটার চাহনি এমন খারাপই বা কি?

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহারা গিয়া নিজ নিজ যানে আরোহণ করিলেন।

প্রকাশ্য বঙ্গালয়ে স্ত্রীপুরুষে এক স্থানে বসিয়া অভিনয় দর্শন করিতেছে, পরস্পর পরস্পরের সহিত পরিচিত হইতেছে, স্ত্রীলোক পুরুষের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতেছে, ইহা বোধ হয় পাঠকের চক্ষে একটু অসম্ভব ও দৃষ্টিকটু বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু পাঠক! মনে রাখিবেন, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ভারত সভ্যতার উচ্চতম শীর্ষে। বিক্রমাদিত্য, কণিষ্ক, অশোক ও চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় নৃপতি তখন ভারতের রাজা! কালিদাস, শঙ্কু, বেতালভট্ট প্রভৃতি তখন ভারতের কবি। মনু, অত্রি, হারীত প্রভৃতি তখন ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা। আত্রেয়ী, গার্গী, খনা, লীলাবতী প্রভৃতি তখন ভারতের গৌরবরূপিণী রমণী। সাহিত্য, অলঙ্কার, কাব্য, দর্শন, সঙ্গীত, চিত্র, সর্ব্ববিধ কলানুশীলনে ভারতের বাস্তবিকই তখন সত্যযুগ। ভারতের নৈতিক উন্নতি তখন চরমসীমায়। তখন অবরোধপ্রথার প্রয়োজনীয়তাও ছিল না, প্রচলনও ছিল না।

আমাদের এই আখ্যায়িকা সেই যুগের, সেই সমাজের। আধুনিক যুগের নহে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—:*:—

রঙ্গালয় হইতে বাহির হইয়া ভাস্করাচার্য্য বরাবর সিপ্রাতটস্থ প্রশস্ত রাজপথ বাহিয়া আপনার আবাসাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। রজনী তখন দ্বিপ্রহরের অধিক। নগরী তখন সুষুপ্ত। আকাশে চাঁদ হাসিতেছে, নক্ষত্রবধূরা হাসিতেছে। সিপ্রার স্বচ্ছ দর্পণে সেই হাসি প্রতিফলিত হইতেছে। নলিনীর নয়নের কোণে সেই হাসি উছলিয়া পড়িতেছে। ভাস্করাচার্য্য তাঁহার উপাস্য দেবতা মহিমময়ী প্রকৃতির গৌরবান্বিত মুখচ্ছবি দেখিতে দেখিতে আনন্দে আত্মহারা হইয়া আনমনে রাজপথ বাহিয়া চলিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিয়া আকাশপটে অঙ্কিত বিরাট কালপুরুষের মূর্ত্তির পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

ভাস্করাচার্য্য ভাবিতেছিলেন, "জগতের বেশীভাগ মানুষই কি গণ্ডমূর্খ, কি নির্ব্বোধের দল। তাহাদিগকে প্রতারিত করা কত সহজ। আভিজাত্যের অভিমানে অতিমাত্র স্ফীত, যথেচ্ছাচারিতা, অপব্যয়িতা ও দুর্ব্বৃত্ততার প্রতিমূর্ত্তি, উচ্ছৃঙ্খল যুবা মিহিরগুপ্ত আমার ভবিষ্যৎ-বাণীর সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে সপ্রমাণিত হ'তে দেখে চম্‌কে উঠ্‌লো, আমাকে এক জন অসাধারণ জ্ঞানী ব'লে ঠাউরে নিলে। দুয়ে-দুয়ে যোগ করিলে চার হয়, এ গণনায় ক্ষমতার কি পরিচয়! মিহিরগুপ্তের বিবাহসম্বন্ধে ভবিষ্যৎ-গণনাও কি ঠিক সেইরূপ নয়? কোন লোকের চরিত্র, প্রবৃত্তি, কার্য্যকলাপ জানা থাকিলে, ঘটনার সহিত ঘটনার যোগবিয়োগে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহা ভুল হইবে কেন? এই মিহিরগুপ্তের বিবাহ-প্রশ্ন লইয়াই দেখা যাক্ না। দুই দিন মাত্র পূর্ব্বে আমি মিহিরগুপ্তের নিকট-আত্মীয় অমরগুপ্তের মুখে তক্ষশিলার এই শ্রেষ্ঠি-কন্যার কথা প্রথম শুনি। সেই দিনই তাহার সহিত কথোপকথনে এইরূপ আভাস পাই যে, সে তাহার কোন নিকট-আত্মীয়ের সহিত এই শ্রেষ্ঠি-কন্যার বিবাহ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। আজ রাত্রে রঙ্গালয়ে অমরগুপ্ত, চিত্রা, চিত্রার মাতা ও মিহিরগুপ্তের এই আকস্মিক সমবায় হইতে ঘটনার যোগবিয়োগে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা কি কদাচ ভ্রান্ত হইতে পারে? না, এ গণনা বড় একটা কঠিন জিনিস?—কিছুই নহে! একটু ভাবিয়া দেখিলে এরূপ ভবিষ্যৎ-গণনায় সকলেই সক্ষম। কিন্তু কি মূর্খতা মানুষের, সে এই সামান্যমাত্র মস্তিষ্কচালনেও নারাজ।"

চলিতে চলিতে ভাস্করাচার্য্য সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। রাত্রি কত দেখিবার জন্য তাঁহার অঙ্গরাখার অভ্যন্তর হইতে একটি ঘড়ি বাহির করিলেন। ঘড়িটির গঠন অথবা উপাদান সাধারণ ঘড়ির ন্যায় নহে। যে ধাতুতে ইহা গঠিত, তাহা অনেকটা সুবর্ণের মত হইলেও সুবর্ণ অপেক্ষা বহুগুণে উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান্। পতঙ্গ যেমন দীপশিখার ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হইয়া ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া গিয়া তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়ে, একটি চোরও সেইরূপ অতর্কিতে ভাস্করাচার্য্যের পশ্চাৎ হইতে আসিয়া, তাঁহার হস্ত হইতে ঘড়িটি ছিনাইয়া লইল। ঘড়িটি চোরের হস্তে স্পৃষ্ট হইবামাত্র একটি তড়িৎ-স্রোত তাহার শরীরের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহার স্নায়ুপেশীগুলিকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। চোর হতবুদ্ধি হইয়া হাত ঝাড়িয়া ঘড়িটি ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু শক্তিশালী চুম্বক যেমন জোরে লৌহকে আকৃষ্ট করিয়া রাখে, ঘড়িটিও তাহার হস্তে সেইরূপ সংলগ্ন হইয়া রহিল। চোর একটি বিকট চীৎকার করিয়া স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, আর এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারিল না।

ভাস্করাচার্য্য তাহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু! কেন এ কাজ করিতে আসিয়াছিলে?"

চোর ত্রস্তভাবে তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিল; কোন উত্তর দিতে পারিল না। তাহার হাত তখন অসাড়। ঘড়িটি তাহার হাতে তখনও দৃঢ়সংলগ্ন।

ভাস্করাচার্য্য হাসিতে হাসিতে চোরের নিকট গিয়া আস্তে আস্তে তাহার হাত হইতে ঘড়িটি খুলিয়া লইয়া নিজের আঙরাখার পকেটে রাখিলেন। চোরের হস্ত শ্লথ ও শক্তিহীন হইয়া ঝুলিতে লাগিল।

ভাস্করাচার্য্য কহিলেন, "বন্ধু! ঘড়িটি তুমি লইয়া যে বড় লাভবান্ হইতে, তাহা বোধ হয় না। উটি তোমার অনেক অসুবিধার কারণ হইত। চোরাই মাল অনেক সময় তাহাই হয়। তুমি কিছু ভয় পাইয়াছ দেখিতেছি। হস্তের পেশীগুলি তোমার আঘাত পাইয়াছে মাত্র—বেশী কিছুই হয় নাই!

কিন্তু সাবধান! বুঝিয়া সুঝিয়া লোকের গায়ে হস্ত-স্পর্শ করিও। এই সভ্যতার যুগে, অনেক তড়িন্ময় যন্ত্রের কথা বোধ হয় শুনিয়াছ?"

রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে চোর কহিল, "তা হ'লে কি না খেয়ে মরবো না কি?"

ভাস্করা। বন্ধু! মিথ্যা কথা ব'লে কেন আরও পাপের বোঝা ভারী করছ? না খেতে পেলেই কি অমন নাদুস্‌-নুদুস্‌ দেহ থাকে? চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় রীতিমত তোমার চলে, তা আমি বেশ জানি; বন্ধু! তুমি পেটের দায়ে চোর নও। চুরি তোমার ব্যবসা। যাক্‌, বোধ হয়, এখন অনেকটা আরাম বোধ ক'চ্ছ! এখন এস। রাত্রি ঢের হয়েছে!

এই বলিয়া ভাস্করাচার্য্য ধীরে ধীরে তাঁহার গন্তব্যপথে চলিতে লাগিলেন। চোরও নিষ্ফল ক্রোধে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

ভাস্করাচার্য্য আপন মনে বলিতে লাগিলেন—'মূর্খ! নিরেট বোকার দল! চোরে চুরি করে, নরহন্তা হত্যা করে, চাষা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাহার প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে। নরনারী খায় বেড়ায়, পাশবরবৃত্তি পরিতৃপ্ত করে। কেন? কি উদ্দেশ্যে? সৃষ্টি কিংবা প্রলয়? জীবন অথবা মরণ? স্বর্গ না নরক? জ্ঞান অথবা মোহ? দয়া না নিষ্ঠুরতা? ঈশ্বর না সয়তান? কোন্‌টা ঠিক? কোন্‌টা সত্য? জগৎ! তোমার অন্তর্নিহিত সত্য কি, আমি জান্‌বো, কিছুতেই ছাড়্‌বো না।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—:*:—

সিপ্রাতটে একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন উদ্যান-বাটিকায় ভাস্করাচার্য্যের আবাস। আবাসে প্রত্যাগমন করিয়া ভাস্করাচার্য্য বার বার নিজের কক্ষে গেলেন। রজত-নির্ম্মিত দীপাধারে দীপ জ্বলিতেছিল। সমস্ত ঘর জুড়িয়া একখানি পরিষ্কৃত গালিচা পাতা। তাহার ঠিক মধ্যস্থলে একখানি অজিন আস্তৃত। দেয়ালের গায়ে তাকে স্তরে স্তরে সজ্জিত কেবল পুথি ও পুরাতন কীটদষ্ট পুস্তকাদি। ঐ মৃগচর্ম্মের আসনে বসিয়া ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সমীপস্থ একরাশি চিঠির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন—আপন মনে কহিলেন, "আজ আর চিঠিগুলি খুলিবার অবসর আমার নাই। কি আশ্চর্য্য! মানুষের একটু মৌলিকত্ব দেখিলেই সংসারের লোক, তাহাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া ত্যক্ত করিয়া তুলে। আমি এক জন অতি সামান্য নগণ্য লোক। কত রাজা-রাজড়া আমার সহিত আলাপ করিবার জন্য ব্যস্ত! কেন? আমি তো তাহাদিগকে তোষামোদ করি না, তাহাদের অনুগ্রহপ্রার্থীও নহি। তবে কেন তাহারা আমার সহিত আলাপ করিবার জন্য ব্যস্ত? তাহার কারণ হচ্ছে আমার মস্তিষ্ক।"

ভাস্করাচার্য্য সহসা দীপের দিকে চাহিলেন। সংযতভাবে একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়াই রহিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই এক জন যুবক দ্বার ঠেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। যুবকের আকৃতি রতিপতির ন্যায় চিত্ত-বিমোহন তাহার বয়স একুশ বাইশ।

ভাস্করা। প্রদ্যুম্ন! তুমি আমার আহ্বান শুন্‌'ত পেয়েছ?

প্রদ্যুম্ন। তা না হ'লে কি ক'রে জান্‌তে পার্‌লাম, গুরুদেব! যে, আপনি বাড়ী ফিরে এসেছেন? গুরু! আপনার এত রাত্রি হ'ল কেন? আমার যে বড় ভয় কচ্ছিল।

ভাস্করা। বালক! ভয় কিসের?

প্রদ্যুম্ন। তা জানি না, গুরুদেব! তবে আপনি না থাকলে, এ বাড়ীতে একা আমার কেমন ভয় ভয় করে।

ভাস্করা। কোনও ভয় নাই! তুমি আহারাদি করেছ?

প্রদ্যুম্ন। আজ্ঞে হাঁ, গুরুদেব!

ভাস্কর। কৃত্তিকা?

প্রদ্যুম্ন। কৃত্তিকা আহার করেছে। তবে তাহার মেজাজটা আজ যেন একটু খারাপ দেখ্‌লাম। বড় কথাবার্ত্তা কইলে না। খেয়েই গিয়ে শুয়ে পড়েছে।

ভাস্করা। যাও প্রদ্যুম্ন! রাত্রি অনেক হয়েছে। তুমিও শোও গে।

প্রদ্যুম্ন প্রস্থান করিল। ভাস্করাচার্য্য ভাবিতে লাগিলেন, কৃত্তিকার মন-খারাপের কারণ কি? প্রদ্যুম্ন, কৃত্তিকা, লীলা এই তিন জনের কাহারও তো আমার ইচ্ছাশক্তি ছাড়া স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তবে কেন আমার এই প্রবল ইচ্ছাশক্তির মধ্য দিয়ে তাহাদের

স্বাতন্ত্র্য মাঝে মাঝে উঁকি মারে? ইহার কারণ কি, আমাকে এখনি তা দেখ্‌তে হলো।"

এই কথা বলিয়া ভাস্করাচার্য্য ত্রিতলে উঠিয়া গিয়া একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এই কক্ষে তখনও দীপ জ্বলিতেছিল। এক পার্শ্বে পর্য্যঙ্কে এক-জন বর্ষীয়সী রমণী নিদ্রা যাইতেছিল। ভাস্করাচার্য্য প্রবেশ করিবামাত্রই রমণী নিদ্রোত্থিত হইয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া আসিয়া তাঁহার সমীপে দাঁড়াইল। অদূরে ভিত্তিগাত্রে একখানি প্রস্তর-ফলক ও একটি লেখনী ঝুলিতেছিল। ভাস্করাচার্য্য সেইখানি লইয়া কি লিখিতে লাগিলেন ও রমণীকে তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিলেন।

ভাস্করাচার্য্য লিখিলেন, "আজ কোন পরিবর্ত্তন কি লক্ষ্য করিয়াছ?"

কৃত্তিকা। কিছুই না।

ভাস্করা। নড়ে চড়ে নাই?

কৃত্তিকা। একেবারেই না।

ভাস্করা। তোমার মনটা আজ এত ভার ভার কেন?

কৃত্তিকা। আমার আবার মন কি? ক্রীতদাসীর আবার মন কি?

ভাস্করা। আমার ধারণা ছিল, তোমার এ দাসত্বে তুমি সুখী নও! কৃত্তিকা! লীলার পরিচর্য্যা করায় কি তুমি সুখ অনুভব কর না? লীলাকে কি তুমি ভালবাস না?

কৃত্তিকা। পাথরের মূর্ত্তি কিংবা কাপড়ে আঁকা পটকে ভালবেসে লাভ কি? ভালবাসা আদান-প্রদানে। জড়ের সঙ্গে মানুষের ভালবাসা কেমন করিয়া সম্ভবে? ভালবাসা! আমি ভালবাস্‌তে জানিনি? বেশ জানি। কিন্তু কি করব? আমাদের হৃদয়ের কবাটের চাবি আপনার হাতে।

ভাস্করা। রাত্রি অনেক হইয়াছে, কৃত্তিকা! তুমি শোও গিয়া, আমি একবার লীলাকে দেখিয়া আসি।

কৃত্তিকা নিঃশব্দপদসঞ্চারে গিয়া পর্য্যঙ্কে শয়ন করিল। ভাস্করাচার্য্য কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার প্রবল তড়িচ্ছক্তিপূর্ণ নয়নের দৃষ্টি প্রৌঢ়া বিগতযৌবনা কৃত্তিকার-দিকে লগ্ন করিয়া মনে মনে কহিলেন—'রমণী! তুমি বিধবা ও সংসারে একাকিনী। তুমি বধির। আমার ইচ্ছাশক্তির বলে তুমি এখনি নিদ্রাগত হও। অতীতের সহস্র সোনালি স্বপ্ন তোমার হৃদয়ে ফুটে উঠুক। তোমার যৌবন ফিরে আসুক্। তোমার বধিরতা দূর হ'ক্।'

এই কথা বলিয়া,ভাস্করাচার্য্য সেই কক্ষের ভিত্তি-সংলগ্ন একটি সবুজ মখমলের পর্দ্দা সরাইয়া ফেলি-লেন। যবনিকার অন্তরালে যেন আমার ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হইল।

একখানি মূল্যবান্ মেহগনি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে সুবর্ণতন্তুবিজড়িত ঝালর-যুক্ত কিংখাপের গদীর উপর কৌষেয় বসনের মসৃণ আস্তরণ। দুইটি সুকোমল মখমলের উপাধান! সেই পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া আছে এক জন ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী। যুবতী তন্বী, গৌরাঙ্গী। তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ আলুলায়িত অলকা যেন শিরোদেশে প্রাবৃটের জলদমালা রচনা করিয়াছে। অপরিসর ললাটে মুক্তাফলের ন্যায় বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম। তাহার উপর দুই একটি চূর্ণ-কুন্তলের গুচ্ছ আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার গণ্ড-যুগলে বস্‌রাই গোলাপের অরুণিমা। ঠোঁট দুখানি পাতলা ও পক্ক বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ। অধরোষ্ঠ ঈষৎ ভিন্ন হওয়ায় তাহার মৌক্তিক দশনগুলি অল্প দেখা যাইতেছিল। রমণীর গলায় একটি বহুমূল্য মুক্তার হার; তাহার মধ্যস্থলে একখানি পদক। এই পদকখানি অষ্ট-ধাতুমিলিত ও নবরত্নখচিত। ইহার মধ্যস্থলে একখানি বহুমূল্য চুণি। লীলার দক্ষিণ হস্ত এই মণিখানির উপরে ন্যস্ত থাকে। এক কথায় রমণী পরমা সুন্দরী।

ভাস্করাচার্য্য অতি সন্তর্পণে গিয়া পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে বসিলেন। তড়িদ্বহ সূত্রের সংযোগমাত্রেই যেমন বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিয়া উঠে,ভাস্করাচার্য্য পালঙ্কে উপবেশন করিবামাত্র সেইরূপ লীলার মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। ভাস্করাচার্য্য কিছুক্ষণ একদৃষ্টে রমণীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন; তাহার বাম-হস্তখানি নিজের হস্তে লইয়া, তাহার মণিবন্ধ দুই অঙ্গুলি দ্বারা একটু চাপিয়া ধরিয়া অনুচ্চস্বরে ডাকি-লেন, "লীলা! লীলা! তুমি কোথায়?"

"এই যে আমি এইখানেই।"

"তুমি বেশ ভাল আছ?"

"হাঁ, বেশ আছি।"

"লীলা! তুমি এখন কি কি জিনিস দেখ্‌তে পাচ্ছ?"

"অসাধারণ সৌন্দর্য্য। অনন্ত সুষমা! অফুরন্ত আলো! কিন্তু কৈ, তোমাকে ত সেথায় দেখ্‌ছি না! কেবল তোমার গলার স্বর শুন্‌তে পাচ্ছি। তোমার আওয়াজ শুন্‌লে আমার আর থাক্‌বার যো নাই। আমাকে তোমার কাছে আস্‌তেই হবে।"

"আস্‌তে হবে? তা হ'লে তুমি এখানে সর্ব্বক্ষণ থাক না? কোথায় থাক?"

"মুক্ত বিহঙ্গিনীর মত সৌন্দর্য্য হ'তে সৌন্দর্য্যান্তরে, নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রান্তরে ঘুরে বেড়াই।"

"সেখানে কি দেখ্‌তে পাওয়া যায়?"

"কোথাও দেখি, ব্যোমস্পর্শী তুষার-কিরীটী অদ্রিমালা। কোথাও দেখি, অনন্তবিস্তৃত জলোচ্ছাসময় মহোর্ম্মি। কোথাও দেখি, সিংহব্যাঘ্রাদিসেবিত ভীষণ অরণ্যানী। কোথাও দেখি, শ্যামল-শাদ্বল-শষ্প-বিলসিত ক্ষেত্র। কেবল শোভা! কেবল সুষমা! কেবল আনন্দ! সে শোভার পরিমাণ নাই। সে আনন্দের শেষ নাই।"

"কোথাও দুঃখ, জরা, মৃত্যু দেখ্‌লে না?"

"না।"

"আবার যাও। ব্যোম ভেদ ক'রে অনন্ত শূন্যের মধ্য দিয়ে ঐ দীপ্তিমান্ আলোকপিণ্ডে প্রবেশ কর গিয়ে। মঙ্গল গ্রহের সকল স্থান তন্ন তন্ন অন্বেষণ ক'রে আমার নিকট ফিরে এস।"

"যে আজ্ঞা।"

ভাস্করাচার্য্য কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে লীলার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। লীলার মুখে সুষুপ্তির শান্তি বিরাজিত।

ভাস্করাচার্য্য ডাকিলেন, "লীলা! এসেছ?"

"হাঁ।"

"কি দেখলে?"

"কই, দুঃখ, জরা, মৃত্যু তো কোথাও দেখ্‌তে পেলেম না। তুমি কে? তুমি কেন আমাকে, যা নেই তারই নিষ্ফল অন্বেষণে পাঠাও? আমি তোমাকে দেখ্‌তে পাই না? শুধু তোমার কথা শুনি। তোমার আজ্ঞা পালন করি।"

"মৃত্যুর সন্ধান পেলে না? দুঃখ জরা দেখ্‌তে পেলে না? সত্য?"

"মিথ্যা কেন বল্‌বো?"

"মৃত্যু এখানেও নাই?"

"না—এখানকার ভাষায় যাকে মৃত্যু বলে, সেটা মৃত্যু নয়, জীবন। নির্ব্বাণ নয়, পরিবর্ত্তন।"

"তুমি স্বপ্ন দেখ্‌ছো, লীলা?"

"কেন দেখাচ্ছ? আমায় ছেড়ে দাও না! আমি চ'লে যাই! আমি তো এখানে আস্‌তে চাই নি। কেন আমাকে তবু ডেকে আন?"

লীলার মুখে যেন একটু অভিমানের ছায়া ফুটিল। তাহার মুখের একটু ভাব-পরিবর্ত্তন হইল।

ভাস্করাচার্য্য ডাকিলেন, "লীলা!"

লীলা নিরুত্তর।

ভাস্করাচার্য্য আবার ডাকিলেন "লীলা!"

কোন উত্তর পাইলেন না। আপনার মনে কহিলেন, "চলিয়া গিয়াছে।" ভাস্করাচার্য্য আস্তে আস্তে লীলার হস্ত দুইখানি তাহার বুকের উপরে, কণ্ঠহারে পদকের মধ্যমণিটি স্পর্শ করাইয়া রাখিয়া, ধীরে ধীরে সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। যাইবার সময় ভিত্তিগাত্রে বিলম্বিত প্রস্তর-ফলকে লিখিয়া রাখিয়া গেলেন—"আমি দুই দিনের জন্য স্থানান্তরে যাইব। এই দুই দিনই দিনের বেলা সমস্ত দরজা-জানালা খুলিয়া দিবে, যেন যথেষ্ট পরিমাণে বাতাস ও সূর্য্যালোক গৃহে প্রবেশ করিতে পারে। ঘরে বেশী গোলমাল করিবে না। ভুলিয়াও তাহাকে স্পর্শ করিবে না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—:*:—

"পরজন্ম একটা কথার কথা। মানুষ ম'রে গেলে আবার ফিরে আসে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। এইখানেই স্বর্গ, এইখানেই নরক। খাও, দাও, স্ফূর্ত্তি কর—ইহাই সার নীতি।"

বক্তা এক জন প্রৌঢ়বয়স্ক তান্ত্রিক বৌদ্ধ। তাহার দেহ হৃষ্ট-পুষ্ট, বলিষ্ঠ, গলে রুদ্রাক্ষের মালা, হস্তে অক্ষবলয়। কপালে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক।

ভাস্করাচার্য্য জিজ্ঞাসিলেন, "আপনারই লিখিত এই পত্রখানি। আপনি একটি বৌদ্ধ-বিহারের পরিচালক।"

"আপনার অনুমান ঠিক।"

"বিহারের অপরাপর ভিক্ষুকগণের সহিত আপনার সদ্ভাব নাই।"

"হাঁ!—না!—ঠিক সদ্ভাব—তা বটে—তবে বিশেষ ঝগড়াও নাই।"

"আপনি কি জানিতে চাহেন?"

"আপনি জ্যোতিষী। আপনিই বলুন, আমি কি চাই।"

"তাহা বড় আপনার শ্রুতি-সুখকর হইবে না।"

"সে ভাবনায় আপনার প্রয়োজন নাই। আপনি বলুন না, শুনি।"

"কোন বিবাহিতা রমণীর প্রতি আপনি আসক্ত।"

"মিথ্যা কথা!"

আমার কথা মিথ্যা! হতভাগ্য মানব! তোমার সমস্ত জীবনটা কতকগুলি বিরাট মিথ্যা ও প্রবঞ্চনায় রচিত। আর তোমার মুখে, চোখে, প্রতি অঙ্গসঞ্চালনে তাই প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। মূর্খ! যে অনন্ত শক্তি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে পরিগণিত করছে, তুমি সেই শক্তিকে প্রতারিত করিতে চাও! কি ধৃষ্টতা! আরও শুন—তুমি সেই রমণীকে লাভ করিবার জন্য তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে নানা প্রকারের অভিচারও আরম্ভ করিয়াছ।"

"এ কথাও ঠিক নহে।"

"ঠিক কি বেঠিক, তাহা তুমি নিজেই ভাল জান। সময় থাকৃতে সাবধান হও—স্থির জানিও, এই রমণীই আপনাকে হত্যা করিবে।"

সহসা এই প্রচ্ছন্নাচার তান্ত্রিক বৌদ্ধের মুখ ছাইয়ের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। ভীতি-বিজড়িত স্বরে সে কহিল, "আপনার অনুমান ঠিক। তবে কথাটা যেন আপনি প্রকাশ করিবেন না।"

ভাস্করাচার্য্য উত্তর দিলেন, "আপনি সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন! আর অর্দ্ধ-প্রহর পরে আপনার সহিত দেখা হইলে আপনাকে চিনিতে পারি কি না, বলিতে পারি না।"

তান্ত্রিক আর কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে এক পা দুই পা করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় ক্রোধে ঈর্ষ্যায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ওঃ—কি দাম্ভিকতা! কি অহঙ্কার! ভৈরবী! দর্প চূর্ণ কর।"

ভাস্করাচার্য্য একটু মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই প্রদ্যুম্ন আসিয়া ভাস্করাচার্য্যকে নমস্কার করিল ও তাঁহাকে বহির্গমনোপযোগী বেশে সজ্জিত দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, "আপনি এখন বাহিরে যাইবেন না কি?"

ভাস্করা। হাঁ প্রদ্যুম্ন! আমি দুই দিনের জন্য একটু স্থানান্তরে যাইব।

প্রদ্যুম্ন। কত দূর?

ভাস্করা। রঘুজী পন্থের আশ্রমে।

প্রদ্যুম্ন। কে? পাগ্‌লা রঘুজী?

ভাস্করা। তোমার অনুমান ঠিক। তবে পাগল এ সংসারে একা রঘুজীই নয়। আমিও পাগল, তুমিও পাগল। যার যেটা ঝোঁক্। যার যেমন খেয়াল। রঘুজীর খেয়াল, বিজ্ঞানবলে সৌদামিনীকে আজ্ঞানুবর্ত্তিনী করে, তাহার বর্ষব্যাপী চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমের ফলে রচিত শিলাচক্রে বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ হইতে আলোকরশ্মি সমানীত ও কেন্দ্রীভূত করে, তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা। তাতে তার অপরাধ?

প্রদ্যুম্ন। আমায় ক্ষমা কর ভাই, রঘুজীকে পাগল বল্লে যে তুমি রুষ্ট হবে, তা আমি ভাবি না।

ভাস্করা। না ভাই, আমি তোমার উপর রুষ্ট হই নাই। তবে তোমাকে এই উপদেশ দিচ্ছি যে, সংসারে যখন সকলেই পাগল, তখন পাগ্‌লামিটা উপহসনীয় নয়! যাহা হউক, শিবিকা প্রস্তুত, আমি চলিলাম। তোমরা সাবধানে থাকিও। অনর্থক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া নিয়তির হস্তাঙ্কিত সীমা উলঙ্ঘন করিয়া ইচ্ছা করিয়া, দুঃখের বোঝা নিজের স্কন্ধে টানিয়া আনিও না।

ভাস্করাচার্য্য প্রস্থান করিলে পর, প্রদ্যুম্ন একটু বিষণ্ণভাবে কক্ষে পদচারণা করিতে লাগিল। তাহার যেন কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। সহসা গালিচার উপরে নজর পড়ায় প্রদ্যুম্ন দেখিল, একখানি হস্তলিখিত পুরাতন পুথি ভাস্করাচার্য্যের আসনের সন্নিকটে খোলা রহিয়াছে। তিনি যেন সেইখানি পড়িতে পড়িতে অন্যমনস্কভাবে উঠিয়া গিয়াছেন। পুথিখানি তুলিয়া রাখিয়া যাইতে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন।

প্রদ্যুম্ন সেইখানে গিয়া বসিলেন। পুথিখানির যেখানে খোলা আছে, সেইখানটা পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পুস্তকখানির ভাষা যদিও সংস্কৃত, কিন্তু তাহা এত প্রাচীন যে, প্রদ্যুম্ন সকল কথার

অর্থোপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলেন না। আর একটি সমস্যা তাহাকে বড়ই চিন্তিত করিয়া তুলিল। প্রদ্যুম্ন পুস্তকখানি পাঠের জন্য নিকটে লইতেই যেন তাহার লেখাগুলি অস্পষ্ট ও পরস্পর জড়িত হইয়া আসে। আবার যখনই পুস্তকখানি রাখিয়া দেন, তখনই লেখাগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। তিনি বিস্মিত হইয়া পুস্তকখানি লইয়া জানালার নিকট গেলেন। নবোদিত সূর্য্যের পরিপূর্ণ আলোকে পুস্তকখানির যে অংশ খোলা ছিল, সেই অংশ পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহাতে লেখা আছে—"জ্ঞান, অনুভূতি, প্রীতি, ঘৃণা, ঈর্ষ্যা, হিংসা, জিঘাংসা প্রভৃতি উৎকট মনোবৃত্তিগুলি সম্বন্ধে কথা হইতেছে এই যে, তাহাদিগকে প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে, এক আত্মা হইতে অপর আত্মায় সংক্রামিত করা যাইতে পারে। ইহা যোগের একটি অংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। দুইটি প্রক্রিয়া দ্বারা এই বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করা যায়। প্রথমতঃ, যাহার আত্মায় ঐরূপ কোনও বৃত্তি সংক্রামিত করিতে হইবে, তাহাকে অন্তর্নিহিত চৌম্বক শক্তি দ্বারা প্রাণিত কোন উজ্জ্বল বস্তুর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রাখিতে হইবে। অথবা প্রবলতর ইচ্ছাশক্তিবলে তোমার চক্ষুর্দ্বয়কেই একটি চুম্বকে পরিণত করিয়া, যাহার আত্মায় তোমার ইচ্ছাশক্তিমত প্রবৃত্তি সংক্রামিত করিতে হইবে, তাহার চক্ষুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা। এতদুভয়বিধ প্রক্রিয়া দ্বারাই তাহার চক্ষুর্দ্বয়ের স্নায়ুমণ্ডলী জড় ও নিষ্ক্রিয় হইয়া আসিবে। তখন তাহার মস্তিষ্ক তোমার দ্বারা সংক্রামিত প্রবৃত্তিগুলিকে অতি স্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত ও তোমার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চালিত করিবে। তখন সেই বশীভূত আত্মাকে, যাহা তুমি দেখাইতে চাও, তাহাই দেখিবে; তুমি যাহা বলাইতে চাও, তাহাই বলিবে। তাহার স্বাধীন সত্তা আর কিছুই থাকিবে না।।"

পুস্তকের এই কয়েকটি ছত্র পাঠ করিয়াই প্রদ্যুম্নের শরীর ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে মনে করিল, 'তবে কি আমি যে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করছি, যে প্রাণোন্মাদকর সঙ্গীত-সুধারসে নিরন্তর ডুবে আছি, সে সমস্তই ভাস্করাচার্য্যের অতি প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সংক্রামিত? তবে কি আমার আত্মার কোন স্বাধীন সত্তা নাই? তবে কি সত্যই আমি ভাস্করাচার্য্যের প্রবল চৌম্বক-শক্তির অনুবর্ত্তী হয়ে জড়ের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করছি? সেই জন্যই কি প্রগাঢ় সুষুপ্তির মধ্যেও তার আহ্বান আমার কানে প্রবেশ করে। কি জানি, কি অজানিত আকর্ষণে আমাকে তখনই তার পানে টেনে নেয়।'

প্রদ্যুম্ন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আকুল-ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। দারুণ চিন্তায় সে সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় দেখিতে লাগিল। মুক্ত বাতায়নপথে কক্ষে পতিত নবোদিত হেমোজ্জ্বল সূর্য্যকর তাহার নিকট নিষ্প্রভ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সহসা কে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার স্কন্ধদেশে হস্তস্পর্শ করিল। প্রদ্যুম্ন চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিল। দেখিল—কৃত্তিকা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—:*:—

কৃত্তিকার মুখের ভাব আজ যেন একটু বিশেষ পরিবর্ত্তিত। তাহার বার্দ্ধক্যশীর্ণ মুখে আজ যেন যৌবনের চাপল্য। তাহার কুঞ্চিত নয়নকোণে হাসির সৌদামিনী-রেখা। আজ তাহার মুখ গাম্ভীর্য্যের ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন নহে। আজ সে বড় মুখরা।

প্রদ্যুম্নের কানের কাছে মুখ লইয়া কৃত্তিকা জিজ্ঞাসিল, "গুরুদেব বেরিয়ে গিয়েছেন?"

অঙ্গুলিসঙ্কেতে প্রদ্যুম্ন উত্তর দিল,—"হাঁ।"

কৃত্তিকা। কোথায়? শীঘ্র ফিরবেন না কি?

প্রদ্যুম্ন। দুই দিন পরে।

কৃত্তিকা। বেশ হয়েছে। আজ রাত্রে তা' হলে নিশ্চয়ই আসবে না। লোকটা হয় দেবতা, না হয় ভূত। তবে আমায় প্রাণে বাঁচিয়েছে। আমাকে মরণের গ্রাস হ'তে কেড়ে নিয়ে এসেছে। প্রদ্যুম্ন! তুমি কি আমায় বৃদ্ধা জরাগ্রস্তা ব'লে ঘৃণা কর? হা! হা! তা করো না। আমিও এক দিন যুবতী ছিলাম। আমারও স্বামী ছিল। আমাকে কত ভালবাসতো! আমি স্বপ্নে কাল সব দেখেছি। গুরুর কৃপায় কাল বড় আনন্দ লাভ করেছি।

প্রদ্যুম্ন। কৃত্তিকা, তুমি পাগল হ'লে না কি? কি আবোল-তাবোল বক্‌ছ?

কৃত্তিকা। আমি পাগল না পাগল তুমি, প্রদ্যুম্ন?

আমি স্ত্রীলোক, আমি বৃদ্ধা, আমার সংসারে কেউ নেই, আমার আর ভোগের সময় নাই। স্পৃহা আছে, কিন্তু শক্তি নাই, সুবিধা নাই। তুমি কি প্রদ্যুম্ন? তোমার যৌবন-মসৃণ দেহ হ'তে নিরুপম লাবণ্য ক্ষরিত হচ্ছে, তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসে সদ্যঃ প্রস্ফুটিত কুমুদিনীর সৌরভ, তোমার বিশাল বক্ষঃস্থল মদনের রঙ্গভূমি, তোমার ভ্রূভঙ্গে কুসুমায়ুধের বিমোহন চাপের ভঙ্গিমা। প্রদ্যুম্ন, ঈশ্বরের অনুগ্রহে যৌবন যদি পেয়েছ, তবে উপভোগ করবে না কেন? জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ রমণীর প্রেম। যাতে সেই অমূল্য জিনিস পাও, এস প্রদ্যুম্ন, আমি তোমাকে সেই রাস্তা দেখিয়ে দিই।

প্রদ্যুম্ন। তুমি কি বলছ কৃত্তিকা? আমি কিছুই বুঝতে পারছিনি।

কৃত্তিকা। তা পারবে কেন? তুমি ত আর 'তুমি' নও, তুমি যে—'সে'। তাই ত তোমাকে বলছি আজ বেশ সুবিধা, আজ গুরু এখানে নেই, আজ আমি তোমার চোখ ফুটিয়ে দেবো। এসো, আমার সঙ্গে এসো।

প্রদ্যুম্ন। কোথায় যাব?

কৃত্তিকা। ত্রিতলে ঐ ঘরে।

প্রদ্যুম্ন। ও ঘরের দিকে চাইতেও গুরুর নিষেধ।

কৃত্তিকা। তা জানি, গুরুর নিষেধ কেন, জান? ভয়ে, ঈর্ষ্যায়। প্রদ্যুম্ন, পাছে তোমার ভুবন-বিমোহন রূপ দেখে সে ভুলে যায়, সেই জন্য।

প্রদ্যুম্ন। কে?

কৃত্তিকা। কে?—নিজের চোখে তাকে দেখ্‌বে এসো।

কৃত্তিকার রহস্যপূর্ণ কথায় প্রদ্যুম্নের মন যৎপরোনাস্তি আন্দোলিত হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, গুরু বলেন, সমস্তই নিয়তি। বাস্তবিক কি তাই? পুরুষকারের বলে কি নিয়তি খণ্ডিত হয় না? স্বাধীন প্রবৃত্তি কি কিছুই নয়? কি করি? আমার হৃদয়ে বিষম কৌতূহল হচ্ছে। প্রলোভনকে পদাঘাতে দূরীভূত করি, কি এই রহস্যের উদ্‌ঘাটনের জন্য গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করি? কি করি, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না।

ভাস্করাচার্য্য প্রস্থানকালে তাহাকে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সেই কথা বারবার তাহার মনে হইতে লাগিল—"অনর্থক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া নিয়তির হস্তাঙ্কিত সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া ইচ্ছা করিয়া দুঃখের বোঝা নিজের স্কন্ধে টানিয়া আনিও না।"

প্রদ্যুম্নের সমস্ত দিন এই চিন্তায় কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—:*:—

উজ্জয়িনী হইতে কিছু দূরে সিপ্রাকূলে বিশাল অরণ্য; তাহারই একদেশে লোকালয় হইতে বহুদূরে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, অট্টালিকার অনেকগুলি কক্ষই একেবারে বাসের অযোগ্য। দুই তিনটি কক্ষ মধ্যে মধ্যে জীর্ণ সংস্কৃত হওয়ায় একটু পরিচ্ছন্ন। এইখানেই তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহারাষ্ট্রীয় জ্যোতির্ব্বিদ রঘুজী পন্ত বাস করেন। রঘুজী সংসারে একক। তাঁহার পুত্র-কলত্রাদি সকলেই পরলোকে। একজনমাত্র পুরাতন ভৃত্য লইয়া রঘুজী সংসারের কোলাহল হইতে বহুদূরে এই অটবীপ্রান্তে আসিয়া গণিত ও বিজ্ঞানের চর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। ভাস্করাচার্য্য ও তাঁহার পুরাতন ভৃত্য ভিন্ন সংসারে রঘুজী পন্তের অন্য কোন আত্মীয় বা বন্ধু ছিল না। তাই বিপদ্ আপদ্, অভাব-অভিযোগের কারণ যদি কিছু হইত,তবে ভাস্করাচার্য্যকেই তিনি তাহা জানাইতেন। ভাস্করাচার্য্য ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহার আশ্রমের সন্ধান বড় একটা জানিত না। আর কেহ সেথায় আসিতও না।

ভাস্করাচার্য্য রঘুজী পন্তের আবাসে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, রঘুজীর ভৃত্য সান্ধ্য-ধূপ-দীপাদি-দান কর্ম্মে ব্যস্ত রহিয়াছে। ভাস্করাচার্য্যকে দেখিয়াই সে দৌড়িয়া আসিয়া গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

ভাস্করাচার্য্য জিজ্ঞাসিলেন, "রঘুজী কেমন আছেন?"

ভৃত্য উত্তর করিল, "তাঁহার শরীর বড় দুর্ব্বল। না খেয়ে, না দেয়ে রাতদিন ব'য়ে-মুখে থাক্‌লে আর কি বেশীদিন বাঁচবেন? আপনি এসেছেন—আপনার পায়ে পড়ি দাদাঠাকুর, দেখুন ব'লে ক'য়ে যদি চারটি

খাওয়াতে পারেন। আপনারও বোধ হয় মধ্যাহ্নে খাওয়া-দাওয়া হয় নি। আমি শীঘ্র শীঘ্র গিয়া পাকের যোগাড় করিয়া দিতেছি।"

ভাস্করা। মহাদেও! তোমার ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আজ একাদশী, একাদশীর দিন আমি উপবাস করি।

ভৃত্য। ও—সত্যিই তো, দাদাঠাকুর, আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। বুঁড়ো হলে ঐ রকম ভুল হয়ে যায়, তা একটু দুধ ও কিছু ফলটলও খাবেন না?

ভাস্কর। না মহাদেও! কাল মধ্যাহ্নের জন্য পারণের ব্যবস্থাটা ভাল করিয়া কর গিয়া। এখন রঘুজী কোথায়, তাই আমাকে বল।

ভৃত্য। তিনি আর কোথায়? তাঁর সেই চিলের ঘরে।

ভাস্করা। আমি সেইখানেঁ গিয়েই তা হ'লে তাঁর সঙ্গে দেখা করি।

সোপানে ভাস্করাচার্য্যের পদশব্দ পাইয়া রঘুজী আহ্লাদে আটখানা হইয়া বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন ও স্নেহ গদ্‌গদস্বরে কহিলেন, "ভাস্কর! আমি তোমার পায়ের শব্দ শুনেই বুঝ্‌তে পেরেছি যে তুমি। ঠিক সময়েই এসে পড়েছ ভাস্কর। আর একটু দেরি হ'লেই হয় ত আর আমায় দেখ্‌তে পেতে না। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথাবার্ত্তা আছে। ঘরের মধ্যে এসো, সব একে একে বলি গিয়ে। আমার অন্তিম-কাল সমাগত। আমি কিছুই সেরে যে'ত পারলাম না ভাস্কর, সময় পেলাম না। বড় শীঘ্র শীঘ্র, কাজ সারা না হ'তে হ'তেই আমাকে যেতে হ'ল।"

ভাস্করা। না রঘুজী, তুমি কোন চিন্তা করিও না। তুমি মর্‌বে না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তুমি একটু অবসন্ন ও ক্ষীণবল হয়েছ বটে। একটু বিশ্রাম, একটু সুষুপ্তি আবার তোমাকে সুস্থ ক'রে তুল্‌বে। তোমার আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত কর্‌বার জন্য যথেষ্ট সময় তুমি পাবে। আমি তোমার জীবিত কালকে প্রলম্বিত ক'রে দিব।

রঘুজীর মুখে একটু ম্লান হাসিরেখা দেখা দিল। ভাস্করাচার্য্যের কথা তাঁহার বিশ্বাস হইল না; ক্ষীণ-স্বরে রঘুজী কহিলেন, "সে কি সম্ভব ভাস্কর? তুমি মানুষ। স্বয়ং ঈশ্বর যা কর্‌তে পারেন না, সে কার্য্য তুমি কেমন ক'রে কর্‌বে, আমি বুঝ্‌তে পারি না।"

অবিচলিতভাবে ভাস্করাচার্য্য কহিলেন, "কেমন ক'রে কর্‌ব, তা তোমার চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিচ্ছি। তা হ'লে তো প্রত্যয় হবে।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার অঙ্গরাখার ভিতর হইতে একটি স্ফটিকের শিশি বাহির করিলেন। শিশিটি এক-প্রকার অতি উজ্জ্বল লোহিতবর্ণের তরল পদার্থে পূর্ণ। শিশির মুখে একটি বিচিত্রভাবে খোদিত সুবর্ণনির্ম্মিত ছিপি। এই স্ফটিকশিশির গায়ে দীপা-লোক প্রতিফলিত হইয়া সেই কক্ষমধ্যে যেন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইন্দ্রধনু রচনা করিল।

রঘুজী আশ্চর্য্যান্বিতভাবে সেই দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শিশিতে কি?"

ভাস্করা। অমৃত।

রঘু। উহার গুণ?

ভাস্করা। মানবের দেহে লুপ্ত জীবনীশক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করা। শুনিয়াছি, দেবতারা সুধা পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আমিও এই সুধার প্রয়োগ দ্বারা একটি মৃত ব্যক্তিকে ছয় বৎসর ধরিয়া জীবিত রাখিয়াছি। রঘুজী! আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তুমিও যদি এই ঔষধ আমার উপদেশমত সেবন কর, তাহা হইলে তোমাকে অনন্তকাল পর্য্যন্ত জীবিত রাখ্‌তে পার্‌বো, তার কোনও সন্দেহ নাই।

রঘু। অনন্তকাল! তা হ'লে আমি অমর হয়ে থাক্‌বো। তা হ'লে আমার আরব্ধ কাজ সব সারা কর্‌তে পার্‌বো?

ভাস্করা। নিশ্চয়। অবশ্য যদি কোন অস্বা-ভাবিক মৃত্যু না তোমাকে কবলিত করে।

রঘু। তাহার অর্থ?

ভাস্করা। তাহার অর্থ, যদি অপঘাতে মৃত্যু না হয়। অপঘাত-মৃত্যু প্রায়শঃ নির্ব্বুদ্ধিতা, অপরিণাম-দর্শিতা ও অসমসাহসের ফল এবং মানুষের নিজের কর্ম্মফল।

রঘু। নৌকাডুবি হইয়া মরা, বজ্রাঘাতে মৃত্যু— এ সকলের উপর মানুষের হাত কি? ইহাতে মানু-ষের কি অপরাধ?

ভাস্করা। মানুষের দোষ নয়, তবে দোষ কাহার, রঘুজী? নৌকাডুবি হয় কেন? নৌকার গঠনের

দোষে। সে দোষ কাহার? মানুষের ভ্রমাত্মক গণনার! আর বজ্রাঘাতে মৃত্যু! তাহাও মানুষের নির্ব্বুদ্ধিতার ফল। মনুষ্য-শরীর খাড়া ভাবে থাকিলে একটি প্রবল তড়িদ্বহ দণ্ডের কার্য্য করে। যে সময়ে আকাশে মেঘমণ্ডলে তাড়িতের আধিক্য বুঝা যায়, সে সময় যদি মানুষ খাড়া না থাকিয়া, উত্তান অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে বজ্রাঘাতে মরণের ভয় একেবারেই থাকে না।

রঘু। ভাল! তোমার অমৃতের গুণ আমি অদ্যই পরীক্ষা কর্‌বো, ভাস্কর! কখন্ খেতে হবে?

ভাস্কর। শয়নের অব্যবহিত পূর্ব্বে।

রঘু। আমার যে আদৌ নিদ্রা হয় না।

ভাস্করা। আজ হবে।

রঘু। উত্তম কথা। এখন চল! গত কয়েক মাসের কূট-দর্শন, অনুশীলন ও বিচারের ফলে আমার আলোক-যন্ত্র সম্বন্ধে অনেকগুলি নূতন তথ্যের আবিষ্কার করেছি, দেখবে এস। আর কয়েক মাস হ'তে ইহার স্বচ্ছ দর্পণে কতকগুলি নূতন অলোক-রশ্মি প্রতিবিম্বিত হচ্ছে দেখ্‌ছি। সেগুলি কোন্ গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু অথবা জ্যোতিষ্ক হ'তে আস্‌ছে, তা ঠিক বুঝতে পার্‌ছি না। এস, ভাস্কর, তোমার প্রখর দূরদর্শনের ফলে, যদি এ রহস্যের কোন মীমাংসা করতে পার। আজ রাত্রিও বেশ পরিষ্কার। জ্যোতিষ্কপরিদর্শনের পক্ষে অতি প্রশস্ত সময়। এস, ভাস্কর, আর বৃথা সময়ক্ষেপে প্রয়োজন নাই।

বৃদ্ধ রঘুজী পথ অগ্রে অগ্রে দীপ লইয়া চলিতে লাগিলেন। ভাস্করাচার্য্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—:*:—

তাঁহারা যে কক্ষে প্রবেশ করিলেন, সেই কক্ষটি নিতান্ত অপরিসর নহে। কক্ষের চারিধারে ভিত্তিগাত্রে বিলম্বিত অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ মানচিত্র; নানা গ্রহ, উপগ্রহ, ভূমণ্ডল, সূর্য্য, চন্দ্র ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলের প্রতিমূর্ত্তি! কক্ষে অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ জানালা, গবাক্ষ ও আলোক আগম-নির্গমের জন্য রন্ধ্র। দশ বারোটা বিভিন্ন গঠনের দূরবীক্ষণ যন্ত্র। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানা প্রকারের ধাতব সূত্র ও ধাতব রজ্জু। কোনওটি উর্ণনাভ-তন্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম, কোনওটি পোতবন্ধন রজ্জুর ন্যায় স্থূল। কক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে একটি ক্রমসূক্ষ্ম সূচ্যগ্র নাতিস্থূল লৌহদণ্ড। সেই দণ্ডটির সূচীর ন্যায় মুখের উপরে একখানি প্রকাণ্ড স্থূল বৃত্তাকার স্ফটিকশিলা, শকটের চক্র যেমন অক্ষদণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘুরে, সেইরূপ ঘুরিতেছিল। পিতা যেমন প্রীতিপূর্ণ নয়নে তাহার সন্তানের মুখের পানে চাহে, উৎকর্ণভাবে তাহার আধ আধ কথা শুনিয়া স্নেহরসে আপ্লুত হয়, রঘুজীও সেইরূপ এই ভ্রাম্যমাণ চক্রের পানে চাহিয়া রহিলেন, কান খাড়া করিয়া যে মধুর শব্দ হইতেছিল, তাহাই শুনিতে লাগিলেন।

"পার্‌বো না? এ সমস্যার পূরণ করতে পার্‌বো না? আরে রে রাক্ষসি! তুই এ কথার মীমাংসা ক'রে দিতে পার্‌বি নি? তবে কি জন্য আমার আজন্ম প্রাণপাত করা সাধনার বলে, তোর ওই অসাড় জড় শিলাময় দেহে প্রাণ সঞ্চারিত কর্‌লাম? কেন?" রঘুজী আপন মনে কহিতে লাগিলেন। পরে ভাস্করাচার্য্যের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "দেখ, ভাস্করাচার্য্য, একটি সূক্ষ্ম সূচীর অগ্রভাগে কত বড় গুরুভার শিলাখণ্ড ঘূর্ণিত হচ্ছে। ইহা কি বিস্ময়জনক আবিষ্কৃতি নহে?

ভাস্করাচার্য্য উত্তর করিলেন, "অবশ্য বিস্ময়জনক বটে! তবে, ব্রহ্মাণ্ডের এই জঙ্গমতা বহুকাল পূর্ব্বে আবিষ্কৃত সত্য।"

"সত্য! কিন্তু, সেই জঙ্গমতার জাজ্বল্য দৃষ্টান্তের আবিষ্কর্ত্তা বোধ হয় আমি। আর সেই দৃষ্টান্তের উপর নির্ভরতায় অনুমিত সত্যগুলিকেও তুমি ভ্রান্ত বলিয়া নিষ্পন্ন করিতে পারিবে না।"

"সে সত্য কি, বল।"

"তাহার সর্ব্বপ্রধান সত্য এই যে, একটিমাত্র বিন্দুতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, একটিমাত্র বিন্দুর উপরে তাহার স্থিতি ও একটিমাত্র বিন্দুতেই তার লয়।"

"সেই বিন্দুটির নাম কি?"

"ব্রহ্ম।"

"তোমার মতে ব্রহ্মই তাহা হইলে সৃষ্টির আদি। কিন্তু সেই আদিও কারণ ব্যতীত সম্ভবে না।"

"সেই কারণই আমি খুঁজিয়া অস্থির হইতেছি।

পাইতেছি না ভাস্কর, যদি আমি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকি, তা হ'লে আমি কারণ খুঁজে বের কর্‌বই কর্‌ব।"

"কোনও ভয় করো না, রঘুজী! এই ঔষধটি সেবন কর। তা হ'লে তোমার আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত হবে। সুনিদ্রা হবে। ক্ষুধা হবে। কার্য্য কর্‌বার শক্তি লাভ কর্‌বে।"

"দাও, ভাস্করাচার্য্য! যা অদৃষ্টে থাকে, আমি ঐ ঔষধই সেবন কর্‌বো। সবটাই খেতে হবে?"

"হাঁ।"

রঘুজী আর কালবিলম্ব না করিয়া ভাস্করাচার্য্যের হস্ত হইতে ঔষধের শিশিটি লইয়া, তাহার সুবর্ণনির্ম্মিত ছিপিটি খুলিয়া সমস্ত ঔষধটুকুই এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলেন। তাড়িৎ শক্তির ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে ঔষধের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। রঘুজী হৃদয়ে একটা অপরিসীম আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতে লাগিলেন এবং অত্যল্পকালমধ্যেই মূর্চ্ছিতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। ভাস্করাচার্য্য তাঁহাকে আস্তে আস্তে তুলিয়া লইয়া শয্যায় শায়িত করিয়া দিলেন ও তাঁহার গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, দেহের উত্তাপ ঠিকই আছে। শ্বাস-প্রশ্বাসেও কোনওরূপ অস্বাভাবিকতা নাই। রঘুজী সুষুপ্তির অঙ্কে সুখ-শায়িত। তাঁহার মুখের ভাব প্রফুল্ল।

ভাস্করাচার্য্য মুক্ত বাতায়নপথে একবার বাহিরের দিকে চাহিলেন—প্রকৃতির মুখে স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোৎস্নার হাসি। তাঁহার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতে লাগিল। সেই স্পন্দনের তালে তালে আকাশে নক্ষত্র-বধূগণেরও হৃদয় যেন স্পন্দিত হইতে লাগিল। ভাস্করাচার্য্য নির্নিমেষে আকাশ পানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি বিশাল এই রহস্য! এ রহস্য মীমাংসা ক'রে দেবে কে? লীলা! লীলাই এই-অজ্ঞানতার তিমিরমধ্যে জ্ঞানালোকরূপিণী।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—:*:—

পরদিন অতি প্রত্যূষেই রঘুজী নিদ্রোত্থিত হইয়া তাঁহার দেহে এক অতি অসাধারণী জীবনীশক্তির সঞ্চার অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন তাঁহার হৃদয় যৌবনের আশায় উৎসাহে পূর্ণ, যেন তাঁহার দেহে মত্ত হস্তীর বল। ভাস্করাচার্য্যও তাঁহার ঔষধের এই আশাতীত ফল-লাভে পরম প্রীত হইলেন। রঘুজী কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ নয়নে ভাস্করাচার্য্যের পানে চাহিয়া কহিলেন, "ভাস্কর! আমি তোমায় কি ব'লে আমার হৃদয়ের আনন্দ জানাবো, সে ভাষা খুঁজে পাচ্ছি নি। তুমি আমাকে মরণের মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছ। তুমি আমার হৃদয়ে যৌবনের আশা ও উৎসাহের উৎস খুলে দিয়েছ। আমি বাঁচ্‌বো! আহা! আমি বাঁচবো! আমার কার্য্য সম্পূর্ণ কর্‌বার যথেষ্ট অবসর আমি পাবো। আজ এই প্রাতঃকালে উঠে আমি যেন নবজীবন পেয়েছি ব'লে বোধ হচ্ছে। ভাস্কর, তোমার কৃপায় আমি যেন আজ নূতন নয়ন লাভ করেছি।"

ভাস্করাচার্য্য ঈষদ্ধাসিয়া কহিলেন, "আমার প্রস্তুত সুধায় যে তোমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাহাতেও আমি পরম আনন্দ লাভ করিলাম, রঘুজী!"

"বল তো আমায় ঠিক ক'রে, ভাস্করাচার্য্য! আমি আমার অভ্যন্তরে যেরূপ অনুভব কর্‌ছি, আমার চেহারাতেও সেইরূপ কোনও পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে না কি?"

"অবশ্য, রঘুজী! তবে সে পরিবর্ত্তন কোন ঐন্দ্রজালিক পরিবর্ত্তন নহে। তোমার শুভ্র কেশ শুভ্রই আছে—যৌবনসুলভ ভ্রমরকৃষ্ণ হয় নি। তোমার মুখ পূর্ব্বের ন্যায় এখনও বার্দ্ধক্য ও চিন্তা-রেখাঙ্কিত রয়েছে বটে, কিন্তু তোমার ভিতরে যে একটা পরিবর্ত্তন এসেছে, তোমার মুখে চোখে, হাবভাবে, কথায় বার্ত্তায়, এমন কি, প্রতি অঙ্গসঞ্চালনেই সেটা বুঝা যাচ্ছে।"

"এ ভাবটা কি স্থায়ী হইবে, না ক্ষণিকের জন্য?"

"যদি তুমি আমার উপদেশমত চল, তা হ'লে,

আমি পূর্ব্বে যা বলেছি, কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনা ভিন্ন তোমার মরণ অসম্ভব। আমি আর একটি স্ফটিকাধারপূর্ণ এই ঔষধ তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। তুমি প্রতিসপ্তাহে দুইবার করিয়া রাত্রিতে শয়নের অব্যবহিত পূর্ব্বে পাঁচ ফোঁটা এই ঔষধ শীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। তা হ'লে জরা ও মৃত্যুকে তুমি চিরদিন উপহাস করতে পারবে।"

"সত্যই তোমার ক্ষমতা অমানুষিক, তোমার বিদ্যাবল অতুলনীয়, ভাস্করাচার্য্য। তোমার উচিত ছিল, একটি রাজ্যের রাজা হওয়া।"

"আমার আকাঙ্ক্ষা অত নীচে নহে, রঘুজী। আমার উচিত ছিল, একটি পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব-লাভ।"

ঐ তো তোমার দোষ, ভাস্করাচার্য্য! তোমার আকাঙ্ক্ষা অসম্ভব উচ্চ। তোমার কিছুতেই সন্তোষ বা পরিতৃপ্তি নাই।

"আত্মার পরিতৃপ্তি কি কখনও সম্ভব, রঘুজী? আত্মার যে আকাঙ্ক্ষা, তাহার উচ্চতা-নীচতা নাই, তাহার আদি নাই, অন্ত নাই। যা লোকে পায়, আমি তা কেন পাব না?"

"না পাবার অবশ্য কোন কারণ নাই। কিন্তু সেটা লাভ করতে যে সময়ের প্রয়োজন, সে সময় যদি তুমি না পাও?"

"কেন পাব না? আমি মরবো না। আমি অনন্ত —অনন্ত কাল বেঁচে আছি। অনন্ত—অনন্ত কাল বেঁচে থাকবো।"

এরূপ নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে সময় জলের ন্যায় কাটিতে লাগিল। রঘুজী পন্থের আশ্রমে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া, ভাস্করাচার্য্য অপরাহ্লেই উজ্জয়িনী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বৃদ্ধ রঘুজী পন্থ যুবার ন্যায় উৎসাহে আবার বিজ্ঞানচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

—:*:—

সেই দিন প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রে ভাস্করাচার্য্য উজ্জয়িনীতে আপন আবাসে গিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার আবাসের সমস্ত কক্ষেই সমস্ত রাত্রি আলো জ্বলিত। প্রবেশদ্বার ভিতর হইতে বন্ধ থাকিলেও, ভাস্করাচার্য্যের নিজের নিকট সমস্ত দ্বারেরই গা-তালার একটি করিয়া চাবী থাকিত। তিনি সেই চাবীর সাহায্যে বাড়ীর অন্য কাহাকেও বিরক্ত না করিয়া, যখন ইচ্ছা তখন বাড়ীতে প্রবেশ করিতে অথবা বাহির হইয়া যাইতে পারিতেন। যখন ভাস্করাচার্য্য বাড়ী আসিলেন, তখন বাড়ীর আর সকলেই নিদ্রাগত। কেবল প্রদ্যুম্ন ভাস্করাচার্য্যের কক্ষে বসিয়া পাঠ করিতেছিল; তখনও নিদ্রা যায় নাই। হঠাৎ ভাস্করাচার্য্য আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করায়, সে একটু চমকিয়া উঠিল। ভাস্করাচার্য্য তাহার মুখের দিকে চাহিবামাত্রই যেন কি একটু ভাবান্তরের চিহ্ন দেখিয়া তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "প্রদ্যুম্ন!"

প্রদ্যু। আজ্ঞা করুন, গুরুদেব!

ভাস্করা। তোমার কি হয়েছে, প্রদ্যুম্ন! তুমিও কি পাঠ করছ?

প্রদ্যু। কই! কিছুই হয় নি। আপনি যে পুঁথিখানি ভুলে বাহিরে ফেলে গিয়েছিলেন, আমি কোন কাজ না থাকায় সেইখানি পাঠ করছি। যা হ'ক, রঘু পাগলকে কেমন দেখে এলেন? কথায় বলে, "রাম মিলায়া জুড়ি।"

ভাস্করাচার্য্য বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে একবার কঠোর দৃষ্টিতে প্রদ্যুম্নের চোখের দিকে চাহিলেন। সে চাহনিতে প্রদ্যুম্নের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার মুখের ভাব সেইরূপ শ্লেষ-পূর্ণ ও অবজ্ঞা-সূচক।

ভাস্করা। প্রদ্যুম্ন, তুমি কি বলছ?

প্রদ্যু। যা বলছি, আপনার কান তো আছে, নিশ্চয় শুনিতে পাচ্ছেন। আরও স্পষ্ট যদি শুনতে চান, তবে শুনুন, আমি এই দাসত্ব-পাশ ছিন্ন করিতে চাই। আমি সব বুঝতে পেরেছি। আর আমি আপনার ভেল্কিতে ভুলব না। আমি সব জেনেছি। আপনার কোনও রহস্য আর আমার নিকট গোপন

নাই। আমি সব জেনেছি। আমি স্বচক্ষে তাঁকে দেখেছি।

ভাস্করা। তাকে? কাকে দেখেছ প্রদ্যুম্ন?

প্রদ্যু। ঐ ত্রিতলের কক্ষে যে অসূর্য্যম্পশ্যা সুন্দরীকে আপনি এনে আবদ্ধ ক'রে রেখে দিয়েছেন, তাকে। যে অনাঘ্রাত চম্পক-কলিকার সুগন্ধে আজ জগৎ মাতোয়ারা হ'ত, তাকে—এ কি নিষ্ঠুরতা নয়?

ভাস্করা। কে তোমাকে সে কক্ষে নিয়ে গেল?

প্রদ্যু। কৃত্তিকা।

ভাস্করা। কৃত্তিকা! ঠিক! রমণী ভিন্ন এরূপ বিশ্বাসঘাতিনী হওয়া আর কাহার সম্ভব? তুমি বোধ হয়, সেই সুপ্ত রমণীকে স্পর্শ কর্‌তে সাহস করনি?

প্রদ্যু। কেন সাহস করব না? আমি তাকে স্পর্শ করেছি। তাকে জাগ্রত করবার চেষ্টা করেছি। পারি নি। তার ঘুম ভাঙ্গাতে পারি নি। গুরুদেব! নিষ্ঠুর! যদি ভাল চান, এই রমণীকে মুক্তি দিন। আমাকেও মুক্তি দিন। আমি রমণীকে বড় ভালবেসেছি।

ভাস্করা। ভালবেসেছ? কি করেছ হতভাগ্য! তুমি কাকে ভালবেসেছ? সে যে ভাস্কর-খোদিত প্রস্তর-গঠিত প্রতিমূর্ত্তি। তার কি প্রাণ আছে যে, তোমার প্রেমের প্রতিদান পাবে?

প্রদ্যু। প্রাণ নেই? কার চোখে ধুলো দিবার চেষ্টা করছেন, গুরুদেব? প্রাণ নেই যদি, তবে কেন আমার স্পর্শমাত্রেই তার নিদ্রালস নয়নকোণে হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌লো?

ভাস্করা। হায় ভ্রান্ত যুবক! তুমি যাকে ভালবেসেছ, সে অন্যূন ছয় বৎসর পূর্ব্বে ইহলোক পরিত্যাগ করেছে। আমি ঔষধের দ্বারা তার ঐহিক দেহটিকে রক্ষা করেছি। আমিই যোগবলে, অতি ক্ষীণ-সূত্রে তার আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধ যুক্ত রেখেছি। শোন প্রদ্যুম্ন, এই রমণীর সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা আমি তোমাকে বল্‌ছি, শোন। ছয় বৎসর পূর্ব্বে বদ্রিনারায়ণের পথে যেতে যেতে লছমনঝোলার নিকট একটি যাত্রিদলের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। সেই দলের মধ্যে একটি প্রৌঢ়া রমণী ও দশ এগার বৎসরের একটি বালিকা হঠাৎ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়। সেই দলের অপরাপর যাত্রীরা তাহাদিগকে রাস্তায় ফেলে রেখে প্রাণভয়ে পলায়ন করে। আমি সেই দুই জন অসহায়াকে পথ হ'তে তুলে আমাদের আশ্রমে নিয়ে যাই। উপযুক্ত পরিচর্য্যার ফলে ও ঔষধের বলে প্রৌঢ়া আরোগ্য লাভ করে। সে-ই এই কৃত্তিকা। বালিকা মারা পড়ে। প্রদ্যুম্ন, তুমি বোধ হয় জান যে, আমি বহুকাল আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলাম এবং তদ্বিষয়ে একটু জ্ঞানও আমার ছিল। সেই শাস্ত্র হইতেই আমি জানিয়াছিলাম যে, বিসূচিকা রোগে অনেক সময়ে রোগী মারা পড়িলেও মৃত্যুর অব্যবহিত কিছু কাল পর্য্যন্ত তাহার দেহে জীবনী-শক্তি গুহ্যভাবে অবস্থিতি করে। সেই জ্ঞানের উপর ভক্তি করিয়া আমি এই বালিকার উপর আমার আবিষ্কৃত একটি ঔষধের ফলাফল দেখিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলাম। মৃতার স্কন্ধদেশ সূচীবিদ্ধ করিয়া সেই রন্ধ্র-পথে পিচকারী দিয়া, সেই ঔষধি তাহার মস্তিষ্কে ও স্নায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করাইয়া দিলাম। পরে তাহাকে উত্তানভাবে শয্যোপরি শয়ন করাইয়া উদ্‌গ্রীবভাবে ঔষধের ফলাফল দেখিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধ-প্রহর পর্য্যন্ত এই বালিকার দেহে জীবচ্ছক্তির কোনও লক্ষণই বুঝ্‌তে পারলুম না। কিন্তু আমি হতাশ হবার নই। আমি পুনর্ব্বার এই রমণীর স্কন্ধদেশের ঠিক মধ্যস্থলে, যেখানে সমস্ত শিরা ও স্নায়ুমণ্ডলী মিলিত হইয়া মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইয়াছে, ঠিক সেই স্থানে অস্ত্রোপচার করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলাম। এতক্ষণে আমার আশা ফলবতী হইবার উপক্রম হইল। কিছুক্ষণ পরে আমি রমণীর নাসিকার নিকট হাত দিয়া দেখিলাম, অতি মৃদুভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে। অতি সন্তর্পণে বুকে হাত দিয়া দেখিলাম, হৃৎপিণ্ডেরও স্পন্দন আরব্ধ হইয়াছে। সেই সময় হইতে একাল পর্য্যন্ত কেবলমাত্র ঔষধের বলেই এই বালিকাকে জীবিতার ন্যায় রাখিয়াছি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে মৃতা।

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া প্রদ্যুম্ন কহিল, "যদি বাস্তবিক সে মৃতা, তবে বালিকার অঙ্গে কি করিয়া যুবতীর লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পাইয়াছে?"

ভাস্করাচার্য্য কহিলেন, "তাহাও ঔষধেরই বলে। এখন বল, প্রদ্যুম্ন, এক জন মৃত ব্যক্তির উপরে পরীক্ষা দ্বারা জগদ্ধিতকর কোন সত্য আবিষ্কার করার প্রয়াস কি নিন্দনীয়?"

"আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না!"

"যাহা বুঝিতে পার না, তাহার ভাল মন্দ বিচার করিতে যাওয়া কি মূর্খতা নয়? প্রদ্যুম্ন, আমার কথা শুন। নিষ্ফল কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া অজ্ঞানতার প্ররোচনে, আমার জীবনব্যাপী সাধনার মূলে কুঠারাঘাত করিও না। লীলার নাম পর্য্যন্ত তুমি বিস্মৃত হও।"

"তা কখনও পার্‌ব না।"

"নিশ্চয় পার্‌বে।" এইবার ভাস্করাচার্য্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার প্রতিভা-উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় নির্নিমেষ প্রদ্যুম্নের চক্ষুর দিকে লগ্ন করিয়া কহিলেন, "আমার আজ্ঞা—প্রদ্যুম্ন, তুমি লীলার নাম বিস্মৃত হও।"

প্রদ্যুম্ন যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে অতি তীব্র কালকূটের জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল। সে শুম্ভিত হইয়া রহিল। মুহূর্ত্ত পরেই সেই জ্বালা শীতল হইল বটে, কিন্তু প্রদ্যুম্নের পূর্ব্বস্মৃতি একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল।

বহু চেষ্টায় প্রদ্যুম্ন লীলাব নাম পর্য্যন্ত মনে করিতে পারিল না।

দশম পরিচ্ছেদ

—:*:—

"রমণীর বিশ্বাসঘাতকতা, যুবকের অপরিণামদর্শিতা ও অবিবেকিতার ফলে, বুঝি বা আমার আজন্মসাধনার ফললাভে আমি বঞ্চিত হ'তে বসেছি। এ কি বিড়ম্বনা? নিয়তি কি আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে? আমার স্পর্শ ভিন্ন লীলার দেহে জীবনী শক্তির বিকাশ কেমন ক'রে সম্ভবে? তবে, তার মরণচ্ছায়াঙ্কিত মুখে হাসিই বা কোথা থেকে এল? আশ্চর্য্য! আমি ভাস্করাচার্য্য, যে যোগবলে মৃতদেহে পর্য্যন্ত জীবন-সঞ্চার কর্‌তে পেরেছে, সে আজ সামান্য মানবের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র কারণে উদ্বিগ্ন।" প্রদ্যুম্নকে বিদায় করিয়া দিয়া আপনার কক্ষে বসিয়া, ভাস্করাচার্য্য এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময়ে কৃত্তিকা নিঃশব্দ-পাদসঞ্চারে আসিয়া সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ভাস্করাচার্য্য একটু বিরক্তভাবে কঠোর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন, কিন্তু কৃত্তিকার মুখে ভীতি বা অপ্রস্তুততার ভাব কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ভাস্করাচার্য্য রিপুজয়ী পুরুষ। কিন্তু কৃত্তিকার ভাব দেখিয়া তাঁহারও মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল।

কৃত্তিকা। আচার্য্য বোধ হয় খুব রেগেছেন।

ভাস্করাচার্য্য অঙ্গুলিসঙ্কেতে কহিলেন, "কৃত্তিকা! তুমি কেন এই বিশ্বাসঘাতকতার কাজ কর্‌লে? আমাব ছয় বৎসরের সাধনার ফল নষ্ট কর্‌লে?"

কৃত্তি। গুরু! আপনারই ভালর জন্য।

ভাস্করা। কি ভাল?

কৃত্তি। শুনুন নবদেবতা! আপনি বিদ্যাবলে আপনাকে দেবতার সমকক্ষ ক'রে তুলেছেন। কিন্তু আসল জিনিস পান নি। সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দিচ্ছেন।

ভাস্করা। হেঁয়ালি ছেড়ে সরল ভাষায় বল, কৃত্তিকা!

কৃত্তি। বল্‌বো? শুন্‌বেন? তবে শুনুন, আচার্য্য। পৃথিবীতে নরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষার দ্রব্য হচ্ছে—রমণীর ভালবাসা। আপনি সেই রত্ন লাভ ক'রে হেলায় হারাচ্ছেন। কৃত্তিকা কি তা দেখে চুপ ক'রে থাক্‌তে পারে? না, আপনার অসন্তোষ বা ক্রোধকে সে ভয় করে?

ভাস্করা। আমি তোমার প্রলাপ শুন্‌তে চাই না। এখন বল, লীলা কেমন আছে?

কৃত্তিকা। ঠিক তেমনি। তেমনই জড়। তেমনই অসাড়। প্রদ্যুম্ন কত ডাক্‌লে, কোনও সাড়া পেলে না। সে তোমাকে চায়, তোমাকে চেনে। আর কাহাকেও সে চায় না। আর কাহারও কথায় সে কান দেয় না। হে দাম্ভিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী নরদেবতা! শুন, তুমি সমস্ত বিদ্যার পরপারে গিয়েছ, আমি মানি। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, তুমি রমণীহৃদয় কি উপাদানে গড়া, তা বোঝ নি।

ভাস্করা। ব্রহ্মাণ্ডের হৃদয় ব্যবচ্ছেদ ক'রে তার উপাদান নির্ণয় করা যার কাজ, সামান্য প্রজাপতির হৃদয় নিয়ে তোলাপাড়া কি তার পক্ষে নিতান্ত উপহসনীয় নয়?

কৃত্তিকা। প্রজাপতি কি ঈশ্বরের সৃষ্ট নয়? প্রজাপতির কি হৃদয় নাই? তার হৃদয়ে কি আশা নাই, বাসনা নাই, প্রেম নাই? আচার্য্য, আপনি

শাস্ত্রজ্ঞ হয়েও এমন চক্ষুহীন কেন? সর্ব্বজীবে দয়া-পরবশ হয়েও এমন নির্দ্দয় কেন? লীলা আপনার। আমি চাই লীলার সহিত আপনার মিলন। আমি কি জন্য আপনার আজ্ঞা উলঙ্ঘন করেছি জানেন? আপনার হৃদয়ে ঈর্ষার বিষ ঢুকিয়ে দেবার জন্য। ঈর্ষ্যা-প্রণোদিত না হ'লে ভালবাসার জিনিসকে পাবার জন্য আকাঙ্ক্ষা তত উৎকট হয় না। সেই জন্য।

ভাস্করা। যাও কৃত্তিকা! তোমার অসংবদ্ধ প্রলাপ শুনিবার অবসর আমার নাই। এবারের জন্য আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম, যেন বারান্তরে আর এরূপ না হয়।

কৃত্তিকা শির নোয়াইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। ভাস্করাচার্য্য ভাবিতে লাগিলেন, "কি অসার মূর্খ আমি! তার বাক্যস্ফূর্ত্তি হওয়ার পূর্ব্বেই আমি কেন তার রসনাকে স্তম্ভিত ক'রে দিলাম না? যে ক্ষমতার গর্ব্বে আমি গর্ব্বিত, সেই ক্ষমতা আমার কোথায় ছিল? কেবল ভালবাসা! কেবল প্রেম! স্ত্রীলোকের হৃদয় কি আর কোন উচ্চতর প্রবৃত্তি পোষণ করতে পারে না? রাত-দিন সেই এক কথা, সেই এক চিন্তা। লীলার প্রেম! মূর্খ রমণী! মন্ত্র-শক্তিতে উজ্জীবিত পাষাণ-প্রতিমার হৃদয়ে আবার প্রেম কি? লীলার আত্মার কি কোন স্বাধীন সত্তা আছে?—না! যাই, একবার লীলাকে দেখে আসি। দেখে আসি প্রদ্যুম্ন ও কৃত্তিকা আমার সিদ্ধির পথে কতদূর অনিষ্টসাধন করেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

লীলার কক্ষ নিস্তব্ধ, রজতের দীপাধারে দীপ জ্বলিতেছে। মুক্ত বাতায়নপথে কুসুম-সুরভিত মন্দ মন্দ সমীরণ কক্ষে প্রবেশ করিতেছে। লীলা শয্যায় সুখসুপ্ত। তাহার মুখ সুন্দর, কিন্তু একটু ফ্যাকাসে।

একটি বিচিত্র পতঙ্গ আলোক-মুগ্ধ হইয়া বার বার সেই দিকে যাইতেছে, কিন্তু স্ফটিকময় আলোর আধারে বাধা পাইয়া ফিরিয়া আসিতেছে, আবার অভ্যন্তরে প্রবেশ-চেষ্টা করিতেছে।

ভাস্করাচার্য্য সেই হতভাগ্য পতঙ্গের দিকে চাহিয়া মৌনভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"আলোকের মধ্যে! অগ্নির মধ্যে! পুড়িয়া ছারখার হইবার জন্য! উচ্চ আকাঙ্ক্ষার এই পরিণাম! কেন? কি উদ্দেশ্যে? কে ইহার উত্তর দিবে? এ সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিবে কে?" ভাস্করাচার্য্য একটি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ-হস্তের দুইটি অঙ্গুলি দ্বারা লীলার মণিবন্ধ স্পৃষ্ট, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় লীলার মুখের দিকে আবদ্ধ। ভাস্করাচার্য্য সহসা লীলার মুখে চেতনার আভাস দেখিতে পাইয়া, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ডাকিলেন, "লীলা! এসেছ?"

লীলার মুখে অতি কোমল হাসি ফুটিল। সে উত্তর দিল, "হাঁ!"

"বল তো লীলা! তুমি কোথায়?"

"এই তো তোমার কাছে। আমার ডান হাত তোমার ডান হাতের মধ্যে।"

"তা হ'লে, তুমি আমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছ?"

"কই, না! তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। তবে তোমার স্পর্শ আমি অনুভব করছি।"

"লীলা! তুমি একলা আছ? না তোমার সঙ্গে আর কেহ আছে?"

"আমি একলা। আমি চিরদিনই একলা।"

"বল লীলা! তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

"তুমি যে আমাকে নরকের সন্ধান করতে পাঠিয়েছিলে। আমি তারই অন্বেষণে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এলাম। নরক কোথাও দেখ্‌তে পেলাম না। তুমি যা বল্‌ছ, ঈশ্বরের রাজ্যে কোথাও তা নাই! দুঃখ, জরা, মৃত্যু—কিছুই নাই, যেখানে যাই, কেবল সৌন্দর্য্য, কেবল আলো, কেবল প্রেম।"

লীলার কথা শুনিয়া ভাস্করাচার্য্যের মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইয়া আসিল।

লীলা আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "ঈশ্বর আনন্দময়, তিনি আলোকময়, প্রেমময়। তাঁর সৃষ্টিতে নিরানন্দ কিংবা অন্ধকার কি কখনও থাকিতে পারে? যদি তাহা থাকে, তবে তাহা তোমাদের পৃথিবীতে। ঈশ্বরের রাজ্যে শোক নাই, তাপ নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই। স্থির জানিও।"

"শোক, দুঃখ, জরা, মৃত্যু নিশ্চয় আছে লীলা!

কিন্তু তুমি তা বুঝতে পার না। তুমি নিজে সুন্দর, তাই তোমার কাছে সবই সৌন্দর্য্যময় মনে হয়।"

ভাস্করাচার্য্যের কথায় লীলা যেন ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "এত অবিশ্বাস, তবে তোমার হৃদয়ে প্রেম কেমন ক'রে স্থান পাবে বল? প্রেম বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। সন্দেহ নরক। সন্দেহে ঈশ্বরকে মিলে না।"

"লীলা! তুমি আমায় আলোকে নিয়ে যাও। তুমি আমার সন্দেহ ভঞ্জন ক'রে দাও। আমাকে বিশ্বাসের পথ দেখিয়ে দাও। আমায় বল, যদি দুঃখ, জরা, মৃত্যু না থাকে, তবে পাপের কি কোন দণ্ড নাই?"

"পাপ নিজে নিজেকে দণ্ড দেয়—ইহাই ঈশ্বরের বিধান।"

"তুমি তা হ'লে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস কর?"

"নিশ্চয়।"

"স্বর্গে?"

"একটি নহে, কোটি কোটি, অনন্ত। তার সংখ্যা করা যায় না! ভাল কথা! কাল রাত্রে কি তুমি আমাকে ডেকেছিলে?"

ভাস্করাচার্য্যের হৃদয় গুরু গুরু করিয়া উঠিল। হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "কেন বল তো লীলা?"

"কে আমায় কাল নাম ধ'রে ডাকছিল। সে কিন্তু তোমার গলা নয়। তার গলা বড় মিষ্ট, বড় নরম। যেন প্রেমে পূর্ণ। সে আমায় ভালবাসে। ভালবাসা বড় মধুর। তোমাদের পৃথিবীতে ভালবাসাই একমাত্র আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী।"

লীলা তো তাহা হইলে প্রদ্যুম্নের আহ্বান শুনিতে পাইয়াছে, তাহা হইলে প্রেম কি বাস্তবিক যোগবলের সহিত তুল্যমূল্য! ভাস্করাচার্য্যের মনে বিষম সন্দেহ জাগিয়া উঠিল।

লীলাকে পুনরায় যোগনিদ্রায় অভিভূত করাইয়া ভাস্করাচার্য্য চিন্তাকুলিত হৃদয়ে গিয়া নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

সেই দিন শেষ রাত্রিতে ভয়ানক বৃষ্টি ও ঝড় আরম্ভ হইল। তাহার পরদিনও ঝড়-জল থামিল না। ভাস্করাচার্য্য সেদিন আর কোথায় বাহির হইলেন না; ঘরে বসিয়া নানা প্রকারের চিঠি-পত্রাদির উত্তর দিলেন ও পুস্তকাদি পাঠ করিয়া সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি বাতায়নে বসিয়া প্রকৃতির এই ক্ষিপ্ত লীলা দেখিতেছেন, আর মনে মনে হাসিতেছেন, এমন সময়ে প্রদ্যুম্ন একজন দীর্ঘাকৃতি পুরুষকে সঙ্গে লইয়া ভাস্করাচার্য্যের কক্ষে প্রবেশ করিল। আগন্তুককে দেখিয়াই ভাস্করাচার্য্য আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "প্রভো! অসময়ে কি প্রয়োজনে আগমন? আপনার পবিত্র পদরজ-স্পর্শে, আমার আশ্রম পবিত্র হ'ল। প্রদ্যুম্ন! প্রণত হও, ইনি মহাজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্যের প্রিয়তম শিষ্য। ইঁহার নাম ত্রোটকাচার্য্য।"

প্রদ্যুম্ন প্রণত হইল। ত্রোটকাচার্য্য আসন-গ্রহণ করিয়া প্রথমে ভাস্করাচার্য্যের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "ভাস্করাচার্য্য! তোমার আপ্যায়নে আমি পরম সন্তুষ্টি লাভ করিলাম।" পরে প্রদ্যুম্নের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বালক প্রদ্যুম্ন দেখিতেছি বেশ বড়সড় হইয়া উঠিয়াছে! সে কি এখনও তোমার প্রবল ইচ্ছাশক্তির ক্রীতদাসই আছে?"

"প্রভো! আপনার কথার অর্থ আমি সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারলাম না। গুরুর প্রতি শিষ্যের ঐকান্তিকী আজ্ঞানুবর্ত্তিতা কি দোষের?"

ত্রোটকাচার্য্য ঈষৎ হাসিলেন। ভাস্করাচার্য্য তর্কে পরাস্ত হইবার নহেন। কিন্তু প্রদ্যুম্নের কানে ত্রোটকাচার্য্যের কথাগুলি যেন একটি অর্থপূর্ণ ঝঙ্কার দিল। সে বিনীতভাবে কহিল, "ভগবন্! আমার হৃদয়ে বিষম ঝটিকা। আমার কি হইবে?"

ত্রোটকা। বৎস! দেখিতেছ না? পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই ঝটিকা! ভয় পাইয়ো না! শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদে শান্তি পাবে।

প্রদ্যুম্ন ত্রোটকাচার্য্যের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া পরম হৃষ্টচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ত্রোটকাচার্য্য ভাস্করাচার্য্যকে কহিলেন, "ভাস্করাচার্য্য! তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। এই যন্ত্রণাময় সংসার হ'তে চিরতরে বিদায়-গ্রহণের পূর্ব্বে একবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন জ্ঞানে এখানে এলাম।"

ভাস্করা। সে কি? আপনি কি মৃত্যুকে বিশ্বাস করেন? আপনি কি মর্‌বেন?

ত্রোটকা। না—বাঁচবো। সাধারণে যাকে মৃত্যু বলে, আমরা সেটাকে নবীন জীবন বলি। ভাস্করাচার্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, কার্য্যকারিতা শক্তিতে তুমি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের গৌরব। কিন্তু বিষম ভ্রমান্ধ। তুমি নিতান্ত দাম্ভিক। তুমি ভগবৎশক্তিকে তুচ্ছ কর। তোমার পতন অবশ্যম্ভাবী। এখন তোমার গতি পরিবর্ত্তিত কর।

ভাস্করা। ত্রোটকাচার্য্য! আমি বালক নহি যে, অস্তিত্বহীন জুজুর ভয় দেখিয়ে আমাকে আমার সংকল্প হ'তে প্রতিনিবৃত্ত কর্‌বে। সত্য কথা বল্‌তে কি, প্রভো! আপনার বক্তব্য কি, তা এখনও আমি ঠিক ধারণা কর্‌তে পার্‌ছি নি।

ত্রোটকা। দম্ভী ভাস্করাচার্য্য! অসামান্য মস্তিষ্ক-সম্পদে তুমি সম্পন্ন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তুমি বুঝতে পার্‌ছ না যে, অনন্তের মুখ থেকে রহস্যের অবগুণ্ঠন সরিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রে তোমার নিজের সর্ব্বনাশের পথ-উন্মুক্ত কর্‌ছো। ভাস্করাচার্য্য, তোমার সম্মুখে ভয়ানক বিপদ। এখনও সাবধান হও। অনর্থক মিথ্যার পশ্চাতে ঘুরিও না। সত্যকে আপনার বলিয়া গ্রহণ কর।

ভাস্করা। প্রকৃতিই ব্রহ্মাণ্ডের সত্তার মূল। প্রকৃতিই সত্য। প্রকৃতিই আমার উপাস্যা দেবী। ব্রহ্ম প্রপঞ্চ মাত্র।

ত্রোটকা। রজ্জুতে সর্পভ্রমের কারণ যেমন ইন্দ্রিয়ের দোষ, সেইরূপ ব্রহ্মে প্রপঞ্চ-প্রতীতির কারণ অনাদি অবিদ্যারূপ দোষ। রজ্জুতে প্রতীয়মান সর্প যেমন রজ্জুর বিবর্ত্তমাত্র, ব্রহ্মে প্রতীয়মান প্রপঞ্চও সেইরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র।

ভাস্করা। আমার বিবেচনায় প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব। তাহার অসাধারণ বৃত্তি অধ্যবসায় বা নিশ্চয়। অধ্যবসায় ভিন্ন প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানলাভের প্রশস্ততর পন্থা আর নাই।

ত্রোটকা। বুদ্ধির ধর্ম্ম আটটি—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। ইহাদের প্রথম চারিটি সাত্ত্বিক, শেষোক্ত চারিটি তামসিক। সাত্ত্বিক পন্থাই প্রশস্ত পন্থা, তামসিক পন্থা প্রকৃত বিবেকলাভের অন্তরায়। আরও শুন, যত দিন না পুরুষের বিবেক-খ্যাতি হইবে, তত দিন প্রকৃতি পুরুষের সঙ্গ ত্যাগ করিবে না। প্রকৃতিপুরুষের বিবেক-খ্যাতি জন্মাইয়া আপনিই অপসৃত হইবে। ভাস্করাচার্য্য! লীলারও অপসৃতির সময় আসিতেছে।

ভাস্করা। আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, লীলার পিঞ্জরাবদ্ধ আত্মাকে মুক্ত করা, ঈশ্বর যদি থাকেন, তাঁরও সাধ্যায়ত্ত নহে। লীলা আমার।

ত্রোটকা। বিশ্বাসবিহীন বিপথগত ক্ষুদ্র মানব! ঈশ্বরের সহিত প্রতিযোগিতা। মূর্খতা ও অজ্ঞতা-পূর্ণ সংসারের লোককে দুটো ইন্দ্রজাল দেখিয়ে ভোলাতে পার। কিন্তু সে কুহকের অর্থ কি, তাহা অন্যে না বুঝতে পারুক্, তুমি তো নিশ্চয় জান। অমি দৃঢ়তার সঙ্গে বল্‌ছি, লীলা তোমার নয়। লীলা ঈশ্বরের। তোমার বিশ্বাস না হয় চল, তোমারই করতলগত আত্মার নিজের সাক্ষ্য গ্রহণ কর্‌বে চল!

এই বলিলে, ভাস্করাচার্য্য উঠিয়া পথ দেখাইয়া চলিলেন। ত্রোটকাচার্য্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। উভয়ে ত্রিতলে লীলার শয়নকক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

শিল্পী যেমন আপনার রচিত শিল্প অপরকে দেখাইয়া ও তাহাদের প্রশংসা লাভ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করে, পর্য্যঙ্কোপরি কুহকনিদ্রাঘোরাচ্ছন্না ফুল্লারবিন্দবদনা লীলাকে দেখাইয়া ভাস্করাচার্য্যও সেইরূপ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ত্রোটকাচার্য্যের মুখে কিন্তু কৌতূহলের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না। তবে কি ত্রোটকাচার্য্য ভাস্করাচার্য্যের অমানুষিক জ্ঞান ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ঈর্ষ্যান্বিত? কেন? ত্রোটকাচার্য্যেরও তো জ্ঞান ভাস্করাচার্য্য অপেক্ষা কোনও অংশে কম নহে। আর

প্রতিষ্ঠা? শঙ্করের অবতার জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের প্রিয় শিষ্য। তাঁহার আবার প্রতিষ্ঠার অভাব কি?

তর্জ্জনী-সঙ্কেতে লীলাকে দেখাইয়া গর্ব্বিতভাবে ভাস্করাচার্য্য কহিলেন, ত্রোটকাচার্য্য! ওই দেখুন, ওই অপূর্ব্ব রমণী-কুসুম-কলিকাটি, আমি ছয় বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যুর করাল হস্ত হ'তে ছিনিয়ে এনে, আমার জ্ঞানোদ্যানে রোপিত করেছিলাম। আজ সেই লতিকাটি যৌবনের লাবণ্যভারে নুয়ে পড়ছে।"

ত্রোটকাচার্য্য ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "ভাস্করাচার্য্য, তুমি যাকে দেখে এত গর্ব্বিত, তার আসল মূর্ত্তি ত তুমি দেখ নাই। আমি তাকে তার আসল মূর্ত্তিতে দেখেছি।"

"কার আসল মূর্ত্তি?

"লীলার।"

"আমার লীলার?"

"লীলা তোমার কখনই নয়! লীলা ঈশ্বরের।"

"ওই দেখ ত্রোটকাচার্য্য! লীলা তোমার কথা শুনে মৃদু হাস্য করছে।"

"আমার কথা শুনে নয়; তোমার কথা শুনে। এ সম্বন্ধে লীলার নিজের সাক্ষ্য তো তুমি বিশ্বাস করবে?"

"অবশ্য!"

"তবে লীলাকেই জিজ্ঞাসা কর।"

ভাস্করাচার্য্য গিয়া লীলার পর্য্যঙ্কপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। ত্রোটকাচার্য্য অদূরে একখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন।

লীলার দক্ষিণ হস্তখানি নিজের দক্ষিণ হস্তের মধ্যে লইয়া ভাস্করাচার্য্য লীলার শরীরে তাঁহার প্রবল তড়িচ্ছক্তি সংক্রামিত করিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আজ যেন লীলার মুখে তিনি কোন পরিবর্ত্তনই দেখিতে পাইলেন না।

সোৎসুক-কণ্ঠে ভাস্করাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "লীলা! তুমি কোথায়?"

লীলা ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—"এই যে, আমি এখানেই আছি।"

ভাস্করা। তুমি কতক্ষণ হ'ল এখানে এসেছ?

লীলা। যখন গুরুদেব এখানে এসেছেন, আমি ঠিক তখনই এখানে এসেছি।

"কে গুরুদেব?"

"এই যে—যিনি ওখানে আমাদের কাছে ব'সে আছেন।"

"উঁহাকে কি তুমি চেন লীলা?"

"কেন চিনবো না? ওঁরই কাছে তো আমি রাতদিন থাকি। ওঁরই কাছে থাকতেই তো আমি ভালবাসি।"

"তা হ'লে আমার কাছে আসতে তুমি ভালবাস না?"

"না! কেন ভালবাসবো? তোমার যে প্রাণ নাই। তুমি যে আমার কথায় বিশ্বাস কর না। তুমি যে আমাকে বড় ঘোরাও। আমার কষ্ট হয় না?"

"তবে তুমি কা'কে ভালবাস?"

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎ সমস্তাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে॥

আমি সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসি।"

"অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অনন্ত, পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ কবির কল্পনা মাত্র।"

ত্রোটকাচার্য্য ঈষৎ হাসিয়া গম্ভীরভাবে ভাস্করাচার্য্যকে বলিলেন, "চক্ষু থাকিতেও যে অন্ধ, নাসিকা থাকিতেও যে গন্ধ পায় না, কর্ণ থাকিতেও যে শুনিতে অক্ষম, তাহার নিকট অবশ্য সেই সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ কবির কল্পনা মাত্র। ভাস্করাচার্য্য, বল দেখি, এই গৃহে তোমার ও আমার ব্যবধানমধ্যে তুমি কিছু দেখিতে পাইতেছ কি না?"

ভাস্করাচার্য্য হাসিয়া উত্তর দিলেন, "শূন্য।"

ত্রোটকাচার্য্য উত্তর দিলেন, "ভাস্করাচার্য্য! নয়ন উন্মীলন কর। দেখ, তুমি যে স্থানকে শূন্য বলছিলে, সেই স্থানে কি বিরাট্ পুরুষ-মূর্ত্তি।

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥"

ত্রোটকাচার্য্য ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত যুক্তকরে ধ্যানস্থ। তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্মধারী ভগবান্। চির-আরাধ্য দেবতাকে সম্মুখে মূর্ত্তিমান্

দেখিয়া ধীরগম্ভীরস্বরে ত্রোটকাচার্য্য গাহিতে লাগিলেন,—

"উদ্যৎকোটিদিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদাং পঙ্কজং
চক্রং বিভ্রতমিন্দিরা-বসুমতী সংশোভিপার্শ্বদ্বয়ম্।
কোটীরাঙ্গদহারকুণ্ডলধরং পীতাম্বরং কৌস্তভো-
দ্দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষবিলসচ্ছ্রীবৎসচিহ্নং ভজে॥"

সহসা এক সঙ্গে লক্ষ লক্ষ বিদ্যুৎ স্ফুরণের ন্যায় একটি অত্যুৎকট জ্বালা সেই কক্ষটিকে উজ্জলিত করিয়া তুলিল। সে জ্বালা এত তীব্র যে, ভাস্করাচার্য্য একটি ভীষণ চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ত্রোটকাচার্য্য যে কখন্ সেখান হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন, তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

--:*:—

সমস্ত রাত্রির মধ্যে ভাস্করাচার্য্যের জ্ঞান হইল না। পরদিন প্রভাতে যখন তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, তখন রাত্রের ঘটনা তাঁহার নিকট স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয় যে এত দুর্ব্বল, তাহা ভাস্করাচার্য্য এই প্রথম বুঝিতে পারিয়া আপনা-আপনিই বড় লজ্জিত হইলেন। তিনি সংসারের লোককে বিভীষিকা দেখাইয়া স্তম্ভিত করেন, আর তিনি নিজেই আজ একটি অমূলক ছায়ামাত্র দর্শনে বালকের ন্যায় ভীত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি চক্ষু মুছিয়া একবার কক্ষের চারিধারে দেখিয়া লইলেন। তিনি ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলেন না যে, তখনও তাঁহার ঘুমের ঘোর কাটিয়াছে কি না? সহসা ত্রোটকাচার্য্য-লিখিত পত্রখানির উপর তাঁহার নজর পড়িল। তিনি ব্যগ্রভাবে সেখানি কুড়াইয়া লইয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে কেবলমাত্র দুইটি ছত্র লিখিত ছিল। তাহা এই—

"শেষ দিন আসিতেছে। প্রেমের সহিত লীলার অবসান, জানিবে।"

কি এক অজানিত বিপৎপাতের আশঙ্কায় ভাস্করাচার্য্যের সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল।

তিনি একবার লীলার মুখের পানে চাহিলেন। দেখিলেন, তাহার প্রশান্ত সুপ্ত মুখে মৃদু হাসির কোমল উজ্জ্বল রেখা অঙ্কিত।

ভাস্করাচার্য্য ছুটিয়া কক্ষের বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন, "প্রদ্যুম্ন!"

মুহূর্ত্তমধ্যে উত্তর আসিল, "যাই গুরুদেব!" পরক্ষণেই প্রদ্যুম্ন আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। রাত্রের ঘটনা সম্বন্ধে প্রদ্যুম্ন যে কোন কথা অবগত আছে, তাহার মুখ দেখিয়া তাহা বুঝা গেল না। বাস্তবিক সে কিছুই জানিতও না।

ভাস্করাচার্য্য জিজ্ঞাসিলেন, "ত্রোটকাচার্য্য কি চলিয়া গিয়াছেন?"

প্রদ্যুম্ন। বোধ হয়; সকালে উঠিয়া আমি তাঁহাকে দেখি নাই। কেন, তিনি যাইবার সময় আপনাকে কি কিছু বলিয়া যান নাই?

ভাস্করা। বোধ হয়, আমাকে নিদ্রোত্থিত করিতে ইচ্ছা করেন নাই। কোন বিশেষ প্রয়োজনে রাত্রেই এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

ভাস্করাচার্য্যের মুখের ভাবে দুশ্চিন্তার লক্ষণ দেখিয়া প্রদ্যুম্ন জিজ্ঞাসা করিল, "গুরুদেব! আজ আপনার মুখ একটু বিষণ্ন দেখিতেছি কেন? কোন উদ্বেগের কারণ হইয়াছে কি?"

ভাস্করা। না প্রদ্যুম্ন! এমন কোন বিশেষ কারণ নাই, তবে কাল রাত্রি হইতে আমার শরীরটা তত ভাল নাই।

প্রদ্যুম্ন ভাস্করাচার্য্যের সঙ্গে যত দিন আছে, তাহার মধ্যে কোনদিনও সে ভাস্করাচার্য্যকে তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার কথা বলিতে শুনে নাই। এই আজ এ কথা প্রথমে তাঁহার মুখে শুনিল।

প্রদ্যুম্ন কহিল, "গুরুদেব, কাল গভীর রাত্রে হঠাৎ আমার নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। আমার কখনও এমন হয় না। আমি যেন আপনার সকরুণ আওয়াজে, প্রদ্যুম্নপ্র—দ্যুম্ন ব'লে আপনার ডাক শুনতে পেলাম। তাড়াতাড়ি উঠে আপনার ঘরের নিকট গিয়ে দেখ্‌লাম, দ্বার অর্গলবদ্ধ। আমি আমার ভ্রম হয়েছে মনে ক'রে আবার গিয়ে শয়ন কর্‌লাম।"

ভাস্করা। কি! আমার শয়নগৃহের দ্বার ভিতর হ'তে রুদ্ধ দেখলে?

প্রদ্যুম্ন। হাঁ গুরুদেব!

ভাস্করাচার্য্য ব্যাপার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি তো সমস্ত রাত্রি মূর্চ্ছিত অবস্থায়

লীলার কক্ষেই পড়িয়া ছিলেন। তাহা হইলে প্রদ্যুম্নকেই বা ডাকিল কে? আর তাঁহার শয়ন-কক্ষের দ্বারই বা ভিতর হইতে অর্গল-বদ্ধ কে করিল? এ কি রহস্য?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

যে রজনীতে উজ্জয়িনী নগরে ভাস্করাচার্য্যের আবাসে এই রহস্যময় ঘটনার অভিনয় হইয়াছিল, সে রাত্রে রঘুজী পন্থের আশ্রমেও ভয়ানক একটি দুর্ঘটনা ঘটে।

সে দিন সমস্ত দিন ধরিয়াই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। প্রবল বেগে ঝটিকা বহিতেছিল। রঘুজী তাঁহার টিলের ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহার শিলাযন্ত্রের পানে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া মঙ্গল গ্রহ হইতে প্রেরিত আলোক-বার্ত্তার অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন।

রজনী দ্বিপ্রহরের কিছু পরেই সহসা আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। মেঘমুক্ত নীলাকাশে উজ্জ্বল বিভায় জ্যোতিষ্কমণ্ডলের বিকাশ হইল। রঘুজী অতিমাত্র আশান্বিত হইয়া কক্ষের একটি গবাক্ষ উন্মোচিত করিয়া দিলেন। পরক্ষণেই দেখিলেন, তাঁহার স্ফটিকময় ঘূর্ণ্যমান শিলাযন্ত্রের উপরে যেন এক বিন্দু শোণিতপাত হইয়াছে। ক্রমে সেই বিন্দুটি আয়তনে বর্দ্ধিত হইতে হইতে সমস্ত শিলাখণ্ডটিকে যেন ছাইয়া ফেলিয়া দিল।

উল্লাসে রঘুজীর হৃদয় ভরিয়া গেল। আনন্দে আত্মহারা হইয়া তিনি শিলাযন্ত্রটির একেবারে নীচে গিয়া মুগ্ধনেত্রে সেই অদ্ভুত আলোকবিন্দুর ক্রিয়া দেখিতে লাগিলেন। শ্বাস রুদ্ধ করিয়া রঘুজী কহিলেন, "ধৈর্য্য। ধৈর্য্য! আর একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই আমার প্রাণদেবতার সন্ধান পাইব। আর এক মুহূর্ত্ত! আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর সুন্দরি! আমি প্রাণ ভ'রে তোমার সৌন্দর্য্যভরা মুখখানি দেখিয়া লই।"

রঘুজীর বার্দ্ধক্যশীর্ণ ওষ্ঠে তখনও তাঁহার শেষ কথা কয়টি কম্পিত হইতেছিল। সহসা বাহিরের তীব্র তেজে ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত করিয়া বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইল। তাহার লেলিহান রসনা মুক্ত গবাক্ষ-পথে আসিয়া ঘূর্ণ্যমান শিলাযন্ত্রের উপর পতিত হইল। সেই ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে যন্ত্রের গতি রুদ্ধ হইল। একটি বজ্রনিনাদ। পরমুহূর্ত্তেই ভীষণ শব্দে গুরুভার শিলাযন্ত্রখানি পতিত হইল।

আর রঘুজী! রঘুজী সেই শিলাখণ্ডের নীচে পড়িয়া একেবারে নিষ্পিষ্ট হইয়া গিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্যের ঔষধের বলে নবীভূত রঘুজীর হৃদয়ের শোণিতে সেই উজ্জ্বল শিলাখণ্ডখানি অনুলিপ্ত। রঘুজীর সারাজীবনব্যাপী বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও জ্ঞানচর্চ্চার ফল এক মুহূর্ত্তে ধ্বংস হইয়া গেল। ভগবানের কোন্ ইচ্ছা তাহাতে পূর্ণ হইল, তাহা কে বলিবে?

রঘুজীর মরণে শোক করিবার লোক সংসারে ছিল কেবল তাঁহার ভৃত্য বৃদ্ধ মহাদেও। সে এই আকস্মিক বিপৎপাতে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া ভাস্করাচার্য্যকে এই সংবাদ দিবার জন্য পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই উজ্জয়িনী অভিমুখে প্রস্থান করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

—:*:—

সেই দিন মধ্যাহ্নেই ভাস্করাচার্য্য লীলার কক্ষে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রঘুজীর এই আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ পাইয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, "মানুষের জ্ঞানার্জ্জন-পিপাসা কি তাহা হইলে প্রকৃতির অভিপ্রেত বা অনুমোদিত নহে? রঘুজীর সারাজীবনব্যাপী অধ্যয়নের ফল যদি প্রকৃতির একটি কটাক্ষমাত্রে ধূলিসাৎ হইতে পারে, তাহা হইলে, আমার সম্বন্ধেও তাহা হওয়া তো কিছুমাত্র অসম্ভব নয়! না! না! তাহা সম্ভব নয়! রঘুজীর সাধনার মধ্যে হয় ত কোন দোষ ছিল। কিন্তু আমার সাধনার মধ্যে কোনও দোষ নাই, কোনও ত্রুটি নাই।"

এই কথা বলিতে বলিতে ভাস্করাচার্য্য কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন, আর এক একবার লীলার মুখের দিকে সলালস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে

লাগিলেন। কি জানি কি এক অজানিত সংশয়ে, এক অনমুভূতপূর্ব্ব ভয়ে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল। ত্রোটকাচার্য্য-লিখিত পত্রখানি যেন শোণিতের অক্ষরে ছাপা হইয়া তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। লীলাকে জাগাইয়া তুলিতে আজ যেন ভাস্করাচার্য্যের কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল। সাহসে ভর করিয়া তিনি লীলার পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিয়া, তাহার কোমল ডান হাত-খানি নিজের হস্তে লইলেন। সহসা লীলার গণ্ডযুগে যেন বিকসিত গোলাপের আভা ফুটিয়া উঠিল। নবোদিত সৌরকর-স্পর্শে সরোজকলিকা যেমন ধীরে ধীরে বিকসিত হয়, লীলার অধরোষ্ঠও সেইরূপ মুকুলিত হইল। ভাস্করাচার্য্য তাহাকে কোন প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে সে কহিল, "হৃদয়-সখা! আমি এসেছি।"

"এ কি নূতন সম্বোধন! এ কি পরিবর্ত্তন!" ভাস্করাচার্য্য লীলার কথা শুনিয়া ভয়ে বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে নিজেকে একটু সংযত করিয়া কহিলেন, "আমি তো তোমাকে আহ্বান করি নাই, লীলা!"

"না! আমি আপনিই এসেছি।"

"কেন?"

"আজ যে তুমি আমাকে ভালবেসেছ, সেই জন্য না ডাকতেই তোমার কাছে এসেছি। সখা! প্রেমের আহ্বান যে বড় মধুর! তা শুনে কি আমি আর স্থির থাকতে পারি?"

ভাস্করাচার্য্যের শরীরের শিরা-উপশিরার মধ্যে কে যেন তরল অনল ঢালিয়া দিল। ত্রোটকাচার্য্যের ভবিষ্যৎ বাণী তাঁহার মানসপটে বার বার বিভীষিকা-ময়ী মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া, তাঁহাকে নিতান্ত চিন্তা-কুলিত করিয়া তুলিল। "লীলার প্রেমের সহিত তাহার অবসান।"

ভাস্করাচার্য্য সে কথা মনে করিতেও যেন কষ্ট বোধ করিতেছিলেন।

"না! না! কখনও সম্ভব নয়।"

ভাস্করাচার্য্য আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "লীলা আমার! তার আত্মার উপরে আমারই অধিকার! আমি তাকে মৃত্যুর কবল হ'তে ছিনিয়ে এনেছি! আমি ঔষধিবলে তাহার দেহটিকে পঞ্চ-ভূতে বিলীন হ'তে দিই নি। আমিই যোগবলে তার দেহের সহিত আত্মার মিলন সংঘটন ক'রে তাহার দৈহিক ও মানসিক উন্নতির উপায়বিধান করেছি। লীলা আমার নহে ত আর কাহার? লীলা! লীলা!"

"কেন প্রিয়তম?"

"তুমি কি আমায় ভালবাস?"

"বাসি ব'লেই ত না ডাকতেই এসেছি। আমি তোমাকে ভালবাসি বটে, কিন্তু কই, তুমি আমার ছায়াটিকে ভালবাসছো—কায়াটিকে ভালবাসছো না, এই আমার বড় কষ্ট।"

"তোমার কায়া আমায় দেখাও লীলা! দেখ, আমি তোমাকে ভালবাসি কি না।"

"দেখাবো; আজ নয়। তিন দিন পরে।"

"কেন লীলা! আজ নয় কেন? আমি যে ধৈর্য্য ধর্‌তে পার্‌ছি না।"

"তা কেমন ক'রে সম্ভবে? তোমার হৃদয় যে এখনও সংশয়ের অন্ধকারে পূর্ণ। অন্ধকার যেখানে, সেখানে কি আমার জ্যোতির্ম্ময়ের বিকাশ হয়? কথায় বলে, 'বিশ্বাসে মিলয়ে হরি, তর্কে বহুদূর'।"

"তোমার হরির অস্তিত্ব আগে প্রমাণ কর লীলা! আমি তখন তোমার কথা শুন্‌বো।"

লীলা কক্ষের ভিত্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "ঐ দেখ সখা! আমার শ্যামরায় আমার ক্রন্দন শুন্‌তে পেয়েছেন। তিনি নিজেই এসে ভুবনমোহন বেশে আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে এসেছেন। যেয়ো না, যেয়ো না সখা! দাসীকে একলা ফেলে যেয়ো না।"

ভাস্করাচার্য্য চারিদিকে চাহিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না; ভাবিলেন, লীলা প্রলাপ বকিতেছে। ভাস্করাচার্য্য কি জানি কি এক অজানিতপূর্ব্ব আবেগে জ্ঞান হারাইয়া, ধৈর্য্য হারাইয়া, লীলাকে তাঁহার বুকের উপর উঠাইয়া লইলেন, তাহার বুকে, মুখে, ললাটে অজস্র চুম্বন করিলেন। কিন্তু পর-ক্ষণেই লীলার মুখের দিকে চাহিয়াই তিনি ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। মুহূর্ত্তমাত্র পূর্ব্বে যে লীলার বুকে, মুখে, গায়ে পূর্ণ বিকসিত নলিনীর সুষমা ক্ষরিত হইতেছিল, এখন তাহা ভ্রষ্টশ্রী, মৃত্যুর করাল কালিমাবেষ্টিত। সে দৃশ্য দেখিয়া ভাস্করা-চার্য্য উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি পাগলের ন্যায় গিয়া লীলার পর্য্যঙ্কের পাদদেশে স্থিত একটি

স্ফটিকের বিচিত্র আলমারী খুলিয়া একটি সুবৃহৎ স্ফটিকাধার বাহির করিয়া আনিলেন। সেই স্ফটিকাধারের সুবর্ণময় ছিপিটি দাঁতে করিয়া খুলিয়া, অধীরভাবে ভাস্করাচার্য্য সেই আধারমধ্যস্থ তরল পদার্থ লীলার মুখে ঢালিয়া দিলেন। লীলা তাহার একবিন্দুও গলাধঃকরণ করিতে পারিল না। সমস্তই তাহার দুই কষ বহিয়া পড়িয়া উপাধানটিকে সিক্ত ও রঞ্জিত করিল।

কেমন করিয়া এই ষোড়শী পূর্ণাবয়বা যুবতী এক মুহূর্ত্তে কৃশাঙ্গী অমুদ্ভিন্নযৌবনা দশমবর্ষীয়া বালিকার আকার লাভ করিল, ইহাই ভাস্করাচার্য্যের বিশেষ বিস্ময়ের কারণ হইল। ছয় বৎসর পূর্ব্বে বদ্রি-নারায়ণের পথে যে বালিকার বিসূচিকা রোগে মৃত্যু হয়, এ যেন সেই বালিকা। ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সাধনার ধন লীলার সহিত এই মৃত দেহের কোন সৌসাদৃশ্যই আর দেখিতে পাইতেছিলেন না। ঔষধের বলে তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করার কল্পনাটাও যেন তাঁহার নিকট এক্ষণে অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

তবু তিনি একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একটি তীক্ষ্ণধার সূচ্যগ্র ছুরিকা লইয়া তিনি লীলার হস্তের শিরার উপর অস্ত্রোপচার করিলেন। কিন্তু সেই রন্ধ্রপথে এক বিন্দুও রক্ত পড়িল না দেখিয়া আতঙ্কে ভাস্করাচার্য্যের মুখ শুকাইয়া গেল। একটি পিচকারীর ন্যায় যন্ত্রপূর্ণ ঔষধ লইয়া ভাস্করাচার্য্য সেই ঔষধটি লীলার অঙ্গে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন।

কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীত হইল। তীব্র দ্রাবক যেমন কিছুতে পতিত হইলে সেই জিনিসটিকে ধীরে ধীরে দগ্ধ বা তরলীভূত করিয়া ফেলে, লীলার শরীরের উপরও ভাস্করাচার্য্য-প্রযুক্ত ঔষধি ঠিক সেই রূপ কার্য্য করিল। লীলার শরীর সেই শয্যার উপরেই ধীরে-ধীরে ভস্মীভূত হইয়া গেল।

নিরাশায় অতিমাত্র পীড়িত ও যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ভাস্করাচার্য্য উন্মত্তের ন্যায় কহিতে লাগিলেন, "সব ব্যর্থ! সব নিষ্ফল! এত জ্ঞান, এত চেষ্টা! তাহার পরিণাম—পরাজয়, অপমান, নৈরাশ্য! কার হাতে? যে অদৃশ্য শক্তিতে জন্মেও কখন বিশ্বাস করি নি, তারই হাতে। 'আমি কখনও ইহা কল্পনাও করতে পারি নি। হে অদৃষ্ট অজানিত শক্তি! আমাকে দেখা দাও। লুকিয়ে থেকো না। মানুষের মস্তিষ্কবলের সঙ্গে, আমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তোমার সত্তা ও প্রাধান্য সপ্রমাণিত কর। তা না হ'লে হে চোর! হে কপট! হে প্রবঞ্চক! আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাবো। আমার লীলার আত্মাকে তুমি যেখানেই লুকিয়ে রাখো, আমি সেই-খান থেকেই তাকে টেনে বার করবো। লীলা! লীলা! দাঁড়াও, আমায় কেবলমাত্র পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। আমি তস্কর মৃত্যুর হাত হ'তে তোমাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসব।"

ভাস্করাচার্য্য তাঁহার আলমারি খুলিয়া একখানি শাণিত ছুরিকা বাহির করিলেন। তাহার উপর মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া ঝলমল করিতে লাগিল।

ভাস্করাচার্য্য সেই শাণিত অস্ত্রের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "শুন আকাশ, বাতাস, দুঃখপূর্ণ দারিদ্র্যপূর্ণ হিংসা-দ্বেষ-কলহপূর্ণ বসুন্ধরা, তুমিও শুন, আমার বহুশতবর্ষব্যাপী জ্ঞানার্জ্জ-নের ফলে আমি যে সত্যে উপনীত, তা আমি আজ এই মরণের প্রাক্কালে তোমাদের নিকট উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করছি। সে সত্যটি এই। ঈশ্বর আছেন। কিন্তু লোকে তাঁকে ভুল ক'রে দয়াময় বলে। তিনি বড় নির্দ্দয়! বড় যথেচ্ছাচারী! বড় শক্তিমান্! ভগবান্! আমি শিখেছি। আমি তোমায় দেখ্‌তে পেয়েছি। আমি তোমায় চিন্‌তে পেরেছি। আমি জান্‌তে পেরেছি যে, তোমায় আমায় কোনও পার্থক্য নাই। আমার মধ্যে তুমি আছ। ঐ ক্ষুদ্র পিপীলিকা-টির মধ্যেও তুমি আছ। তুমি সর্ব্বশক্তিমান্। তুমি আমাকে পরিবর্ত্তিত করতে পার বটে, কিন্তু বিনষ্ট করতে পার না। তোমার যতদূর সাধ্য, তুমি আমাকে নির্য্যাতিত করেছ। আমার আজন্ম-সাধনার ধনকে তুমি হরণ করেছ। হে প্রাণদেবতা! আমার প্রাণের মধ্যে তোমার যে সত্তা নিগূঢ়ভাবে নিহিত রয়েছে, তারই বিরুদ্ধে তুমি আজন্মব্যাপী তুমুল সংগ্রাম করেছ। এখন আমি পরাজিত, এখন আমি বিধ্বস্ত। পরাজিত শত্রুর প্রতি করুণা দেখাও, দয়াময়! যেখানে আমার লীলাকে নিয়ে গিয়েছ, আমাকেও সেই রাস্তা দেখিয়ে দাও। আমি অনন্ত—অনন্তকাল নতজানুতে তোমার পূজা করবো।" এই কথা বলিয়া ভাস্করাচার্য্য তাঁহার

হস্তস্থিত শাণিত ছুরিকায় তাঁহার নিজের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় কে আসিয়া পশ্চাদ্দিক্ হইতে তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল।

ভাস্করাচার্য্য মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন—ত্রোটকাচার্য্য!

ত্রোটকাচার্য্যের মুখ গম্ভীর, প্রশান্ত ও করুণায় মাখান।

ত্রোটকাচার্য্য ধীর-গম্ভীর-ভাবে স্নেহার্দ্রভাষায় কহিলেন, "ভাস্করাচার্য্য! তুমি পরমজ্ঞানী হয়ে কি কার্য্য করতে যাচ্ছিলে? অনিত্যের জন্য নিত্যধনকে ভুলে যাচ্ছিলে। লীলা কে? লীলা তো মায়ার অপর নাম মাত্র। এই জগৎ লীলায় চালিত, সুতরং তাত্ত্বিকসত্তাশূন্য ও মিথ্যা। যেমন কোন ঐন্দ্রজালিক কৌশলাদি-প্রয়োগ-ক্ষুভ্যমান মায়া দ্বারা ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে, সেইরূপ মহামায়াবী ঈশ্বরও বিনা ব্যাপারে স্বেচ্ছাদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন। তুমি জ্ঞানী। তোমাকে এ কথা বুঝান অনাবশ্যক। লীলা ঈশ্বরের। সে ঈশ্বরেই লীন হয়েছে। সে তোমাকে ঈশ্বর-লাভের প্রকৃষ্টতম পন্থা দেখিয়ে দিয়ে মহা-প্রস্থান করেছে। সেই পন্থা অবলম্বনে তুমিও পরমব্রহ্মলাভ করবে। এস বৎস! পুণ্যভূমি বদরিকাশ্রমে তোমার জন্য বড় একটি সুন্দর আশ্রম রচনা করা হয়েছে। চল, আমরা তথায় যাই।"

ত্রোটকাচার্য্য অগ্রে অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিলেন। তাহার পশ্চাতে ভাস্করাচার্য্য। ভাস্করা-চার্য্যের নয়ন-কোণে দুই বিন্দু অশ্রু। সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী হইলে কি হয়, মানুষ মানুষ তো বটে। এই দুই মানব-দেবতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহাদের অগণ্য শিষ্যগণ উজ্জয়িনীর রাজপথ মুখরিত করিয়া গাহিতে গাহিতে চলিলেন:—

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীববিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত-
স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥
মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥
নলিনীদলগতজলমতিতরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥
যাবজ্জননং তাবন্মরণং
তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥
দিনযামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ
শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু-
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥
সুরবরমন্দিরতরুমূলবাসঃ
শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ॥
অষ্টকুলাচলসপ্তসমুদ্রাঃ
ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোক-
স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত-
স্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥

সমাপ্ত।

অজিতা

বা

বঙ্গে পাঠান

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

অবতরণিকা

বঙ্গ বেহার উড়িষ্যা হইতে পাঠান-শক্তিকে নির্ম্মূলিত করিতে মোগল সম্রাটের অনেক কাঠ-খড় পোড়াইতে হইয়াছিল।

পাঠান-সভ্যতা, মোগল-সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীনতর, পাঠানের রুচি মোগলের রুচির চেয়ে অধিকতর মার্জ্জিত ছিল। পাঠান বাঙ্গালায় আসিয়া রাজত্ব করিতে করিতে বাঙ্গালীর সহিত এমন একমন একপ্রাণ হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল যে, তাহাদের মধ্যে জাতিগত ও ধর্ম্মগত পার্থক্য অনেকটা লুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল।

বাঙ্গালা যখন মোগল সুবাদার ও ফৌজদারদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত, দেশজোড়া বিপ্লবের আগুন যখন বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার সর্ব্বত্র দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল, তখন পাঠানশক্তি বাঙ্গালার বাঙ্গালীর সহিত মিলিয়া বার বার মোগলের অত্যাচারে বাধা দিয়াছিল। ইতিহাসপাঠকমাত্রেরই ইহা জানা আছে।

রহিমশা ও শোভাসিংহের বিদ্রোহও ঐতিহাসিক সত্য। সেই সত্য ঘটনার উপর মূল ভিত্তি করিয়া এই আখ্যায়িকাটি রচিত হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, এই উপন্যাসখানি নাটকের আকারে 'রহিমশা' এই নামে কলিকাতার স্থায়ী রঙ্গমঞ্চগুলির মধ্যে একটিতে অভিনীত হইয়াছিল। কাজে কাজেই এই উপন্যাসখানির লিখনভঙ্গীতে একটু নাটকীয় ভাবের আভাস পাওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

যদি উপন্যাসখানি পাঠকবর্গের মনস্তৃপ্তি করিতে পারে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ইহার নাটকীয় আকার তাঁহাদের হস্তে দিব, ইহাই আমার সঙ্কল্প। ইতি—

গ্রন্থকার।

অজিতা

বা

বঙ্গে পাঠান

প্রথম পরিচ্ছেদ

—:*:—

জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গী।

"না, আজ আর দলপতির কথা শুনছি নি। আজ আর সোনারূপো নিচ্ছি নি। চাল চাই—"

"এক ঝুড়ি সোনার বদলে যদি এক মুঠো চাল পাই—তাও ভাল।"

"পেট জ্বলে গেল—জ্বলে গেল—ক্ষিদের জ্বালায় পেট জ্বলে গেল। শিয়াল-কুকুরের মাংস—তাও তো পেট ভ'রে খেতে পাই না!"

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, অন্নক্লিষ্ট, শীর্ণকলেবর কয়েক জন দস্যু গোবিন্দপুরের নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে একটি পরিষ্কৃত স্থানে বসিয়া এইরূপ পরামর্শ করিতেছিল।

আধুনিক কলিকাতার যে অংশে আজ রাইটার্স বিল্ডিংস্, জেনারেল পোষ্ট আফিস, টেলিগ্রাফ আফিস এবং ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণ হাইকোর্ট প্রভৃতি সৌধমালার অভ্রভেদী চূড়া গর্ব্বোন্নত-শিরে ইংরাজ-রাজের বিশাল রাজত্বের মহিমার নিদর্শনরূপে বিরাজ করিতেছে, যেখানে আজি বিচিত্র কুসুমাভরণ-ভূষিতা মর্ত্ত্যের নন্দন-কানন ইডেন-গার্ডেন লতাগুল্মের শ্যামল সুষমা বসনাঞ্চলে স্বীয় চারু দেহ-বল্লী আবরিয়া নধর অধরকোণে তড়িতের হাসি-রেখা ফুটাইয়া মূর্ত্তিমতী বিলাসিনীর মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, যেখানে আজি অসংখ্য পণ্য-পরিশোভিত, বৈদ্যুতিক আলোকমালা-সজ্জিত, বিপণিশ্রেণী শত শত ক্রেতা, বিক্রেতা ও দর্শকগণের বাদ-বিসংবাদ, হাস্য-কলরব অথব পরিহাসে মুখরিত, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সেই স্থান নিবিড় জঙ্গলে সমাকীর্ণ, শার্দ্দূলাদি হিংস্র শ্বাপদের আবাসভূমি। সে আজ প্রায় সার্দ্ধ এক শতাব্দীর কিছু বেশী দিনের কথা। সম্রাট আরংজীব তখন সুবিস্তৃত মোগল-সাম্রাজ্যের অধিপতি। প্রদীপ যেমন নিবিয়া যাইবার আগে একবার খুব জ্বলিয়া উঠে, মোগল-সাম্রাজ্যেরও অবস্থা তাই। রাজ্যের উন্নতি ও বিস্তৃতি এখন চরম সীমায় উপনীত। রাজ্য বড়। শাসকের ক্ষমতা কম। সেইজন্য সমগ্র ভারতবর্ষ এখন আভ্যন্তরীণ বিপ্লবে উৎপীড়িত। আরংজীব কত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে বিপ্লব থামিবার নহে। সে অগ্নি নিবিবার নহে। বাঙ্গালা, দিল্লী হইতে অনেক দূরে। তাই সেখানে অত্যাচারও বেশী। বাঙ্গালার শাসনভার ঢাকার নবাব ইব্রাহিম খাঁর উপর। ইব্রাহিম খাঁ বৃদ্ধ—নিরীহ। যাহা করেন তাঁহার অধীনস্থ ফৌজদার-গণ। ফৌজদারদিগের অত্যাচারে প্রজাগণ একেবারে জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে আবার দৈব প্রতিকূল। তিন বৎসর হইতে অজন্মা। শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমি এখন শ্মশান। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। তাই প্রজাগণ পেটের দায়ে ডাকাতি আরম্ভ করিয়াছে। এই শ্রেণীর এক দল ডাকাত, আজ গোবিন্দপুরের বনের মধ্যে বসিয়া, কেমন করিয়া ক্ষুধা মিটাইবে, সেই পরামর্শ করিতেছে। আজ তাহারা ক্ষুধায় পাগল—আহার্য্যও কোথাও মিলে নাই—মিলিবার আশাও নাই; তাই এক জন বলিল, "আয় ভাই, আজ সবাই মিলে দলপতিকে ধ'রে কেটে পুড়িয়ে খাই।"

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সকলেই সেই প্রস্তাবের সমর্থন করিল। আর এক জন দস্যু বলিয়া উঠিল, "যা বলেছিস্ ভাই, আমাদের শরীরে তো মাংসের লেশ নাই। শুধু চামড়া দিয়ে ঢাকা হাড়। দলপতির শরীরে একটু মাংস আছে, একটু চর্ব্বি আছে।"

প্র, দস্যু। যা হয় কর বাবু! আর ক্ষিধের জ্বালা সহ্য হয় না। ক্ষিদের জ্বালায় কচি ছেলেটাকে পর্য্যন্ত খেয়েছি।

দ্বি, দস্যু। দেখা যাক্, আজ বাজার লুটে কি আন্‌তে পারে।

তৃ, দস্যু। আন্‌বে আর কি? সুতোনুটীর বাজারে আছে কি? গাড়ী বোঝাই ক'রে কতকগুলো সুতো নিয়ে আসবে, না হয় কতকগুলো কাপড় নিয়ে আসবে।

দ্বি, দস্যু। কাপড় আন্‌লেও তো প'রে বাঁচা যায়, লজ্জানিবারণ হয়।

তৃ, দস্যু। তোর তো লজ্জা দেখ্‌ছি বেশী। ক্ষিধেয় মারা যাচ্ছি, তা চুলোয় গেল—ওঁর লজ্জা-নিবারণ। আয় ভাই সব, দলপতির এখনও আসতে দেরী আছে। আমরা ততক্ষণ এই ব্যাটাকেই কেটে পোড়াই। জন্মের মতন ওর লজ্জা নিবারণ ক'রে দিই।

চ, দস্যু। সেই ভাল! যা মানুকে, তুই আগুন কর্ গিয়ে। আমরা ও ব্যাটাকে কেটে মাংস তৈরি করি।

যাহাকে মারিবার কল্পনা হইতেছে, সে প্রমাদ গণিল; দেখিল, কথা কার্য্যে পরিণত হইতে যাইতেছে। অনন্যোপায় হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে তাহার শীর্ণ হাত দুইখানি দিয়া একেবারে অন্য দস্যুর দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, "তোদের পায়ে পড়ছি, আমায় মারিস্ নি। আমার শরীরে মাংস নেই; কেবল হাড়! এতে তোদের ক্ষিদে মিট্‌বে না।"

এক জন দস্যু বলিল, "সে পরামর্শ তোকে দিতে হবে না।" অপর এক জন কহিল, "ধর—ধর—চল, সবাই মিলে ব্যাটাকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে যাই চল।"

ঠিক এই সময়ে বনের মধ্যে বহুকণ্ঠে গীত একটি সঙ্গীতের ধ্বনি শুনিয়া দস্যুদল চমকিয়া উঠিল। এক জন দস্যু কহিল, "ওই শোন শোন, চৌরঙ্গী বাবার দল আস্‌ছে; এসে পড়লে আর ব্যাটাকে মারতে দেবে না।" আর এক জন দস্যু কহিল, "খবরদার, মুখের গ্রাস না পালায়। আজ আর কিছু জুট্‌ছে না, মহামাংস দিয়েই পেট ভর্‌তে হবে।"

দস্যুর কাতর ক্রন্দনে কেহই কর্ণপাত করিল না, সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া তাহাকে বধ করিতে লইয়া গেল। চৌরঙ্গী বাবা ও তাঁহার শিষ্যগণ একটি জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। শিষ্যগণ গাহিতে লাগিলেন :—

(গীত)

মা আমাদের সোনা মোদের সোনা মা!
ফলে ফুলে সুষমাতে ঢাকা মায়ের গা।
মায়ের ক্ষেতে ফলে পাকা সোনা
জলে মাণিক ঢালা;
মায়ের ঘরে ঘরে দেখ গিয়ে রতন-প্রদীপ জ্বালা
মোদের সোনা মা।
মায়ের মুখের হাসি-রাশি ফুটে জোছনায়
মায়ের কনক আঁচর চুরি ক'রে উড়ায় মলয়-বায়।
মায়ের দশভুজে শোভে দশ প্রহরণ
দুই পদে করেন মাতা অসুর-দলন।
এস সপ্তকোটি কণ্ঠে গাহি মা'য়র নাম গান
মায়ের চরণে সঁপিব আমরা সপ্তকোটি প্রাণ
আমরা মায়ের সন্তান।
আমরা মা বিনা কারেও জানি না
মা আমাদের সোনা মোদের সোনা মা।

গানের ছন্দে ছন্দে, স্বদেশ-সেবক ভক্ত জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গীর শিষ্যগণের হৃদয় নাচিয়া উঠিল। সমস্ত বনস্থলী যেন সেই গান শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গী কে? ইনি এক জন সিদ্ধপুরুষ। গোবিন্দপুরের বনের মধ্যেই ইঁহার আশ্রম। কালীঘাটের যে কালিকাদেবীর মূর্ত্তি আজ সমগ্র ভারতবাসী দ্বারা সম্পূজিতা, সেই দেবী-মূর্ত্তি এই পরম ভক্ত সিদ্ধযোগী জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গীর সম্মুখে গোবিন্দপুরের নিবিড় বনমধ্যে সর্ব্বপ্রথমে প্রকটিতা হন। এই মহাপুরুষের নাম ভারতবাসীর হৃদয়পটে চিরতরে অঙ্কিত রাখিবার জন্যই যেন কি এক উপায়ে, আধুনিক কলিকাতায় যে সুবিস্তৃত রাজবর্ম্ম ধর্ম্মতলার মোড় হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহার নাম চৌরঙ্গীর রাস্তা রাখা হইয়াছে।

গান শেষ হইলে চৌরঙ্গী তাঁহার ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভক্তগণ, আজ সেই দিনের কথা মনে পড়ে, যে দিন বিশ্বপূজ্য আর্য্য

ঋষিগণ দৃশদ্বতী পার হইয়া যখন প্রথম আর্য্যাবর্ত্তে পদার্পণ করিলেন, তখন ভারত বর্ব্বরতা-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। আর্য্যদিগের সঙ্গে সঙ্গে যেন জ্যোতির্ম্মাতা শুক্লাম্বরী মূর্ত্তিমতী উষা দিগ্‌দিগন্তরে প্রতিভা বিকীর্ণ করিয়া সহসা উদিতা হইলেন। পঞ্চনদতটে ঋষিমুখ-উদীরিত সামবেদ গীতি আচম্বিতে ভারত প্লাবিয়া ফেলিল। সরস্বতী, দৃশদ্বতী—এই দুই দেবনদীর অন্তরভূমিতে যাহারা এতদিন মোহনিদ্রাতুর ছিল, তাহারা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া জাগিয়া উঠিল। ফলে ফুলে সুশোভিতা শ্যামলা জননী, কম অঙ্গে সাগর-অম্বর ঝাঁপিয়া—সর্ব্ব অলঙ্কারবিভূষিতা, হাস্যময়ী অনন্ত ঐশ্বর্য্যময়ী বর্ব্বরের বাসভূমে আপনার পদ্মাসন স্থাপন করিলেন। আচম্বিতে সে দৃশ্য দেখিয়া চমকিত আর্য্য ঋষিগণ গাহিলেন,—

"সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাং
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং লোচনত্রিতয়ান্বিতাম্।
ত্রিবলীবলয়োপেতনাভিনালমৃণালিনীং
প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীম্।"

ভক্তগণ! আজ একবার মায়ের মুখপানে চেয়ে দেখ। অন্নপূর্ণা আজ অন্নাভাবে শীর্ণা। দুষ্ট দস্যুগণ তাঁর অঙ্গ-আভরণ হরণ করিয়াছে, তাই আজ তিনি নগ্নিকা। সমস্ত ভারত আজ শ্মশানের ধূমে ব্যাপ্ত, তাই কমলাননা পদ্মাসনা মাতা আজি মহামেঘস্বরূপিণী—উলঙ্গিনী—কপালমালিনী।"

জনৈক শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব, কবে আবার বিশ্বমাতা মুখ তুলে সন্তানের পানে চাহিবেন?"

চৌরঙ্গী উত্তর করিলেন, "যে দিন সপ্তবিংশ কোটি মায়ের সন্তান জাতিগত, বর্ণগত, ধর্ম্মগত, ভিত্তিহীন পার্থক্য ভুলিয়া মায়ের চরণতলে আত্মোৎসর্গ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হবে, যে দিন হিন্দু মুসলমান মাতৃভূমি জননীর যমজ-সন্তান হিংসা-দ্বেষ ভুলিয়া, এক জন আর এক জনকে হৃদয়ের গাঢ়তম আলিঙ্গনে বক্ষে টানিয়া লইবে, সেই দিন এই অভিশাপ দূর হবে। সেই দিন সেই পুণ্যময় ক্ষণে জননী আমাদের তমোময়ী মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া কল্যাণদায়িনী বেদ-বিদ্যাপ্রসবিনী শান্তি-স্বরূপিণী বাণীমূর্ত্তি ধারণ করিবেন। যার চরণ-কমলপ্রান্তে সমবেত হিন্দু-মুসলমান তারস্বরে গাহিবে—

"আশাসু রাশীভবদঙ্গবল্লী ভাসৈব
দাসীকৃতদুগ্ধসিন্ধুম্।
মন্দস্মিতৈর্নিন্দিতশারদেন্দু বন্দে-
হরবিন্দাননসুন্দরি ত্বাম্।"

যাও শিষ্যগণ, ফলাফল-বিচারণা ছাড়িয়া সকলে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও।"

শিষ্যগণ একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "মা আদ্যাশক্তি! কার্য্য তোমার, আমরা ক্ষুদ্র নিমিত্ত মাত্র। তাই বলি মা, আমাদের হৃদয়ে বল দাও।" এই কথা বলিয়া শিষ্যগণ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। চৌরঙ্গী ইষ্টদেবী কালিকার ধ্যানে মগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ সেই ভাবে থাকিতে থাকিতে মহাপুরুষ যেন তাঁহার হৃদয়ে মহাশক্তির দিব্যজ্যোতির বিকাশ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "সর্ব্বার্থসাধিকা জগৎপালিকা মাতা! আমার সাধনা কি সিদ্ধ হইবে না? বল্ মা চামুণ্ডা! কিসে তুই পরিতুষ্টা হইবি? মা, ভক্ত-হৃদয়ের রক্তপান হেতু এতই যদি তোর পিপাসা, সে তীব্র শোণিত-পিপাসা তোর এখনি মিটাব।" চৌরঙ্গীর প্রেমোজ্জ্বল নয়নদ্বয় দেবীর পুরোভাগে মঙ্গল-ঘটের পার্শ্বে রক্ষিত তীক্ষ্ণ খড়্গের দিকে বদ্ধ হইল মা যেন ভক্তের অভিপ্রায় বুঝিয়া লইলেন। বনভূমি কম্পিত করিয়া মেঘমন্দ্রে আকাশবাণী হইল—"শুন বৎস! কর্ম্ম কখনও নিষ্ফল হয় না! প্রাণপণে কর্ম্ম কর, অসংশয় সিদ্ধিলাভ হইবে।" বিশ্বজননীর এই আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া মহাপুরুষ যেমন চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, অমনি দেখিতে পাইলেন—বঙ্গের অদ্বিতীয় কর্ম্মবীর পাঠান সর্দ্দার রহিম শা কৃতাঞ্জলিপুটে অদূরে দণ্ডায়মান।

রহিম শা কে? দেখ গিয়াছে পৃথিবীতে অনেক সময়ে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইতিহাসের পাতে তাঁহাদের নাম উঠে নাই। কাব্যের নায়করূপে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য তাঁহাদের ঘটে নাই। বনের ফুল যেমন বিজনে ফুটিয়া বিজনেই ঝরিয়া পড়িয়া যায়, কেহ তাহার খবর লয় না, ইঁহারাও ঠিক সেইরূপ। ইঁহাদের নীরব জীবন যশের ঢক্কানিনাদে নিনাদিত নহে, অথচ কেবল কর্ম্মময়—কেবল শক্তিময়। এই প্রকৃতির মহাপুরুষদিগের মধ্যে এক জন ছিলেন—রহিম শা। ইতিহাসে তিনি দস্যু-সর্দ্দার রহিম শাঁ বলিয়া উল্লিখিত। মোগল যে সময় ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্, পাঠানশক্তি সে সময়ে

পর্য্যুদস্ত হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। বঙ্গে এবং উৎকলে পাঠানের প্রভাব বরাবরই অপ্রতিহত ছিল। সুযোগ পাইলেই তাহারা মোগল ফৌজদারদিগকে নির্য্যাতিত করিতে ছাড়িত না। দারুণ অত্যাচারী মোগল-সম্রাট আরংজীব ও তাহার উপযুক্ত অনুচর নিষ্ঠুর প্রজাপীড়ক বাঙ্গালার ফৌজদারদিগের অত্যাচার হইতে বাঙ্গালা এবং উৎকলের প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এই মহাপ্রাণ পাঠান সর্দ্দার আপনার জীবন বিসর্জ্জন করেন। বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমানে সখ্য স্থাপন করিয়া – তাহাদের মিলিত শক্তি প্রবল মোগল-শক্তির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থাপিত করাই তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল?

রহিমশা চৌরঙ্গীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কহিলেন,"ভগবন্, কিঙ্করেরে কোন্ প্রয়োজনে স্মরণ করিয়াছেন?" চৌরঙ্গী আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "শক্তিমান্ পাঠান সর্দ্দার, আজ আত্মপ্রয়োজনে তোমাকে এখানে ডাকি নাই। জানিও বীর! ইহা শত শল্যক্ষতা দুর্ভিক্ষের গুরুভারে ভূশ-নিপীড়িতা জন্মভূমি জননীর করুণ আহ্বান।

রহিমশা। হায় পিতা! আমি ক্ষীণবল, অর্থহীন, জন্মদাত্রী ধরিত্রীর অযোগ্য তনয়। রাজদণ্ড-ভয়ে সদা সশঙ্কিত ক্ষুদ্র দস্যুমাত্র। পিতা মোগলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি জয়ী হইব, ইহা কি সম্ভব?

চৌরঙ্গী। বিশ্ববরণীয়া বিশ্বমাতা নিজে যাহার সহায়, কহ বৎস, তাহার পরাভব-ভয় কে থায়?

রহিমশা। দেব! তুমি ত্রিকালজ্ঞ, ভবিষ্যের তমোময় অসীমতামাঝে যে রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে, তোমার নিকটে তাহা দিবালোকের ন্যায় প্রকাশিত। তাই ভগবান্, শ্রীচরণসমাশ্রয় করিয়াছি। তাই বিনা বাক্যব্যয়ে 'দস্যু রাজদ্রোহী' এই অপবাদ স্বেচ্ছায় শিরে ধরিয়াছি।

চৌরঙ্গী। বৎস! আজি এই বঙ্গভূমে দস্যু নামে কে না শ্লাঘা করে? বল, কত কাল আর প্রজা মোগল-হস্তে এই নিদারুণ নিগ্রহ ভোগ করিবে? দেখ, ধরামাঝে সর্প-সম নীচ জীব আর নাই। সর্ব্বদা ধূলির ভিতরে মাথা গুঁজিয়া রহে, কিন্তু পদাহত হ'লে, সেও ফণা আস্ফালিয়া উঠে। নিরন্তর অত্যাচারে প্রজা কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে পাঠান সর্দ্দার! একবার ভাবিয়া দেখ, কোন্ দেশে তীব্র কুঠার-তাড়নে, জননী অপত্য-স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া, নিশ্বাস রুধিয়া আপনার কোলের সন্তান মারিয়া ফেলে, আর তাহারই মাংসে নিজের দগ্ধোদর পূর্ণ করে?

রহিমশা। সত্য পিতা! জননী বঙ্গভূমির উপরে বিধাতার ঘোর অভিশাপ।

চৌরঙ্গী। পাঠান সর্দ্দার! তা হ'লে কি তুমি জননীর উপরে এই ঘোর অত্যাচার মূকের ন্যায় দাঁড়াইয়া দেখিবে?

রহিমশা। কখনই না। ভগবন্, আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণ এবং তুচ্ছ নশ্বর দেহ মার পদতলে অর্পণ করিলাম।

চৌরঙ্গী। বৎস! এই তো তোমার যোগ্য কথা। তোমা হইতে নিশ্চয় জননীর ব্যথা ঘুচিবে।

রহিমশা। তাত! আশীর্ব্বাদ কর, তাই যেন হয়।

চৌরঙ্গী আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বৎস! মহাশক্তি মহাবলে তোমার হৃদয় পূর্ণ করুন! তুমি প্রাণপণে মোগল-বিজয় কর।

মহাপুরুষের স্নেহাশীর্ব্বাদ শিরে লইয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে মহাপ্রাণ পাঠান সর্দ্দার তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—:*:—

জোহান বেয়ার।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, কালীঘাট তখন ভাগীরথীতীরস্থ একটি অতি ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র। অল্পদিন হইল, যশোরের অধীশ্বর মহারাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্তরায় বন কাটিয়া কালিকা দেবীর একটি প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। রাজা বসন্ত রায় কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, ইন্দ্রজালসমুদ্ভূত ছায়ার মতন সোনার যশোর রাজ্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজা বসন্তরায়ের সেই অক্ষয় কীর্ত্তি কালীঘাটের দেবী-মন্দির এখনও বর্ত্তমান। মন্দিরের পাদমূল ধৌত করিয়া কলনাদিনী ভাগীরথী বহিয়া যাইতেছে। সময়ের গতি বিচিত্র। তাই ভাগীরথী আজ ইতিহাসে "টালির নালা" নামে পরিচিত।

প্রভাত হইয়াছে। পল্লী-রমণীগণ দলে দলে

মঙ্গলগীত গাহিতে গাহিতে ভাগীরথী সলিলে স্নান পূজা করিতেছেন। রমণীগণ গাহিতেছিলেনঃ—

"প্রণমি পুণ্যমূরতি জাহ্নবি
তব চরণে
শ্যামলা সুষমা ছড়ায়ে বঙ্গে
নাচিয়া নাচিয়া চলেছ রঙ্গে
নির্ম্মল ঢল ঢল সলিলা গঙ্গে
প্রণমি তব চরণে।
তুমি বিশ্ব-বরেণ্যা মাঙ্গল্যরূপিণি
তুমি জগৎ শরণ্যা কারুণ্যশালিনী
তুমি দুরিত-হারিণী ত্রিতাপ-বারিণী
প্রণমি তব চরণে।
রত্নবিলসিত তব রাজীবচরণে
কি সুষমা বিজড়িত শ্যামলে হিরণে
অঞ্জলি পূরিয়া কুসুমধান্য
সাজাইয়া দিয়া হব মা ধন্য
অয়ি নীলোৎপল বরণে।"

গীত শেষ হইলে এক জন রমণী বলিলেন, "চল ভাই। আমরা শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর স্নান ক'রে মায়ের পুজো দিয়ে, বেশী বেলা না হ'তে হ'তে ঘরে ফিরে যাই। যে গোরার ভয় হয়েছে, দিনের বেলায়ও বাহিরে বেরুতে শঙ্কা হয়।"

দ্বি-রমণী। যা বলেছিস্ ভাই! পাঠানের ভয়েই অস্থির, তার ওপরে আবার এই এক নূতন উপসর্গ।

তৃ-রমণী। যাই বল ভাই! পাঠান সর্দ্দার রহিমশা শুনেছি বড় উঁচু দরের লোক। সে দুর্ব্বলের প্রতি, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের প্রতি কখনও কোন অত্যাচার করে না। বরং যারা দুর্ব্বলকে ও স্ত্রীলোককে পীড়ন করে, পাঠান সর্দ্দার তাদের যথোচিত শাস্তি দেন—"

প্র-রমণী। অমন "গরু মেরে জুতো দানে" লাভ কি ভাই? অত্যাচারীর অত্যাচার নিবারণ করবার জন্য ফৌজদার আছেন, নবাব আছেন। সকলের ওপরে দুনিয়ার বাদশা মোগল সম্রাট আছেন। যিনি রাজ্যের রাজা তাঁরই ওপরে প্রজা-রক্ষার ভার। অন্যের পক্ষে সে ভার আপনার ওপর নেওয়া কেবল অবাধে কুকার্য্যসাধন করবার জন্য নিঃস্বার্থতার ভাণ মাত্র।

দ্বি-রমণী। চুপ্! চুপ্! রহিমশার নিন্দে করিস্ নি। তাতে সইয়ের গায়ে বড় ব্যথা লাগে। পাঠান সর্দ্দার যদি হিঁদু হ'তো, তা হ'লে সই বোধ হয়, তার সঙ্গে এত দিন স্বয়ংবরা হ'ত।

তৃ-রমণী। সইয়ের সব কথায়ই কেবল ঠাট্টা। বীরের বীরপণা কীর্ত্তন কল্লেই যদি তাকে ভালবাসা হতো, তা হ'লে অমলা দিদি যে নবাব বাদশার কথা বলছে, বোধ হয়, সে তাদেরকে খুব ভালবাসে।

চ-রমণী। কিন্তু ভাই, দিনে দিনে হ'ল কি? দেশটা একেবারে অরাজক হয়ে গেল। আমার দেওর সুতোনুটির কুঠীতে সাহেবের চাকরী করে। সে বলছিল যে, গোবিন্দপুরের কাছে গঙ্গার ধারে ইংরাজেরা নাকি মস্ত এক কেল্লা তৈয়ের করছে।

প্র-রমণী। তা হ'লে কি বোন্ আমাদের দোর গড়ায় ইংরাজের কেল্লা! জাতকুল বাঁচানো যে ক্রমে দায় হয়ে উঠল ভাই!

চ-রমণী। কেন ভাই, আমি আমার দেওরের মুখে শুনেছি যে, ইংরাজ নারীজাতিকে বড়ই সম্মান করে। আর তারা যেমন কর্ম্মকুশল, সাহসী ও উদ্যমশীল, তাতে বোধ হয় যে, এক দিন এদেরই হাতে ভারতের ভাগ্য-সূত্র সমর্পিত হবে।

তৃ-রমণী। পাঠান সর্দ্দার রহিমশা আর শোভাসিংহ জীবিত থাকতে ত নয়। রহিমশা আর শোভাসিংহের মত কর্ম্মবীর জগতে বিরল।

দ্বি-রমণী। এই দুই দস্যু সর্দ্দারকে দমন করবার জন্য শুনলুম, শাহজাদা আজিমুশ্বান পঞ্চাশ-হাজার ফৌজ নিয়ে বাঙ্গালার দিকে আসছেন। এ দিকে নবাবপুত্র জবরদস্ত খাঁও উপযুক্ত সৈন্যবল নিয়ে তাঁকে এগিয়ে আনতে গেছে।

তৃ-রমণী। সম্রাট-পুত্র বাঙ্গালার মাটীতে পদার্পণ করবার পূর্ব্বে রহিমশার তীক্ষ্ণ খড়্গে দ্বিখণ্ডিত না হ'লে আপনাকে ভাগ্যবান ব'লে জানবেন।

দ্বি-রমণী। সম্রাট-পুত্র আজিমুশ্বানও দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করেন না। তার ওপরে ইংরাজের তোপ ও ইংরাজের যুদ্ধ জাহাজ। চাণক সাহেব একখানি জাহাজ আর একশ খানেক গোরা নিয়ে হুগলীর কাছে ঘোলঘাটের কুঠীতে কি কাণ্ডটাই না করলে, ফৌজদারের বিশ হাজার ফৌজ একেবারে সাবাড়।

তৃ-রমণী। মোগল ফৌজদারের কথা ছেড়ে দাও। ফৌজদার সাহেবেরা এখন ফৌজ ছেড়ে দিয়ে মৌজ নিয়েই ব্যস্ত।

প্র-রমণী। আমাদের ভাই সব দিকেই লোক-শান,"রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়,উলুখাগড়ার প্রাণ যায়" আমাদের দিনে-দুপুরে ঘাটে-মাঠে যাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ। দিন গেলে যে একবার মায়ের পায়ে দুটো ফুল দিয়ে যাব, তারও যো-টি নাই। এক দিকে ডাকাতের ভয় আর এক দিকে গোরার ভয়।

তৃ-রমণী। ওই দেখ, "বন থেকে বেরুচ্ছে টিয়ে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।"

রমণীগণ। ও মা, কি হবে? একটা গোরা যে! পালা—পালা—

ছোট ছোট ছেলেরা যেমন জুজুর ভয়ে জড়সড় হয়, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বাঙ্গালার আবাল বৃদ্ধ বনিতা গোরা ও বর্গীর ভয়ে সেই রকম অস্থির হইত। ভয়ের কারণও যে না ছিল তাহা নহে। ইতিহাসপাঠকমাত্রেই জানেন যে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে পর্ত্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিক্‌গণ, অতি তীক্ষ্ণ ব্যবসা-বুদ্ধি এবং অপ্রমেয় অধ্যবসায়ে ভারতের বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া লইল। তৎকালীন বাণিজ্যপ্রধান প্রধান স্থানগুলিবাছিয়া বাছিয়া মোগল ফৌজদারগণকে কৌশলে অথবা উৎকোচদানে বশীভূত করিয়া, তাহাতে কুঠী স্থাপন করিতে লাগিল। হুগলী, মুর্শিদাবাদ, সুতানুটীতে ওলন্দাজ ও পর্টুগীজ কুঠী স্থাপিত হইল। এই সকল কুঠীর-অধ্যক্ষতা করিবার জন্য ইয়ুরোপ হইতে দক্ষ-শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী আমদানী করা হইতে লাগিল। এই সকল শ্বেতাঙ্গ যুবকের নৈতিক শিক্ষা খুব কম। তাহাতে এ দেশে আসিয়া আবার তাহারা যথেষ্ট পয়সার মুখ দেখিতে লাগিল। ধনাধিপ কুবেরের উপাসনার সহিত ক্রমে তাহারা শয়তানের উপাসনা আরম্ভ করিল। সংগ্রহেরও অভাব হইল না। স্বার্থান্ধ বাঙ্গালী, কুঠীর দেওয়ানীর লোভে, অর্থের লোভে (লিখিতে লেখনী সরে না) আপনাদের কন্যা ভগ্নী পর্য্যন্ত এই সকল চরিত্রহীন শ্বেতাঙ্গের পদে উপহার দিতেও কুণ্ঠিত হইত না। সুতানুটীর ওলন্দাজ বণিক্‌দিগের কুঠীর অধ্যক্ষ জোহান বেয়ার এক জন উল্লিখিত পর্য্যায়ের শ্বেতাঙ্গ যুবক। গোরা দেখিয়া পল্লীরমণীগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। বেয়ার সে দিকে লক্ষ্য করিল না। চিন্তিত ও উৎসুকভাবে পরিক্রমণ করিতে করিতে বেয়ার বলিতে লাগিল, "সুন্দরি! আমি অবশ্যই তোমাকে আমার অঙ্কশায়িনী করিব। ক্ষুদ্র দস্যু রহিমশা কিংবা তাহার অনুচরগণ তোমাকে আমার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাহারা যদি তোমাকে অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন পর্ব্বত-গহ্বরে লুকাইয়া রাখে, তাহাতেও জোহান বেয়ারের হস্ত হইতে তোমার নিষ্কৃতি নাই। আমি শয়তানের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি,—আমি তোমাকে আপনার করিবই। এখন দেখা যাউক, রাজারাম কতদূর কি করিতে পারে। বাঙ্গালার লোকমাত্রেই বেজায় ধূর্ত্ত। রাজারাম আবার তাহাদের সকলের উপরে যায়। সে আমাকে একটা মস্ত কাপ্তেন পাকড়াও করিয়াছে, এবং ফাঁকি দিয়া আমার নিকট হইতে বেশ দু-পয়সা লইতেছে। যাক্, এখন এই সয়তান বাঙ্গালীকে ঠিক তার উপযুক্ত কাজেই পাঠাইয়াছি। যদি সুখবর নিয়ে ফেরে, তবেই তার রক্ষা। তা না হ'লে, তার অদৃষ্টে ঘোড়ার চাবুক লেখা আছে।

বেয়ার ব্যগ্রভাবে যাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই অদ্ভুত জীবটি আসিয়া সেখানে উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। যে লোকটি আসিল, তাহার পরিধানে সাদা ধুতি, গায়ে সাদা মেরজাই,মাথায় মলমলের চাদর—পাগড়ীর আকারে জড়ান। ক্রমাগত সেলাম করিতে করিতে ইহার কোমরটা বোধ হয় যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। চেহারাটা ছিলাবদ্ধ ধনুকের মত। ইনি সুতানুটীর ওলন্দাজ কুঠীর দেওয়ান - বেয়ার সাহেবের বাহন। নাম রাজারাম। রাজারামকে দেখিয়াই সাহেব চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর কি? সব ঠিক তো?" রাজারাম লম্বা লম্বা সেলামের উপরে সেলাম ঠুকিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"মাই লার্ড! আল রাইট। এক দম্ আল রাইট্। বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে মিট্‌লুম তো একেবারে মাই লেডীকেই মিট্‌লুম।

বেয়ার। বটে! তোমার সঙ্গে যখন তার দেখা হয়, তখন সে একলা ছিল?

রাজারাম। এলোন্ ব'লে এলোন্! মাই লার্ড, একেবারে এলোন্। ডগ্ স্ট্রেবাস্টির পর্য্যন্ত সাড়া-শব্দ নাই।

বেয়ার। তুমি কি মনে কর রাজারাম! কাজটা ঠিক হবে? তুমি তার কাছে কথাটা পেড়েছিলে?

রাজারাম। মাই লার্ড! রাজারামকে কি

আপনি একটা আহাম্মক ঠাওরালেন। হাষ্টিং হাতে পেয়ে রাজারাম ছেড়ে আসে নাই লার্ড! আমি প্রোপোজ কম্পোজ সব ঠিক ক'রে এসেছি। এখন কেবল ফোর আইজে ওয়ান হয়ে গেলেই হয়।

বেয়ার। তুমি বল্‌ছ কি ছাই; আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না।

রাজারাম। এই বল্‌ছি হুজুর! যে উকীল দিয়ে যতদুর হয়, আমি ততদুর সব ঠিক ক'রে এসেছি। এখন তার হুজুরের ওপর। একবার মাই লার্ড তার বাড়ীতে গিয়ে দুটো ওয়ার্ড বল্লেই একেবারে সব আলরাইট্‌ হয়ে যাবে।

বেয়ার। ভাল! আমি প্রস্তুত আছি। আমাকে সেখানে নিয়ে চল।

রাজারাম। চলুন মাই লার্ড চলুন। বেশী দূর নয়। গ্যাঞ্জেস্‌ সাইডের এম্বল রোডেই মাই লেডীর সঙ্গে দেখা হবে। আমি ট্রির আড়াল থেকে দেখিয়ে দেবো হুজুর ফ্রটাফ্রন্টি ওয়ার্ড এস্পিক্‌ করবেন।

বেয়ার। (স্বগত) ভীরু সয়তান বাঙ্গালী! আমাকে আর শেখাতে হবে না। আমি সে বিষয়ে এক জন খুব পাকা ওস্তাদ। কি করতে হবে না হবে, তা বেশ ভাল জানি। একবার তার সঙ্গে দেখা হ'লে হয়। তার পর যা করবার, সে আমার হাতে।

রাজারাম। চলুন মাই লার্ড! চলুন।

একটি অসহায়া বঙ্গললনার হৃদয়ের ধন সতীত্ব-রত্ন লুণ্ঠনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সুতানুটীর ওলন্দাজ কুঠির কুঠীয়াল জোহান্‌ বেয়ার বনপথ ধরিয়া পল্লী-অভিমুখে চলিলেন। পশ্চাতে বাঙ্গালীজাতির কলঙ্ক—রাজারাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—:*:—

রহিমশা ও শোভাসিংহ।

সুতানুটীর নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে একটি সুপরিসর পরিস্কৃত স্থান। মধ্যস্থলে একখানি পর্ণকুটীর। সেই পর্ণকুটীরখানি বেড়িয়া চারিধারে যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল অসংখ্য পট্ট বাস। পাঠান সর্দ্দার রহিমশা এই কুটীরে বাস করেন। পট্টাবাসগুলি তাঁহার অনুচরগণের জন্য। কুটীরের সম্মুখে বিস্তৃত আঙ্গিনা। এই সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে আজ ভীষণ জনতা। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র বেদী গঠিত হইয়াছে। বনজাত লতা-পুষ্পে এই বেদীটি অতি মনোহর ভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে। এই বেদীর উপরে দণ্ডায়মান পাঠান সর্দ্দার রহিমশা। আজ রহিমশার দরবার। এত বড় প্রকাণ্ড জনতা; কিন্তু বনস্থলী নীরব। সামান্য সূচীপতন-শব্দ পর্য্যন্ত স্পষ্ট শুনা যায়। এই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া প্রাণোন্মাদকারিণী ওজস্বিনী ভাষায় সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া রহিমশা বলিতে লাগিলেন, "শুন প্রভুভক্ত পাঠান সর্দ্দারগণ! খোদার আজ্ঞায় সমগ্র সাম্রাজ্যব্যাপী মোগলের ঘোর অত্যাচার হইতে ভূশনিপীড়িত শক্তিহীন প্রজাবৃন্দকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আজ আমরা বদ্ধপরিকর। দুরাচার ফৌজদারগণ শাসনের ব্যপদেশে নিরন্তর প্রজাপীড়ন করিতেছে। প্রজাগণ দুর্ভিক্ষতাড়নে কঙ্কালাবশিষ্ট! রাজ্য জুড়িয়া বিপ্লব-অনল প্রজ্বলিত। সেই দাবানলে প্রকৃতিপুঞ্জ অনিবার দগ্ধ হইয়া মরিতেছে। দুনিয়া খোদার; আমরা তাঁহার দাস। আজ সকলে সত্য সাক্ষ্য করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও—প্রাণদানে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিব। যে পাপিষ্ঠ নরাধম হিন্দু কিংবা মুসলমান মনুষ্য নামে কলঙ্ক অর্পণ করিয়া দুর্ব্বলের প্রতি কিংবা অসহায়া রমণীর উপর অত্যাচার করিবে, খড়্গাঘাতে তাহার শির দ্বিখণ্ডিত করিব। যদি সয়তান নিজে আসিয়া তাহার সহায় হয়, তথাপি রহিমের হস্ত হইতে তাহার নিষ্কৃতি নাই।" রহিমের কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল। শ্রোতৃবর্গ সেই অমৃতনিস্যন্দিনী ভাষা শুনিয়া কিছুক্ষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় থাকিয়া একেবারে সহস্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "যে আজ্ঞা সর্দ্দার! আমরা আজ খোদার পবিত্র নাম লইয়া শপথ করিলাম—যে কেহ দুর্ব্বলের প্রতি কিংবা অসহায়া রমণীর উপর অত্যাচার করিবে, তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান করিব।"

এই সময়ে সেই গভীর জনতা ভেদ করিয়া এক-জন পঠানবীর বেদীর সম্মুখে যাইয়া পাঠান সর্দ্দারকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "সর্দ্দার! যশোরের ফৌজদার নূরুল্লা খাঁর হুকুমে কতকগুলি নিরীহ প্রজা একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। এ বৎসরের দুর্ভিক্ষে তাহাদের গৃহে চালের কণাটি পর্য্যন্ত নাই। গাছের পাতা সিদ্ধ করিয়া তারা কোনরূপে দিন

গুজরান করছিল। ছেলেপিলেগুলো না খেয়ে মড়ার মতন হ'য়ে গেছে। হাড় জিল্‌জিল্ করছে। চেঁচিয়ে কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। খেটে খুটে দু-পয়সা আনিবার শক্তি নাই। ফৌজদারের লোকজন এসে তাহাদের ঘটী-বাটি, গরু-বাছুর কেড়ে নিয়ে গেছে। এই দারুণ শীতে নিরন্ন প্রজারা রাস্তায় ব'সে কাঁদছে। সে দৃশ্য দেখ্‌লে, সর্দ্দার, পাষাণও ফেটে যায়। আমরা ডাকাত—বংশাবলীক্রমে ডাকাতী ক'রে আস্‌ছি, আমাদের বুক পাথর দিয়ে গড়া, চোখের জল দরিয়ায় বিসর্জ্জন দিয়াছি। কিন্তু সে দৃশ্য দেখে আমাদেরও চোখ দিয়ে জল বেরিয়েছে।"

এই মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী শুনিয়া পাঠান-সর্দ্দার রোষে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। অলক্ষ্যে তাঁহার হস্ত কোষ-নিবদ্ধ কৃপাণের মুষ্টি ধরিল ও রাগে কাঁপিয়া উঠিল। খড়্গ-পিধান বর্ম্মের সহিত ঠেকিয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। রহিম শা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফৌজদারের লোকজন কোথায়?" আগন্তুক পাঠান বীর উত্তর করিল, "তাহারা লুঠের জিনিসপত্র গাড়ী বোঝাই ক'রে নিয়ে, যশোরের দিকে ফিরে যাচ্ছে।"

"তাদের সংখ্যা কত?

"পাঁচ শো।"

একটি পিত্তল-নির্ম্মিত ভেরী রজ্জুবদ্ধ হইয়া পাঠান সর্দ্দারের পার্শ্বে বিলম্বিত ছিল। রহিম শা ভেরীবাদন করিলেন। সঙ্কেত শুনিয়া এক জন সম্ভ্রান্ত-বেশধারী পাঠান সৈনিক-পুরুষ রহিম শার নিকটে আসিলেন। রহিম শা কহিলেন, "সইফ খাঁ! এই দণ্ডে পাঁচ শত সৈন্য নিয়ে, যশোরের পথে ফৌজদারের ফৌজ ঘেরোয়া কর। আজ সূর্য্যাস্তের মধ্যে যেন আমি তোমার মুখে শুনতে পাই যে, ফৌজদারের সৈন্যদলের মধ্যে একটি প্রাণীও যশোরে ফিরে যায় নি।"

সইফ খাঁ। যো হুকুম সর্দ্দার!

রহিম শা। এই সর্দ্দার তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

পাঠান সর্দ্দারের আদেশমাত্র অপেক্ষা। অনতিবিলম্বেই পাঁচ শত সমরকুশল অশ্বারোহী সেনা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সুতানুটীর বনমধ্যস্থ সৈন্যাবাস হইতে বহির্গত হইল। সর্দ্দার সইফ খাঁ ইহাদের পরিচালক।

এই সময়ে এক জন দস্যু আসিয়া সংবাদ দিল যে, হিন্দুবীর শোভাসিংহ পাঠান-সর্দ্দারের সাক্ষাৎকারপ্রার্থী।

পাঠক! এই স্থলে একবার কিয়ৎকালের জন্য আভ্যন্তরীণ কলহে সঙ্ক্ষিত বাঙ্গালার তৎকালীন ইতিহাসের নীরস পৃষ্ঠার দিকে আপনার দৃষ্টি আবদ্ধ করুন। অত্যাচারী প্রবলপরাক্রান্ত মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে তখন সশস্ত্রে দণ্ডায়মান দক্ষিণে মহারাষ্ট্র; পূর্ব্ববাঙ্গালায় ও উৎকলে পরিম্লানা পরিক্ষীণা পাঠানশক্তি। এই পাঠানশক্তির পরিচালকগণ ইতিহাসে দস্যু নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালীর মধ্যেও তখন জাতীয়-জীবন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই! বঙ্গে যশোহরের মহারাজা প্রতাপাদিত্য ও বিক্রমপুরের রাজা কেদার রায়, বরেন্দ্রভূমে রাজা গণেশ প্রভৃতি "ভূঁইয়াগণের" অভ্যুত্থান ও মোগলদাসত্বের রজ্জু ছিন্ন করিবার ক্ষীণ প্রয়াসই তাহার নিদর্শন। হুগলীর অন্তর্গত চেতোবরদার তালুকদার শোভাসিংহও এই শ্রেণীর এক জন বঙ্গীয় বীর। ইতিহাসে তিনি দস্যু শোভাসিংহ নামে পরিচিত।

রহিম শা পাঠানগণকে কিছুক্ষণের জন্য অন্যত্র অবস্থান করিতে আদেশ করিলেন এবং চিন্তিতভাবে পরিক্রমণ করিতে করিতে শোভাসিংহের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পাঠান-সর্দ্দার মনে মনে কহিতেছিলেন, "দুর্ব্বলপীড়ক মোগলের হস্ত হইতে অনাহারক্লিষ্ট নিপীড়িত আর্ত্ত প্রজাগণের রক্ষণের ভার আমার উপর। আমি স্বেচ্ছায় এই গুরুভার শিরে লইয়াছি। অর্থহীন বলহীন ক্ষুদ্র দস্যুমাত্র আমি—কি করিব, আমার দ্বারা কি সম্ভব? দয়াময় খোদা! তোমারই কার্য্য—আমি তোমার হস্তে ধারহীন জড় অস্ত্রমাত্র। দেব, কল্পনায় অপ্রমেয় তোমার শক্তিতে রহিমের ক্ষুদ্র হৃদয়খানি পূর্ণ কর। আমি রাজ্য চাহি না, রাজসিংহাসন চাহি না। তুমি অন্তর্য্যামী, তুমি জান, আমার হৃদয়ের অন্ধতম নিভৃত প্রদেশে কোন্ আশা জাগিতেছে, কোন্ সুতীব্র পিপাসা রহিমের হৃদয়খানি জর্জ্জরিত করিতেছে? তুমি সবই জান। বড় আশা করিয়া এই দৃঢ় পরহিতব্রত শিরে লইয়াছি। দয়াময় খোদা! এ ব্রত কি উদ্‌যাপিত হইবে না?"

শোভাসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুইটি

উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল প্রবল জলস্রোত আসিয়া মিলিত হইলে যেমন সেই সঙ্গমস্থলে একটি প্রচণ্ড আলোড়ন দৃষ্ট হয়, এই দুইটি বিভিন্ন শক্তির সম্মিলনে, এই দুই কর্ম্মবীরের হৃদয়ও সেইরূপ আবেগ-বিক্ষুব্ধ হইল। পরস্পর অভিবাদন শেষ হইলে রহিম শা কহিলেন, "হে মতিমান্! এই দরিদ্রের কুটীরে পদার্পণ আপনার মহানুভবতা। রাজদণ্ডভয়ে সদা বিকম্পিত ক্ষুদ্র দস্যুমাত্র রহিম শা। শোভাসিংহ! আপনাকে সে কি দিয়া সংবর্দ্ধনা করিবে, জানে না।"

ভক্তিগদ্‌গদ-স্বরে শোভাসিংহ কহিলেন, "পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত বহু পুণ্যফলে আজ স্বচক্ষে পাঠানকুল-ভাস্কর রহিম শার পুণ্যমূর্ত্তি দেখিলাম—যাঁহার কীর্ত্তি-গাথা আজ শতমুখে কীর্ত্তিত; যাঁহার যশের সৌরভে আজ অর্দ্ধবিশ্ব আমোদিত।"

রহিম শা। শোভাসিংহ। অন্বর্থ আপনার নাম। আপনি বীরকুল-বিক্রম-কেশরী। আপনার দর্শনে আজ আমার জীবন ধন্য। হে বীর! এক্ষণে আগমন প্রয়োজন বিবৃত করুন। রহিম শা অতিথির অভিলাষ পূর্ণ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

শোভাসিংহ। তীর্থযাত্রী যেমন বহুদূর হইতে বহু কষ্ট সহিয়া কেবলমাত্র দেবদর্শনের জন্য তীর্থে গমন করিয়া কটাক্ষের তরে সেই দেবপ্রতিমাকে দর্শন ক'রে যেমন তাহার সব কষ্ট দূরে যায়, পাঠান সর্দ্দার, আমারও সেইরূপ আগমন-প্রয়োজন অবসিত হইয়াছে। সৌভাগ্য-বলে আমার দেবতার দর্শনলাভ হইয়াছে। হে বীরশ্রেষ্ঠ! আপনি উচ্চ কার্য্যে ব্রতী। আমার বাসনা, শোভাসিংহকে সেই কার্য্যে আপনার ক্ষুদ্র নগণ্য সহায়-জ্ঞানে সংবর্দ্ধিত করিবেন। আসুন, প্রবল স্নেহের ভাবে আমরা জাতীয়তা-বাঁধ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলি। হিন্দু-মুসলমান এই জাতিগত পার্থ-ক্যের মোহ হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে মুছিয়া ফেলি। হিন্দু-মুসলমান—আমরা একই বিশ্ববিধাতার সন্তান। তবে বৃথা এই জাতি-অভিমান কেন? আসুন মহা-প্রাণ, আমার সহিত স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ হউন। রণে বনে আপনার এই মহাব্রত উদ্‌যাপনে শোভাসিংহ আমরণ আপনার সহায়।

রহিম শা। বুঝিলাম, বিশ্বধাতা আমার সহায়। তাহা না হইলে, কোন্ মায়াবলে এই অপূর্ব্ব সম্মিলন সংঘটিত হইল? বীরশ্রেষ্ঠ শোভা-সিংহ রণস্থলে দোসর থাকিলে রহিম মোগল সম্রাট্‌কে পর্য্যন্ত তুচ্ছ পিপীলিকার ন্যায় নিষ্পেষিয়া ফেলিবে।

শোভাসিংহ। পাঠান-সর্দ্দার! দূতমুখে শুনিলাম, আরংজীবসুত আজিমউশ্বান বাঙ্গালার বিদ্রোহ দমনের জন্য এবার চতুরঙ্গে এ দিকে আসিতেছেন। শুনিলাম, তিনি নাকি আমাকে ও আপনাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া মোগল-সম্রাটের চরণতলে আমা-দিগকে উপহার দিলেন।

রহিম শা। তাহাই যদি বিধাতার অভিপ্রায় হয়—হইবে। কে তাহা নিবারণ করিবে? তবে সম্রাট্‌-নন্দন যেন তাঁহার হৃদয়কোণে এ ধারণা পোষণ না করেন যে, শোভাসিংহ অথবা রহিম শা তাঁহার এই বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ সমর-আয়োজনের কথা শুনিয়া মূষিকগহ্বরে পলায়ন করিবে।

শোভাসিংহ। শুনিলাম, এই অভিযানে ইংরাজ-বণিক্ নাকি মোগল-সহায়।

রহিম শা। সেইটি-ই বাস্তবিক শঙ্কার বিষয়। আমারও ধারণা, ইংরাজ সামান্য বণিক্ মাত্র নয়। তাই ভয় হয়, শেষে বুঝি বণিকের মানদণ্ড রাজ-দণ্ডে পরিণত হয়।

ব্যোমতাত্ত্বিক যেমন মেঘের স্তরবিন্যাস অথবা প্রকৃতি দেখিয়াই বৃষ্টিপাত হইবে কি না বলিয়া দিতে পারেন, ভূতত্ত্ববিৎ যেমন পৃথিবীর উপবিভাগ দেখিয়াই মৃত্তিকার অভ্যন্তরে নিহিত খনিজ-স্তরের বিষয় জানিতে পারেন, সূক্ষ্ম রাজনীতি-তত্ত্ববিৎও সেইরূপ আভাসেই বুঝিতে পারেন যে, বিবদমান শক্তিনিচয়ের মধ্যে কোন্‌টি কালে জয়ী হইবে। রহিম শা অনুমান যাহা করিয়াছিলেন, অর্দ্ধশতাব্দী অতিবাহিত হইতে না হইতেই, অক্ষরে অক্ষরে তাহার সত্যতা সপ্রমাণিত হইল। বণিকের মানদণ্ড নৃপতির রাজদণ্ডে পরিণত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—:*:—

আমিনা।

আশ্বিন মাস। মা আনন্দময়ী আসিতেছেন। তাই আজ বঙ্গের ঘরে ঘরে উৎসবের বাঁশী বাজিয়া উঠি-য়াছে। তাই প্রাণহীনা বঙ্গভূমিতে আজি যেন

একটা সরস সজীবতা ফিরিয়া আসিয়াছে। আজি পূর্ণিমা। মেঘমুক্ত নীল নভস্তলে পূর্ণ প্রতিভা সম্পৎ-বিলসিত পূর্ণিমার চন্দ্রমা উদিত হইয়া জ্যোৎস্না-কিরণে সুতানুটীর বনভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে। বনের নির্জ্জনতম দেশে একখানি অতি ক্ষুদ্র জীর্ণ পর্ণকুটীর। কুটীরের চতুর্দ্দিকেই জঙ্গল। প্রাঙ্গণে একটি বিশাল আম্রবৃক্ষ। বৃক্ষতলে একটি সুন্দর মৃন্ময় বেদী। বৃক্ষকাণ্ডে দেহ সংন্যস্ত করিয়া একটি যুবতী সেই বেদীর উপরে বসিয়া আপন মনে গীত গাহিতেছিলেন। সেই নীরব নিশীথে অসংখ্য নক্ষত্র-বিখচিত উদার উন্মুক্ত আকাশের চন্দ্রাতপতলে, প্রকৃতির সেই গভীর সুষুপ্তির মধ্যে, যুবতীর কণ্ঠস্বর পাপিয়ার সঙ্গীতের ন্যায় উচ্চতমগ্রামে উঠিয়া আকাশে বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল। যুবতী গাহিতেছিল -

কেন ভালবাসি,
কেন ভালবাসিতে বাসনা ?
হৃদয় সঁপিনু যারে
সে তো ভুলেও তা নিতে চাহে না।
মনেরে বুঝাতে চাই
মন ত' বুঝে না ছাই—
এ কি লো বালাই !
ধরিতে হৃদয়চাঁদ
পেতেছি রূপের ফাঁদ
তারে ধরি ধরি ধরা যায় না !

একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যুবতী আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "আরে মুগ্ধ হৃদয় আমার ! যে অমূল্য নিধি পাবে না, পাবার নয়, তার জন্য কেন বৃথা আশা ? সে কি মর্ম্মদিগ্ধকারী আমার হৃদয়ের ভাষা বুঝিতে পারে ? সে কি বুঝিতে পারে, আমার হৃদয়ের মধ্যে কোন্ তৃষ্ণা জাগিয়া রহিয়াছে ? হৃদয়-বিহীন যদি বুঝিয়া থাকিত, তবে কি সে উদার গগনতলে অলস মেঘ-খণ্ডের মত ভাসিয়া যাইতে পারিত ? এক বিন্দু বারিদানে বারিদের কি আসে যায় ? আমি বিন্দুমাত্র বারি আশে তাহার মুখপানে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া রহিয়াছি, তবুও তো তাহার করুণা হইল না।"

যুবতী আবার গাহিতে লাগিলেন :—

বঁধুয়া তুয়া সম নিরদয়
নিখিলে না নেহারি,
পিয়াসী চকোরী হামি
তুহুঁ মম জীবন-বারি ;
তোঁহে বিসরি হাম
রব কোন্ কাজে,
পরাণ সঁপিব হাম
চরণে তুহাঁরি।

যুবতীর নাম আমিনা। মোগল ফৌজদারের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া জনৈক সমৃদ্ধিশালী পাঠান-ওমরাহের বিধবা-পত্নী অত্যাচারীর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত পলাইয়া আসিয়া নিবিড় সুতানুটীর বনমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আমিনা এই বিধবার একমাত্র কন্যা। খুব সুখের কোমল অঙ্কে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমিনা আজি ভাগ্যবিপর্য্যয়ে দীনা কাঙালিনী - পর্ণকুটীরবাসিনী।

যুবতীর উদ্বেগ উচ্ছাসময় হৃদয়টুকু আজি তরঙ্গ-সঙ্কুল ফেনিল সাগরোর্ম্মির ন্যায় মুহুর্মুহু তাহার পঞ্জর-তটে আঘাত করিতে লাগিল। একান্ত নিরাশ হৃদয়ে আমিনা সেই শারদ-কৌমদী-প্লাবিতা বনবীথি-পানে আনমনে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরেই আমিনা দেখিতে পাইলেন যে, একটি মনুষ্য মূর্ত্তি সেই বনপথ ধরিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাদের কুটীরাভি-মুখে আসিতেছেন। মনুষ্যমূর্ত্তি আর কেহই নহে —সে আমিনার আজন্ম সাধনার ধন, তাঁহার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম—পাঠান-সর্দ্দার রহিম শা। এতক্ষণ অনন্যমনা হইয়া যে দেবতার ধ্যান করিতেছিলেন, আমিনার জীবনের সেই ধ্রুবতারা রহিম শাকে আসিতে দেখিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বনবিহারিণী কুরঙ্গীর ন্যায় তিনি প্রিয়-সম্মিলনে ছুটিয়া গেলেন। রহিম শাও আবেগভরে আমিনাকে তাঁহার প্রসারিত বক্ষে টানিয়া লইলেন। প্রেমিক-প্রেমিকার সেই পুণ্যসম্মিলন সম্যক্ ও পরিস্ফুট ভাবে চিত্রিত করিতে কবি ভাষা খুঁজিয়া পায় না, শিল্পীর তুলিকা অক্ষম ! ইহা বর্ণনার জিনিস নহে—উপভোগের জিনিস, উপলব্ধির জিনিস। রহিম শা দূর হইতেই আমিনার মর্ম্মস্পর্শী বিষাদগীত শুনিয়াছিলেন ; তাই বলিতে লাগিলেন, "কেন, কেন প্রাণারামা সুষমার অক্ষয়ভাণ্ডার আমিনা আমার !

কেন এই অরুন্তুদ করুণ সঙ্গীত—যাহার প্রতি মূর্চ্ছনায় হৃদয়ের মর্ম্মগ্রন্থিগুলি ছিঁড়িয়া যায়। সুহাসিনি, তোমার মুগচ্ছবি আজি শিশির-সম্পাত-ক্লিষ্ট সিতাব্জের মত পরিম্লান কেন? বুঝি আমার বিলম্বের জন্য এত অভিমান? জান তো মানিনি! রহিমের শিরে কত গুরুভার ন্যস্ত। প্রবল বন্যার মত কার্য্য-স্রোত ছুটিয়া আসিতেছে। কার্য্য সারা না হইলে কহ বরাননে, কেমন করিয়া আসিব?"

আমিনা কহিল,—"প্রাণের রহিম! তবু ভাল যে, এতক্ষণে কার্য্য হইতে অবসর পাইলে। হে প্রিয়! পূর্ব্বাশার গায়ে উষার সোনালি হাসি না ফুটিতে, পাপিয়ার শেষ তান অতি ক্ষীণ মরণ-সঙ্গীতের ন্যায় গগনে না মিলাইতে, আমি বনে বনে ঘুরিয়া, রাশি রাশি কুসুম অবচয়ন করিয়া আকাঙ্ক্ষার সূক্ষ্ম তন্তু দিয়া মোহন মালিকা গাঁথিয়া রাখিয়াছি। কেন? রহিম, তোমাকে সাজাব বলিয়া। ওই দেখ সখা, পরিম্লান হৃদয়ের ছবি আমার সে সযত্নে-রচিত বাসনা-কুসুমমালা রবিকরস্পর্শে শুকাইয়া গিয়াছে। তুমি সারাদিন কার্য্যে ব্যস্ত রহ। সংসারের সব আশা, সমস্ত বাসনা, ছিন্নদল শতদলসম কর্ম্মরূপে আসিয়া তোমার পদতলে পড়ে। তুমি অদ্বিতীয় কর্ম্মবীর। কিন্তু এ জগতে আমিনার তুমি ছাড়া কি আছে বল? তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, জীবন মরণে তুমিই আমার একমাত্র চিন্তা।"

আমিনার অরুণ-গণ্ডে আবেগভরে শত প্রেম-চুম্বন অঙ্কিত করিতে করিতে রহিম কহিতে লাগিলেন, "অয়ি প্রাণতমে, জান না তুমি, আমার উপরে খোদার কি ঘোর অভিশাপ! তাই দেবি, অযুত কার্য্যের রাশি উত্তুঙ্গ গিরির মত তোমার আমার মাঝে এই দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃজন করিয়াছে।"

আমিনা। রহিম, কে কবে কোথায় শুনেছে যে, জগতের সমস্ত বাধার রাশি একত্রিত হইয়া প্রণয়িনীর বুক হইতে প্রণয়-আস্পদকে ছিনাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে? প্রিয়তম, স্থির জানিও, প্রণয়ের প্লাবন-পীড়নে চূরমার হইয়া সমস্ত বাধার রাশি অনন্তে মিশাইয়া যাইবে। তোমার আমার মধ্যে তিলমাত্রও স্থূল ব্যবধান রহিবে না।

পাঠান-সর্দ্দার বিস্মিতভাবে আমিনার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। আমিনার হৃদয়ে এত প্রেম! সে প্রেমে এত বিশ্বাস, এত সরলতা, এত মাধুর্য্য! রহিমের কটাক্ষ আমিনার বিশাল হৃদয়ের সীমান্ত পর্য্যন্ত অবগাহন করিতে চেষ্টা করিয়াও যেন নিষ্ফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল। রহিম বলিলেন, "তাই হউক, তাই হউক বালা! আমার এ পঞ্জরের অস্থিরাশি ভাঙ্গিয়া চূরিয়া জন্মের মত এই স্থূল ব্যবধান লুপ্ত করিয়া দিক্। প্রাণে প্রাণে পূর্ণ সম্মিলনে মিশিয়া যাক্।"

আমিনা। প্রাণেশ্বর, আজিকার মত কার্য্যের তো শেষ হইয়াছে? ওই দেখ, সুখসুপ্তা প্রকৃতি সুন্দরী! নীল নভস্তলে ওই নিদ্রাতুরা পূর্ণিমাচন্দ্রমা! শিরোপরি নিদ্রালস সপ্তর্ষিমণ্ডল! নিদ্রামগ্না ভাগীরথী সৈকত-শয়নে! ইহারা যেন মানবকে দেখাইয়া দিতেছে—বিশ্রামের কাল সমাগত।

রহিম। বরাননা! বিশ্রামের অবসর কোথা? যে দিন কবরের সুখশয্যাপরে শয়ন করিব, সেই দিন বিশ্রামের অবসর।

বাস্তবিকই তাই। কর্ম্ম বড়, কর্ম্ম অনন্ত। জীবন ছোট, জীবনকাল নিয়মিত। কর্ম্মবীরের বিশ্রামের অবসর নাই। সে অবসর মরণে। এই অটুট সত্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করিবার জন্যই যেন নিয়তি-পরিচালিত হইয়া এক জন দস্যু-নায়ক আসিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং পাঠান-সর্দ্দার রহিম শাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। রহিম শা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্দ্দার, সংবাদ কি?"

দস্যু-নায়ক। সর্দ্দার! সুতোনুটীর বনের মধ্যে আমাদের ছাউনী পড়েছে জেনে, দশ হাজার ফৌজ নিয়ে জবরদস্ত খাঁ বন ঘেরোয়া করবার মৎলবে এ দিকে অগ্রসর হচ্ছে। হুগলীর আড়পারে ছাউনী ক'রে, হুগলীর ফৌজদারী ফৌজের অপেক্ষায় রয়েছে। দুই এক দিন মধ্যেই, বোধ হয়, এই মিলিত সৈন্যদল সুতানুটির বনের দিকে অগ্রসর হবে।

রহিম। তার জন্য চিন্তা কি সর্দ্দার! বাঙ্গালার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর দশ হাজার ফৌজ আমার হাজার সৈন্যের সমকক্ষ নয়।

দস্যু। আরও শুনলুম, দুখানা মানওয়ার আর দুশো লোক নিয়ে ইংরাজ কাপ্তেন নিকল্‌সন্ দরিয়ার দিক থেকে আমাদের পথ আটকাবে।

রহিম। সিবাষ্টযান গঞ্জালের মানওয়ারের বহর এখন কোথায়?

দস্যু। দরিয়ার মোহানায় সন্দীপের বন্দরে।

রহিম। এখনি একখানা ছিপ রওনা ক'রে গঞ্জালেকে জানাও যে, আজ হ'তে চতুর্থ দিনে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে হাজার সৈন্যসমেত পাঁচখানি যুদ্ধ-জাহাজ গোবিন্দপুরের নীচে ভাগীরথীবক্ষে নঙ্গর করা চাই। তুমি যাও, শত্রু-সৈন্যের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ কর গিয়ে। আমি শীঘ্রই ছাউনীতে যাচ্ছি।

দস্যু-নায়ক প্রস্থান করিলেন। রহিম শা আমিনাকে কহিলেন, "দেখ প্রিয়ে! কর্ম্মরূপ ঘূর্ণাবর্ত্ত হ'তে যত পলাইতে চাই, কার্য্য তত পাছে পাছে ছুটিয়া আসে। তুমি বিশ্রামরূপিণী! তোমার শান্তিপূর্ণ বক্ষে আমায় টানিয়া লইবে বলিয়া হেথায় দাঁড়াইয়া আছ; কিন্তু নির্ম্মম কর্ত্তব্য আমায় কোন্ অচেনা প্রদেশে টানিয়া লইয়া যাইতেছে!"

আমিনা বলিলেন, "সখা! স্থির জানিও, এ জগতে যত শক্তি আছে, প্রেম সব চেয়ে বড়—সব চেয়ে কঠিন বন্ধন। দেখি, কোন্ শক্তি সেই ডোর ছিন্ন করে?"

পূর্ণ-আবেগে আমিনা তাঁহার হৃদয়-দেবতা পাঠান-সর্দ্দার রহিম শার পদতলে উপবেশন করিলেন। অশ্রুজলে প্রেমময় পাঠান বীরের চরণ-যুগল ধৌত করিয়া আদর্শ-প্রেমিকা আমিনা কাঁদিতে লাগিলেন।

কর্ত্তব্যের জয় হইল। কঠোর কর্ত্তব্যের আদেশে রহিম শাকে তখনই অন্ততঃ কিছুকালের জন্য প্রেম-স্বর্গ-চ্যুত হইতে হইল। আমিনার হৃদয়ে যে হাসি-রেখাটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেটুকু নিবিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—:*:—

প্রত্যাখ্যাতা।

"একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।" মহাকবির এই উক্তিটি যে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে সত্য নহে, তাহা অন্ততঃ এক ক্ষেত্রে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। মানুষ সর্ব্ববিধ গুণগ্রামে বিভূষিত হইলেও, যদি সে চারিত্রিক সম্পদে সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে রাজ-রাজেশ্বর হইলেও সে চরিত্রবান্ দীনতম ভিখারী অপেক্ষাও হীন।

চেতোবরদার তালুকদার শোভাসিংহের সমস্ত গুণই ছিল; একমাত্র চরিত্রদোষেই সমগ্র জীবনকে কলঙ্কিত করিয়াছিল।

রজনী দ্বিপ্রহর। শোভাসিংহ আপনার শয়ন-কক্ষে পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন পূর্ব্বক করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া কি ভাবিতেছিলেন; সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং চিন্তিতভাবে কক্ষমধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। শোভাসিংহ আপনমনে কহিতে লাগিলেন, "বর্দ্ধমান-অধিপতি দুষ্ট কৃষ্ণরাম মোগলের বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া শোভাসিংহকে অপমান করে! যদি বিধি তাহাকে সহস্র প্রাণ দিয়া থাকে, সহস্র হইলেও তাহার পরিত্রাণ নাই। সৃষ্টির ললামভূতা কৃষ্ণরামসুতা, শোভাসিংহ বর্ত্তমানে অন্য কাহারও গলায় বরমাল্য অর্পণ করিবে! তাহা অপেক্ষা আমার মৃত্যু শ্রেয়ঃ। শোভাসিংহ দস্যু দলপতি—কৃষ্ণরাম রাজা। বংশ-গরিমায় আমা হইতে উচ্চতর, শ্রেষ্ঠতর! তাই সে আজি হীনবীর্য্য কুক্কুরের ন্যায় গিয়া মোগলের চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। শোভাসিংহ ক্ষুদ্র দস্যুমাত্র সত্য, কিন্তু সামান্য দস্যুর পক্ষে কি এ অসামান্য সম্মানের কথা নহে—যে তাহার বীরগর্ব্বে মোগল-সম্রাট্ পর্য্যন্ত বিকম্পিত! মীরা—মীরা! স্বরগের পারিজাত এই দেবভোগ্যা কুসুমমালিকা দানবের উপভোগ্যা হইবে? না—শোভাসিংহের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র শোণিত থাকিতে মীরাকে অপরের অঙ্কশায়িনী হইতে দিব না। যদি তাহাতে প্রয়োজন হয়, কৃষ্ণরাম! তোমার হৃদয়-রক্তে আমার এই তীক্ষ্ণধার অসি প্রক্ষালিত করিব। তার পরে সেই রুধির লাঞ্ছিত হস্তে তোমার তনয়াকে বাসরের পুষ্পশয্যাতলে লইয়া যাইব।"

একটি রমণী ধীরপাদবিক্ষেপে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রমণী পরমা সুন্দরী। ত্রয়োদশীর চন্দ্রমার ন্যায়, ভাদ্রমাসের গঙ্গার ন্যায় রমণীর রূপ কাণায় কাণায় পূর্ণ। তাহার দেহবন্ধ যেন সে রূপ বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না—তাই যেন বাঁধ টুটিয়া উছলিয়া পড়িতে চাহিতেছে। রমণীকে দেখিয়া শোভাসিংহ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কে? কে তুমি রমণী?" রমণী উত্তর করিলেন, "নিরমম! এখন কি আমায় চিনিতে পারিবে?"

রমণীর স্বরে তীব্র বিষাদ, বুকভাঙ্গা নৈরাশ্য, দুর্দ্দমনীয় ঘৃণা। রমণী বলিতে লাগিলেন, শোভাসিংহ! যখন অজিতার লাবণ্য-সম্পদ-কথা প্রবাদগাথার মত বঙ্গভূমে প্রতি গৃহে গৃহে ঘোষিত হইত, তখন তুমি আমায় চিনিতে। আমি সেই অজিতা-কুসুম—যাহার উন্মাদন মকরন্দলোভে এক দিন তুমি প্রলুব্ধ মধুপের ন্যায় ছুটিয়া গিয়াছিলে, যাহার পদতলে গিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছিলে।"

বিদ্রূপব্যঞ্জক বিকৃত স্বরে শোভাসিংহ কহিলেন, "এ ত' চির-প্রচলিত প্রথা রহিয়াছে অজিতা! সে হেতু কুণ্ঠিতা কেন? মধুটুকু ফুরাইয়া গেলে ভ্রমর কি কখনও কুসুমের নিকট আইসে? আজি সন্ধ্যাকালে যে সরস কুসুমমালা প্রণয়ি-যুগল অতি যত্নে হৃদয়ে ধারণ করে, কালি প্রাতে, পর্য্যুষিত পরিম্লান উপভুক্ত সে মালার কে সন্ধান লয়? তখন তাহার স্থান কোথায়? পূতিগন্ধময় পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে।"

অজিতা। শোভাসিংহ! তোমার প্রাণ পাষাণে গঠিত। কে জানিত, তুমি মনুষ্যের বহিরাবরণে ঢাকা পশু!

শোভাসিংহ। বিধুমুখি! বৃথা তুমি শোভাসিংহকে গঞ্জনা দিতেছ। আমার হৃদয় সত্যই পাষাণে গঠিত। কিন্তু অজিতা! তুমিও কি পাষাণের চেয়ে কঠিনা নহ? তা না হইলে, যে হস্ত তোমার নিরপরাধ পিতার হৃদয়-রক্তে রঞ্জিত হইল, সেই হস্ত হইতে শোণিত-কলঙ্করেখা না শুকাইতে, নিরমমে! কোন্ প্রাণে তুমি সেই কর পীড়ন করিলে? পিতৃহন্তা মানবের গলে, কোন্ প্রাণে অজিতা! বরমাল্য অর্পণ করিলে?

নশ্বর মাংসপিণ্ডের বিষয়ীভূত ক্ষুদ্র দেহের লালসার পরিতর্পণে নিরত শোভাসিংহ কি বুঝিবে, রমণীর প্রণয় কি? তাই রোষ-কম্পিত অধরে অজিতা বলিল, "কি বুঝিবে, প্রাণহীন হৃদয়বিহীন পশু তুমি? কি বুঝিবে তুমি, কত মদিরতা, কত উন্মত্ততা, কত আত্মত্যাগ রমণীর প্রেমে! অন্ধ প্রেম, প্রণয়-আস্পদকে সর্ব্বদা দেবোচিত গুণগ্রামে বিভূষিত দেখে। ন্যায়, তর্ক, মান, অপমান, ভালমন্দ বিচার, বিবেক সমস্ত প্রেমরূপ খরতর বন্যা-স্রোতে ভাসিয়া যায়। তুমি মূর্খ! তাই রমণীর হৃদয়ের সারবৃত্তি প্রণয়ের উপরে এই অযথা কটাক্ষপাত করিতেছ!"

শোভাসিংহ। বাতুলের উন্মত্ত প্রলাপ। যাও অজিতা, তোমার কথা শুনিবার অবসর আমার নাই। শোভাসিংহের হস্তে অনেক কাজ।

অজিতা। উর্ণনাভ যখন জাল রচনা করে, তখন তাহার হস্তেও অনেক কার্য্য রহে। স্বামী যদি আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়া বিপথে ধাবমান হয়, তাহা হইলে তাহাকে রক্ষা করিবার পূর্ণ অধিকার কি রমণীর নাই?

শোভাসিংহ। তুচ্ছ বারবনিতার মুখে সে কথা সাজে না। অজিতা! শোভাসিংহ যে এক দিনের জন্যও তোমাকে তাহার হৃদয়ে স্থান দিয়াছে, তাই আপনাকে ভাগ্যবতী বলিয়া মান। স্থির জানিও, আমার স্বার্থের পথে অন্তরায় হইলে, পদাঘাতে তোমাকে আমার পথ হইতে সরাইব!

অজিতা। পাপিষ্ঠ দানব! তুমিও নিশ্চয় জানিও, রমণীর হৃদয়ে যত মধুরতা, যত প্রেম, যত ভালবাসা প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি আছে, অপমান-তীব্র-বিষস্পর্শে তাহারা অন্য মূর্ত্তি ধারণ করে। প্রত্যাখ্যাতা নারী বিষধরী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী।

শোভাসিংহ। শোভাসিংহও কালসাপিনীর বিষদন্তপাঁতি উপাড়িয়া ফেলিতে চিরাভ্যস্ত। পাপিনি! আমার সম্মুখ হইতে দূর হ। তোর ওই ঘৃণিত বদন আর এ দেশে দেখাস্ নে।

সুন্দরী অজিতা, প্রেমিকা অজিতা, পিতৃবিয়োগ-বিধুরা অজিতা, এক দিন যখন বামহস্তে শোকাশ্রু মুছিতে মুছিতে দক্ষিণ হস্তে পিতৃহন্তার গলে বরমাল্য পরাইয়া দিয়াছিল, তখন সে জানিত না যে, তাহার পিতার প্রেতাত্মা অলক্ষ্যে বসিয়া সেই বিকৃত বিবাহের উপর অজস্র শাপ বর্ষণ করিতেছেন। সেই শাপ ফলিল। যাহাকে এক দিন অজিতা দেবতা-জ্ঞানে আলিঙ্গন করিয়াছিল—আজ সে তাহার পৈশাচিক নিজ মূর্ত্তি দেখাইল। লাঞ্ছিতা অজিতা পদাহতা ভুজঙ্গীর ন্যায় রোষে গর্জ্জন করিতে করিতে বলিল, "চলিলাম—নির্দ্দয় দানব! দেশ ছাড়িয়া চলিলাম। প্রতিশোধ-পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠে দেশে দেশে ভ্রমণ করিব। দুষ্ট শোভাসিংহ! যত দিন আমার এই কঠোর ব্রতের উদ্‌যাপন না হইবে, তত দিন আর তোমাকে আমার এই ঘৃণিত বদন দেখাইব না।"

অজিতা আর ফিরিয়াও দেখিল না। সেই মুহূর্ত্তেই চেতোবরদা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। প্রভাতে আর কেহই অজিতাকে গ্রামে দেখিতে পাইল না।

——

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—:*:—

সুবাদার-দরবারে।

সুবে বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার শাসনদণ্ড পরিচালনার ভার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর হস্তে। রাজ্য যে ভাবেই শাসিত হউক না কেন, নিয়মিত রাজস্ব যথাসময়ে মোগল-সম্রাটের রাজকোষে পৌছান চাই। কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গালার রাজস্ব ঠিক সময়ে সম্রাট্-দরবারে পৌছায় না। ইহা লইয়া অনেক কানাঘুষা চলিতে লাগিল। রাজসভায় দলাদলি আবহমান চলিয়া আসিতেছে। সম্রাট্ দরবারে ইব্রাহিম খাঁর বিরুদ্ধপক্ষীয়দিগের জয় হইল। সম্রাট আরংজীব সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ কিছুই নহে, কেবল রাজস্ব-সম্বন্ধে সম্রাট্কে প্রতারিত করিবার জন্য বৃদ্ধ সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ কর্ত্তৃক রচিত একটি বিরাট প্রবঞ্চনা মাত্র। সচিবগণও সম্রাটের মতে মত দিলেন। স্থিরীকৃত হইল যে, সুবাদারের হস্ত হইতে রাজস্ব আদায়ের ভার কাড়িয়া লওয়া হউক। মুরশীদ-কুলি খাঁ নামে এক জন মস্তিষ্কশালী রাজস্ববিৎ সচিব বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার রাজস্ব আদায় সম্বন্ধীয় সমস্ত ভার প্রাপ্ত হইয়া ঢাকায় আসিবার জন্য সম্রাট্ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেন। ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, এই মুরশীদকুলী খাঁই পরে সুবা বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার রাজতক্তে উপবেশন করেন। তিনিই বাঙ্গালার নবাবী মছনদ ঢাকা হইতে মুরশীদাবাদে স্থানান্তরিত করিয়া নিজ নামে ঐ রাজধানীর নামকরণ করেন।

পাঠক আসুন, আমরা একবার ঢাকার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর দরবারে গিয়া বাঙ্গালার তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস লইয়া আসি।

প্রাসাদের একটি সুপরিসর, সুসজ্জিত কক্ষে নবাব ইব্রাহিম খাঁর দরবার। বিচিত্র কারুকার্য্যময় একখানি স্বর্ণ-সিংহাসনে আসীন রহিয়াছেন—বৃদ্ধ নবাব ইব্রাহিম খাঁ। তাঁহার সিংহাসনতলে সুবর্ণ-খচিত গালিচার উপরে শ্রেণীবদ্ধভাবে পর্য্যায়ানুসারে উপবিষ্ট সমস্ত আমীরওমরাহগণ। সিংহাসনের কিছু দূরে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান উজীর। উজীরের পার্শ্বে স্তূপীকৃত কাগজ, খাতাপত্র ও দলিলাদি।

নবাব মনোযোগের সহিত একখানি আরজী পাঠ করিতেছিলেন। পাঠ সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, "উজীর!" উজীর দুই হাতে কুর্ণীস করিয়া উত্তর দিলেন, "জনাব।"

ইব্রাহিম খাঁ। দেখ উজীর! তোমার আরজীর তাড়াটি শীঘ্র শীঘ্র খতম ক'রে ফেল। দুনিয়ায় এসে, দুনিয়াদারী কর্‌তে কর্‌তে, আর এই আরজী বর্ণনা দেখ্‌তে দেখ্‌তেই বাজী ভোর হয়ে এলো। পরকালের কাজ তো কল্লুমই না। শেষ-জীবনটা যে পাঁচ জন বন্ধুবান্ধব নিয়ে একটু আয়েস ক'রে, একটু বা গোলেস্তা প'ড়ে,একটু বা গান শুনে প্রাণটা ঠাণ্ডা কর্‌ব, তারও যোটি নাই। ওই তোমার আরজী—আর ওই তোমার বর্ণনা। তোমার হাতে ওখানা আবার কি উজীর?

উজীর। এখানি দুনিয়ার বাদশাহ আরংজীবের মোহরছেপ্ত একখানি হুকুমনামা। বাদশাহ জনাবকে জানাচ্ছেন যে, আপনাকে সাহায্য কর্‌বার জন্য মুরশীদকুলি খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে রাজস্ব-সচিব ক'রে শীঘ্রই ঢাকায় পাঠাচ্ছেন। তিনি অবশ্য সুবাদারের অধীনে থাক্‌বেন। তবে সরকারী রাজস্ব আদায় বন্দোবস্ত ও আয়-ব্যয় পরিদর্শনের ভার সমস্তই এই নূতন নিযুক্ত দেওয়ানের উপরে থাকবে, এবং সুবাদার ও দেওয়ান উভয়ে মিলে বাদশাহের প্রচারিত দস্তর-উল-আমল অনুসারে কার্য্য কর্‌বেন।

ইব্রাহিম। কেন, ইব্রাহিম খাঁ বৃদ্ধ হয়েছে বলে? ভাল, বন্দোবস্ত অতি উত্তমই হয়েছে। নব-নিযুক্ত দেওয়ান মুরশীদকুলী কবে নাগাৎ ঢাকায় আসবেন?

উজীর। কোন্ নাগাৎ আসবেন, তার কিছু নির্দ্ধারিত সময় দেওয়া হয় নাই।

ইব্রাহিম। আচ্ছা বেশ, তার পরে ওখানা কি?

উজীর। এখানাও বাদশাহের চিঠি। এতে জানাচ্ছেন যে, শাহাজাদা আজিমুশ্বান উপযুক্ত সৈন্যবল নিয়ে দাক্ষিণাত্য থেকে বিদ্রোহী হিন্দু তালুকদার শোভাসিংহ আর পাঠান দস্যু রহিম শাকে দমন কর্‌বার জন্য বাঙ্গালা অভিমুখে আসছেন। হিন্দুরাজা অজিতসিংহ শাহজাদা আজিমুশ্বানের সহকারী

সেনাপতিরূপে আসছেন। শাহজাদা আপাততঃ রাজমহল দুর্গে অবস্থিতি করবেন। রাজা অজিতসিংহ সসৈন্যে বর্দ্ধমান হয়ে ঢাকায় আসবেন।

ইব্রাহিম। অবশ্য রাস্তায় কোন বিপদ না হ'লে। ও আশমানী রংয়ের পত্রখানা কার ?

উজীর। এখানা যশোরের ফৌজদার মুরুল্লা খাঁর পত্র। তিনি লিখেছেন যে, গত কিস্তিতে এক কপর্দ্দকমাত্র রাজস্ব আদায় হয়নি। দস্যুর উৎপীড়নে বারো আনা প্রজা একেবারে সর্ব্বস্বান্ত ও ফেরার্ হয়েছে। রাজস্ব যা কিছু সামান্য আদায় হয়েছিল, তা উপযুক্ত পাহারা বন্দোবস্ত ক'রে সদরে পাঠান হয়েছিল। রাস্তায় ডাকাতে সব লুঠপাট ক'রে নিয়েছে।

ইব্রাহিম। বেশ, ভাল হয়েছে, মুরুল্লা খাঁকে জানাও যে, বর্ত্তমান অবস্থা শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হচ্চে। ডাকাতের ভয় আর থাকছে না। আর এক জন সুদক্ষ রাজস্ব-সচিবও শীঘ্র নিযুক্ত হচ্ছেন; সুতরাং রাজস্বের ভাবনাও আর ভাবতে হবে না। তিনি নাসিকায় সর্ষপ-তেল দিয়ে নিদ্রা যান। নাও উজীর, শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর শেষ ক'রে ফেল। তোমার হাতে ওখান আবার কি ?

উজীর। ইংরাজ বণিক্ সম্প্রদায় কাশিমবাজারের নিকট সোরা এবং রেশমের কারবার চালানের জন্য একটি কুঠী স্থাপিত করিতে ইচ্ছুক। সেই নিমিত্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ থেকে হুজুরের নিকট মঞ্জুরী প্রার্থনা ক'রে এই চিঠি আসছে। পত্রবাহক উকীলও আপনার দর্শনপ্রার্থী। অনুমতি হ'লে, তিনি এসে জনাবের পদচুম্বন করেন।

ইব্রাহিম। সব বুঝেছি উজীর, সব বুঝেছি। হুকুমনামাও অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হবে; কিন্তু ইংরেজ-কোম্পানী এই হুকুমের দাম কি পরিমাণ দিতে স্বীকৃত? দশ পোনর হাজার মুদ্রা সেলামী নিয়ে একটি কুঠী নির্ম্মাণের হুকুম দেওয়া যেতে পারে না। আর কতকগুলা নগণ্য রাংতা-মোড়া ছেলেপিলের খেলনার সওগাৎ পেয়ে বৃদ্ধ ইব্রাহিম খাঁ ভোলবার নয়। বোঝই ত উজীর, আমরা প্রজার কাছ থেকে এক পয়সা আদায় করতে পারি আর না পারি, সরকারের কিস্তি খেলাপ করতে পারি না। এই টাকাটা যে কোন দিক্ থেকেই হউক, আদায় ত' হওয়া চাই।

উজীর। জনাব ত' ঠিকই অনুমতি কচ্ছেন, তা হ'লে জনাবের হুকুম হ'লে উকীল সাহেবের মুখে তাহাদের বক্তব্য কি আছে, সমস্ত শোনা যায়।

ইব্রাহিম। উজীর, তোমার আজকার কাজ শেষ হয়েছে ত'?

উজীর। আজ্ঞা হাঁ জনাব!

ইব্রাহিম। তা হ'লে এখন বিদায় হ'তে পার। একবার সেনাপতি মবারক খাঁকে এখানে পাঠিয়ে দাও। ওমরাহগণ, তোমরাও নিজ নিজ গৃহে গিয়ে বিশ্রাম করতে পার।

সে দিনকার মত দরবার ভঙ্গ হইল। বৃদ্ধ নবাব এত করিয়াও সম্রাটের মন যোগাইতে পারিলেন না। ইব্রাহিম খাঁ বুঝিলেন যে, সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছেন। তাঁহার সুখের দিন শেষ হইয়াছে। মুরশীদকুলী খাঁর দিন আসিতেছে। যাদুকরের মায়াসৃষ্টির মত বৃদ্ধ এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার হৃদয়মধ্যে নিজ বিষাদময় ভবিষ্যৎ ছবি পরিস্ফুটভাবে দেখিতে পাইলেন; দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। ইব্রাহিম খাঁ ভাবিতে লাগিলেন, "এই তো মানুষ। এই ত' মানুষের বল, বীর্য্য, আশা, ভরসা। কয় দিনের জন্য? কিসের জন্য? এই সুবে বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার সর্ব্বময় কর্ত্তা, প্রজাগণের ভাগ্যসূত্রের একমাত্র নিয়ামক এক দিন ছিলেন —অপরিমিত ক্ষমতাশালী, পরম-কৌশলী শায়েস্তা খাঁ। কোথায় রহিলেন শায়েস্তা খাঁ, কোথায় রহিল পাঠান-শক্তি। দু'দিনের জন্য গড়া খেলা ঘর, দুদিনেই ভেঙ্গে গেল। একটা ঝাপটারও ভর সহিল না। ইব্রাহিম খাঁ আজি বাঙ্গালা বেহার, উড়িষ্যার কর্ত্তা। কিন্তু কে জানে, ভাগ্যবিপর্য্যয়ে, কালি তাহার স্থান কোথায় থাকিবে! আজি যে ইব্রাহিম খাঁর চরণ চুম্বন করিবার জন্য সহস্র লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে, কে জানে, কালি ইব্রাহিম খাঁকে আবার তাহাদেরই কৃপা ভিক্ষার জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইতে হইবে না! সর্ব্বশক্তিমান্ খোদা! সব তোমারই ইচ্ছা। সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া, জীর্ণ প্রলোভনের বাহ্য চাকচিক্যে ভুলিয়া দিনান্তেও এক বার তোমার নাম করিতে পারি না। দেখিও দয়াময়! তাই বলিয়া যেন অন্তিমে আমায় ভুলিয়া থাকিও না।"

এই সময়ে সেনাপতি মবারক আসিয়া সেই কক্ষে

প্রবেশ-পূর্ব্বক সুবাদারকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "জাঁহাপনা! এ অধীনেরে কোন্ প্রয়োজনে স্মরণ করিয়াছেন?" নবাব কহিলেন, "সেনাপতি! জান তুমি, তোমার প্রতি বৃদ্ধ ইব্রাহিম পিতৃসম স্নেহশীল। মবারক! বিপদে সম্পদে তুমি আমার চির-অনুগত সহায়।"

মবারক নবাবকে বেশ ভাল রকম চিনিতেন। তিনি বেশ জানিতেন যে, তিনি হৃদয়ের অতি নিভৃত প্রদেশে অতি সঙ্গোপনে যে উচ্চ আশা পোষণ করিতেছেন, যাহা একমাত্র তিনি ছাড়া অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই, সূক্ষ্ম রাজনীতিজ্ঞ, সুচতুর নবাবের নিকট তাহাও অজানিত নহে।

মবারক মনে মনে বলিলেন, "আরে রে কপট বৃদ্ধ! ক্রূর রাজনৈতিক কৌশলে তুমি আমাকে ভুলাইতে চাহ? তোমার সে প্রয়াস নিষ্ফল।" প্রকাশ্যে কহিলেন, "নবাব! আমার প্রতি আপনার স্থির কৃপা। তাই আমাকে এই প্রশংসা-গৌরবে সজ্জিত করিতেছেন। আমি নিতান্তই তাহার অযোগ্য। কেবল প্রাণপণে আপনার পদসেবা মাত্র করি।" ইব্রাহিম খাঁ কহিলেন, "মবারক! বীর তুমি, এ বিনয় তোমারই উপযুক্ত। শুন বৎস! যে কারণে আজ তোমাকে আমার কাছে আসিতে বলিয়াছি। তুমি জান, দস্যুদিগের অত্যাচারে সমস্ত বাঙ্গালা আজি প্রপীড়িত, প্রজাগণ সর্ব্বস্বান্ত। সেই অত্যাচার নিবারণের জন্য পুত্র জবরদস্ত খাঁকে সুবাদারী সৈন্যের সেনাপতি করিয়া কলিকাতা অভিমুখে পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছি। আমি বৃদ্ধ; অস্ত্রসঞ্চালনে অক্ষম। সেই জন্য বৎস! এই রাজ্যরক্ষার ভার তোমার উপরে।"

মবারক নতশিরে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, "জাঁহাপনা! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।" মনে মনে কহিলেন, "অতি দুরদৃষ্টি তোমার; কিন্তু বৃদ্ধ, বুঝিয়াছ কি আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে সঙ্গোপনে কোন্ আশা পোষণ করিয়া আসিতেছি? বাঙ্গালার সিংহাসন, আর সৃষ্টির ললামভূতা তোমার কন্যারত্ন।"

ইব্রাহিম খাঁ কহিলেন, "যাও বৎস! আমার সৈন্যগণ এক্ষণে তোমার আজ্ঞাধীন। তাহারা তোমার আদেশে চালিত হইবে।" মবারক কহিলেন, "ইহা আমার পক্ষে দুর্লভ সম্মান! জাঁহাপনা, আপনার অনুগ্রহ সমাদরে শিরে ধরিলাম।"

ইব্রাহিম খাঁ প্রস্থান করিলেন। মবারক কক্ষমধ্যে চিন্তিতভাবে পাদচারণা করিতে করিতে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "আরে আকাঙ্ক্ষা রাক্ষসী! কিছুতেই কি তোর হাত হ'তে নিষ্কৃতি নাই? এই যে আমার হৃদয়ের ক্ষুদ্র শিরা-উপশিরাগুলি নখাঘাতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, উৎকট পিপাসাবেগে, অযুত অযুত মুখে আমার সমস্ত রক্তটুকু শোষণ করিলি, তবুও তোর তীব্র তৃষ্ণা নির্ব্বাপিত হইল না? ভাল, দেখি কুহকিনি! তুই কত মত কুহক রচনা করিতে শিখিয়াছিস্। আজি খোদার কৃপায়, সমগ্র বাঙ্গালায় আমার ন্যায় সম্মানিত সম্পূজিত কে? মূর্খ আমি! রাজ-অনুগ্রহের উপর কি বিশ্বাস? আজি আমার উপর নবাবের কৃপাদৃষ্টি। কে বলিতে পারে, কালি তাহা বিষদৃষ্টিরূপে পরিণত হইবে না? তখন আমার এই সমস্ত কল্পনা-স্বপ্ন কোথায় রহিবে? ক্ষণস্থায়ী জলবিম্বের মত নিমেষে উঠিয়া নিমেষে মিলাইয়া যাইবে। তখন আমার এই যত্ন-পুষ্ট কাঙ্গাল বাসনা কি ধূলিমাঝে বিলুণ্ঠিত হইবে না? না—দূরে যাও বিচার-বিবেক! তর্ক-গবেষণা দূরে যাও। সয়তান! তোমার দেহে যত শক্তি আছে, সব আমার হৃদয়ে ঢালিয়া দাও। আমার জন্য নরকের প্রশস্ত দুয়ার খুলিয়া রাখ। সকলে আমাকে অকৃতজ্ঞ রাজদ্রোহী কহিবে। তাহাতে ক্ষতি কি—যদি ধর্ম্মপথে বাঙ্গালার স্বর্ণ-সিংহাসন লাভ করিতে পারি? তার পর দেখিব জুলিখা! তখন মবারককে পতিত্বে বরণ কর কি না?"

আশা মরীচিকা। মানুষ আশার কুহকে ভুলিয়া অন্তঃসারহীন বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া, পথ ছাড়িয়া বিপথে যায়, আসল ছাড়িয়া ঝুঁটা জিনিসের পাছে পাছে ছুটে। তাহার পরিণাম বুকভাঙ্গা নিরাশা। তাহার পরিণাম মৃত্যু। মবারকেরও অদৃষ্টে বুঝি তাই লেখা আছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—:*:—

তসবীরওয়ালী।

সৌন্দর্য্যসম্পৎ-শালিনী নানারঙ্গময়ী বিলাসিনী যেমন বার্দ্ধক্যেও তাহার বিগত যৌবনের সুষমার ছায়াটুকুকে প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করে, সুপ্রাচীনা রাজধানী ঢাকা নগরী অধুনা সেইরূপ তাহার বিগত সমৃদ্ধি-গৌরব-বৈভবের ভস্মাবশেষমাত্র-টুকুকে লইয়া আপনাকে পরমা ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ঢাকা সুবে বাঙ্গালা-বেহার-উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। তখন ঢাকার সমৃদ্ধি, ঢাকার ঐশ্বর্য্য, ঢাকার বাণিজ্য সমস্ত জগতের ঈর্ষ্যার জিনিস—সমস্ত সভ্য-জগতের আদর্শস্থানীয় ও অনুকরণীয় ছিল।

ঢাকা নগরে, বুড়ীগঙ্গার ধারে, একটি বিচিত্র প্রমোদ-উদ্যান। সেই উদ্যানের একটি লতামণ্ডপের মধ্যে এক জন রমণী একাকিনী একখানি কৃত্রিম শৈলাসনে উপবেশন করিয়া আছেন। নানাজাতীয় প্রস্ফুটিত কুসুমে তাঁহার সুচারু দেহবল্লীখানি ঢাকিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার সরস সুকুমার মুখখানি, সেই লতাপুঞ্জমধ্যে একটি ফুটন্ত বসোরা গোলাপ বলিয়া ভ্রম হয়। ইনি নবাব ইব্রাহিম খাঁর কন্যা জুলিখা। রমণী কহিতেছিলেন, "জানি না, প্রাণ আমার কি চায়! আমার কাছে চারি দিক্ নিরাশায় সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না। পিতার মুখ সর্ব্বদাই বিষাদকালিমা-লিপ্ত দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কার জন্য পিতা আমার বিরসবদন? অভাগিনী জুলিখাই তাঁহার একমাত্র চিন্তার কারণ।"

ফিরোজা জুলিখার প্রিয় সহচরী। অনেকক্ষণ হইতে জুলিখাকে দেখিতে না পাইয়া সে অন্য সখী-গণকে লইয়া পাঁতি পাঁতি করিয়া উপবনের সব ঠাঁই খুঁজিয়া সেই লতা-মণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইল। ফিরোজা বলিল, "এ কি নবাব-নন্দিনি! আমাদের ছাড়িয়া একা তুমি এখানে পলাইয়া আসিয়াছ? আমরা তোমায় খুঁজিয়া সারা।" সখীগণ গাহিতে লাগিল,—

"সখি! কাছে কাছে তারে বুঝি দেখিতে না পাও?
কার আশে, চারু হাসে!
তুমি দূরে দূরে দূরে স'রে যাও?
তুমি খুঁজে খুঁজে সারা হৃদয়-চোরে।
সে যে মনগড়ান মনমাতান রয়েছে মনে!
সে কি আছে ভুবনে?
সেই হবে লো মনের মত তুমি যার পানেতে চাও।"

এই সময়ে এক জন পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল যে,আগরা হইতে এক জন তস্‌বীরওয়ালী আসি-য়াছে। সে নবাব-পুত্রীর সহিত সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করে; জুলিখা তাহাকে লইয়া আসিতে পরিচারিকার প্রতি আদেশ করিলেন। তস্‌বীরওয়ালী আসিয়া নবাবজাদীকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "নবাব-জাদি! মেহেরবাণী করিয়া বাঁদীর তস্‌লিম গ্রহণ করিবেন। আমি তস্‌বীর বিক্রয় করিবার জন্য হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়াছি। যেখানেই গিয়াছি, সব জায়গায়ই নবাব-জাদী জুলিখার নাম শুনে আমার বড়ই ইচ্ছা ছিল যে, একবার আপনার শ্রীচরণ দর্শন ক'রে কৃতার্থ হব। আজ আপনাকে দেখে বুঝিলাম যে,আপনি যথার্থই এই সুনামের যোগ্যপাত্রী।"

জুলিখা। তস্‌বীরওয়ালী, তোমার কাছে কার কার ছবি আছে?

তস্‌বীওয়ালী। হিন্দুস্থানের মালিক আগরার বাদশাহগণ ও বাদশাহ-জাদীগণের, মুসলমান নবাব-গণের ও হিন্দু-রাজন্যবর্গের তস্‌বীর আমার কাছে আছে। অনুমতি হ'লে বাঁদী সে সমস্ত দেখাতে প্রস্তুত।

জুলিখা। ভাল, দেখাও; ফিরোজা, সখীগণ, এস আজ পরীক্ষা করব—কার কার পছন্দ কেমন? দেখ ফিরোজা, কি সুন্দর চেহারা! উদারতা, সদা-শয়তা ও ন্যায়পরতার প্রতিমূর্ত্তি ইনি কে?

তস্‌বীরওয়ালী। ওখানি সম্রাট্‌কুলতিলক মহাত্মা আক্‌বরের ছবি।

জুলিখা। আর বক্র কুটিল চাহনি, কুঞ্চিত ললাট, দীর্ঘ মুখ, যাতে হাস্যের ও সরলতার লেশমাত্র নাই, হিংসাভারে কুঞ্চিতবদন—কার এই ছবিখানি?

তস্‌বীরওয়ালী। বাদশাহ-জাদি! চুপ? সম্রাট্ আরংজীবের চর সর্ব্বত্র ঘুরছে, ঘুণাক্ষরে সম্রাট্ এ কথা শুন্‌লে অনিষ্ট হবে। এখানি হিন্দুস্থানের বর্ত্তমান বাদশাহ আরংজীবের।

জুলিখা। দিব্য সৌন্দর্য্যশালিনী কে এই রমণীর শিরোমণি—যার বিদ্যুদ্দামনিভ লাবণ্যচ্ছটায় দিগন্ত

উদ্ভাসিত হচ্ছে, যার সর্ব্ব-অঙ্গে সুষমা ক্ষরিত হচ্ছে? কে এই নারী-রত্ন?

তস্‌বীরওয়ালী। ওই ভুবনমোহিনী নারীকুল-শিরোমণি সম্রাট্ জাহাঙ্গীর-পত্নী সাম্রাজ্ঞী নুরজাহান।

জুলিখা। আর কে এই সুন্দরকান্তি যুবাপুরুষ, উচ্ছৃঙ্খল রণতুরঙ্গমপরে দৃঢ় সমাসীন, শিরে রত্নরাজি-বিভূষিত শোভন উষ্ণীষ, বিশাল উরসে দুর্ভেদ্য কবচ, কটিবিলম্বিত তীক্ষ্ণধার অসি, বামপার্শ্বে শাণিত ভল্ল, বীরত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—কে ইনি?

তস্‌বীরওয়ালী।...এখানি পাঠান-দস্যু রহিম শার ছবি।

জুলিখা জড়িতস্বরে কহিলেন, "এই ছবিখানির দাম কত?" তস্‌বীরওয়ালী উত্তর করিল, "এক শত স্বর্ণ মুদ্রা।" জুলিখা কহিলেন, "আচ্ছা, আমি এখানি রাখিলাম।" প্রার্থিত মূল্য পাইয়া তস্‌বীরওয়ালী চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—:*:—

ইনি কে? ইংরাজ না দেবতা!

প্রভাত হইয়াছে। বাল-সূর্য্যের অরুণ কিরণে দিগ্-দিগন্ত উদ্ভাসিত। আকাশে রাঙ্গা মেঘ। জলে তাহার রাঙ্গা ছবি। বনে বনে রাঙ্গা কুসুমের মেলা। প্রকৃতির রাঙ্গা ঠোঁটে ভুবন-ভুলান মদিরতাময় রাঙ্গা হাসি-রাশি। হাসি জলে, হাসি স্থলে। ঊর্দ্ধে হাসি, নিম্নে হাসি। সুতানুটীর বনস্থলীর প্রত্যেক পত্র-পুষ্প আজি উল্লাসে হাসিতেছে। কেবল আমিনার মুখে আজ হাসি নাই। বৃক্ষশাখে কোকিলবধূ সপ্তমে তান তুলিয়া কুহরিতেছিল। বনমধ্যস্থ একটি সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া পুষ্প চয়ন করিতে করিতে কোকিল-বিনিন্দিত স্বরে মূর্ত্তিমতী বনদেবী আমিনা গাহিতে লাগিলেন,—

"আঁধার জীবনে মম, তুমি সখা! ধ্রুবতারা।
যেন অনন্ত বারিধিমাঝে হই না কো পথহারা
প্রতিভা প্রকাশি সখা
নাশ এ তমসা-রাশি
পুণ্যময় করে তব
ঢাল হে কিরণধারা।"

গানের অক্ষরে অক্ষরে নিদারুণ ব্যথা; অথচ যেন প্রেমিকা সে ব্যথায় বিহ্বলা নয়, একেবারে বিভ্রান্ত-চিত্তা নয়। সে আকুলতাও যেন আশার আলোক-রশ্মিপাতে উজলিতা।

আমিনা কহিতে লাগিলেন, "রহিম! আমিনার হৃদয়-দেবতা! তুমি আমায় ছাড়িয়া যাইতে চাও! কেন প্রিয়তম! অভাগীর বক্ষোবন্ধে যত মধু, যত গন্ধ, যত পরিমল লুকান আছিল, সব কি নিঃশেষিত হইয়াছে?"—না—না—সখা! প্রণয়বল্লরী আমার এখনও তো অর্দ্ধ-মুকুলিতা নহে। বঁধু! ইহারই মধ্যে কি তোমার পিপাসা মিটিয়া গেল? যদি তাই হয়, তবে আজ্ঞা দেহ সখা! যে নন্দন-কানন-জাত সৌন্দর্য্যের কুসুমভার নিজ হস্তে অবচয়ন করিয়া তোমারই প্রীতির জন্য তোমার চরণ-কমলে নিবেদন করিয়াছিলাম, আজি যদি পূজা সাঙ্গ হইয়া থাকে, আজ্ঞা দেহ হৃদয়ের রাজা! এখনই তোমার পদতল হইতে সেই নির্ম্মাল্যের ডালি কুড়াইয়া লইয়া পবিত্র জাহ্নবী-সলিলে তাহা বিসর্জ্জিয়া আসিব।"

আমিনা মুখ ফিরাইয়া দেখেন, বনের মধ্যে লতা-গুল্মের আবরণে আপনাকে অংশতঃ আচ্ছাদিত করিয়া এক জন গোরা তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে। পাঠক! এই ইংরাজ আর কেহ নহে, আপনাদের পূর্ব্ব-পরিচিত সুতানুটীর ওলন্দাজ-কুঠীয়াল জোহান্ বেয়ার। বন-বিহারিণী কুরঙ্গী যেমন বনমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে সহসা আপনাকে শার্দ্দূলের কবলে নিপতিত দেখিলে ভয়ে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়ে, দৌড়িয়া পলাইয়া যাইতেও যেমন তাহার পা উঠে না, আমিনাও এই আকস্মিক বিপৎপাতে সেইরূপ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া রহিলেন। বেয়ার সে সুযোগ পরিত্যাগ করিল না; একেবারে আমিনার সম্মুখে আসিয়া কহিল, "সুন্দরি, টুমি এক্ষণে সম্পূর্ণ আমার ক্ষমটার মধ্যে।" একটি অস্ফুট চীৎকার আমিনার মুখ হইতে আপনা-আপনি নির্গত হইল। সে একটি বৃক্ষান্তরালে আশ্রয় লইতে গেল। বেয়ার তাহার পাছু ছাড়িল না। অনন্যোপায় হইয়া আমিনা কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, "সাহেব! তোমার পায়ে ধরি, আমায় ছেড়ে দাও। তোমাদের জাত স্ত্রীলোকের মান রক্ষা করতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। তুমি তোমাদের জাতের স্বধর্ম্ম ভুলিও না।

স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করো না। তোমাকে তোমাদের যীশু খ্রীষ্টের দিব্য।"

জোহান্ বেয়ার সে কথায় কর্ণপাতও করিল না। বরং বলপ্রকাশের জন্য আমিনার দিকে আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিল, "সুণ্ডরি! টোমার ক্রন্দন নিষ্ফল। টোমার অজস্র গালিবর্ষণকেও আমি ভয় করি না। আমার ডুই-ই গা-সহা আছে।"

বনমধ্যে একাকিনী অসহায়া অবলা! সম্মুখে কামোন্মত্ত নর-পিশাচ। তাই আমিনা উর্দ্ধে চাহিয়া করজোড়ে কহিল, "দয়াময় খোদা! তুমি ভিন্ন এই জনহীন বনমধ্যে এখন আমায় এই দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে কে রক্ষা করিবে? এ সময় যদি রহিম কাছে থাকিত।"

রহিমের নাম শুনিয়া বেয়ার একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় একলম্ফে গিয়া আমিনার হাত ধরিয়া কহিল, "সুণ্ডরি! চীট্‌কার করিয়া ডাক যদি, টোমার রহিম আসিয়া টোমায় রক্ষা করিতে পারে?"

দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়, নিরবলম্বনের অবলম্বন চিরদিনই ভগবান্! ভগবান্ রক্ষা করিলেন। উত্তোলিত বন্দুক হস্তে এক জন ইংরাজ বনমধ্য হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া অপর শ্বেতাঙ্গটিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "জোহান বেয়ার! কাজটা বেশ করেছ! কিন্তু এর দরুণ তোমায় ভালরকম ভুগ্‌তে হবে। ভাল চাও তো স্ত্রীলোকটিকে ছেড়ে দাও। তা না হ'লে তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।"

এই আগন্তুক ইংরাজ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সুবিখ্যাত উদারচেতা ন্যায়পরতার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত—জব চার্ণক! এই মহাপ্রাণ ইংরাজ, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিরূপে ভারতবর্ষে আসিয়া, নিজ অসামান্য অধ্যবসায়ে ও অকৃত্রিম সৌজন্যে, সম্রাট্ ও তাঁহার অনুচরগণকে বশীভূত করিয়া বঙ্গের নানাস্থানে কুঠী খুলিয়া রেশম, সোরা ইত্যাদির কারবারে যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মুরশিদাবাদ, হুগলী, সুতোনুটী প্রভৃতি কুঠীর তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী ছিলেন। বিলাতে কোর্ট-অফ-ডিরেক্টরদিগের নিকটও জব চার্ণকের অশেষ প্রতিপত্তি ছিল। এই সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ রাজপুরুষের নামেই কলিকাতার সান্নিধ্যে স্থিত বারাকপুর নামক গণ্ডগ্রামের নাম 'চাণক' হইয়াছিল।

সর্পের কবল হইতে তাহার আহার ছিনাইয়া লইলে সে যেমন রোষে উন্মত্ত হইয়া উঠে, জোহান্ বেয়ারও তাহার-হৃদয়কোণে বহু-যত্ন-পুষ্ট আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির পথে পরিপন্থী এই ইংরাজের অকস্মাৎ আবির্ভাবে সেইরূপ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া একেবারে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া কহিল, "জব চার্ণক! তুমি আমাকে বিলক্ষণ চেন। আমার বন্দুকের সন্ধান যে অব্যর্থ, তাহাও বোধ হয় তোমার জানা আছে।"

জব চার্ণক উত্তর করিলেন, "বাক্‌চতুর! আর কথা কহিও না, তুমি আমাদের শ্বেতজাতির কলঙ্ক। তুমি ইয়ুরোপীয় নামে অভিহিত হইবারও অযোগ্য। তোমাদের ন্যায় লোকের অস্তিত্বই বিমল জাতীয়-সম্মানকে কলঙ্ক-কালিমায় লাঞ্ছিত করে। এখনও বলিতেছি শুন, তোমার কৃতপাপের জন্য অনুতাপ কর। তোমার দিন ফুরাইয়া আসিতেছে।"

কি ভীষণ দৃশ্য! বন-কুসুমের গন্ধে সুরভিত, বসন্তানিলচুম্বিত, নির্ম্মল প্রভাত! নির্জ্জন বনপথ। নীরব প্রকৃতি। পরস্পরের রক্তশোণিত-পান-পিপাসায় উত্তোলিত-বন্দুক দুই জন শ্বেতাঙ্গ যুবক। অদূরে স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধির ন্যায় দণ্ডায়মানা যুবতী আমিনা। পাশ্চাত্য জাতিমধ্যে প্রচলিত দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রথানুসারে দণ্ডায়মান হইয়া জোহান্ বেয়ার গণিতে লাগিলেন, এক—দুই!—তিন এই সংখ্যাটি উচ্চারণমাত্রেই হয় জোহান্ বেয়ার, নয় জব চার্ণক, অথবা উভয়েরই মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া গুলী চলিয়া যাইবে। বেয়ারের মুখ হইতে সেই সাঙ্কেতিক "তিন" কথাটি উচ্চারিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, জীবন-মরণের সেই ভীষণ সন্ধিক্ষণে একটি ঘটনা সংঘটিত হইল। বনের মধ্য হইতে তীব্রতেজে ঘূর্ণ্যমান একখানি শাণিত চক্র-অস্ত্র আসিয়া কুঠিয়াল জোহান্ বেয়ারের দক্ষিণহস্তের মণিবন্ধে লাগিল। হস্তখানি মনিবন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূ-লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। বন্দুকটি মাটীতে পড়িয়া নিষ্ফল আওয়াজে বনভূমি কম্পিত করিল। এই আকস্মিক ঘটনায় সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া রহিল। এমন সময়, এক জন সশস্ত্র সৈনিক পুরুষ বনের অন্তরাল হইতে ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমিনা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার বুকের উপরে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। পাঠান-সর্দ্দার রহিম শা ভীতি-বিহ্বলা আমিনাকে দৃঢ়ভাবে

পালিঙ্গিয়া বেয়ারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "দেখ্ দুষ্ট কুঠীয়াল, রহিম তাহার আমিনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ কি না?" আমিনার চিবুক ধরিয়া তাহার লজ্জারুণ মুখখানি একটু উঠাইয়া কহিলেন, "আমিনা! চেয়ে দেখ, যে নরাধম শৃগালের ন্যায় অতর্কিতভাবে এসে, অসহায়া রমণীর প্রতি অত্যাচার করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, সে এক্ষণে তোমার চরণতলে বন্দী। পাঠান-সর্দ্দার রহিম শা জীবিত থাকিতে তাহার আমিনার অঙ্গ স্পর্শ করে, এমন লোক পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই।"

এই বলিয়া পাঠান সর্দ্দার ভেরীবাদন করিলেন, অমনি পিপীলিকার শ্রেণীর মত সারিবদ্ধ হইয়া অগণ্য পাঠান সৈনিক-পুরুষ আসিয়া সেই বনভূমি ছাইয়া ফেলিল। রহিম শা আজ্ঞা দিলেন, "সর্দ্দারগণ! এই পাপিষ্ঠের হস্তপদ বন্ধন ক'রে ছাউনীতে নিয়ে যাও। কাল বিচার ক'রে তার পর অপরাধীর সমুচিত শাস্তি বিধান কর্‌ব।" তৎপরে বেয়ারকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "ছি নরাধম! তুমি না ইয়ুরোপীয়—যে ইয়ুরোপীয় জাতিগণ সভ্য জগতের শীর্ষস্থানীয়, উদারতা এবং মহাপ্রাণতার উজ্জ্বলতম আদর্শ বলিয়া সমগ্র জগতীতলে সম্পূজিত, যে ইয়ুরোপীয়গণ রমণীর সম্মান রক্ষা করিতে আপনার জীবনকে পর্য্যন্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করে, যাহাদের মধ্যে জব চার্ণকের মত মহাপুরুষের সংখ্যাও কম নহে, তুমি না সেই বিশ্ববরণীয় শ্বেতাঙ্গবংশসম্ভূত? তোমার ন্যায় দুই চারিটি ঘৃণিত জীবের অস্তিত্বই জ্যোৎস্নাধবল জাতীয় সম্মানকে কলঙ্ক-কালিমায় লাঞ্ছিত করে। তোমার অপরাধের শাস্তি কি জান? ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়ান। যাহাতে তিল তিল ক'রে তোমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে, যাহাতে মরণের যন্ত্রণা তুমি সম্পূর্ণরূপে ভোগ করতে পার্‌বে।"

ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্ব সময়ে এই নৃশংস শাস্তিপদ্ধতি সাধারণে অজ্ঞানিত ছিল না। তাই ওলন্দাজ কুঠীয়াল জোহান্ বেয়ার কল্পনায় তাহার বিসদৃশ পরিণাম স্মরণ করিয়া একেবারে শিহরিয়া উঠিল। পাঠান-সর্দ্দারের সে ভীষণ দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া আমিনাও আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার নিজের প্রতি অত্যাচারের কথা ভুলিয়া গিয়া রহিম শাকে কহিলেন, "রহিম! সত্য সত্যই সাহেবকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবে? কেন? এত যন্ত্রণা দিয়ে মানুষ মারার চেয়ে, এককোপে কেটে ফেল্লেই তো হয়! ক্ষমা কর রহিম! এবারকার মত সাহেবকে ক্ষমা কর।"

রহিম শা কহিলেন, "দেখ দুর্ব্বিনীত কুঠীয়াল! তুমি যাহার উপরে হৃদয়বিহীন পশুর মত অত্যাচার কর্‌বার উদ্যোগ করেছিলে, তারই অনুকম্পায় আজ তুমি পুনর্জ্জীবন লাভ কর্‌লে। তোমাদের যশ, তোমাদের কীর্ত্তি, সমগ্র সভ্যজগতে অতুলনীয়। তাই বলি, এই মহানুভব ইংরাজ জব চার্ণকের উচ্চ আদর্শে তোমরা আপনাকে গঠিত কর, এই সোনার ভারত অচিরাৎ বালকের ক্রীড়া-কন্দুকের মত তোমাদের বিশ্বজয়ী সিংহাসনতলে গড়াইয়া পড়িবে। আমিনা! এই চরিত্রবান্ ইংরাজ জব চার্ণককে প্রণাম কর। চল—তোমায় কুটীরে রাখিয়া আসি।" দস্যু সর্দ্দার রহিম শার সদাশয়তায় ও সৌজন্যে ওলন্দাজ জোহান্ বেয়ার এবং ইংরাজ জব চার্ণক উভয়েই বিস্মিত হইলেন। আমিনা জব চার্ণককে প্রণাম করিলেন এবং ভক্তি-গদ্গদস্বরে রহিম শাকে কহিলেন, "রহিম! ইনি কে? ইংরাজ না দেবতা?"

নবম পরিচ্ছেদ

—:*:—

পদাহতা ভুজঙ্গিনী।

পতিহস্তে লাঞ্ছিতা, পতিপ্রসাদ হইতে চিরতরে বঞ্চিতা, ভাগ্যহীনা অজিতা পাগলিনীর ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে চেতোবরদা ছাড়িয়া চলিতে লাগিল। গ্রামের পরে গ্রাম, প্রান্তরের পর প্রান্তর অতিক্রম করিয়া, অভিশপ্তের ন্যায় অজিতা চলিতে লাগিল। কোথায় যাইবে, অনাথিনী কাহার আশ্রয় লইবে, কিছুরই স্থিরতা নাই। তাহার হৃদয়ে মর্ম্মভেদী জ্বালা। অজিতা জানে না, কোথায় গেলে সে জ্বালা জুড়াইবে। বালিকা লোকমুখে পাঠান-সর্দ্দার রহিম শার কীর্ত্তিগাথা শুনিয়াছিল। তাই মনস্থ করিল, পাঠান-সর্দ্দারের চরণতলে গিয়া আশ্রয় লইবে। তিনি সহায়তা করিলে, অজিতার তীব্র প্রতিশোধ-পিপাসা মিটিতে পারে।

সুতানুটীর বনের মধ্যে রহিম শার সেনানিবাস,

বাঙ্গালার সকলেই তখন সে কথা জানে। অজিতা অনাহারে অনিদ্রায় রাত্রি-দিন অবিশ্রামে হাঁটিয়া সুতানুটীর বনপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বঙ্গের প্রত্যেক জনপদ, প্রতি রাজপথই তখন দস্যু-তস্কর-সমাকীর্ণ ছিল। অজিতার অঙ্গের আভরণ দেখিয়া লোভে কতকগুলি দস্যু তাহার সঙ্গ লইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সেই বিদ্যুদ্দামনিভ তেজঃপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহস করে নাই। অজিতা একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "এ কি ঘোর অশান্তির পারাবার হৃদয় আমার! উন্মত্ত সিন্ধুর মত উত্তাল উচ্ছ্বাস নিরন্তর আমার হৃদয়তটে আছাড়িয়া পড়িতেছে। বুঝি বা সেই আঘাতে আমার বক্ষোবন্ধ টুটিয়া যায়! শোভাসিংহ, নির্দ্দয় দানবসম মমতা-বিহীন তুমি পশুর মত বিনা দোষে আমার জনকের প্রাণ সংহার করিলে। আমি সব ভুলিয়া, হৃদয়ের শল্যক্ষত অশ্রুজলে মুছিয়া ফেলিয়া, তোমার গলে বরমাল্য দিলাম! এই কি তাহার উপযুক্ত প্রতিদান! ওই অন্তরীক্ষে প্রেতপুরীদ্বারে দাঁড়াইয়া পিতৃদেব আমার অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে আমাকে কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দিতেছেন। দুষ্ট শোভাসিংহ, যতক্ষণ অজিতা জীবিতা রহিবে, কিছুতেই তাহার হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবে না। হা-হা-রবে রুদ্ধশ্বাস প্রলয়ের বায়ু হাঁকিতেছে। ভীষণা রাক্ষসী সম, নিরমমা তামসী রজনী, মসীময়ী নীরস রসনা বিস্তারিয়া, প্রতিশোধ-আশে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিতেছে। রঙ্গময়ী মরুমরীচিকা পিপাসা-জর্জ্জরকণ্ঠে উন্মাদিনীপারা চলিতেছে। চল্, ছুট চল্, আরে প্রত্যাখ্যাতা! তুই সেথায় ঝটিকার বুকে বসিয়া মহা-হর্ষে-দেখিবি—তোরই হৃদয়ের অত্যুৎকট প্রতিহিংসা-তৃষা নানা মূর্ত্তিধ'রে পিশাচের মত খল খল অট্টহাসে মেদিনী কাঁপাইয়া, নির্য্যাতকের তপ্ত হৃদি-রক্তে কেমন করিয়া তীব্র প্রতিহিংসা-ব্রত উদ্‌যাপন করে। ব্রত সাঙ্গ হ'লে সে কেমন করিয়া গিয়া হাসি-মুখে মরণেরে আলিঙ্গন করে। চাই—প্রতিশোধ চাই!"

অজিতা চলিতে লাগিল। পশ্চাতে এক দল দস্যু। দস্যুগণ বলাবলি করিতেছিল:—

প্র-দস্যু। আমি বেহালার হাটতলার কাছ থেকে বরাবর তার পেছু নিয়েছি, মাগী যখন খেয়া নৌকায় গঙ্গা পার হয়, তখন আমিও একটা ডিঙ্গি নিয়ে ঠিক সেই সময়েই পার হয়ে এলুম।

দ্বি-দস্যু। তোর মত আহাম্মক তো আমি দেখিনি, শীকার হাতে পেয়ে দেরী কর্ত্তে আছে?

প্র-দস্যু। তুই ত' বল্লি, দেরী কর্ত্তে নেই, মুখে অমন বড়াই কর্ত্তে সবাই পারে। এখন কি আর আমাদের হাতে সে জোর আছে, না বুকে সে সাহস আছে যে, একেবারে স্থাখ্-মার্ করি, কাঁচা মাথা-গুলো ফটাফট্ ফাটিয়ে দিই।

তৃ-দস্যু। বেশ, এখন তোরা আপোষে ঝগড়া কর, আর এদিকে শীকার জাল ছিঁড়ে পালাক।

প্র-দস্যু। পালাবে আর কোথায়, এখন ঘাঁটির মধ্যে এসে পড়েছে।

চ-দস্যু। আমাদের তো শত্রুর অভাব নেই, মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেবারও লোকের কমি নেই। ডাকাতের দল তো এখন হাটে মাঠে ঘাটে যেখানে যাবে সেইখানে। আমরা পেটের দায়ে ডাকাত। চৌরঙ্গী বাবার দল—সন্ন্যাসী ডাকাত। রহিম শার দল—রাজ্যের জন্য ডাকাত।

দ্বি-দস্যু। চল্ আর দেরী করা কিছু না, বেশ ক'রে জঙ্গল খুঁজে দেখা যাক্—কাছাকাছি নিশ্চয় আছে—আবার চৌরঙ্গী-বাবার দল, কি পাঠানের দল এসে পড়লে, মুখের শীকার কেড়ে নেবে।

প্র-দস্যু। ঐ একটা কে না এ দিকে আস্‌ছে, চল্, আমরা একটু গা-ঢাকা দি।

এই সময়ে ভগবান্ অংশুমালী ধীরে ধীরে অস্তা-চলের গুহাশায়ী হইলেন। দিবালোক-তটদেশে বাহু পসারিয়া দণ্ডায়মান দানবের ন্যায় অন্ধকারকে দেখিয়া রক্তিমবসন-পরিহিতা সন্ধ্যা-বধূ সভয়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন! অন্ধকার আসিয়া আপনার কৃষ্ণবর্ণ উত্তরীয়াঞ্চলে বসুধার মুখখানি ঢাকিয়া ফেলিল। দস্যুদল অবসর পাইয়া একাকিনী অসহায়া অজিতাকে আক্রমণ করিল। বিপন্না অজিতা পাশবদ্ধ কুরঙ্গীর ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। কয়েক জন শিষ্য সমভিব্যাহারে মহাপুরুষ জঙ্গল-গিরি চৌরঙ্গী সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। রমণীর আর্ত্তনাদ শুনিয়া অবিলম্বেই তিনি আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে তাঁহাকে দেখি-য়াই দস্যুদল অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া বনমধ্যে

পলাইয়া গেল। চৌরঙ্গী অজিতাকে দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়া আশ্রয় দিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

—:*:—

মন্ত্রণা।

পাঠান-সর্দ্দারের ছাউনীতে আজ সকলেই বড় ব্যস্ত। যোদ্ধৃগণ অনন্যকর্ম্মা হইয়া আপন আপন অস্ত্র-শস্ত্র মনোমত করিয়া শাণাইয়া লইতেছেন। সেই শাণিত অস্ত্রে প্রাতঃসূর্য্যের কিরণ প্রতিফলিত হইয়া লক্ষমুখে ঠিকরিয়া পড়িতেছে। যোদ্ধৃগণের মুখে উদার গাম্ভীর্য্য ও অটুট স্থির-সঙ্কল্প, ভীতির লেশ-মাত্রও নাই। উচ্ছৃঙ্খল রণ-তুরঙ্গমসকল যুদ্ধসজ্জায় সুসজ্জিত। কুট্টিম-প্রাঙ্গণে একান্তে উপবেশন করিয়া পাঠান-সর্দ্দার রহিম শা ও হিন্দু তালুকদার শোভা-সিংহ আজ গভীর মন্ত্রণায় মগ্ন।

শোভাসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "রহিম শা! জবরদস্ত খাঁর সৈন্যসংখ্যা মোট কত?"

রহিম শা। দূতমুখে যা শুনলুম, তাতে খুব বেশী ব'লে বোধ হয় না। সুবাদারী সৈন্যের সংখ্যা দশ হাজারের ঊর্দ্ধ নহে। হুগলীর ফৌজদারী সৈন্যের সংখ্যাও দু' হাজারের বেশী নয়। মোট এই বারো হাজার। তার মধ্যে প্রায় তিন হাজার সুবাদারী সৈন্য একেবারে কাজের বাহির। জ্বরের প্রকোপে এবং উদরাময়ের কল্যাণে কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট এবং হাতিয়ারের ভার বহনে অশক্ত!

শোভাসিংহ। তা হ'লে এই যুদ্ধের জন্য আমরা যে সৈন্য সংগ্রহ করেছি, বোধ হয়, তাহাতেই যথেষ্ট।

রহিম শা। আমার ত' তাহাই ধারণা। তবে ইংরাজ সুবাদারের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে, এই যা ভাবনা।

শোভাসিংহ। যোগ না দিয়েই বা ইংরাজ কর্‌বে কি? সুবাদারের অনুগ্রহ ব্যতীত তাহাদের বাঙ্গালার স্বর্ণ-প্রসূ বাণিজ্যের আশা দুঃস্বপ্ন মাত্র। তাই ইচ্ছায় হ'ক, অনিচ্ছায় হ'ক, তাহাদের সুবাদারকে সাহায্য কর্‌তেই হবে। কাপ্তেন নিকল্‌সনের জাহাজ ক'খান এবং ফৌজই বা কত?

রহিম শা। দু'খান মাত্র! তাও রীতিমত যুদ্ধ-জাহাজ নয়। সওদাগরী জাহাজ, দরকার মত মান-ওয়ারে পরিণত হয়। ফৌজ দুশোর বেশী হবে না।

এই সময়ে এক জন দৃঢ়কায় ফিরিঙ্গী সৈনিক পুরুষ সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, বাঙ্গালা সে সময়ে পর্ত্তু-গীজ জলদস্যুগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত। কাপ্তেন গঞ্জালে এই দস্যুদলের অন্যতম নেতা। গঞ্জালের নাম তৎ-কালে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদিগেরও নিকটে অপরিচিত ছিল না। গঞ্জালে আসিয়াই পাঠান-সর্দ্দারকে অভি-বাদন করিয়া কহিলেন, "সর্ডার! হামি টোমার হুকুমনামা পেয়েই রাট্-দিন জাহাজ চেলিয়ে এসেছে। কেনো সর্ডার! এটো জরুরি টলব্ কেনো? বাড্-সার সঙ্গে কিছু বখেড়া বেধিয়েছ বুঝি?"

রহিম শা। আমি বাধাইনি কাপ্তেন সাহেব! তারাই বাধাচ্ছে। আর যখন বাধছেই, তখন আমাদেরও তার জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার।

গঞ্জালে। আরে সর্ডার, হামি টে৷ টোমার টাঁবেডার আছে। আমাকে হুকুম করা মাট্র হামি হাজির আছে। হাজার ফৌজ নিয়ে টোমার পাঁচ-খান জাহাজ দেখো ডরিয়ার বুকে রাজহাঁসকা মাফিক নাচ্‌টে আছে। এখন হুকুম ডাও--আমাকে কি করটে হোবে। হামরা টোমার জন্যে জান ডিটে প্রষ্টুট্।

রহিম শা। ভাই, তোমাদেরই বলে রহিম শার এত বল। সিবষ্টিয়ান্, তুমি আমার সহোদর ভাই।

পরে শোভাসিংহের প্রতি চাহিয়া রহিম শা গঞ্জালেকে কহিলেন, "তোমাকে আর এক জন ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিই। ইনিই স্বনামখ্যাত বীরশ্রেষ্ঠ শোভাসিংহ।"

গঞ্জালে ও শোভাসিংহ পরস্পর অলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন।

রহিমশা কহিলেন, "আমরা সর্ব্বশক্তিমান্ খোদার নামে, তিন সহোদরে মিলিয়া খোদার কার্য্য আরম্ভ করিলাম। দেখিও দয়াময়, আমাদের অভি-লাষ পূর্ণ করিও।"

গঞ্জালে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন সর্ডার! টোমরা জমীনে যুঢ্ঢের কি বণ্ডোবস্ত করিলে?"

রহিম শা কহিলেন, "সে বন্দোবস্ত সব ঠিক। যাও

সাহেব! তুমি ভারী কষ্ট ক'রে এসেছ। যুদ্ধ বোধ হয় কালই বাধবে। তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে থাক গিয়ে।"

গঙ্গালে বিদায় হইলেন। রহিম শা ক্ষণিক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "শোভাসিংহ! খোদা আমাদের সহায়। তা না হ'লে আমি মনেও ভাবিনি যে, এত অল্পসময়ের মধ্যে গঙ্গালে আমাদের সাহায্যে আস্‌তে পারবে।"

শোভাসিংহ কহিলেন, "তা হ'লে রহিম শা! আমরা এখানেই শত্রু-সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষা কর্‌ব, না অগ্রসর হয়ে আক্রমণ কর্‌ব?"

রহিম শা কহিলেন, "সেইটা আমি এখনও স্থির করি নাই, গঙ্গালের জন্য বড উদ্বিগ্ন ছিলাম। আমাদের আশ্রয়স্থান সুতানুটী গোবিন্দপুর কলিকাতা আগে বাঁচান দরকার। গঙ্গালে এসে না পৌঁছুলে তাহা অত্যন্ত কঠিন হ'ত। দরিয়ার ভেতর ইংরাজের জাহাজ থেকে অজস্র গোলাবৃষ্টি হ'ত। আমরা ওধারে সুবাদারের সৈন্যগণকে হারিয়ে দিলেও, আমাদের বড় সাধের আশ্রয়স্থল এই সুতানুটীর বনভূমি হারাতেম।"

শোভাসিংহ বিস্মিতভাবে কহিলেন, "পাঠান-সর্দার, তোমার ন্যায় স্বদেশ-প্রেমিক জগতে দুর্লভ! গঙ্গালের উপস্থিতিতে তোমার প্রধান উদ্বেগ তো দূর হয়েছে! এখন আমাদের দু'জনের মধ্যে কে শত্রুপক্ষের কাহাকে কি ভাবে আক্রমণ কর্‌বে, তাহাই স্থির করা যাক্।"

রহিম শা কহিলেন, "চরমুখে সংবাদ পেয়েছি যে, জবরদস্ত খাঁ সমস্ত ফৌজ নিয়ে আজই চাণকের ছাউনি তুলে দিয়ে কলকাতার দিকে রওনা হবে। আমার বোধ হয় যে, বারাসতের রাস্তা দিয়ে ঘুরে গিয়ে, শত্রুসৈন্যকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ কর্‌লেই ভাল হয়।"

শোভাসিংহ। আচ্ছা রহিম শা! আমিই যৎসামান্য ফৌজ নিয়ে এ কার্য্যে যেতে প্রস্তুত আছি।

রহিম শা। তোমার কত ফৌজ দরকার শোভাসিংহ?

শোভাসিংহ। দু হাজারই যথেষ্ট।

রহিম শা। আচ্ছা, তবে তাই হ'ক। শত্রুপক্ষের রসদ আগে লুটপাট করা চাই।

শোভাসিংহ। তাই হবে, তবে আমি চল্লুম সর্দার!

রহিমশা ও শোভাসিংহ পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন।

রহিম শা কহিলেন, "এস ভাই! যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে যেন এই রকম হাসিমুখে ফিরে এস। শত্রুকে যেন সুতানুটীর মাটীতে পা না দিতে হয়।"

শোভাসিংহ সস্মিতমুখে কহিলেন, "সব বিধাতার ইচ্ছা রহিম শা!'

শোভাসিংহ প্রস্থান করিলেন। পাঠান-সর্দার রহিম শাও ধীরপাদবিক্ষেপে সৈন্যাবাসমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

জবরদস্ত খাঁর শিবিরে।

দস্যু-দলপতি রহিম শা ও শোভাসিংহকে দমনকল্পে বদ্ধ-পরিকর নবাব-পুত্র জবরদস্ত খাঁ সসৈন্যে আসিয়া চাণকের সন্নিকটে ভাগীরথীতীরে ছাউনী স্থাপন করিলেন। হুগলীর ফৌজদার জিয়াদিন খাঁ দস্যুদিগের আবাসভূমি কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বস্থ পথঘাটের বিষয়ে অভিজ্ঞ। সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ, এই জন্য পূর্ব্বেই জিয়াদিন খাঁকে তাঁহার সমগ্র ফৌজদারী ফৌজ লইয়া চাণকের শিবিরে নবাবপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সেই অনুজ্ঞাপত্র প্রাপ্তিমাত্রেই ফৌজদার জিয়াদিন খাঁ সসৈন্যে আসিয়া নবাবপুত্রের চাণকের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছেন।

চাণক ও দস্যুদিগের অবাসস্থান গোবিন্দপুর সুতানুটী ও কলিকাতার জঙ্গল এই উভয়ের মধ্যে ব্যবধান মাত্র—পাঁচ ছয় ক্রোশ। চাণকের শিবিরে বসিয়াই দস্যুদিগের প্রতি আক্রমণের ব্যবস্থা সকল স্থিরীকৃত হইতেছিল।

রজনী দ্বি-প্রহর। পাহারায় নিযুক্ত অল্পসংখ্যক সৈন্য ব্যতীত নবাবপুত্রের প্রকাণ্ড বাহিনীর অপর সৈন্যগণ সকলেই গভীর নিদ্রামগ্ন। এই শিবিরশ্রেণীর অন্যতমটির মধ্যে দুই জন পুরুষ বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে এক জনের বয়স অনুমান পঞ্চবিংশ। দেহ নাতি-স্থূল; ললাট প্রশস্ত; বর্ণ উজ্জ্বল গৌর। ইনিই নবাব-পুত্র

জবরদস্ত খাঁ। অপর পুরুষটির বয়স অনুমান পঞ্চা-শং বর্ষ! দেহ ক্ষীণ, ললাট চিন্তাভারে কুঞ্চিত। ইনিই হুগলীর ফৌজদার—জিয়াদিন খাঁ।

সেই শিবিরের প্রগাঢ় নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নবাব-পুত্র জবরদস্ত খাঁ কহিলেন, "জিয়াদিন খাঁ! রহিম শা ও শোভাসিংহ ক্ষুদ্র দস্যু মাত্র। নিরাশ্রয় নিরবলম্বন প্রজাগণ তাহাদের ভয়ে কম্পিত হইতে পারে, কিন্তু হুগলীর ফৌজদার কিংবা সুবে বাঙ্গাল, বেহার, উড়িষ্যার নবাব ইব্রাহিম খাঁর পুত্র জবরদস্ত খাঁর সামান্য দস্যুভয়ে বিচলিত হওয়া উচিত নয়।

জিয়াদিন খাঁ। নবাবজাদা! আপনি রহিম শা কিংবা শোভাসিংহকে চেনেন না, তাই এ কথা বল্‌ছেন। এই দুই দস্যু-সর্দ্দার মানুষ নয়, তাহারা সয়তান! তাহাদের গায়ে সয়তানের বল। কৌশলে তাহারা সয়তানের চেয়ে বেশী।

জবরদস্ত খাঁ। হউক্! কিন্তু তাহাদের দলে কত লোক আছে? সুশিক্ষিত রণ-কুশল সুবাদারী ও ফৌজদারী ফৌজের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে তাহারা কত-ক্ষণ টিক্‌বে?

জিয়াদিন খাঁ। সম্মুখ-যুদ্ধ যে তাহারা কর্‌বে, তা'র স্থিরতা কি, নবাবজাদা? বিশেষতঃ সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা বিষম জঙ্গলময় স্থান। পথ-ঘাট আমরা কেহই ভালরকম চিনি না। এই দস্যুদলের প্রত্যেকের নিকট সেই সকল বনের প্রতি সঙ্কীর্ণ পথও নখদর্পণের ন্যায় পরিচিত। তাহারা সেই সকল পথে নিরন্তর গমনাগমনে অভ্যস্ত। সুতা-নুটীর পূর্ব্বদিকে ভয়ানক জলাভূমি। সেই সকল জলা অতিক্রম ক'রে আমাদিগের ফৌজ নিয়ে যেতে হবে। জলার ভিতরে নৌকা চল্‌বে না। শাল্‌তিতে ক'রে জলা পার হ'তে হবে। এত শাল্‌তিই বা কোথা হ'তে সংগ্রহ হবে?

জবরদস্ত খাঁ। তা হ'লে কি ফৌজদার সাহেব! আপনি বলেন যে, এতদূর ফৌজ নিয়ে এসে শেষে এই বনের ও জলার ভয়ে দস্যু-দমন সংকল্প ত্যাগ ক'রে যে রাস্তায় এসেছিলাম, আবার সেই রাস্তায় ঢাকায় ফিরে যাবো?

জিয়াদিন খাঁ। ক্ষমা করবেন নবাবজাদা, জিয়া-দিন খাঁ এত ভীরু নয় যে, সে আপনাকে ফৌজ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পরামর্শ দিবে। তবে, নবাবজাদা যে গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছেন, সে সম্বন্ধে গোলাম যতদূর অবগত আছে, তাহা আপনাকে পূর্ব্বে জানানো কর্ত্তব্য বিবেচনা ক'রেই, এ কথা বল্‌ছি।

জবরদস্ত খাঁ। তাহা ভালই করেছ ফৌজদার সাহেব! এবং এ সকল বিষয় পূর্ব্বে জানা উচিত বিবেচনা করেই তোমাকে তলব করা হয়েছে। আচ্ছা! এই জলা পার হয়ে যাওয়ার কি অন্য কোন সুগম রাস্তা নাই?

জিয়াদিন খাঁ। আছে নবাবজাদা! দু-তিনটি সঙ্কীর্ণ পথ যে নাই, তাহা নয়। তবে, সেইগুলি শত্রু-কর্ত্তৃক বিশেষরূপে পরিরক্ষিত হবে। আর সেই পথগুলি এত সঙ্কীর্ণ যে, দুই তিন জনের বেশী লোক পাশাপাশি হয়ে তার উপর দিয়ে যেতে পারে না। গাড়ী তো চল্‌বেই না। রসদ ব'য়ে নিয়ে যাবার কি বন্দোবস্ত কর্‌বেন?

জবরদস্ত খাঁ। রসদ অগত্যা ঘোড়ার পিঠে নিয়ে যেতে হবে।

জিয়াদিন খাঁ। ঘোড়া সেই জলা একেবারেই পার হ'তে পার্‌বে না। পদাতিক সৈন্য ছাড়া আপ-নার অন্য কোন সৈন্যই কাজে আস্‌বে না। গোল-ন্দাজের কামান ও-পারে নিয়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

জবরদস্ত খাঁ। অশ্বারোহী আর গোলন্দাজ সৈন্য না নিয়ে যেতে পার্‌লে কোন্ ভরসায় এই দস্যুদলকে আক্রমণ কর্‌বো?

দুই জনে এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময়ে ভৈরবী বেশধারিণী একটি রমণী আসিয়া একে-বারে তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। রমণীর সুন্দর মুখখানির প্রত্যেক অংশে পৈশাচিক কঠোরতা অঙ্কিত, তাহার ভাষার প্রতি পদাংশ পৈশাচিক ভাবে অনুপ্রাণিত ও পৈশাচিক ছন্দে বদ্ধ। কোন্ এক অদ্বিতীয় শক্তিবলে রমণী তখন নবাবপুত্রের হৃদ-য়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিয়া লইল। রমণী বলিতে লাগিল, "কোন ভয় নাই নবাবপুত্র! কোন ভয় নাই ফৌজদার সাহেব! আমি তোমাদিগকে পথ দেখিয়া নিয়ে যাব। সে পথ আর কেহ জানে না। তোমাদের রসদের গাড়ী, কামানটানা গাড়ী সব সেই রাস্তায় নিয়ে যেতে পার্‌বে। এখনও রওনা হ'লে একেবারে রাতারাতি সুতানুটীর বনের মধ্যে গিয়ে পড়বে।

জবরদস্ত খাঁ। তুমি কে, আওরৎ ?

অজিতা। আমি পিশাচী তোমাদের সহায়তা কর্‌তে সয়তান আমায় পাঠিয়ে দিয়েছে। আমার পরামর্শ শুন্‌লে অতি সহজে দস্যুদের দমন কর্‌তে পার্‌বে নবাবপুত্র ! তাহা না হ'লে, তোমার সমস্ত ফৌজ জলার মধ্যে রেখে যেতে হবে। এক জনকেও ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে না।

জবরদস্ত খাঁ। দস্যুদের দমন হ'লে, তোমার লাভ কি আওরৎ ?

অজিতা। আমার লাভ ? নবাবজাদা ! লাঙ্গুলাবমৃষ্টা সর্পিণী যতক্ষণ না তাহার অপকারকের বুকে দংশন করতে পারে, ততক্ষণ সে আপনার বিষে আপনি জর্জ্জরিত হ'তে থাকে। আমিও তাই, নবাবপুত্র ! জ্বলে গেল ! আমার হৃদয় জ্বলে গেল ! উহুঃ ! অপমানে বুক ফেটে যায়। আমি যাহার করে জীবন-যৌবন সব সমর্পণ কর্‌লুম, সেই পিশাচ কি না আমাকে মজিয়ে, আমাকে কুল-কলঙ্কিনী ক'রে, শেষে পদাঘাতে দূর ক'রে দিলে ! চল—নবাবপুত্র ! চল, আর সময় নাই। বিলম্বে তোমার সমস্ত ফৌজ ধ্বংস হবে। আমি পিশাচী হই—সয়তানী হই—নিশ্চয় জেনো নবাবপুত্র ! তোমাদের অনিষ্ট কর্‌বো না। তেমোদের অনিষ্ট-সাধন কর্‌লে আমার প্রতিশোধ-পিপাসা মিটবে কেন ?

মন্ত্র-পরিচালিতের ন্যায় জবরদস্ত খাঁ জিয়াদিন খাঁকে হুকুম দিলেন, "জিয়াদিন ! এখনই ছাউনী তুলতে আজ্ঞা দাও।"

জিয়াদিন খাঁ সেলাম করিয়া শিবিরের বাহিরে গেলেন। রমণী স্থির অচঞ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সে যেন প্রতিহিংসা মূর্ত্তিমতী ! নবাব-পুত্র সে দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তিনি মনে করিতে লাগিলেন, "এ রমণী কে ? এ কি পাগলিনী !"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

—:•:

বিদায় গ্রহণ।

শিশির-সিঞ্চিত বসোরা গোলাপের মত আমিনার অশ্রুসিক্ত গণ্ডে একটি সুদীর্ঘ প্রেমচুম্বন অঙ্কিত করিয়া রহিম শা কহিতে লাগিলেন, "বীরাঙ্গনা তুমি লো আমিনা ! আমার বীরব্রতে অন্তরায় হইও না। বরারোহে ! তুমি ত' সকলই জান—যত দিন আমার এ ব্রতের পূর্ণ উদ্‌যাপন না হইবে, তত দিন তোমার আমার মধ্যে এই নিষ্ঠুর ব্যবধান আর দূর হইবে না।"

আমিনা। রহিম ! আজি কালি করিয়া দিন গেল, মাস গেল, বর্ষ ফিরিয়া আসিল। আমার এ স্বপ্ন স্বপ্নই রহিয়া গেল। তাও ছিল ভাল। সহস্র সত্যের চেয়ে সেই সুখ-স্বপ্নও লক্ষগুণে ভাল ছিল। আজি বুঝি সেই স্বপ্ন-মরীচিকা সহসা টুটিয়া যায়। তুমি চলিয়া যাইবে, আমি ছিন্ন-তার ভগ্ন বীণাটির মত ভূমিতলে পড়িয়া রহিব। না—না—সখা ! তোমাকে যাইতে দিব না। তোমাকে বাহু-পাশে অটুট বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়া দিব।

রহিম। আমিনা ! আমিনা ! তোমাকে ত' আমি আপন ইচ্ছায় ধরা দিয়াছি। কোন্ কুহকের বলে জানি না, কুহকিনি ! তুমি রহিমকে বশ করিয়াছ !

আমিনা। সে তুমি স্বেচ্ছায় নিজেকে ধরা দিয়াছ বলিয়া। তাহাতে বল আমিনার কি গুণপণা ? শুন হৃদয়-দেবতা ! আমি কত বার মনে ভাবিয়াছি, কত বার আমার মনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তার এত উচ্চ আশা কেন ? আমিনা ত' রহিমের দাসী-যোগ্যাও নহে।

রহিম। কি মহান্, কত উচ্চ, কত গরীয়ান্ প্রেমপূর্ণ হৃদয়খানি তোমার আমিনা ! বোধ হয়, বেহেস্তের সমস্ত সৌন্দর্য্য দিয়া বিধাতা তোমায় গড়িয়াছেন। দুর্ভাগ্য আমার, তাই দুনিয়ার সার-রত্ন লাভ করিয়া যে আদরে তাহা গলায় পরি, তাহারও অবসর নাই। কার্য্যরূপ শিলাযন্ত্রের নিষ্পেষণে বিচূর্ণিত ধূলিকণার মত কোথায় চলিয়া যাইতেছি, তাহার নির্ণয় নাই।

প্রেমিক-প্রেমিকা এইরূপ আলাপনে ব্যস্ত, এমন

সময়ে কুটীরদ্বারে পদশব্দ শুনিয়া, পাঠান-সর্দ্দার সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন, এক জন সৈনিকপুরুষ তাঁহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রহিম ব্যস্তভাবে সেই সৈনিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি ?"

দস্যু। সর্দ্দার, সুবাদারের সৈন্যদল জলার রাস্তা ছেড়ে দিয়ে বনের মধ্যে মধ্যে দিয়ে চলে এসে, একেবারে স্তুতানুটীর উত্তরে সমস্ত সৈন্য জড়ো করেছে। বোধ হয়, ভোর না হ'তে হতেই আমাদের বন ঘেরোয়া কর্‌বে।

রহিম। আশ্চর্য্য ! এই বনের রাস্তা দিয়ে কে তাহাদের পথ চিনিয়ে আন্‌লে ? সইফ খাঁ কোথায় ?

দস্যু। সইফ খাঁ হাজার ফৌজ নিয়ে সুতানুটীর জঙ্গলের মধ্যে আছেন।

রহিম। শোভাসিংহ ?

দস্যু। শোভাসিংহও শত্রুদল জলার রাস্তায় এলো না দেখে সন্দেহ ক'রে ফৌজ নিয়ে বনের রাস্তার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। আপনাকে সংবাদ দিবার জন্য তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন।

পাঠান-সর্দ্দার ঐ সৈনিক পুরুষকে প্রস্থান করিতে আজ্ঞা দিলেন। সৈনিক চলিয়া গেল পর, তিনি আমিনাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া তাহার অপ্রসর ললাট ও নিটোল কপোল হইতে ভ্রমরপংক্তির মত গুচ্ছ গুচ্ছ অলকরাশি সরাইয়া দিয়া পিপাসু চকোরের ন্যায় প্রিয়তমার মুখচন্দ্রিকা পান করিতে করিতে প্রেমরসে অপ্লুত হইয়া কহিলেন, "আমিনা, আসি তবে ! খোদার কাছে প্রার্থনা কর, যেন জয় করিয়া আসিয়া আবার বিজয়োল্লাসে তোমার ললাট চুম্বন কর্‌তে পাই।"

বাষ্পগদ্গদস্বরে আমিনা কহিল, "এস রহিম ! আমার জীবনের ধ্রুবতারা ! দেখ যেন রণরঙ্গে দাসীরে ভুলিয়া থাকিও না।"

পাঠান-সর্দ্দার রহিম শা প্রস্থান করিলেন। আমিনা একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার কপোল বাহিয়া মুক্তাফলের মত দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। একটি বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস তাঁহার হতাশ হৃদয়কে যেন মুহূর্ত্তের জন্য আলোড়িত করিয়া ফেলিল। কিন্তু সে ভাব অধিকক্ষণ রহিল না। যেন কোন তাড়িত-শক্তি আমিনার হৃদয়ের স্তরে স্তরে এবং দেহের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাকে এক নবীন উৎসাহে জাগরিত করিয়া তুলিল। আমিনা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "পুরুষের কর্ত্তব্যের পথে রমণী চিরদিন কণ্টক ! পুরুষ জগতের এই উন্মুক্ত উদার কার্য্যক্ষেত্রমাঝে বাধাহীন বিচরণ করিবে ; নারী তাহার অন্তরায়। তাহার কার্য্য নিরন্তর পুরুষের পায় প্রণয়ের আয়স-শৃঙ্খল পরাইয়া দেওয়া। দয়াময় খোদা ! আমিনার হৃদয়ে বল দাও। যেন অযুত বাধার রাশি চরণে ঠেলিয়া নারী আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে। রমণীর উপরে বিধাতার এই ঘোরতম অভিশাপ ঘুচাইব। পুরুষের কর্ত্তব্যের পথে অন্তরায় না হইয়া, বরং তাহার সহায় হইব। আজি হইতে পুরুষের বেশ ধরিব। তাই বলি, দেখ বিশ্বধাতা, বাহ্যকাঠিন্যের আবরণতল হইতে যেন চির-দৈন্যময় ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয় উঁকি না মারে। রহিম, তুমি আমিনার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা। প্রভু, তোমারেই লক্ষ্য করিয়া জীবন-সাগরে ঝাঁপ দিলাম। দেখ হৃদয়-দেবতা, যেন অন্তহীন পারাবারে কূল পাই।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

--:*:--

মন্ত্র-দীক্ষিতা।

কালীঘাট কালীমন্দিরে এইমাত্র সায়ংসন্ধ্যা ও আরতি সমাপিত হইয়াছে। পল্লী-রমণীগণ আরতির পরে আপন আপন গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। যে মন্দির-প্রাঙ্গণ কিছুক্ষণ মাত্র পূর্ব্বে পল্লী-বালক-বালিকাগণের কলরবে ও শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসরাদির ধ্বনিতে মুখরিত ছিল, এখন তাহা সম্পূর্ণ নীরব। বনস্থলী নীরব। মাঠে, ঘাটে, পল্লীবাটে জন-মানুষের সাড়া-শব্দটি পর্য্যন্ত নাই। কেবল স্থানে স্থানে জীর্ণ কুটীরাভ্যন্তরে ক্ষীণ দীপালোকে কৃষক-দম্পতির স্বভাব-মধুর বিশ্রব্ধ প্রেমালাপের অস্ফুট শব্দ ও বন-মধ্যে কর্ণবধিরকারী ঝিল্লীরব ব্যতীত প্রাণি-সত্তার অন্যবিধ কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হইতেছিল না। কেবল মন্দির-প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে সুচিত্র অজিনাসনে উপবেশন করিয়া ছিলেন—এক জন গৈরিক-বেশধারী সন্ন্যাসী। তাহার সম্মুখে, ভূতলে উপবিষ্ট ছিল গৈরিক বসন-পরিহিতা একটি রমণী। সন্ন্যাসীর সম্মুখে তালপত্রে লিখিত শাস্ত্রগ্রন্থ। রমণীর দৃষ্টি

ভূতলবদ্ধ। সন্ন্যাসী অধ্যয়ন সমাপন করিলেন। রমণী সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কেন পিতা, কেন তুমি আমাকে দস্যু-হস্ত হইতে রক্ষা করিলে ? কেন আমার জীবন বাঁচাইলে ? ভগবন্, আর এই দুর্ভর জীবনের ভার বহিতে পারি না। বন্ধনমুক্ত বিহগীরে কেন পিতা ! আবার তুমি সংসার-পিঞ্জরে আনিয়া বদ্ধ করিলে ?"

জলদ-গম্ভীরস্বরে চৌরঙ্গী উত্তর করিলেন, "হায়, মাতা ! বহুকাল তপস্যার ফলে যে জীবনলাভ করিয়াছ, আশী-লক্ষ দেহ ভ্রমণ করিয়া বহুপুণ্যে যে নব-আত্মা ধারণ করিয়াছ, তাহা কি বিধাতা অবহেলায় বিসর্জ্জন দিতে দিয়াছেন ?"

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অজিতা কহিলেন, "আমি অভাগিনী ! আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ !"

ঈষৎ হাসিয়া চৌরঙ্গী কহিলেন, "আরে অবোধ বালিকা ! ভাবিস্ কি তোর ইচ্ছা লইয়া জগৎ চালিত হইবে ? জন্মমাত্রে বিধাতা তোর ললাটফলকে যে ভাগ্য রেখা অঙ্কিত করিয়াছে, সে লিখন তুই কোন্ বলে মুছিয়া ফেলিয়া দিবি বল্ দেখি ?"

অস্ফুটস্বরে অজিতা কহিল, "আত্মহত্যা !"

চৌরঙ্গী বিস্ফারিত-নেত্রে অজিতার পানে চাহিলেন। দেখিলেন, রমণীর মুখে তীব্র নৈরাশ্যের চিহ্ন। চৌরঙ্গী কহিলেন, "মা ! আত্মহত্যা সব চেয়ে গুরুতর পাপ। তাহার ফল—মরণের পরে অনন্ত নরক !"

অজিতা উত্তর করিল, "তাহাও ভাল ! পিতা, এ জগতে সবাকার ঘৃণ্য হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা, অনন্ত—অনন্তকাল নরকভোগও লক্ষগুণে ভাল। বাঁচিয়া থাকিয়া, লাঞ্ছনার, নিরাশার তীব্র হুতাসনে তিল তিল করিয়া দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা, নরকের লেলিহান নীল অগ্নিশিখা লক্ষগুণে ভাল।"

চৌরঙ্গী কহিলেন, "বৎসে ! এ জগতে কামনাই নরক। মাতা, একটিবার কামনার রাশি বিসর্জ্জিয়া, আত্মস্বার্থ ভুলিয়া গিয়া, ভবানীর পদে আত্মসমর্পণ করিয়া দেখ্ দেখি, তোর সব দুঃখ দূরে যাইবে। এই দুঃখময় সংসার তখন স্বর্গীয় সুষমাময় নন্দন কাননের ন্যায় বোধ হইবে।"

অজিতা কহিল, "পিতা ! আমি অন্ধ - জ্ঞানচক্ষু-হীন। বল পিতা, কে আমায় কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দিবে ?"

চৌরঙ্গী কহিলেন, "দেবতার কাজে, দেবতা নিজেই সহায়।"

অজিতা উত্তর করিল, "পিতা ! অনাথা, পতিতা কুলকলঙ্কিনী, অভাগিনী আমি। আমা হইতে উচ্চ-কার্য্য সাধনার সম্ভাবনা কি ?"

চৌরঙ্গী কহিলেন, "তোমা হইতে উচ্চকার্য্য সাধনার সম্ভাবনা কি ? তুমি রমণী ! আদ্যাশক্তি চণ্ডিকার অংশস্বরূপণী। সেই মহাশক্তিই পাংশুজালে আচ্ছাদিত বহ্নিকণার ন্যায় তোমার হৃদয়কোণে লুক্কায়িত আছে। গুরুদত্ত মন্ত্র-স্পর্শে এখনি তাহা জাগিয়া উঠিবে। ওই দেখ মাত', মহৎ কর্ত্তব্যরাশি তোমার সম্মুখে, তোমার উপরে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষণের ভার।"

অজিতা কহিলেন, "অন্তর্য্যামী তুমি পিতা, তুমি জান, তনয়ার হৃদয়ে কোন্ নিদারণ ব্যথা নিরন্তর জাগিতেছে।"

চৌরঙ্গী মর্ম্মাহতা অজিতাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "এ কি মাতা মানুষের হাত ? মানুষ এ জগতে নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে। ওই যে জাহ্নবী-বক্ষে জীর্ণ তরীখানি স্রোতোবেগে ভাসিয়া যাইতেছে, জান কি তুমি তাহার বিরাম কোথায় ! জান কি তুমি কোথায় গিয়া সে কূল পাইবে ? যতক্ষণ আকর্ষণ অটুট রহিবে, ততক্ষণ সে অবাধে দূর দুরান্তরে চলিয়া যাইবে। সেইরূপ জানিও, পার্থিব কামনা-স্রোতে শক্তিহীন জীব ভাসিয়া যাইতেছে। কামনা ত্যাগ করিলে তবে তো নিত্যধন লাভ করিতে পারিবে।"

অজিতা কহিলেন, "দাও পিতা, পথহারা তনয়ারে কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দাও।"

চৌরঙ্গী কহিলেন, "আত্মস্বার্থ বলিদান—সাধনার মূলমন্ত্র। ভাবিয়া দেখ, তাহা পারিবে তো ?"

অজিতা উত্তর করিলেন, "গুরুদেব ! তোমার অনুগ্রহ হইলে অবশ্যই পারিব।"

অজিতার এই প্রতিজ্ঞা যেন মন্দিরমধ্যে বিশ্বজননীর কানে গেল। মায়ের অধরপ্রান্তে আনন্দের হাসিরেখা উছলিয়া পড়িল। সেই হাসির ছটায় মুহূর্ত্তের তরে, সেই অন্ধকার গহ্বর আলোকিত হইয়া উঠিল। অপর কেহই তাহা দেখিল না, দেখিলেন কেবল মহাযোগী জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গী। আশায়, আশ্বাসে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

কৌশলে।

ভাগীরথীবক্ষ ঈষৎ রক্তিম ছটায় আলোকিত করিয়া পরিণত সূর্য্যের শেষ রশ্মি কয়েকটি পতিত হইয়াছে। যেন কোন নিপুণ শিল্পী স্ফটিকের উপরে পদ্মরাগ বসাইয়া রাখিয়াছে। ভাগীরথী কূলে কূলে পূর্ণা। তাহার ঢল ঢল লাবণ্যরাশি উছলিয়া পড়িতেছে। তাহার উভয় কূলে নিবিড় শ্যামল সুষমা। জাহ্নবীতীরে আজি বহুলোকের সমাগম। যে গঙ্গায় কেবল মৎস্যজীবীদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিঙ্গি এবং পণ্যপরিপূর্ণ বড় বড় নৌকা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার জলযানই প্রায়শঃ দেখা যাইত না. সেই গঙ্গাবক্ষে আজ পর্ত্তুগীজ ও ইংরাজের যুদ্ধ-জাহাজ সকল আপন আপন জাতীয় চিহ্ন-লাঞ্ছিত পতাকামালায় সুসজ্জিত হইয়া রাজহংসীর মত সগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া ভাসিতেছে। কৃষক-রমণীগণ কক্ষে জলপূর্ণ কলসী লইয়া অনিমিষনেত্রে সেই অপূর্ব্বদৃষ্ট দৃশ্য দেখিতেছে। বালক-বালিকাগণ অবাক্ হইয়া কৌতুক দেখিতেছে। যুবক-যুবতীগণ এই দৃশ্য লইয়া ব্যঙ্গ করিতেছে। বৃদ্ধগণ এক অজানিত অরিষ্টপাতের আশঙ্কায় ভীত হইতেছে।

একখানি ক্ষুদ্র তরণী কূলে লাগান রহিয়াছে। সন্নিকটে তটে দাঁড়াইয়া রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ-পরিহিত তিন জন ইংরাজ সৈনিক-পুরুষ কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে, এবং এক এক বার পথের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে।

এক জন সৈনিক-পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, "বল্‌তে পার, বিল্! আজ কাদের সঙ্গে আমাদের লড়াই কর্‌তে হবে?"

দ্বিতীয় সৈনিকপুরুষ উত্তর করিল, "জানি বৈ কি, জ্যাক! নিশ্চয় জানি। জলের বেঁড়ে-ইঁদুর পর্ট্টুগীজদের সঙ্গে।"

তৃতীয় সৈনিক পুরুষ কহিল, "বিল্ কিছু জানে না। আমরা নবাবের সঙ্গে লড়াই কর্‌তে যাচ্ছি।"

প্র-সৈ। নবাব একটি আস্ত জানোয়ার, আমাদের তোপের একটা আওয়াজ শুন্‌লেই ভিরমি যাবে।

দ্বি-সৈ। তা ঠিক জ্যাক্! এই যুদ্ধে আমরাই নিশ্চয় জয়ী হব।

তৃ-সৈ। তা হ'লে আর দেরী কেন? লড়াই বাধবার আগেই এস আমরা আমাদের বিজয়-আনন্দ সুরু করি। কি বল, বিল্?

প্র-সৈ। ছাপাছাপি ভরা গ্লাস মদ সব সময়ই আদরে চুম্বন কর্‌বার জিনিস। তা জিৎই হ'ক, আর হারই হ'ক!

তৃ-সৈ। ঠিক বলেছ বন্ধু! আর মিছে সময় নষ্ট করার দরকার নাই। বের ক'রে ফেল বোতল।

সৈনিক পুরুষগণ মহোল্লাসে মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিল। এমন সময়ে এক জন বৈষ্ণবী একটি গীত গাহিতে গাহিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বৈষ্ণবী গাহিতেছিল:—

(গীত)

জয় জয় জননি! প্রণমি জনমভূমি।
অবলা বলিয়া মা গো! নিদয়া কি হবে তুমি?
রমণী বলিয়া বুঝি মোদের বাহুতে নাহিক বল।
এ ছার জীবনে তবে, বল কিবা আছে ফল?
তাই—তোমারি কাজে জীবন সঁপিতে
আমি জীবন করেছি পণ।
তোমার করুণাবলে জিনিব জিনিব রণ!
জয় জয় জননি! প্রণমি জনমভূমি!

বৈষ্ণবী যুবতী। পরম রূপলাবণ্যবতী। গৈরিক-বসনে তাহার সুচারু দেহবল্লী আচ্ছাদিত। তাহার স্কন্ধে বিলম্বিত ভিক্ষার ঝুলি। তাহার হস্তে একটি একতারা। বৈষ্ণবীর সঙ্গীতধ্বনি সান্ধ্য গগনে পাপিয়ার সঙ্গীতের মত স্তরে স্তরে উঠিয়া ঊর্দ্ধে বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল। মদিরাপানে ঈষল্লুপ্তসংজ্ঞ ইংরাজ সৈনিকগণের কর্ণকুহরে সেই গীতধ্বনি যেন অমৃতধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে এক জন অতিরিক্ত রসাবেশে নেত্র নিমীলিত করিয়া কহিল, "আহা কি মিঠে। ক্যা বড়িয়া।"

দ্বি সৈন্য। নিশ্চয়! বড় সুন্দর! বৈষ্ণবীকে এ ধারে ডাক। ওর গান শুনা যাক্।

তৃ সৈন্য। ঠিক বলেছ বন্ধু! ওকে ডেকে একপাত্র মদ দাও।

এক জন সৈনিক একটি পাত্রে সুরা পরিপূর্ণ করিয়া বৈষ্ণবীর দিকে অগ্রসর হইল।

ঠিক সেই সময়ে পর্ত্তুগীজ যুদ্ধ-জাহাজ হইতে

"গ্রুম্ গ্রুম্" শব্দে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। সৈনিক পুরুষগণ সেই শব্দে চমকিয়া উঠিল। যাহার হস্তে সুরাপাত্র ছিল, তাহার হস্ত হইতে পাত্রটি স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। সে বলিয়া উঠিল, "শত্রুগণ এরই মধ্যে লড়াই আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। চল আমরা তাড়াতাড়ি গিয়া কাপ্তেনকে খবর দিই।"

সৈন্যগণ তাহাদের কাপ্তেনকে এই আকস্মিক বিপৎপাতের বার্ত্তা জানাইতে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গ্রামের দিকে গেল। আমিনাও চকিতে বৈষ্ণবী-বেশ উন্মোচন করিয়া জাহ্নবী-গর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। গৈরিক-বসন, একতারা প্রভৃতি সব স্রোতে ভাসিয়া গেল। বৈষ্ণবীর বহিরাবরণ উন্মোচিত হইয়া, সহসা পুরুষ-বেশী আমিনা আবির্ভূত হইল। আমিনা এক লম্ফে যাইয়া সেই ক্ষুদ্র তরণীখানির উপরে উঠিয়া দাঁড় ধরিয়া বসিল। এমন সময়ে এক জন সশস্ত্র ইংরাজ সৈনিক-পুরুষ ক্ষিপ্তের ন্যায় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তটসংলগ্ন সেই ক্ষুদ্র তরণীখানি দেখিয়া, সে যেন একটু আশ্বস্ত হইল। কর্ণধারকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, তাহাকে কোন প্রশ্ন করিবার অবসরমাত্র না দিয়া, সে এক লম্ফে নৌকার উপরে উঠিয়া বসিয়াই বলিল, "জাহাজ পৌঁছাও।" এই সৈনিক পুরুষই ইংরাজ নৌ-সমরবাহিনীর নায়ক —কাপ্তেন নিকল্‌সন্।

আমিনাও সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া নৌকা খুলিয়া দিলেন। ভাঁটার টানে নৌকা তীরবেগে ছুটিয়া পর্ত্তুগীজ নৌ-বাহিনীর মধ্যে গিয়া পড়িল। বিনা যুদ্ধে, বিনা আয়াসে কাপ্তেন নিকল্‌সন্ শত্রু-হস্তে বন্দী হইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

— :*: —

মীরার চিন্তা।

বর্দ্ধমান-অধিপতি রাজা কৃষ্ণরাম মোগল সম্রাট্ আরংজীবের পরমবন্ধু এবং বাঙ্গালার তৎকালীন ভূস্বামিগণের মধ্যে সম্পদে ও শক্তিতে অন্য ভূস্বামীদিগের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহেন। বিশেষ সম্রাটের অনুগৃহীত বলিয়া মুসলমান সুবাদার ও ফৌজদারগণের নিকটও তাঁহার প্রতিপত্তি অসামান্য।

মীরা বর্দ্ধমানাধিপতি কৃষ্ণরামের একমাত্র কন্যা। শৈশবে মাতৃহীনা, সেই জন্য মীরা পিতার অত্যধিক আদর ও সোহাগে লালিতা। স্ফুটনোন্মুখী কুন্দ কলিকার ন্যায়, তৃতীয়ার শশাঙ্ক-লেখার ন্যায় কিশোরী মীরা আপন স্নিগ্ধোজ্জ্বল রূপরাশি ছড়াইয়া সমস্ত রাজপুরীটিকে হাস্যময় করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। মীরার বিবাহের বয়স হইয়াছে। কিন্তু বৃদ্ধ কৃষ্ণরাম মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার নয়নপুত্তলী কন্যাকে চক্ষের অন্তরাল করিতে অনিচ্ছুক; তাই পিতা কন্যার বিবাহ-সম্পর্কে ততদূর আগ্রহবান্ নহেন। কিন্তু রত্ন মানুষকে অন্বেষণ করে না; মানুষই তাহা খুঁজিয়া লয়। নানা দেশের রাজন্যগণ ও ভূস্বামিবর্গ স্বর্ণকমলিনী মীরার পাণিগ্রহণাকাঙ্ক্ষায় অবস্থানুরূপ ঐশ্বর্য্যের ডালি লইয়া অর্থীর বেশে বর্দ্ধমানরাজ-সমীপে আপনাপন প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ কৃষ্ণরাম কাহাকেও নিরাশ করিলেন না, বিশেষ আশাও কাহাকে দিলেন না। কন্যার এখনও বিবাহযোগ্য বয়স হয় নাই, এই হেতুবাদেই প্রার্থিগণ নীরব রহিল। চেতোবরদার তালুকদার দস্যু-দলপতি শোভাসিংহ, মীরার পাণিপ্রার্থিগণের অন্যতম ছিল।

বর্দ্ধমান রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলের উদ্যান-বাটিকায় একটি লতাকুঞ্জে একান্তে বসিয়া রাজকন্যা মীরা কি চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় এক জন সখী আসিয়া কহিল, 'সখি! শুনিলাম, দুষ্ট শোভা-সিংহ তোমার করপ্রার্থী হইয়া মহারাজ-সকাশে দূত প্রেরণ করিয়াছে।"

মীরা এই নিদারুণ সংবাদে চমকিত হইয়া উঠিলেন। শোভাসিংহের চরিত্র তৎকালে বঙ্গভূমে কাহারও নিকট অজ্ঞাত ছিল না।

মীরা কহিলেন, "সখি! নরপশু শোভাসিংহ যে মুহূর্ত্তে আমার গলে বিবাহের মাঙ্গলিক মালা পরাইয়া দিবে, সেই মুহূর্ত্তে যেন সেই কুসুম-মালিকা তীক্ষ্ণ বিষ আশীবিষ হইয়া আমার হৃদয়ে দংশন করে।"

সখী কহিল, "শুনিলাম, মহারাজ নাকি দূতকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছেন।"

মীরা আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, "তাহার ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিফলই হইয়াছে।"

ভীতিজড়িত কণ্ঠে সখী কহিল, "রাজবালা,

শুনিতে পাই, শোভাসিংহ দস্যুদলপতি, সে নাকি দেবতা কিংবা মনুষ্য কাহাকেও ভয় করে না। মোগলসম্রাট্ পর্য্যন্ত নাকি তাহার ভয়ে সর্ব্বদা বিকম্পিত। তাই ভয় হয় সখি! এই প্রত্যাখ্যানে শেষে বা কি অনর্থ ঘটে।"

গর্ব্বভরে ঈষৎ গ্রীবা উন্নত করিয়া মীরা কহিলেন, "রাজা কৃষ্ণরাম আত্মরক্ষায় অসমর্থ নহেন। হীনবীর্য্য জম্বুকের ভয়ে পিতা আমার তিলমাত্রও বিচলিত নহেন।"

সখী কহিল, "পাঠান-সর্দ্দার রহিম শা শুনিয়াছি শোভাসিংহের সহায়।"

মীরা কহিলেন, "তুমি ভুল শুনিয়াছ। রহিম শা দুর্ব্বলের বল। তাঁহার চরিত্র দেবতার ন্যায়। পাঠান-সর্দ্দার কখনও অধর্ম্মের সহায়তা করে না।"

সখী। কবে এই দুষ্ট দস্যু শোভাসিংহের দমন হইবে? কবে বঙ্গভূমি এই দুষ্ট দস্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে?

মীরা। সখি! তার আর বহুদিন বিলম্ব নাই। দুষ্ট দস্যু শোভাসিংহকে দমন করিবার জন্য শাহাজাদা আজিমুশ্বান চতুরঙ্গ দলে আসিতেছে।

সখী। শুনিলাম, এক জন অমিতবিক্রমশালী ক্ষত্রিয় রাজাও শাহজাদার সহকারী সেনাপতিরূপে আসিতেছেন। শুনিলাম, তিনি বর্দ্ধমান রাজপুরেই অতিথি হইবেন।

মীরা। তাই বুঝি এত উৎসবের আয়োজন?

সখী। শুধু তাই নহে; আরও কারণ আছে।

মীরা। আরও কি কারণ সখি?

সখী। সখি! প্রস্ফুটিত মীরা-ফুল নিজ বক্ষের সম্পুটে অফুরন্ত মকরন্দ লয়ে বিজনে ফুটিয়া কি লো বিজনেই ঝরিয়া যাইবে? মর-জগতের কেহই কি সেই লাবণ্য সম্পদ্ দেখিতে পাইবে না?

মীরা। সখি! দানবের কর্কশ স্পর্শে বৃন্তচ্যুত হওয়ার চেয়ে, তাহাই ভাল। ক্ষুদ্র বনফুল বিজনে ফুটিয়াছি, বিজনেই ঝরিয়া যাইব।

সখী অতিমাত্র সোহাগে মীরার সুগঠন চিবুকখানি ধরিয়া কহিল, "দেব অর্চ্চনার তরে জন্ম কুসুমের। ধরণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলে, তুমি শোভাময়ী রমণী-কুসুম।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

—:*:—

কুটীর-সম্মুখে।

প্রিয়া-সন্দর্শন-লালসায় অতিমাত্র ব্যাকুল-হৃদয়ে পাঠান-সর্দ্দার রহিম শা সুতানুটীর একটি সঙ্কীর্ণ সুপরিচিত বনপথ বাহিয়া উন্মত্তের ন্যায় আমিনার কুটীরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। একসঙ্গে সহস্র আশা, সহস্র আকাঙ্ক্ষা প্লাবনবেগে তাঁহার হৃদয়তটে আঘাত করিতে লাগিল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! রণরঙ্গে এ কি উন্মত্ততা, কি উদ্‌ভ্রান্ত বিহ্বলতা! প্রতিশোধ-পিপাসায় হৃদয় হইতে সুকুমার বৃত্তিগুলিকে নির্ব্বাসিত করিয়াছি। এখন অরাতিশোণিত-সিক্ত পূতিগন্ধময় সমরাঙ্গন, আমার কাছে মনে হয় যেন দেবতার উপভোগ্য বিলাস-কানন। অস্ত্রে অস্ত্রে বর্ম্মে বর্ম্মে দৃঢ় ঝন্‌ঝনি, নূপুর-নিক্কণ হইতে সুমধুর বলিয়া মনে হয়। আঁখি পালটিতে পল সম দীর্ঘ দিন গত হয়। মুগ্ধ স্বপ্নে স্বপ্নের মত ত্রিযামা কাটিয়া যায়। আঁখি পাকালিয়া সম্মুখে দেখি—সুবিস্তার কার্য্যক্ষেত্র অবকাশ-হীনা অবিচ্ছিন্ন ব্যস্ততার অনন্ত প্রসার। তার মাঝে কেবল ওই শান্তি-স্বরূপিণী! বিদ্যুৎস্ফুরিত-সম আমার হৃদয়ের পটে চকিতে ফুটিয়া উঠে; ক্ষণিকের তরে সুপ্ত স্মৃতি জাগাইয়া দিয়া আবার সেই কল্পনা-প্রতিমা বিস্মৃতির কুহেলিকামাঝে ডুবিয়া যায়। এক একবার মনে হয় যে, আর কেন? এই অসার কার্য্যরাশির শিরে পদাঘাত করিয়া যেথা আমার প্রণয়ের প্রস্ফুট কলিকা বালিকা আমিনা অনিমিখে রহিমের পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছে, সেথায় ছুটিয়া যাই। পরক্ষণেই আবার জ্বলন্ত জিঘাংসাবৃত্তি যেন ইঙ্গিতে আমার হৃদয়ের ভাষা বুঝিয়া লয়, যেন বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহে, 'পাঠান-সর্দ্দার! ভুলিলে কি প্রতিজ্ঞা তোমার?'

"না- না—সুধু একবার মাত্র দেখিয়া যাইব; একবার শান্তিস্বরূপিণী আমিনাকে হৃদয়ে ধরিয়া হৃদয়ের তৃষ্ণা মিটাইব। তার পরে ফিরিয়া যাব। কর্ত্তব্য পালন করিতে ফিরিয়া যাব। প্রতিহিংসানলে হৃদয়-শোণিত আহুতি অর্পিতে আবার সেই সমর-ক্ষেত্রে ফিরিয়া যাব।"

ভাবিতে ভাবিতে রহিম শা আমিনার কুটীরদ্বারে

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, কুটীরের দ্বার অভ্যন্তর হইতে অর্গলবদ্ধ। দ্বারে করাঘাত করিয়া রহিম শা ডাকিলেন,"বরাননে আইস, দেখ আসিয়া, তোমার দুয়ারে অতিথি সমাগত।" রহিম তখনও জানেন না যে, পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পাখী উড়িয়া গিয়াছে। রহিমের চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র আমিনার মাতা শশব্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া চীৎকারপূর্ব্বক ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কহিলেন, "রহিম! রহিম! এত দিন পরে কি আমাদের মনে পড়িয়াছে? আজ কাহাকে দেখিতে আসিয়াছ রহিম? আমিনাকে? আমার আমিনা কি আর আছে? দুষ্ট কুঠিয়াল আমাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া হৃদয়ের ধন আমিনাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। রহিম, আর কি তাহাকে ফিরিয়া পাইবে? রহিম! তুমি শুনিয়াছি বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর। আনিয়া দাও বৎস! নিষ্ঠুর দস্যুর হাত হইতে আমার আমিনা-রত্নকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া আমায় ফিরাইয়া দাও রহিম!"

রহিম বুঝিলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে কি অনর্থ সংঘটিত হইয়াছে। ক্রোধে কর্ম্মবীর রহিম শার নাসাগ্র কম্পিত হইতে লাগিল, ললাটের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল। রহিম বলিলেন, "কি বলিলে মা! আমিনা নাই? দুষ্ট ওলন্দাজ কুঠিয়াল আমি-নাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে? নরাধম! সর্পের বিবরে হাত দিতে সাহস করিয়াছে। পাঠান-সর্দ্দার রহিম শার অনুপস্থিতির অবসর পাইয়া, শৃগালের ন্যায় অতর্কিতভাবে আসিয়া তাহার হৃদয়-রত্ন হরণ করি-য়াছে। কাল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সুতানুটীর ওলন্দাজ কুঠীর প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ড চূর্ণ করিয়া ভাগীরথীবক্ষে নিক্ষেপ করিব। দুষ্ট কুঠিয়াল যদি আমিনাকে দুর্ভেদ্য লৌহকক্ষের মধ্যে লুক্কায়িত রাখে, তাহা হইলেও, রহিম শার হস্তে তাহার পরিত্রাণ নাই। খড়্গাঘাতে তাহার হৃদয় দ্বিখণ্ডিত করিয়া, সেই রক্ত-মাখা হাতে গিয়া আমিনাকে উদ্ধার করিয়া আনিব।"

কন্যাশোকে মুহ্যমানা আমিনার মাতা ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রহিম উন্মত্তের ন্যায় কুটীর হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার মুখে নিরাশা, বৈরনির্য্যাতন-সঙ্কল্প ও স্থিরপ্রতিজ্ঞার চিহ্ন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

নবাবজাদী জুলিখা।

প্রাচীন ঢাকা নগরী বাঙ্গালার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর রাজধানী। আধুনিক জরাজীর্ণ ঢাকা তখন পূর্ণ যৌবন-সম্পৎ-বিলসিতা বিলাসিনীর ন্যায় সৌন্দর্য্য-গৌরব-বৈভব ও সমৃদ্ধিতে অতুলনীয়া। বুড়ী-গঙ্গার তীরে নবাব ইব্রাহিম খাঁর প্রাসাদ। প্রাসাদের পুষ্পোদ্যানে নানাবর্ণের নানাজাতীয় পুষ্পসম্ভার-সুর-ভিত লতামণ্ডপে মর্ম্মর-বিনির্ম্মিত আসনে একান্তে বসিয়া আছেন—নবাবজাদী জুলিখা। সুনীল আকাশতলে ত্রয়োদশীর চাঁদ হাসিতেছে। লতা-মণ্ডপের স্নিগ্ধ শ্যামল আচ্ছাদনতলে জুলিখাও ত্রয়ো-দশীর চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। জুলিখা একটি সেতার বাজাইয়া, সেই সুরে সুর মিলাইয়া গাহিতেছিলেন,—

"বঁধুয়া হিয়া পর আওরে
মিঠি মিঠি হাসয়ি মৃদু মৃদু ভাষয়ি
মোর মুখপর চাওরে।
যুগ যুগ সম কত দিবস
শ্যাম তু আওলি না
তুঝ মুখ চাহয়ি শত যুগ ভর দুখ
নিমিখে হবে অবসান।
এক হাসি তুঝ দূর হয়ব যে
সকল মান অভিমান।"

সেতার রাখিয়া দিয়া, জুলিখা বক্ষঃস্থলের বস্ত্রাব-রণের অভ্যন্তর হইতে একখানি আলেখ্য বাহির করিয়া চন্দ্রালোকে অনিমেষনয়নে সেই চিত্রখানি দেখিতে লাগিলেন। অতিমাত্র সোহাগে সেই চিত্র-খানিকে বুকে ধরিয়া জুলিখা কহিলেন, "হৃদয়ের কোণে লুকাইয়া রাখিয়া দিব তোমারে আলেখ্য! হৃদয়ের ভাষা মোর বুঝিবে বলিয়া। শুনিয়াছি, প্রণ-য়ের সঞ্জীবনী-শক্তির স্পর্শে প্রাণময় হয় জড়ের হৃদয়। বুঝিতে পার কি তুমি, হে জড় আলেখ্য! কার প্রেমপূর্ণ মূর্ত্তি হৃদয়ের অন্তস্তলে মোর জাগিছে সতত, পূর্ণ প্রতিভায়? হায় জান যদি! তবে তোমার পায়ে ধরি; বলিয়া দাও আমায়, কোথা গেলে আমি আমার হৃদয়রাজ্যেশ্বরের দেখা পাইব?"

বালিকার আবেগরুদ্ধ কম্পিত কাতর কণ্ঠে করুণ প্রার্থনা অন্য কেহ শুনিতে পাইল না। শুনিল কেবল—সেই জড় আলেখ্য, সুষুপ্তা প্রকৃতি, আকাশে নিদ্রালস চন্দ্রমা।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

সুতাহুটীর বনমধ্যে রহিম শার কুটীরের প্রাঙ্গণে।

পাঠান-সর্দার একাকী প্রাঙ্গণে পাদচারণা করিতেছেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় কখনও বা ভূতলবদ্ধ, কখনও বা আকাশতললগ্ন, হৃদয় গুরু চিন্তাভারাক্রান্ত। একটি বুকভাঙ্গা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া রহিম শা বলিতে লাগিলেন, "এ কি, নিদ্রা কিংবা জাগরণ —কিছুই ত বুঝিতে পারি না! তারি ছবি রাতদিন হৃদয়ে নেহারি। পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পাখী কোন্ মুক্ত নীলাকাশে পলায়েছে! আর কি সে ফিরিয়া আসিবে? যদি চ'লে গেল নিরমমা, কেন তবে রহিমের হৃদয় হইতে সে তাহার সোহাগের স্মৃতিগুলি উৎপাটিত ক'রে নিয়ে গেল না?"

অবসন্নভাবে রহিম কুটীরের সোপানে উপবেশন করিলেন। তাঁহার শূন্য-দৃষ্টি আকাশতলে লগ্ন। রহিম শা কহিতে লাগিলেন, "অয়ি ছলাময়ি! রহিমেরে ছাড়িয়া গেলে, তবু তোমার ছলা মিটিল না! কভু বা জ্যোতির্ম্ময়ী নারীরূপে, কখন বা পুরুষের বেশে রহিমের পাশে আসিয়া দাঁড়াও। তোমায় ধরি ধরি মনে করি, ধরিতে পারি না। ওলো মায়াবিনি! তুই দূরে সরিয়া পালাস্! যাও তবে নারী, কর পলায়ন, জগতেরে উল্লঙ্ঘিয়া, জগতেরে বহু দূরে বহু পাছে ফেলিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে বিশ্বতটদেশে ছুটিয়া যাও নারী! কেবল নগ্ন বিশ্বপটে আপনার ছায়াখানি আঁকিয়া রাখিয়া যাও। খোদা! অন্তর্য্যামী তুমি। জান তুমি রহিমের একমাত্র অপরাধ তারে ভালবাসা। তাহারি তরে আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়াছিলাম, বংশপরম্পরাগত প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। শেষে সেও চ'লে গেল! তবে আর কেন? দাও খোদা! আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান আমায় ফিরাইয়া দাও। আমার বীর-ধর্ম্ম আমায় ফিরাইয়া দাও। আমি উলঙ্গ কৃপাণ করে সমরঅঙ্গনে ছুটিয়া যাই। কম্পিত স্তম্ভিত বিশ্ব পাঠানের হৃদয়ের সুকঠোর ব্রত-উদ্‌যাপন কেমন, তাহা চাহিয়া দেখুক।"

সহসা শোভাসিংহের আগমনে রহিমের চিন্তাস্রোত বাধাপ্রাপ্ত হইল। যথারীতি অভিবাদন-প্রত্যভিবাদনানন্তর শোভাসিংহ কহিল, "সর্দ্দার! আমিনার সন্ধানের জন্য চারিদিকে অশ্বারোহী পাঠাইয়াছি।"

রহিম শা। শোভাসিংহ! ফিরাও ফিরাও তাহাদের। অশ্বারোহী তাহার সন্ধান কোথায় পাইবে? বন্দীকে মুক্ত করিয়া শৃঙ্খল চলিয়া গিয়াছে। আর কেন তাহার সন্ধানে ঘুরিয়া মরি? আজি মুক্তি, আজি আমার জাগরণ। শোভাসিংহ, চতুরঙ্গবাহিনী সাজাইতে আজ্ঞা দাও। উন্মুক্ত কৃপাণ-করে এখনই রণাঙ্গনে প্রবেশ করিব। মোগলের উষ্ণরক্তে রণস্থল কর্দ্দমিত হইবে!

এক জন দস্যু আসিয়া সংবাদ দিল।

দস্যু। সর্দ্দার! দু-হাজার ফৌজ নিয়ে বাদশাহের হিন্দু-সেনাপতি অজিতসিংহ বর্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বর্দ্ধমানের পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে এসে ছাউনি ফেলেছে। বোধ হয়, দু'এক দিন সেখানে বিশ্রাম ক'রেই বর্দ্ধমানের দিকে রওনা হবে।

দস্যু প্রস্থান করিল। রহিম শা শোভাসিংহকে কহিলেন, "শোভাসিংহ! এখনই ফৌজ নিয়ে রওনা হওয়া যাক্। আমরা দু'জনে দু'ধার থেকে সম্রাটের সৈন্যদলকে আক্রমণ কর্‌ব। অজিতসিংহ বর্দ্ধমান রাজবাটীর দ্বার অতিক্রম কর্‌বার পূর্ব্বেই তাকে বন্দী করা চাই!"

শোভাসিংহ কহিলেন, "তাই হবে সর্দ্দার!"

উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

বারাসতের বন-ভূমিতে।

আজ মহরমের দিন। এক দল দস্যু বারাসতের নিবিড় বনস্থলীর মধ্যে সমবেত হইয়াছে। বালক আমিন এই দস্যুদলের নেতা। আমিনের মুখখানি

রমণীর ন্যায় সুন্দর সরল কোমল। তাহার কণ্ঠস্বর শারদ-প্রভাতে পাপিয়ার কণ্ঠস্বরের ন্যায় স্নিগ্ধ মধুর।

আমিন। ভ্রাতৃগণ! আজ মহরমের দিন। আজ মুসলমানগণ তাদের সাম্প্রদায়িক পার্থক্য ভুলে গিয়ে পরস্পর হিংসাদ্বেষ সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে একই জাতীয় জীবনে অনুপ্রাণিত। এই জাতীয় সম্মিলন-দিনে এস আমরা সকলে মিলে প্রাণের সহিত খোদাকে ধন্যবাদ করি।

দস্যুদল। আল্লা হো আকবর!

আমিন। ভ্রাতৃগণ! আজ যেমন ত্রি-সহস্রাধিক-কণ্ঠে উচ্চারিত আল্লা হো আকবর ধ্বনিতে বারাসতের বনভূমি মুখরিত, আশীর্ব্বাদ করি, সর্ব্বশক্তিমান্ খোদার অনুগ্রহে তোমাদের প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়ুক। আমাদের দল দিন দিন এর চেয়ে বেশী পুষ্ট হ'ক্।

দস্যুগণ। খোদার ইচ্ছা আর আপনার আশীর্ব্বাদ।

আমিন। ভেবে দেখ ভ্রাতৃগণ, আমরা সকলে একই বিশ্বধাতা খোদার সন্তান। তবে "আমি হিন্দু" "আমি মুসলমান" ব'লে এই নিরর্থক জাতিগত সম্মান—অসম্মান নিয়ে রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষি কেন? যে পরিবারের মধ্যে ভায়ে ভায়ে মারামারি কাটাকাটি হয়, সে পরিবার কি কখনও উন্নতি লাভ করতে পারে?

সকলে। কখনও না, কখনও না।

আমিন। ভাই সব, আজ তোমরা সকলে খোদার নামে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হও যে, আর কখনও তোমরা বৃথা রক্তপাত করবে না, বৃথা হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করবে না। নিষ্ঠুর জমীদার, হৃদয়হীন দিক্-বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য ফৌজদারের কর্ম্মচারিগণের অত্যাচারে আজ আমাদের সোনার বাঙ্গালা প্রপীড়িত! তোমরা তাহাদের অত্যাচার হ'তে, দরিদ্র, আর্ত্ত ও বিপন্নকে নিরন্তর রক্ষা করবে।

দস্যুগণ। তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য সর্দ্দার!

আমিন। ভাই সকল! একটি কথা যেন তোমরা কখনও বিস্মৃত হয়ো না। পাঠান-সর্দ্দার রহিম শা আমাদের সকলের গুরু, আমাদের সকলের ওস্তাদ্। তাঁহার প্রয়োজন হ'লে আমরা তাঁহার জন্য প্রাণ দেবো।

দস্যুগণ সকলেই একবাক্যে ও সর্ব্বান্তঃকরণে সেইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

বর্দ্ধমান, কৃষ্ণসায়র-তীরে।

অমাবস্যার রাত্রি। প্রায় দ্বিপ্রহর। একে ঘোর অন্ধতমসার মসীময় আবরণে প্রকৃতির মুখখানি ঢাকা, তাহাতে আবার প্রবল ঝটিকা, বৃষ্টি ও করকাপাতে নৈশ প্রকৃতি আকুলিতা। মধ্যে মধ্যে কর্ণ-বধিরকারী বজ্রের নির্ঘোষ। মনুষ্য ত দূরের কথা, নিশা-বিহারী হিংস্র শ্বাপদাদিও আজি এই দুর্য্যোগে নিজ নিজ আশ্রয়স্থান ত্যাগ করিয়া আহারান্বেষণে বহির্গত হয় নাই।

বর্দ্ধমান, কৃষ্ণসায়রের তীর দিয়া সুপ্রসর রাজ-বর্ত্ম। তাহার অনতিদূরে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান একটি মনুষ্যমূর্ত্তি। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে। সেই বিদ্যুদালোকে মূর্ত্তিটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, পরক্ষণেই আবার তাহা অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। কে এই নির্ভীক পুরুষ, ঝড়-বৃষ্টি-করকাপাত অগ্রাহ্য করিয়া ধবলগিরির ন্যায় রাজপথপার্শ্বে দণ্ডায়মান কেন? পুরুষের আপাদমস্তক লৌহবর্ম্মে আবৃত। হস্তে দীর্ঘ বর্শা কটিতটে কোষ-পিনদ্ধ শাণিত অসি। সে আর কেহই নহে—পাঠান-সর্দ্দার রহিম শা। চিকুরের চকিতালোকে পাঠানবীর রহিম শার সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত একটি যোদ্ধৃ-মূর্ত্তি দৃশ্যমান হইল।

রহিম। শোভাসিংহ, শত্রু-সৈন্য দামোদর পার হইয়াছে?

শোভাসিংহ। না সর্দ্দার, এখনও পার হয় নাই। এক একবার পার হওয়ার উদ্যোগ করছে, আবার দুর্য্যোগ দেখে পেছিয়ে যাচ্ছে।

রহিম। পারের নৌকা সব আমাদের?

শোভা। হাঁ।

রহিম। মাঝি মাল্লা?

শোভা। সব আমাদের দৈন্য।

রহিম। অজিতসিংহ তাহার কিছুই বুঝতে পারে নি?

শোভা। ঘুণাক্ষরেও না।

রহিম। পার করবে কোথায় ঠিক করেছ?

শোভা। সর্দ্দারের হুকুম হ'লে, একেবারে

ঠিকানায় পার করা যেতে পারে। মাঝ-নদীতে এসে নৌকার তলা ছেঁদা ক'রে দিলে সব আপদ চুকে যাবে।

রহিম। না, তাতে গোল হবে; ও-পারে যে সব ফৌজ থাক্‌বে, তাদের আর পার কর্‌তে পার্‌বে না। এ পারে পৌঁছানোর আগে তাদের কিছুই জান্‌তে দেওয়া হবে না।

শোভা। তাই হবে। তা হ'লে ভাটার টানের মুখে নৌকো ছেড়ে দেওয়া যাবে। দু-চার ক্রোশ ভেটিয়ে গিয়ে বনের মধ্যে নৌকো লাগিয়ে দেওয়া যাবে। এই দুর্য্যোগ আর এই অন্ধকার রাত্রে অজানা লোকের পক্ষে পথ খুঁজে পাওয়া অসাধ্য। আর আমার ফৌজ ত সেই বনের মধ্যেই লুকানো আছে।

রহিম। অজিতসিংহকে অল্পসংখ্যক অনুচরের সঙ্গে তাড়াতাড়ি ক'রে পার ক'রে দেবে।

শোভাসিংহ। যে আজ্ঞা।

রহিম। অজিতসিংহের নৌকো পার হ'লে আমাকে যেন সংবাদ দেওয়া হয়।

শোভাসিংহ পাঠান-সর্দারকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন; রহিম শা পূর্ব্বমত সেই স্থানেই চিন্তাকুলভাবে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। সহসা ঝটিকাবেগ প্রবল হইল, অজস্রবৃষ্টি পড়িতে লাগিল। রহিম শা পথ-পার্শ্বস্থ একটি বিটপিকুঞ্জতলে গিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রকৃতি এইরূপ পৈশাচিক লীলায় উন্মত্ত। অজিতাও আজ পিশাচী অপেক্ষা ভয়ঙ্করী। শোভাসিংহ কর্তৃক সেই নির্দ্দয় প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সে আজ পাগলিনী। উন্মাদিনীর ন্যায় সে শোভাসিংহকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। খুঁজিতে খুঁজিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়াছে। তাহার পরিধেয় বসন ও আলুলায়িত কেশপাশ সিক্ত। তবু রমণী উন্মত্তের ন্যায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অজিতা কহিতে লাগিল, "উঠ উঠ প্রলয়ের ঝড়! কালমেঘ বসুধার মুখখানি ঢাকিয়া ফেল। আইস নারকীয় চমূ, বিশ্বতটে ছুটিয়া আইস; তোমরা সকলে আসিয়া আমার সহায় হও। আইস তোমরা; আসিয়া নারীর হৃদয় নারকীয় তেজে পূর্ণ কর। যেন আমার সুকুমার বৃত্তিচয় নিজ নিজ গুণ ত্যাগ করিয়া প্রতিহিংসারূপে পরিণত হয়। শোভাসিংহ! আমি সব ভুলিয়া তোমার চরণতলে আমার হৃদয় অর্পণ করিলাম, নির্দ্দয় দানব! তুমি পদাঘাতে তাহা শত খণ্ডে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে? কোথায় শান্তি? কোথায় পরিত্রাণ? কোথায় গেলে আমার হৃদয়ের এই তীব্র জ্বালা নির্ব্বাপিত হইবে? দুষ্ট শোভাসিংহ! অবিশ্বাসী আততায়ী ঘৃণ্য নরকের কীট! নির্দ্দয় দৈত্যের মত তুমি আমার হৃদয়ের নন্দন-কাননে প্রবেশ করিয়া নখাঘাতে আমার অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত প্রণয়-কলিকা ছিঁড়িয়া ফেলিলে; তৃষ্ণা না মিটিতে নৃশংস দানব, আমার হৃদয়খানিকে দুই পদে দলিয়া ফেলিলে! তবে যাক্, সব যাক্, কেবল দ্বিগুণ তেজে অজিতার হৃদয়মধ্যে প্রতিহিংসার তীব্র কালানল জ্বলিয়া উঠুক। উহ্, জ্ব'লে গেল, প্রাণ জ্ব'লে গেল। শোভাসিংহ, আমি তোমার উষ্ণ রক্তে বক্ষ নিমজ্জিয়া স্নান করিব, তবে আমার এই জ্বালা নির্ব্বাপিত হইবে।"

রমণী ছুটিতে ছুটিতে অন্ধকারমধ্যে মিলাইয়া গেল।

বৃষ্টি ও ঝটিকাবেগ কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়াছে। রহিম শা ও কয়েক জন দস্যু পথপার্শ্বস্থ ঝোপের আড়াল হইতে বাহির হইয়া রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল। রহিম শা বলিলেন, "নিশ্চয়ই তাহারা এই পথে আস্‌বে। তোমরা ওই ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে থাক। খুব হুঁসিয়ার, যেন শত্রুদলের এক জনও পালাতে না পারে।"

দস্যুগণ কহিল, "যো হুকম সর্দ্দার!"

রহিম শা অনুচরদিগকে এইরূপ আজ্ঞা দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই অজিতসিংহ একাকী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ। তিনি একাকী, পথঘাট সমস্তই তাঁহার কাছে অপরিচিত। অজিতসিংহ বিষম বিপন্ন। একবার বিদ্যুৎস্ফুরণ হইল, সেই স্বল্পকালস্থায়ী আলোকে অজিতসিংহ দেখিলেন, দূরে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি। দেখিয়া মনে মনে কহিলেন, "কুজ্ঝটিকা-ঘেরা ধবল-গিরির মত কাহার ওই ছায়ামূর্ত্তি, শিরে রজত-শিরস্ত্রাণ, বিপুল উরসে রত্ন-বিখচিত শোভন কবচ। ক্ষণপ্রভার স্পর্শে তাহা হইতে লক্ষমুখে কিরণ ঠিকরিয়া পড়িতেছে। কে ইনি?" কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া অজিতসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "কে তুমি, কেন এই ঘোরতম দুর্য্যোগের কালে আসিয়া তুমি আমার পথ আগুলিয়া

দাঁড়াইলে? দেব, দৈত্য, নর কিংবা গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস তুমি যে হও, আমার পথ ছাড়িয়া দাও। তাহা না হইলে স্থির জানিও, এই তীক্ষ্ণধার অসি তোমার হৃদয়ের উষ্ণ রক্ত পান করিবে।"

রহিম শা একটু অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "রাজপুত, পাঠান-সর্দ্দার রহিম শা প্রাণভয়ে ভীত নহে।" অজিতসিংহ কহিলেন, "পাঠান-সর্দ্দার, বীর-আখ্যা ধারণ করিয়াছ, বীর বলিয়া পরিচয় দিতেছ। এই কি তোমার বীরযোগ্য আচরণ? এই কি তোমার বীরোচিত ব্যবহার? তস্করের মত গুপ্ত অস্ত্রে আমার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছ।"

রহিম শা উত্তর করিলেন, "রাজপুত, পাঠান-সর্দ্দার যদি এত হীনচেতা হইত, তবে কি তুমি দামোদর পার হইতে পারিতে? তাহা হইলে অনেক পূর্ব্বেই অজিতসিংহের নাম ধরাধাম হইতে লুপ্ত হইত। বাঙ্গালার কোন্ স্থান তুমি দেখাইবে রাজপুত, যেখানে রহিম শার চর সবার অলক্ষ্যে না ভ্রমণ করিতেছে?"

অজিতসিংহ ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, "পাঠান-সর্দ্দার, রাজপুত আত্মরক্ষায় অসমর্থ নহে। ন্যায়-যুদ্ধে সে কদাচিৎ পরাঙ্মুখ হইবে না।"

রহিম শা কহিলেন, "বীরবর, রাজপুতের সমরের পদ্ধতি আমি অবগত আছি। আমি জানি, রাজপুত কখনও অরাতির সমর-আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে না; তাই তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। দস্যুদল-অধিপতি পাঠান-সর্দ্দার রহিম শা—যাহার অন্বেষণে, হে রাজান্! তুমি সুদূর আগরা হইতে বাঙ্গলায় আসিয়াছ, সেই রহিম শা আজ যাচকের বেশে তোমার নিকট উপস্থিত। আমায় রণ ভিক্ষা দাও।"

অজিতসিংহ অসি নিষ্কোষিত করিয়া কহিলেন, "অস্ত্র ধর পাঠান-সর্দ্দার, আমিও প্রস্তুত আছি।"

উভয়ে ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইল। অজিতসিংহ হঠাৎ পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। রহিম শা কহিলেন, "রাজপুত, তুমি রণশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছ। শোণিতমোক্ষণে তোমার দেহ বলহীন। এখনও বশ্যতা স্বীকার কর। অনর্থক কেন প্রাণ হারাইবে?"

অজিতসিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া বলিলেন, "যুদ্ধ—যুদ্ধ, পাঠান-সর্দ্দার! হৃদয়ে এক বিন্দু শোণিত থাকিতে রাজপুত বশ্যতা স্বীকার করিবে না।"

রহিম শা কহিলেন, "ভাল; অচিরে তোমার শোণিত একেবারে নিঃশেষিত হইবে।" পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। পাঠান-সর্দ্দারের ভীষণ অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া অজিতসিংহ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

পিতা-পুত্রে।

প্রভাত হইয়াছে। ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণরাম বর্দ্ধমানাধিপতি। জগৎরাম তাঁহার একমাত্র পুত্র। জগৎরাম অতি প্রত্যুষে অশ্বারোহণে বাহির হইয়াছিলেন। কৃষ্ণসায়রের তীরে রাজপুতবীর অজিতসিংহকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় পতিত দেখিয়া তাঁহাকে প্রাসাদে লইয়া আসিয়াছেন। সেই সম্বন্ধে পিতাপুত্রে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল।

কৃষ্ণরাম। বল কি জগৎ! ডাকাতের দলের এত বাড় বেড়েছে? দীনদুনিয়ার মালিক মোগল বাদশা, যাঁর নামে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়, তাঁর সেনাপতি অজাগর বীর অজিতসিংহ বড় কেও-কেডা নয়, তাঁকে কি না এমন অপমান!

জগৎরাম। শুধু অপমান নয় পিতা, তাঁর প্রাণ পর্য্যন্ত সংশয়।

কৃষ্ণরাম। না—এ সম্ভব নয়। জগৎ, তুমি ঠিক ক'রে দেখেছ ত? ঠিক বাদশার সেনাপতি অজিতসিংহ ত?

জগৎরাম। সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই পিতা! আপনি তাঁকে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, তিনি অজিতসিংহ ছাড়া আর কেহই নহেন—সেই বীরত্ব-ব্যঞ্জক সুন্দর মুখশ্রী, বীরজনোচিত বিশাল উরসে নানা রত্নবিখচিত অক্ষয় কবচ, শিরে উজ্জ্বল রজত-বিনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ, কটিতটে বিলম্বিত মণিময় ছত্রদণ্ডাঙ্কিত খড়্গাপিধান। তাহাতে স্বর্ণাক্ষরে 'অজিত সিংহ' নাম লেখা।

কৃষ্ণরাম পুত্রের কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "বাস্ বাস্! ঠিক হয়েছে—আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার মনে বড়ই ভয় হচ্ছে যে, বাদশাহ এ কথা শুনে কি মনে করবেন। আমার দোর-গোড়ায় তাঁর সেনাপতির এই অবস্থা!"

জগৎরাম কহিলেন, "পিতা! সে জন্য চিন্তিত হচ্ছেন কেন? বাদশাহ কি বাঙ্গালার অবস্থা সম্যক অবগত নন? পাঠান দস্যুর অত্যাচারে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা প্রপীড়িত। সেই জন্যই ত সম্রাট-জাদা আজিমুশ্বান ও অজিতসিংহের বাঙ্গালায় আগমন।"

কৃষ্ণরাম কহিলেন, "কাঁল রাত্তিরে কি দুর্য্যোগ-টাই গিয়াছে। কটা বজ্রাঘাত হ'ল—ঠিক যেন কানের পাশ দিয়ে গেল। আমি তো মনে মনে 'ত্রাহি মধুসূদন কর্‌তে কর্‌তে কোন প্রকারে' রাত্তির কাটালাম। নিদ্রা আর হ'ল না। তা জগৎ! ভাগ্যিস্ তুমি সকালে বেরিয়েছিলে, তাই তো সেনা-পতিকে জীয়ন্ত পেলে।"

জগৎরাম উত্তর দিলেন, "হাঁ পিতা! আমি মনে করলুম যে, কাল রাত্তিরের ভয়ানক ঝড়ে প্রজাদের বোধ হয় ঘর-দরজা অনেক প'ড়ে গিয়েছে। তাহারা ছেলে পিলে নিয়ে অনাশ্রয় ভাবে বোধ হয় বড়ই কষ্ট পাচ্ছে। তাই দেখবার জন্য অতি প্রত্যুষে অশ্বারোহণে বেরিয়ে যেতে যেতে দেখি, কৃষ্ণসায়রের তীরে রাজপথের উপরে সশস্ত্র সৈনিক পুরুষের মৃতদেহ। আমি অশ্বের রশ্মি সংযত ক'রে তখনই অশ্ব হ'তে অবরোহণ করলাম।"

কৃষ্ণরাম কহিলেন, "তা কর্‌বেই তো, কর্‌বেই তো—তুমি আমার কুলের প্রদীপ সন্তান।

জগৎরাম বলিতে লাগিলেন, "অশ্ব হইতে অব-রোহণ ক'রে সেই দেহের নিকটে গিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলুম যে, শিরায় অতি মৃদুভাবে শোণিত প্রবাহিত হচ্ছে। চক্ষের স্পন্দন একেবারে মৃদু, নাসিকায় অতি ক্ষীণভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে। সমস্ত অঙ্গে গভীর অস্ত্রক্ষত। সেই সকল অস্ত্রক্ষত হ'তে তখনও রক্ত নির্গত হচ্ছে। তাঁর পরিধানের বহুমূল্য রাজ-পরিচ্ছদ শোণিতসিক্ত, আর্দ্র ও কর্দ্দমলিপ্ত। তাঁহার সংজ্ঞা একেবারেই নাই। কিন্তু তাঁহার দক্ষিণহস্তের শাণিত কৃপাণ তখনও মুষ্টিচ্যুত হয় নি।"

কৃষ্ণরাম কহিলেন, "যা হ'ক্! সেনাপতির যে জীবনহানি হয় নি, তাই যথেষ্ট। চিকিৎসায় বোধ হয় আরাম হ'তে পারেন। বৈদ্যরাজকে খবর দেওয়া হয়েছে?"

জগৎরাম উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হাঁ! তিনি এলেন ব'লে।"

কৃষ্ণরাম কহিলেন, "তা হ'লে তুমি নিজে উপ-স্থিত থেকে রোগীর পরিচর্য্যা কর গিয়ে।"

জগৎরাম উত্তর করিলেন, "যে আজ্ঞা!"

কৃষ্ণরাম কহিলেন, "মীরা রোগীর শুশ্রূষা কর্‌তে বড় ভালবাসে। তারই উপরে রাজা অজিতসিংহের শুশ্রূষার ভার দাও। অজিতসিংহ সম্রাটের অতিশয় প্রিয়। তাঁকে যত্নে বাধ্য করতে পারলে আমাদের অনেক লাভ, এই কথাটি মনেরেখো, জগৎ!"

জগৎরাম কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, মীরার উপরই অজিতসিংহের শুশ্রূষার ভার দেওয়া যাবে।"

এই সময়ে এক জন দৌবারিক আসিয়া রাজা ও রাজপুত্রকে সসম্ভ্রমে অভিবাদনপূর্ব্বক দূরে দাঁড়াইয়া কহিল, "মহারাজ! তালুকদার শোভাসিংহের পত্র-বাহক এক জন দূত আপনার সাক্ষাৎকারপ্রার্থী।"

কৃষ্ণরাম একটু উন্মনা হইয়া কহিলেন, "কেন! সে ডাকাত বেটা আবার দূত পাঠিয়েছে কি জন্য? হরে মুরারে—হরে মুরারে! বেটার নাম শুন্‌লেই পীলে চম্‌কে যায়। আমার বোধ হয়, জগৎ যে, কালকার কাণ্ডটি এই বেটারই কারসাজি।"

পিতার এই চঞ্চল্য ও ভীতির ভাব দেখিয়া জগৎরাম কহিলেন, "পিতা! আপনি অত উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন? পত্রখানা দেখুনই না, শোভাসিংহ কি চায়।"

কৃষ্ণরাম ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে কহিলেন, "কি চায়! —বেটা ডাকাত—তার চাওয়ার কি একটা ঠিক আছে, হয় ত বল্‌বে যে, এই দণ্ডে তোমার জমীদারী আমার নামে লিখে পড়ে দিয়ে, তুমি বনে গিয়ে বাস কর। তুমি তাকে তাই দেবে নাকি? হরে মুরারে —হরে মুরারে। কবে এই ডাকাতের দলের হাত থেকে উদ্ধার হওয়া যাবে?" একটু চিন্তিতভাবে থাকিয়া কৃষ্ণরাম কহিলেন, "বুঝেছ জগৎ! আমার ঠিক বোধ হচ্ছে যে, এ সব ঐ শোভাসিংহ বেটারই কারসাজি!"

জগৎরাম কহিলেন "তা হ'লে কি পিতা আপনি শোভাসিংহের দূতকে ফিরিয়ে দিতে চান?"

কৃষ্ণরাম কহিলেন, "বাপ্ রে বাপ্, তা হ'লে কি ডাকাত বেটা রক্ষে রাখ্‌বে? আজ রাত্তিরেই এসে দলবল নিয়ে বাড়ী-ঘর লুঠপাট ক'রে নেবে।"

ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গ্রীবা বাঁকাইয়া ধীর গম্ভীর স্বরে জগৎরাম কহিলেন, "যদি সামান্য ডাকাতের

ভয়ে আমাদিগকে এমন জড়সড় হ'য়ে থাক্‌তে হয়, তাদের সমস্ত আবদার সহ্য কর্‌তে হয়, তাদের সমস্ত অন্যায় দাবী গ্রাহ্য করতে হয়, তা হ'লে আমাদের রাজত্বই বা কিসের—আর এই রাজা নামই বা কি জন্য ?"

এই সময়ে কক্ষের বহির্দেশ হইতে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত কয়েকটি কথা শুনা গেল। সে গলা শোভাসিংহের দূতের।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

দেবী না মানবী ?

বর্দ্ধমান রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরের একটি কক্ষে কুমার অজিতসিংহ রোগশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। রাজদুহিতা মীরা রাত-দিন তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অক্লান্তভাবে তাঁহার সেবা করিতেছেন। রাজবৈদ্য-গণের বিশেষ চেষ্টাতেও কিন্তু কুমারের লুপ্তসংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতেছে না।

মীরা একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া আপনমনে কহিতে লাগিলেন, "হে নির্ম্মম পান্থ! আমি নিশ্চয় জানি, তুমি কেবল দুই দণ্ডের জন্য আসিয়া আমার জীবনের স্নিগ্ধ ছায়াতলে আশ্রয় লইয়াছ। শ্রান্তিটুকু দূর হ'য়ে গেলে, আবার কোন্ দূরদেশে চ'লে যাবে, তাহার নির্ণয় হইবে না। আমি একাকিনী জগতের একটি কোণে প'ড়ে থাকবো। অভাগীর সন্ধান কে লইবে? মুক্ত বিশ্বতলে যে দিকে নয়ন ফিরাব, অযুত স্মৃতির কাঁটা অতি নির্দ্দয়ভাবে আমার হৃদয় নিরন্তর বিদ্ধ কর্‌বে। লজ্জাকে হৃদয়ের আড়ালে যত লুকিয়ে রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌বো, সে ততই সময় বুঝে তীক্ষ্ণবিষ আশীবিষের মত আমাকে এসে দংশন কর্‌তে থাকবে। আমি বহু আশে তোমাকে পরাই-বার জন্য জীবন-কুসুম অবচিত করিয়া সোহাগ-কনক-সূত্রে মালিকা রচনা করিব। তুমি চ'লে যাবার বেলা হয় ত সেই মালা দুই পদে দলিয়া যাইবে। আমার এই বক্ষঃপুটে যত প্রেম, যত কোমলতা, যত মধুরতা, যত মহিমা, যত আকাঙ্ক্ষা আছে, সমস্ত শতধা বিচূর্ণ হয়ে ধূলায় লুটাবে।"

সহসা অজিতসিংহের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া মীরার দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি বিস্মিতভাবে কহিলেন, "এ কি। কোথায় আমি! শত্রুকারাগারে? হে সুতন্বি! কে তুমি? আমায় পরিচয় দাও। বল—আমি শত্রু অথবা মিত্রপুরে রহিয়াছি ?"

মীরা কহিল, "বীরশ্রেষ্ঠ, বিহ্বল হইবেন না। আমার পিতা বর্দ্ধমান-অধিপতি আগরার সম্রাটের চির-অনুগত পরম সুহৃৎ।"

অজিতসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "বলুন নৃপসুতা! আমার সৈন্যবৃন্দ কোথায় ?"

মীরা কহিল, "আপনার সৈন্যগণ বর্দ্ধমান রাজ-পুরে কুশলে রয়েছে। চিন্তিত হইবেন না সেনা-পতি!"

অজিতসিংহ কহিলেন, "দেবি! জানেন যদি বলুন দেখি তবে, আমার ভাগ্যে এ বিপত্তি কেমন করিয়া ঘটিল? আর কোন্ জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলেই বা পুণ্যময়ি! আজ তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল ?"

মীরা কহিল, "অম্বররাজপুত্র, দুরাচার দস্যুগণ রজনীর অন্ধকারে গুপ্ত খড়্গাঘাতে আপনাকে নির্য্যাতিত করিয়াছে।"

অজিতসিংহ একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "ক্রমে ক্রমে স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায়, এখন সেই ঘটনারাজি আমার স্মৃতিপথে উদিত হচ্ছে। সেই ঘোর অন্ধকারসমাচ্ছন্ন নিশা। সেই মুহুর্মুহু সচকিত বিদ্যুৎস্ফুরণ। সেই শ্রবণবধিরকারী কুলিশের কড়্ কড়্ শব্দ। সেই নারকীয় অন্ধকারমাঝে কি ভীষণ পৈশাচিকী লীলা! সেই খলখল অট্টহাসি, সেই বিকট তাণ্ডব, যে কথা স্মরণপথে উদিত হইলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।"

মীরা কহিল, "আপনি চুপ করুন, রাজপুত্র! সে কথা স্মরিয়া কাজ নাই। আপনার শরীরের শল্যক্ষতগুলি এখনও ভাল করিয়া সারে নাই। আবার শোণিতমোক্ষণে বিপদের সম্ভাবনা আছে।"

অজিতসিংহ কহিলেন, "অয়ি শুভে! শত্রু-হস্তে পরাজয় অপেক্ষা, ক্ষত্রিয়ের আর কি অধিক বিপদ আছে? এই গুরুভার অপমানরাশি শিরে ধরিয়া জীবনধারণ অপেক্ষা মৃত্যু লক্ষগুণে ভাল ছিল। কোথায় শান্তি? কোথায় মরণ?"

অজিতসিংহ সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মীরা ব্যস্তভাবে তাঁহার সখী কুসুমিকাকে ডাকিয়া

কহিলেন, "কুসুমিকা! শীঘ্র যাও, বৈদ্যরাজকে ডেকে নিয়ে এস। রাজকুমার আবার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন।"

সখী প্রস্থান করিলে পর, মীরা আপন মনে কহিতে লাগিল, "হে বিধাতঃ! বহু আরাধনার ফলে আমি হৃদয়ের আরাধ্য দেবতাকে পেয়েছি। দেখ দয়াময়! অমূল্য নিধি দিয়ে আবার যেন কেড়ে নিয়ো না।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

বালকবেশে আমিনা।

সুতানুটীর জঙ্গলের এক অংশে একটি বৃক্ষতলে একাকী বসিয়া পাঠান সর্দ্দার রহিম শা গভীর চিন্তায়-মগ্ন ছিলেন। সহসা নারীকণ্ঠোত্থিত একটি সঙ্গীতের শব্দে তিনি চমকিয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, "এ কি? কাহার এই পুরাতন পরিচিত কণ্ঠস্বর? অনন্ত কুহকময়ী অন্তহীন ছলাকলাময়ী আমিনা কি এখনও তাহার সেই শৈশবের খেলাঘর ভুলে নাই—যে ঘর, সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অযুত অপূর্ণ আশ থরে থরে সাজিয়ে নিজহস্তে রচনা করেছে? তাই কি কৌতুকময়ী মাঝে মাঝে এসে সেই ঘরখানি দেখে যায়? আমি জানি না, আমার সেই চির-জীবনের মরমের ব্যথা কি নূতন বেশে এসে, জীবনের শেষে দেখা দিবে? হয়ত, প্রতিভাময়ী আমার মরণ-নিশায় এসে পূর্ণ প্রতিভায় বিশ্বরাজ্য আলোকিত ক'রে আমার সম্মুখে দাঁড়াবে।"

রহিম শা চাহিয়া দেখিলেন যে, এক জন বালক গান গাহিতে গাহিতে তাঁহারই দিকে আসিতেছে।

তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "বালক! তুমি কে?"

আমিনা কহিল, "সুপ্রতিষ্ঠ দস্যুদল-অধিপতি ভীমপরাক্রমশালী করিম খাঁকে বঙ্গভূমে কে না চিনে? তিনি আমার পিতা! আমার নাম আমিন।"

রহিম শা বালকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিত হইয়া কহিলেন, "কি! কি বলিলে, তোমার নাম আমিন? আর একবার ভাল করিয়া তোমার নাম বল। তুমি কি সত্য, কিংবা প্রবঞ্চনা মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে আমাকে ছলনা করতে এসেছ? হে বালক! তোমার সুগভীর রহস্য আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। হে আমার চিরজীবনের নিরন্তর সাধনার'ধন! এত দিনে কি রহিমেরে মনে পড়েছে? এস তবে, প্রাণময়ী পবিত্রতা! আমার হৃদয়ে এস। আমার হৃদয়ের ছন্দোময়ী ভাবময়ী গীতা। আমি জানিতে চাহি না, তুমি সত্য কিংবা তুমি প্রবঞ্চনা। তোমার ওই মদির-সঙ্গীতে আমার অন্তরের প্রতি ক্ষুদ্র শিরা উপশিরাগুলি পূর্ণ হ'ক। ক্ষুব্ধ বারিধির মত তোমার ওই অফুরন্ত লাবণ্যপ্রবাহ বুঝি লক্ষ খণ্ডে আমার এই বক্ষোবন্ধ ভাঙ্গিয়া দিবে!"

বহু কষ্টে হৃদয়ের আবেগ চাপিয়া রাখিয়া আমিনা আপন মনে কহিল, "খোদা! দুর্ব্বলহৃদয়া নারীর হৃদয়ে বল দাও। আমার হৃদয়দেবতা উচ্চ-কার্য্যে ব্রতী হয়েছেন। নারী যেন তাহার পথে অন্তরায় না হয়। স্বার্থ বলিদান না করিলে কোনও উচ্চকার্য্য হয় না। আমি কুসুমপেলব রমণীর প্রাণ সুকঠিন বজ্রলেপ দিয়া ঢাকিয়া রাখিব। আজ কি উদ্‌ভ্রান্ত, কি উৎকটবাসনার রাশি লেলিহান অগ্নি-শিখার মত আমার হৃদয়ে জ্বলছে। হে প্রিয়তম! আমার ক্ষণে ক্ষণে মনে হচ্ছে যে, এই প্রবঞ্চনার আবরণ পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ ক'রে তোমার চরণ-প্রান্তে আমার তপ্ত শির রেখে, আমার হৃদয়ের যত কলঙ্ককালিমা সব অশ্রুনীরে মুছে ফেলি। আবার কর্ত্তব্য এসে, তর্জ্জনী হেলায়, আমায় ধরা দিতে মানা করছে।"

রহিম শা কহিলেন, "বল সৌম্যে! তুমি কি ভাবছো? কেন তোমার অক্ষিযুগল ধরাতললগ্ন, বল। বল, কি মোহিনী স্মৃতির স্পর্শে তোমার আঁখি-পাতে বিন্দু বিন্দু নীহারের কণা দেখা দিল? ওগো রহস্যময়ি! আর তো আমি পারি না। তোমার অপার রহস্য প্রকাশ কর। শত খণ্ডে অনৃতের আচ্ছাদন ছিঁড়িয়া ফেল। আর তুমি কঠোর সীমাহীন মহামৌন সাগরের মত নীরব থাকিও না। সেই মহান্ অসীমতার মাঝখান হ'তে, প্রেমময়ি! তুমি জ্যোতিঃ-স্নাতা পদ্মাসনা কমলার মত উঠিয়া এস। দেবি! তোমার ওই অলক্ত-লাঞ্ছিত কনক-চরণ দুইটি দিয়া আমার হৃদয়ের তটে এসে দাঁড়াও। উৎসবের হেমকুম্ভসম তোমার বক্ষ হ'তে বসন-অঞ্চল সরাইয়া ফেল। তোমার শুভ্র ললাটফলক হ'তে

কুঞ্চিত কুন্তলজাল অপসারিত কর। তোমার উন্মুক্ত উদার নগ্ন সুষমায় ধরা প্লাবিত হউক। অয়ি রাজ-রাজেশ্বরি! আমাকে মুহূর্ত্তের জন্য অমরার সুখভোগ করিতে দাও। হে সৌম্য! আমায় ক্ষমা কর। হে প্রিয়দর্শন! বাতুলের এই নিরর্থক প্রলাপের জন্য মনে কিছু করিও না। আমায় বল, কোন্ প্রয়োজনে তোমার এই বিজন বনে আগমন?"

আমিনা কহিল, "শুনিয়াছি মহাত্মন্! এই সুতানুটী বনস্থলী সৃজনের সারভূত আত্মত্যাগী মহা-যোগী পাঠান-সর্দ্দারকে তাঁহার পুণ্যময় অঙ্কে লালন করেছেন। সেই বীরেন্দ্রের পদযুগল ভক্তিপুষ্পহারে সাজাইবার জন্য, তাঁহার রাঙ্গা চরণদ্বয় হৃদয়ের তপ্ত অশ্রুসেকে ধোয়াইবার জন্য, আমি বহু আশে বহুদূর হ'তে হেথায় আসিয়াছি। হে ধীমান্! জানেন যদি, তবে ব'লে দিন কোথায় গেলে আমি তাঁহার দর্শন পাবো?"

রহিম শা কহিলেন, "এ নিদ্রা, না জাগরণ, কিছুই ত আমি বুঝতে পার্‌ছি না; কিংবা যেন আমি অতি তীব্র হলাহল পান করেছি। এই জড় বিশ্ব যেন চারিদিকে ঘুরছে দেখছি। যেন আমাকে অবলম্বন-হীন আকাশে টানিয়ে রেখে, ধরা আমার পদতল হ'তে ক্রমাগত স'রে যাচ্ছে। আরে নিরমমে! আমি তোর কাছে কি অপরাধ করেছি যে, আমাকে তুই এমন নির্দ্দয়ভাবে পীড়ন কর্‌ছিস্? বুঝেছি নারি! তুমি কখনও পিপাসার বারি নহ। তুমি স্নেহভরা শ্যামল শাদ্বল নিকুঞ্জের স্নিগ্ধ ছায়া নহ। তুমি করু-ণার উৎসধারা নহ। তুমি দীপ্ত বহ্নিশিখাসম উত্তপ্ত তুলিকা দিয়া উৎকট কামনা-পটে আঁকা তৃষ্ণার্ত্তের মুগ্ধ স্বপ্ন মায়া-মরীচিকা। বুঝেছি নিশ্চয় স্মিতাননা! তুমি মূর্ত্তিমতী প্রবঞ্চনা। হে বালক! তুমি রহিম শার সহিত আলাপ কর্‌তে এসেছ? জান না কি, হতভাগ্য সনে আলাপ করলে চির-সৌভাগ্য-অন্বিত যে, সে-ও কমলার কোপানলে পতিত হয়। এ জগতে রহিমের মত ভাগ্যহীন কে আছে?"

আমিনা কহিল, "কি বল্‌লেন, পাঠান-সর্দ্দার? ভাগ্যহীন? এ জগতে তাঁহার মত ভাগ্যবান্ আর কে আছে? আজ তাঁহার পতাকাতলে হিন্দু-মুসলমান চিরন্তন জাতিগত পার্থক্য ভুলিয়া একসাথে সমবেত হইয়াছে। ওই দেখুন, বঙ্গমাতা ধান্যদূর্ব্বা গঙ্গোদক আশিসসম্ভার করে লয়ে, তাঁহাকে অভিষেক করিবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। ওই দেখুন, রহিমের সমুন্নত ভালে কি উজ্জ্বল রত্নময় কিরীট—যার চারিদিক্ হ'তে কিরণ বিচ্ছুরিত হইতেছে। পাঠান-সর্দ্দার আজ রাজরাজেশ্বর।"

রহিম শা কহিলেন, "এত দিন যাহার সন্ধানে ফিরিয়াছি, আজ কি খোদা! তাহাকেই মিলাইয়া দিলেন! হে বালক! তুমি যাকে দেখ্‌বার জন্য বহু শ্রম ক'রে এত দূর এসেছ, সেই রহিম তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে।"

আমিনা বিস্মিতের ন্যায় একদৃষ্টে কিছুক্ষণ রহিম-শার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আজ আমি আমার হৃদয়ের উপাস্য দেবতাকে দেখ্‌লাম। আমার জীবন সার্থক হলো। পাঠান-সর্দ্দার, আমি পিতার স্নেহময় অঙ্কে বসে প্রতি নিশি তোমার অলৌ-কিক বীরত্বকাহিনী শুনেছি, আর মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পিতার মুখের পানে চেয়ে রয়েছি। আমার শিরায় শিরায় তড়িৎ খেলে গিয়েছে। সেই কাহিনী শুন্‌তে শুন্‌তে আমি গর্ব্ববিস্ফারিত বুকে পিতার কোল হ'তে নেমে গিয়ে, আমার লীলা-অসি আস্ফালন করতে করতে আমি অরাতির সনে বিগ্রহের কত ক্ষুদ্র অভিনয় দেখিয়েছি। কল্পনায় তোমার মূর্ত্তি গড়িয়ে নিয়ে তাঁরি পদতলে আমি দীক্ষা গ্রহণ করেছি।"

রহিম শা কহিলেন, "এস বন্ধু! রণে কিংবা বনে আজ হ'তে তুমি রহিমের চিরসহচর।"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

অজিতার আত্মত্যাগ।

কালীঘাট কালীমায়ের মন্দিরের মধ্যে অজিতা একাকিনী বসিয়া মায়ের আরাধনা করিতেছিলেন। আরাধনা শেষ হইলে তিনি একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "মা গো! আমি এত ক'রে তোর পায়ে মাথা রেখে কাঁদলাম, তুই তনয়ার ব্যথিত ক্রন্দন শুন্‌লি না? নির্ব্বাক্ নিশ্চল জড় স্পন্দহীন চেতনাবিহীন নির্ম্মম পাষাণের স্তূপ দাঁড়িয়ে আছিস্। বিশ্বমাতা! জানি না, কেন তোর বিশ্ব-মাতা নাম? ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করতে কেন তুই এত বাম? ভাল, সতীকুলরাণি! মহাশক্তিস্বরূপিণি!

যদি তোর অসুরনাশিনী শক্তির কণামাত্র অজিতার হৃদয়ে থাকে, তাহা হইলে কখনও দুষ্ট শোভাসিংহ, তাহার হাত হ'তে পরিত্রাণ পাবে না। পামর নিজ-হস্তে যে অনল প্রজ্বালিত করেছে, অসংশয় সেই অনলে ভস্মীভূত হবে। আর শোন্ জননি! যদি অরাতিরুধির পান ক'রে তোর শোণিত-পিপাসা না মিটে থাকে, তা হ'লে এই ভক্ত-হৃদয়ের সুতপ্ত শোণিতে তোর ওই বিশুষ্ক খর্পর এখনই পূরাব। মাতঃ! এখনই এই শাণিত ছুরিকা আমূল আমার হৃদয়-কন্দরে বসিয়ে দিব। অর্জ্জুনের বাণবিদ্ধ বসুন্ধরা হ'তে ভোগবতী উৎস-সম আমার হৃদয়-শোণিত ছুটে উঠ্‌বে। কপালিনি! বদন-ব্যাদানি! আনন্দে তাহা পান কর্‌বি।"

অজিতা তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিবার জন্য ছুরিকা উত্তোলিত করিল, পশ্চাৎ হইতে জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গী আসিয়া ধীরোদাত্ত স্বরে ডাকিলেন, "মা অজিতা!"

অজিতা কহিল, "কেন পিতা!"

চৌরঙ্গী কহিলেন, "আবার মোহ? দেবকার্য্যে ব্রতী হয়ে অসুর-শক্তিকে হৃদয়ের মাঝে সঙ্গোপনে পোষণ কর্‌ছো? মা! এখনও স্বার্থ বলি দিতে পার্‌লে না?"

অজিতা কহিল, "পিতা! স্বার্থ-পূর্ণা ভাগ্যহীনা নারী আমি। আমাকে কি স্বার্থ বলি দিতে বল্‌ছেন? শক্তিহীনা নারী আমি। আমা হ'তে জগতের কি উপকার সম্ভবে?"

চৌরঙ্গী কহিলেন, "নারী শক্তিহীনা, এই কথা ব'লে আদ্যাশক্তি জননীর অপমান করো না। ওই দেখ্ মাতা! তোর কথা শুনে, জননীর স্নেহাননে বিষাদ-কালিমা ঘনায়ে এলো। আজি এই বিশ্বব্যাপী জাগরণ-দিনে, তুই কেন মা ঘুমায়ে থাকৃবি? তোর ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে, জননীর হৃদয়ের ব্যথা তুই কেন না দূর কর্‌বি?"

অজিতা কহিল, "আপনি তো সকলি জানেন পিতা! কোন্ নিদারুণ ব্যথা নিরন্তর অজিতার হৃদয়ে জেগে রয়েছে?"

চৌরঙ্গী কহিলেন, "মাতঃ! তুমি যদি নিজের হৃদয়ের ব্যথা ভুলে না যাও, যদি তুমি নিজের স্বার্থ নিয়ে রাত-দিন ব্যস্ত থাক, তা হ'লে জন্মভূমি জননীর দুঃখ কেমন ক'রে দূর হবে? সত্য বটে, শোভাসিংহ পশু হ'তে নির্দ্দয়-হৃদয়। কিন্তু সে আজ মায়ের কাজে ব্রতী। তুমি মায়ের মেয়ে হয়ে, মায়ের কার্য্যে অন্তরায় হবে?"

অজিতা কহিল, "না পিতা! কখনও না। যায় যাক্—আমার ছার প্রাণ। ঘায় যাক্ আমার বক্ষো-বন্ধ নিরাশা-পীড়নে শত খণ্ডে টুটে যাক্। সোনার বাঙ্গালা! তোমার উদ্ধারপথে অজিতা কখনও কণ্টক হবে না। বিশ্বমাতা! নারী তুমি! নারীর হৃদয় জান তুমি। আমার দুর্ব্বল হৃদয়ে বল দাও মা।"

চৌরঙ্গী অজিতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "মা! আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি জয়যুক্তা হও।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ।

যখন বাঙ্গালার চারিদিকে রাজ্যজোড়া বিপ্লবানল জ্বলিতেছিল, তখন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা অশীতি-বর্ষীয় বৃদ্ধ সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ তাঁহার প্রাসাদের একটি নিভৃত কক্ষে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, কে বলে আমিরীতে সুখ? কে বলে ঐশ্বর্য্যে শান্তি? কে বলে রাজত্বে পরিতৃপ্তি? মেহেরবান্ খোদা! তোমার দাসানুদাস ইব্রাহিম খাঁকে দুনিয়ার ভোগ্যবস্তু সবই তো দিয়েছ। সুবে বাঙ্গালা-বেহার-উড়িষ্যার নবাবী, অগণ্য ধনরত্নপূর্ণ কোষাগার, পরম পিতৃবৎসল দুনিয়ার সেরা পুত্ররত্ন, লয়লার মত রূপবতী ও গুণবতী কন্যা জুলিখা, প্রেমের অফুরন্ত উৎসস্বরূপিণী নয়নানন্দ-দায়িনী প্রণয়িনী দরিয়া। দুনিয়ার এত ঐশ্বর্য্য কাহার আছে? কাহার ভাণ্ডার এত রত্নে পরিপূর্ণ? আমার একমাত্র চিন্তা, জুলিখার কি হবে? জুলিকে একটি সৎপাত্রে ন্যস্ত করিতে পার্‌লেই, বৃদ্ধ ইব্রাহিম নির্ভাবনা হয়ে, ঈশ্বর-চিন্তায় শেষ জীবন অতিবাহিত কর্‌তে পার্‌তো। আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি যে, সেনাপতি মবারক জুলিখার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। কিন্তু মবারকের মত নৃশংস হীনচেতা ক্রীতদাসের হস্তে এই লোকললামভূতা কন্যারত্নকে অর্পণ করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। তবে রাজ্যের অবস্থা চিন্তা ক'রে আমি বেশ বুঝ্‌ছি যে, এখন মবারককে চটালে আমার অনেক বিপদ্। বরং তাকে প্রলোভনে

ভুলাতে পার্‌লে আমার অনেক সুবিধা। জবরদস্তের পত্রে বুঝ্‌তে পারলুম যে, সম্রাট্‌পুত্র আজিমুখান্ জুলিখার অপরূপ রূপলাবণ্য ও গুণগ্রামের কথা শুনে তার পাণিগ্রহণেচ্ছু হয়েছেন। সেইজন্য তিনি জুলিখাকে রাজমহলে পাঠাবার জন্য আমায় অনুরোধ করেছেন। যদি জুলিখা সম্রাট্-পুত্রের চিত্তাকর্ষণ কর্‌তে পারে, তা হ'লে বৃদ্ধ ইব্রাহিম খাঁ নির্ভাবনায় মর্‌তে পারে।"

সহসা সুবাদারের চিন্তাস্রোত প্রতিহত হইল। এক জন পরিচারক কক্ষে প্রবেশিয়া নিবেদন করিল, "জাঁহাপনা! সেনাপতি মবারক দ্বারদেশে।"

সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ কহিলেন, "গোলাম! তাহাকে এখনই এখানে আস্‌তে বল।"

মবারক আসিয়া যথাবিধি সুবাদারকে অভিবাদন করিয়া যুক্তকরে কহিল, "জাঁহাপনা! গোলামকে কিসের জন্য স্মরণ করেছেন?"

ইব্রাহিম খাঁ কহিলেন, "কোনও বিশষ রাজনৈতিক প্রয়োজনে জুলিখাকে উপযুক্ত অনুচর সহ নৌকাপথে রাজমহলে পাঠাতে মনস্থ করেছি। তুমি উপযুক্ত সৈন্যবল নিয়ে, এই কার্য্যে যেতে প্রস্তুত হও। মবারক, তোমার ন্যায় বিশ্বস্ত লোক ভিন্ন আর কাহারও উপর আমি এই ভার দিতে পারি না।"

মবারক কহিল, "জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্য্য।"

ইব্রাহিম খাঁ কহিলেন, "তা হ'লে তুমি এক দল ফৌজ নিয়ে স্থলপথে যাত্রা কর্‌তে প্রস্তুত হও গিয়ে। স্থলপথে নদীর ধার দিয়ে দিয়ে বরাবর বজরার সঙ্গে সঙ্গে যাবে।"

মবারক কহিল, "যে আজ্ঞা, জাঁহাপনা!"

ফিরিবার সময় মবারক মনে মনে বলিতে লাগিল, "বৃদ্ধ সুবাদার! জানি আমি, তুমি চিরদিন রাজনীতিগুটিকা চালনে সিদ্ধহস্ত; তুমি হৃদয়ের ভাব সঙ্গোপন করতে চিরাভ্যস্ত। কিন্তু ভেব না যে, রাজনীতিক্ষেত্রে মবারকও অজ্ঞ শিশুমাত্র, কূট মনস্তত্ত্বনির্ণয়ে নিতান্ত অপারগ। তুমি ঠিক বুঝেছ যে, মবারক তাহার হৃদয়ের মাঝে উচ্চ আশা পোষণ কর্‌ছে। তুমি নিজচক্ষে তাহার কার্য্যদক্ষতা দেখেছ। তাই তুমি ছলে তাহাকে নির্ব্বাসিত করতে চাও। তুমি স্থির বুঝেছ যে, জুলিখা আমার প্রাণ হ'তেও অধিকতর প্রিয়। সেই অটুট বিশ্বাসে আমার উপর জেনে শুনে তোমার সম্মানরক্ষার ভার অর্পণ করেছ। সত্যই জুলিখা আমার নিকট আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তর। তাহার পদে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হ'লে, সেই কণ্টক উদ্ধার করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে, আমি অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করতে পারি। কিন্তু ঘুণাক্ষরে জানি যদি যে, সেই নিরমমা আমার হইবে না, তা হ'লে আবার মবারক নখাঘাতে সেই প্রণয়-প্রতিমার শির অবলীলাক্রমে ছেদন কর্‌তে পারে।"

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

— :*:—

দেবতা ও দানব।

শোভাসিংহের কক্ষে বসিয়াই পাঠান-সর্দ্দার রহিম শা ও শোভাসিংহ সম্রাট্-পুত্র আজিমুখানের অভিযানে বাধা দিবার জন্য যে সকল রণনীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন, সেই সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিলেন।

এমন সময়ে দৌবারিক আসিয়া সংবাদ দিল যে, বর্দ্ধমানে যে দূত প্রেরিত হইয়াছিল, সেই দূত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

শোভাসিংহ কহিলেন, "এখনই তাকে এখানে নিয়ে এস।"

দূত আসিয়া যথোচিত অভিবাদন করিয়া নির্ব্বাক্‌ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

শোভাসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "সংবাদ কি দূত? আশা করি, আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ ক'রে ফিরে এসেছ। বর্দ্ধমান-অধিপতি তোমাকে সমাদরে সংবর্দ্ধনা করেছিলেন তো?"

দূত কহিল, "কি বল্‌বো দেব! সে কথা বল্‌তে মুখে বাক্ সরে না। অপমানে বুক ফেটে যায়। আপনার পত্রখানি পাঠ ক'রে, বৃদ্ধ রাজা তাঁর পুত্রের দিকে চেয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, 'দেখ পুত্র! হীনবীর্য্য জম্বুকের অভিলাষ দেখ। দস্যুদলপতি শোভাসিংহ বর্দ্ধমান-রাজ-দুহিতার পরিণয়-প্রার্থী। শৃগাল হয়ে কেশরী-নন্দিনী লাভ করতে তার বাসনা।' তার পরে আমার দিকে বিদ্রূপের কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে, হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, 'রে প্রগল্‌ভ! দূত ব'লে তোকে ক্ষমা করলাম। তা না হ'লে এতক্ষণে বধ্যভূমি তোর রক্তে সিক্ত হ'ত। আরে ধৃষ্ট! তোর প্রভু

খলমতি দস্যুসর্দ্দার শোভাসিংহকে বল গিয়ে যে, সে যদি শতযুগ ধ'রে বদরিকাশ্রমে তপস্যা করে, সেই পুণ্যফলে কখনও কোন সুপ্রতিষ্ঠ রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে, তখন বর্দ্ধমান রাজসুতা তার গলায় বরমাল্য অর্পণ করবে।' আমায় ক্ষমা করুণ দেব! বার্ত্তাবহ আমি। ঘটনার যথাযথ স্বরূপ বর্ণনা করা আমার কর্ত্তব্য।"

দূতের কথা শুনিয়া শোভাসিংহ ক্রোধে জলিয়া উঠিয়া কহিলেন, "আরে আরে স্পর্দ্ধিত কুক্কুর! তুচ্ছ বংশগরিমায় মুগ্ধ হয়ে তুই আপনাকে বিস্মৃত হয়েছিস্! মোগল-সাহায্যে তুই এতই স্ফীত হয়েছিস্ যে, শোভাসিংহকে অপমান করতে সাহসী হয়েছিস্। ভাল, শীঘ্রই এর প্রতিফল লাভ করবি। পাঠান-সর্দ্দার! তুমি নিজকানে শুন্‌লে, বর্দ্ধমান-অধিপতি আমাকে কি অপমান করেছে। এর প্রতিশোধ গ্রহণ কর্‌তে, তুমি আমায় সাহায্য করবে তো?"

রহিম শা কহিলেন, "ন্যায্য কার্য্যে রহিম শা কবে পরাঙ্মুখ বল, শোভাসিংহ! তবে যদি রহিমের বামেতর কর কখনও অধর্ম্মের সেবা করে, সেই দণ্ডে আমার অন্য ভুজ অসির আঘাতে তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করবে।"

শোভাসিংহ কহিলেন, "তা হ'লে তুমি বল্‌তে চাও পাঠান-সর্দ্দার! যে আমারই এটা অন্যায়।"

রহিম শা কহিলেন, "শোভাসিংহ! সত্য যাহা, তাহা চিরদিনই সত্য।"

শোভাসিংহ কহিলেন, "বহুকাল হ'তে রাজা কৃষ্ণরাম আমার হস্তে তাহার কন্যাকে অর্পণ কর্‌তে প্রতিশ্রুত ছিল। এখন যদি প্রবঞ্চক তাহার প্রতিজ্ঞা পালন না করে, আমি এই তীক্ষ্ণধার অসির আঘাতে তাহার হৃদয় বিদ্ধ কর্‌বো। তার পরে সেই রক্তমাখা হাতে তাহার কন্যাকে বাসরের পুষ্প-শয্যাতলে নিয়ে যাবো।"

রহিম শা জিজ্ঞাসিলেন, "ইচ্ছা ক'রে সে কি তখন তাহার পিতৃহন্তার গলে বরমাল্য দিবে?"

শোভাসিংহ কহিলেন, "ইচ্ছা ক'রে না দিলে আমি বলপ্রয়োগেও কুণ্ঠিত হব না। আমার অভীষ্ট-সিদ্ধির পথে কে অন্তরায় হবে?"

রহিম শা কহিলেন, শোভাসিংহ! যদি তুমি বীরধর্ম্ম ভুলে রমণীর উপর অত্যাচার কর, রহিম শা-ই তোমার স্বার্থের পথে বিষম কণ্টক হবে।"

শোভাসিংহ কহিলেন, "তাই যদি, তবে এই দণ্ডে সেই কণ্টক আমি উদ্ধার কর্‌বো। ওই দেখ পাঠান-সর্দ্দার! ভিত্তিগাত্রে অস্ত্র সমুদয় বিলম্বিত রয়েছে। যাহা ইচ্ছা বেছে লও। দৃঢ় লৌহবর্ম্মে তোমার দেহ আবরিয়া লও। শিরস্ত্রাণে শির মণ্ডিত কর। বক্ষে দুর্ভেদ্য কবচ পরিধান কর। একবার ইষ্টদেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া লও। রহিম শা! হয় তুমি, নয় শোভাসিংহ, ধরিত্রীর বুকে দুই জনে একসঙ্গে আর থাকবো না।"

রহিম শা কহিলেন, "শোভাসিংহ! তোমার এই নিষ্ঠুর সঙ্কল্প পরিহার কর। জগতে মিত্রতাই স্বর্গীয় পীযূষধারা। বিশ্বধাতা সেই সুধা অকৃপণ করে বিশ্ববাসীর শিরে ঢাল্‌ছেন। সেই সুধা পায়ে ঠেলে ফেলে, ঈর্ষার কালকূট সযত্নে আপন কণ্ঠে ঢেলে দিও না। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের অনাদর ক'র না।"

শোভাসিংহ কহিলেন, "আমি তোমার কপটতা-পূর্ণ বচনবিন্যাস শুন্‌তে চাই না। আমার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র শোণিত থাকতে, আমি এই সঙ্কল্প ত্যাগ কর্‌বো না। পাঠান-সর্দ্দার! বীর তুমি। তবে কেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাঙ্মুখ?"

রহিম শা কহিলেন, "শোভাসিংহ! মিত্র তুমি।"

শোভাসিংহ কহিলেন "না! না! মিথ্যাকথা। রহিম শা! আজ হ'তে আমি তোমার ঘোর শত্রু।"

রহিম শা কহিলেন, "শত্রু পরিচয় মাত্রে রহিম শা অরাতিগাত্রে শস্ত্রক্ষেপ করে না।"

শোভাসিংহ কহিলেন, "এই তবে লও পাঠান! শত্রু-ব্যবহার। কাপুরুষ! বীর ব'লে পরিচয় দিয়ে যেই জন জম্বুক সমান দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয়, পদাঘাত উপযুক্ত পুরস্কার তার।"

রহিম শা কহিলেন, "বুঝিলাম শোভাসিংহ! নিতান্তই কৃতান্ত তোমাকে স্মরণ করেছে।"

শোভাসিংহ কহিলেন, "বাক্যবীর! বাক্য রেখে অস্ত্র লও।"

রহিম শা কহিলেন, "আজ সয়তান তোমার স্কন্ধে ভর করেছে। ভাল, আত্মরক্ষা কর, শোভাসিংহ!"

রহিম শা কৃপাণ উন্মুক্ত করিয়া শোভাসিংহকে আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন।

এমন সময় জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গী আসিয়া সেই

কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "পাঠান-সর্দ্দার! ক্ষান্ত হও। শোভাসিংহ! দেবীদত্ত অসি ভ্রাতৃরক্তে কলঙ্কিত ক'র না। ওই দেখ, দেশ-বৈরী মোগল তোমার দ্বারে সমাগত। এ সময়ে তোমাদের আত্ম-দ্বন্দ্বে শক্তিক্ষয় করা কি উচিত?"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

ষড়্‌যন্ত্র ধরা পড়িল।

সুবাদারের সেনাপতি তাহার কক্ষমধ্যে একাকী চিন্তিতভাবে পাদচারণা করিতেছিলেন ও আপন মনে কহিতেছিলেন, "আমার হৃদয়ের অতি নিভৃত প্রদেশে পরিপুষ্ট কামনা হচ্ছে, স্বর্ণপ্রসূ বাঙ্গালার রত্নসিংহাসন করতলগত করা। ইংরাজ বণিকের সহায়তা বিনা আমার সে কামনা পূর্ণ হবে না। তাহাদের সাহায্য পাবো না? আচ্ছা দেখি তো একবার চেষ্টা ক'রে। ফরিদ!"

ফরিদ আসিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কহিল, "বান্দা হাজির।"

মবারক কহিলেন, "শুন ফরিদ! তোমার উপর আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস। তাই আজ তোমাকে এই গুরুতর কার্য্যের ভারার্পণ করছি। যদি কাজ হাঁসিল করতে পার, তা হ'লে বিস্তর শিরোপা দেব।"

ফরিদ কহিল, "হুজুর—মালিক। ইচ্ছা করলে শিরোপাও দিতে পারেন, আবার শিরপা ক'রে জ্যান্ত কবরও দিতে পারেন। এখন আজ্ঞা করুন দিকি —কি করতে হবে?"

মবারক কহিলেন, "এই পত্রখানি নাও। একটি দ্রুতগামী অশ্বে আজই কলিকাতার দিকে রওনা হও। রাত্রিদিন ঘোড়া চালিয়ে গিয়ে, গোবিন্দ-পুরের ইংরাজের কেল্লার অধ্যক্ষ কাপ্তেন নিকল্‌সনকে এই চিঠিখানি দাও গিয়ে। কেমন, পারবে তো?"

ফরিদ কহিল, "এ আর পারবো না, হুজুর?"

মবারক কহিলেন, "শুন ফরিদ! জান্ যায়, তাও ভাল। কিন্তু পত্র কাপ্তেন সাহেব ছাড়া অন্য কোনও লোকের হাতে যেন না পড়ে।"

ফরিদ কহিল, "যে আজ্ঞা, হুজুর!"

মবারক একটি মুদ্রাপূর্ণ থলি ফরিদের হাতে দিয়া কহিলেন, "তোমার পথ খরচের জন্য এই টাকা নাও। এতেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে।"

ফরিদ কহিল, "হুজুরের কৃপাদৃষ্টি থাক্‌লে, যথেষ্ট হলেও হবে, না হলেও হবে। আমি তা হ'লে এখন বিদায় হ'তে পারি?"

মবারক কহিলেন, "হাঁ! খুব হুঁসিয়ার। পত্র বেহাত হ'লে কিন্তু তোমার জান্ যাবে।"

ফরিদ প্রস্থান করিলে পর মবারক আবার কক্ষ-মধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন ও ভাবিতে লাগি-লেন, "আমি এত দিন ধ'রে যে আশা-লতিকায় সলিল সেচন ক'রে আস্‌ছি, সেটি এখন গুচ্ছ গুচ্ছ ফলভারে অবনত হয়ে পড়ছে। সেই ফলভোগ কি বিধাতা আমার ভাগ্যে লিখেছেন? কি জানি, কিছুই বল্‌তে পারি না। আমি বেঁচে থাক্‌তে জুলিখা অপরের হবে! তাহা আমি কখনও দেখ্‌তে পার্‌বো না।"

সেনাপতি মবারকের আদেশমত ফরিদ দিবা-রাত্রি ঘোড়া ছুটাইয়া সুতানুটীর বনভূমির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। বনের মধ্যে দলে দলে রহিম শার সৈন্যগণ সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত রহিয়াছে।

ফরিদ আপন মনে কহিতে লাগিল, "আরে বাপ্‌রে বাপ্। ভেবেছিলাম যে, যায়গাটা নিরিবিলি। এখানে আবার দেখছি যে, বেজায় ঝামিলি। এখানে বাঘ ডাকছে 'হালুম' ওখানে সাপ করছে 'ফোঁস্।' কি মুস্কিল! পড়্‌বি তো পড়্, একেবারে একটি বাঘের মুখেই গিয়ে পড়েছিলুম। ভাগ্যিস্—পাস কাটিয়ে স'রে পড়েছি, তাই রক্ষে। নইলে তো গিয়েছিলাম আর কি? রসো বাবা! আমি দেখে নিই যে, আমার থানে-থানে সব বজায় আছে কি না? চোখ দুটো তো আছে, তা না হ'লে আর এই জঙ্গলের মধ্যে এসে ঢুকলাম কেমন ক'রে? (মুখ ব্যাদান করিয়া) মুখখানা তো আছে? না! ভাল ক'রে দেখতে হ'ল। পুঁটুলি থেকে কিছু কাবাব বের ক'রে খেয়ে দেখি। যদি খাওয়া যায়, তবেই বুঝবো যে, মুখটা ঠিক আছে। (তথাকরণ) না! মুখটা তা হ'লে বোধ হয় আছে। (নাকে হাত দিয়া) নাক-টাও ত' এখনও পর্য্যন্ত আছে দেখছি। এখন যত গোল বাধছে—এই মাথাটা নিয়ে। এইটের উপরই লোকের নজর বেশী। (মাথায় হাত বুলাইয়া) এই

বাবা! আসল জিনিসটাই দেখছি নেই। কি হবে খোদা! শিরোপার লোভে কি শেষ-কালে মাথাটা রেখে যেতে হল। আমি এখন এই অন্ধ কন্ধকাটা হয়ে, দেশে ফিরে যাব কি ক'রে? আগ হা।—বিবি আমার দাড়িই বা চুমুবে দেবে কি করে?"

এক জন দস্যু নিকটে প্রহরায় ছিল। সে আসিয়া ফরিদকে আপনা আপনি বকিতে দেখিয়া, বাতুল অথবা শত্রুর চর মনে করিয়া জিজ্ঞাসিল, "তুই কে রে এখানে?"

ফরিদ উত্তর দিল, "দেখ্‌তে পাচ্ছ না, আমি এক জন কবন্ধ।"

দস্যু কহিল, "কবন্ধ কি রকম? মস্ত নাদুষ-নুদুষ দেহখানি। তার ওপর গজে মাপা পূরো এক গজ বহরের দাড়ি-সমেত একটি মাথা। কবন্ধ কি রকম? তা কবন্ধই হও, আর মামদোই হও, তোমার পরিচয় না পেলে ছাড়ছি নি।"

ফরিদ কহিল, "কেন বলুন্ তো মশায়! এতটা কুটুম্বিতে? মশায়ের কি ভগিনীর বিবাহের জন্য পাত্র অনুসন্ধান কর্‌তে বেরুনো হয়েছে?"

দস্যু কহিলেন, "তবে রে শালা বদ্‌মায়েস্! মস্করা ক'রে ভোলাবে?"

ফরিদ কহিল, "আমার দোষ কি বলুন, মশায়ই তো মস্করার সম্পর্ক পাতাচ্ছেন।"

দস্যু কহিল, "যাই বল না কেন সোনার চাঁদ! আমায় তুমি ফাঁকি দিয়ে যেতে পারছ না। আমাদের সর্দ্দারের হুকুম আজকাল বড় কড়া।"

ফরিদ কহিল, "আপনাদের এই সর্দ্দারটি কে?"

দস্যু কহিল, "পাঠান-সর্দ্দার রহিম শা।"

ফরিদ কহিল, "ওঃ! আপনারা তা হ'লে বনেদি লোক। তা নিন্—এই টাকার থলিটি। আমায় ছেড়ে দিন।"

দস্যু কহিল, "দে! টাকার থলি দে, আর তোর ওই জামা আর পাগড়ীটা খুলে দে।"

ফরিদ কহিল, "কি বাবা! শেষকালটায় কুটুম্ব লোকটাকে কপ্নী পরিয়ে বিদেয় কর্‌বে? এই ন্যাও—পড়েছি যখন বনেদি লোকের হাতে।"

ফরিদ পাগড়ীটি খুলিয়া দিবার সময় মবারকের চিঠিখানি আস্তে আস্তে সরাইয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। দস্যু তাহা দেখিয়া কহিল, "তোর পাগড়ীর মধ্যে ওই চিঠি কিসের?"

ফরিদ কহিল, "ও চিঠি নয়, চিঠি নয়—একখান ছেঁড়া কাগজ। আমার সব নাও, ওইখানি নিও না।"

দস্যু কহিল, "ওঃ! বুঝতে পেরেছি! তুই শত্রুর গুপ্তচর।"

দুই জনে এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছিল, এমন সময় চৌরঙ্গী-বাবা আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন।

চৌরঙ্গী জিজ্ঞাসিলেন, "প্রহরি! এ কে?"

দস্যু উত্তর দিল, "ঠাকুরজি! আমি এই ঘাঁটীতে পাহারা দিচ্ছিলাম। এই লোকটা ঐখানে ব'সে বিড় বিড় ক'রে বক্‌ছিল। আমার সন্দেহ হওয়ায় আমি ওকে আটক করেছি। সন্ধান কর্‌তে কর্‌তে ওর পাকড়ীর ভেতর এই চিঠিখানি পাওয়া গিয়েছে।"

প্রহরী পত্রখানি চৌরঙ্গী-বাবার হস্তে দিল। তিনি পত্রখানি পাঠ করিয়া কহিলেন, "একে নিয়ে গিয়ে নজরবন্দী ক'রে কয়েদে রাখ। পত্রখানি হস্তগত হওয়ায় আমাদের খুব সুবিধা হয়ে গেল। প্রহরি! তুমি পুরস্কার পাবে।"

চৌরঙ্গী-বাবা পত্রখানি লইয়া তখনই রহিম শার সহিত দেখা করিতে গেলেন।

দস্যু ফরিদকে কহিল, "আর ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাক্‌লে কি হবে মিয়া! চল এখন গারদে ব'সে ঠাণ্ডি পোলাও আর বাইগণকা কোপ্তা খাও গিয়ে।"

———

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

জুলিখার চোখ ফুটিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পদ্মা ও খড়িয়া নদীর সঙ্গমস্থলে নদীবক্ষে একখানি ষোলদাঁড়ের ধবধবে সাদা রংকরা প্রকাণ্ড বজরা পাল তুলিয়া দিয়া রাজহংসীর মত ভাসিয়া যাইতেছিল।

সহসা ঈশানকোণে মেঘের সঞ্চার দেখিয়া মাঝি দাঁড়ীদিগকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য কহিল, "ওরে, টান্ দে টান্ দে। দেখছিস্ না, কি জবর ঝাঁপি

আসতেছে। কালবৈশাখী। তাতে যায়গাডা খারাপ—তেমোহনী। আঁখি আলি লাক্ দে কান্ দে পানি ছুটুতি সুরু হবে য়্যানে। এহন জোরে টান্ দে। বলি তোরা প্যাচাল্ পার্‌বি, না টান দিবি? ট্যাকের মাথায় কিছু নজর হতিছে? মাস্তুম পাতিছিস্ নাকি?"

এক জন দাঁড়ী কহিল, "মাঝি খোয়াব দেখতিছে।"

মাঝি কহিল, "খোয়াব কি—কি? ট্যার্‌ডা পাবি য়্যানে।"

ঠিক সেই সময়ে প্রবলবেগে ঝটিকা উঠিল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তাহার সঙ্গে অজস্র করকাপাত হইতে লাগিল।

রহিম শা ও আমিনা তীরে দাঁড়াইয়া সেই বজরাখানির গতি লক্ষ্য করিতেছিলেন।

আমিনা জিজ্ঞাসিল, "সর্দ্দার! বজরা থেকে বন্দুকের আওয়াজ হ'ল কেন? বজরার সঙ্গে কি সুবাদারের ফৌজ আছে?"

রহিম শা কহিলেন, "না! ফৌজ ডাঙ্গাপথে আস্‌ছে। বজরার ওপর কয়েকজন পাহারার সিপাহী আছে, তারাই বিপদ সন্দেহ ক'রে বন্দুকের আওয়াজে ডাঙ্গার ফৌজকে কাছে আসতে ইঙ্গিত করছে। ডাঙ্গার ফৌজ কিন্তু এখনও অনেক দূরে রয়েছে। বিশেষতঃ, এই দুর্য্যোগে তারা বেশী এগুতেও পারছে না। এগুলেই আমরা অতর্কিতভাবে তাদের ওপরে প'ড়ে তাদেরকে একেবারে বিধ্বস্ত কর্‌তে পার্‌বো।"

আমিনা জিজ্ঞাসিল, "আমার ওপর কি ভার দিচ্ছেন সর্দ্দার?"

রহিম শা কহিল, "আমিন! আজিকার সকলের চেয়ে কঠিন কার্য্যের ভারই তোমার ওপর। তুমি পাঁচখানি সৈন্যপূর্ণ ছিপ সঙ্গে ক'রে, সন্ধ্যার অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে, ভেটিয়ে গিয়ে বজরা ঘেরোয়া করবে। গুরুতর প্রয়োজন ভিন্ন অনর্থক রক্তপাত করো না—দেখো! নবাবজাদীর একটিমাত্র কেশও কেহ যেন না স্পর্শ করে। খুব সাবধান।"

আমিনা কহিল, "যে আজ্ঞা সর্দ্দার! আপনার আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে।"

আমিনা প্রস্থান করিলে পর রহিম শা সেই একই স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া বজরার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। আমিনার ছিপ্ কয়খানি পদ্মাবক্ষে দিক্‌চক্রবালে ছয়টি ভাসমান কাষ্ঠফলকের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। সেই সময়ে এক জন দস্যু আসিয়া রহিম শাকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "সর্দ্দার! সব ঠিক।"

রহিম শা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুবাদারের ফৌজ কত দূরে আছে?"

দস্যু কহিল, "এখান হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে। আমরা নবাবী ফৌজকে একেবারে চারিদিক্ হ'তে বেড়াজালে ঘিরে ফেলে দিইছি। সর্দ্দার সইফ খাঁ এই সংবাদ আপনাকে জানিয়েছেন।"

রহিম শা কহিলেন, "আচ্ছা যাও—সর্দ্দার সইফ খাঁকে জানাও গিয়ে যে, তিনি যেন খুব সতর্কভাবে ফৌজদারী ফৌজ ঘেরোয়া ক'রে রাখেন। তারা যেন কোনমতে নৌকাপথের লোকদের সাহায্য করতে না পারে।"

ও দিকে আমিনারও ছিপ গিয়া নবাবজাদীর বজরা ঘিরিয়া ফেলিল।

ভিতর হইতে পুরুষবেশী আমিনা চীৎকার করিয়া কহিল, "শুন প্রহরিগণ! যদি প্রাণে বাঁচিতে চাও, যে যেমন আছ, স্থিরভাবে থাক, নড়ো চড়ো না। ওই দেখ, পদ্মাতটে যত দূর দৃষ্টি চলে, স্তরে স্তরে সর্দ্দার রহিম শার সৈন্যদল সজ্জিত। নবাবনন্দিনীকে জানাও যে, কোন একটি বিশেষ প্রয়োজনে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করতে চাই।"

নবাবজাদী বজরার একটি গবাক্ষ খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া কহিলেন, "দস্যু! আমার বজরা লুঠ করতে এসেছ, লুঠ কর। বজরার আসবাবপত্র, আমার গায়ের গহনা, টাকা-কড়ি, সব তোমরা নাও। আমার এইমাত্র মিনতি, তোমরা অসহায়া রমণীর প্রতি অত্যাচার করো না।"

আমিনা কহিল, "নবাবজাদি! আপনি ভুল বুঝছেন। আমরা দস্যু নহি, আপনার শত্রু নহি। বন্ধুবেশে শত্রু আপনার সাথে সাথে ফির্‌ছে। তারি হাত হ'তে আপনাকে বাঁচাবার জন্য আমরা আপনাকে এই অনর্থক কষ্টটুকু দিয়েছি।"

জুলিখা কহিলেন, "বালক! চাপল্য প্রকাশের এ সময় নহে। আমার এই বজরায় মণিমুক্তা,

টাকা-কড়ি যাহা কিছু আছে, সব তোমরা লও। আমায় অক্ষত শরীরে যাইতে দাও

আমিনা কহিল, "পাঠান-সর্দ্দার রহিম শার শিষ্যগণ রমণীর উপর পীড়ন করে না। নবাবজাদি, চেনেন কি এই লিপি-খানির শিরোনামার হস্তাক্ষর কাহার?"

জুলিখা বিস্মিতভাবে কহিলেন, "এ ত দেখছি সেনাপতি মবারকের হস্তাক্ষর।"

আমিনা কহিল, "আপনার অনুমান ঠিক নবাবজাদি! পত্রখানি পাঠ করলেই, বুঝতে পারবেন যে, আপনার প্রকৃত শত্রু কে? উদারচেতা, শত্রু-মিত্রে সমান-সদয় পাঠান-সর্দ্দার রহিম শা—অথবা পরান্নভোজী, কুকুর অপেক্ষাও হীন, বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মবারক।"

জুলিখা সেই পত্রখানি দুই তিনবার পাঠ করিয়া আমিনাকে কহিলেন, "ভাই! তোমাদের এই ঋণ আমি কোনও কালে শোধ দিতে পারিব না। পাঠান-সর্দ্দার রহিম শা সত্যই মানুষ নহেন, তিনি দেবতা।"

কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র পূর্ব্বে নবাবজাদী জুলিখা যে পাঠান-সর্দ্দার রহিম শাকে সাধারণ দস্যুজ্ঞানে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছিলেন, এখন কৃতজ্ঞতাযুক্ত হৃদয়ে তাঁহারি চরণোদ্দেশে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া আপনাকে নিতান্ত কৃতার্থন্মন্য মনে করিতে লাগিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

পাঠানের পরাজয়।

উল্লিখিত ঘটনার অল্পদিন পরেই, সুতানুটীর জঙ্গলের সন্নিকটে প্রবল বিজিগীষায় উন্মত্ত বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার আধিপত্য লইয়া দুইটি বিবদমান শক্তির সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের এক পক্ষে মহাপরাক্রান্ত মোগল-সম্রাট্ আরংজীব, অন্য পক্ষে বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার 'নির্ব্বাপিতবীর্য্য পাঠান। মোগলবাহিনীর নেতা ছিলেন স্বয়ং সম্রাট্পুত্র আজিমুশ্বান। মানসিংহের পুত্র অজিতসিংহ তাঁহার সহকারী হইয়া আসিয়াছিলেন। আর, পাঠানগণ সমবেত হইয়াছিল সর্দ্দার রহিম শার অর্দ্ধ-শশাঙ্কলাঞ্ছিত বৈজয়ন্তীতলে। হিন্দুবীর শোভাসিংহ তাঁহাকে প্রথমে কিছু সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহার উপর রুষ্ট হইয়া এই সুতানুটীর যুদ্ধের পূর্ব্বেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন।

এই যুদ্ধে পাঠানগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

বন্দুকের গুলীতে পাঠান-সর্দ্দার রহিম শার দুইটি চক্ষুই নষ্ট হইয়া গেল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া রণস্থলে পতিত হইলেন। পুরুষবেশী আমিনা বরাবর তাঁহার কাছে কাছে থাকিয়া মোগলের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। সে মূর্চ্ছিত অবস্থায় রহিম শার দেহ স্কন্ধে উঠাইয়া লইয়া দুর্গম বনপথ ধরিয়া নিবিড়তম জঙ্গলের মধ্যে লইয়া গিয়া রহিম শার প্রাণ বাঁচাইল।

মূর্চ্ছা অপনোদিত হইলে পাঠান-সর্দ্দার যখন শুনিলেন যে, মোগল জয়ী হইয়াছে, তখন ক্ষোভে, মনস্তাপে তাঁহার মন দগ্ধ হইতে লাগিল।

রহিম শা কহিলেন, "আমিন! আমিন! বল্তে পার, কোন্ পাপে অভাগা রহিম আজ দৃষ্টিশক্তিহীন? বহু দিন হ'ল, অনন্ত প্রতিভাময়ী আমিনার সাথে, আমার হৃদয়ের আলো নিভে গিয়েছে! দয়াময় খোদা! তাতেও আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ল না! আমার বাহিরের আলোটুকুও নিভিয়ে দিলে!"

আমিনা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল, "সর্দ্দার! একেবারে নিরাশ হয়ো না। তোমার চক্ষুর আঘাত সাংঘাতিক নয়। খোদার ইচ্ছায় আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে।"

রহিম শা কহিলেন, "কেন আমিন! এই যে সুদীর্ঘ জীবন ধ'রে জীবনের নাট্য অভিনয় ক'রে এলাম, এতেও কি সাধ মিটলো না? মাতার শোণিত-পুষ্ট অকৃতজ্ঞ অধম সন্তান আমি শত্রুহস্ত হ'তে মাতৃভূমি উদ্ধার করতে পারলাম না। বালক! আমার এই দগ্ধ মুখ ভাল ক'রে দেখাবার জন্য, আবার আমার এই লুপ্ত দৃষ্টি কি তুমি ফিরে নিতে বল?"

আমিনা কহিল, "সর্দ্দার! যতক্ষণ প্রাণ, আশাও ততক্ষণ।"

রহিম শা কহিলেন, "আরে রে রহস্যময় বালক আমিন! তোর কথা শুনে সত্য সত্য আমার হৃদয়ের লুপ্ত আশা জেগে ওঠে। ভবিষ্যের পটে অযুত কল্পনাস্বপ্ন বিচিত্রবর্ণে ফুটে ওঠে। আবার যখন অতীতের পানে ফিরে চাই, সব অন্ধকারময় দেখি।"

আমিনা কহিল, "সর্দ্দার, এ জগতে সবক্ষণস্থায়ী; সকলই ভঙ্গুর। শুধু প্রেম চিরন্তন। প্রেম মর্ত্ত্যধামে স্বর্গের নন্দন-কানন।"

রহিম শা কহিলেন, "মূর্খ আমি! সেই স্বর্গ আমি হাতে পেয়ে পায়ে ঠেলে দিয়েছি। কার্য্যের জন্য আমি আমার হৃদয়-দেবীকে বিসর্জ্জন দিয়েছি! তাতে কি ফল হ'ল আমিন! দেবতার আশীর্ব্বাদের মত মুহূর্ত্তের জন্য আমায় দেখা দিয়ে আমার হৃদয়ের উপাস্যা দেবী চ'লে গেল। জন্মভূমি জননীর পায়ের শৃঙ্খল মোচন হ'ল না, অনর্থক নররক্তে ধরণী প্লাবিত হলো। সব শেষে অন্ধ রহিমের জন্য, মোগলের কারার দ্বার খোলা আছে।"

আমিনা কহিল, "কখনও না, সর্দ্দার! আমার হৃদয়ে এক বিন্দু শোণিত থাকতে কখনও তাহা হবে না।"

রহিম একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "আরে অবোধ বালক! অগণন শত্রুসৈন্য এখনই এসে সুতানুটীর বন ঘিরে ফেল্‌বে। একেশ্বর কতক্ষণ তাদের সঙ্গে যুঝ্‌বে?"

আমিনা কহিল, "যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাক্‌বে; যতক্ষণ ধমনীতে এক বিন্দু শোণিত থাক্‌বে!"

রহিম শা কহিলেন, "বালক! অনর্থক এই আত্মবিসর্জ্জনে ফল কি?"

আমিনা কহিল, "ফলাফল জানি না সর্দ্দার! তুমি যে নীতি শিখায়েছ, তাই শিখেছি। তার যুক্তি নিজের হৃদয়ের কাছেও কখন জিজ্ঞাসা করি নাই। সে মীমাংসা মন নিজেই ক'রে নিয়েছে।"

রহিম শা কহিলেন, "ভাল! আমিন, আমি তোমার কথা শুনে বড় সুখী হলাম। যুক্তিহীন, তর্কহীন, সংশয়সন্দেহহীন যে প্রেম, সেই প্রেমই স্বর্গের প্রেম। তাহা মর্ত্ত্যের নয়। প্রাণসখা! তুমি রহিমের আজ্ঞা পালন করতে চিরদিনই প্রস্তুত ছিলে। এখনও আছ?"

আমিনা কহিল, "হাঁ, সর্দ্দার।"

রহিম শা কহিলেন, "দেখ, আপনাকে আবার ভাল ক'রে বুঝে নাও। আমার আজ্ঞা যতই কেন কঠিন হোক না, তাহা পালন করতে প্রস্তুত আছ? যদি দ্বিধা বোধ কর, কাজ নাই—থাক্ তবে।"

আমিনা কহিল, "না সর্দ্দার! তোমার আজ্ঞা যতই কেন কঠিন হোক না, পালন করবো।"

রহিম শা কহিলেন, "তুমি কি চাও যে, রহিম শা মোগলের বশ্যতা স্বীকার করবে?"

আমিনা কহিল, "কখনও না সর্দ্দার! তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।"

রহিম শা কহিলেন, "ঠিক বলেছ, সখা! তার চেয়ে মৃত্যু ভাল! বীর তুমি—তুমি ঠিক বুঝেছ, বীরের হৃদয় কোন্ উপাদানে গড়া। বীরের সপ্তস্তর আয়স আস্তরণের তলে হৃদয়ের অন্তস্তলে যে কালানল জ্বলে, তাতে কত তাপ, সেই দাবদাহে কত জ্বালা, তাহা বীরের হৃদয় ভিন্ন কে বুঝবে? আমিন্! আমিন্! বুঝি আমার পঞ্জরের অস্থিগুলি চূর্ণ হয়ে গেল। বুঝি বা আমার হৃদয়, বিক্ষুব্ধ বারিধির মত অযুত অযুত খণ্ডে আমার এই রক্তমাংসে গড়া বাধার রাশি চূর্ণ ক'রে দিলে। খোদা, বল দাও! আর কেন এই বিড়ম্বনা, আর কেন এই জঞ্জাল? দূরে যাও লৌহবর্ম্ম, বক্ষস্ত্রাণ, অক্ষয় কবচ শত বজ্র-শল্য দীর্ণ। আজ তোমাদের প্রয়োজন পূর্ণ। আমায় ছেড়ে, অন্য যোগ্য জন বেছে আশ্রয় লও গিয়ে।"

রহিম শা অস্ত্রবর্ম্মাদি নিজের গাত্র হইতে খুলিয়া দূরে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিতে লাগিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

বিজেতার দরবার।

সুতানুটীর যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া, সম্রাট্‌পুত্র আজিমুশ্বান বঙ্গে মোগলের প্রভাব দৃঢ়ীভূত করিলেন। বিজয়ী সৈন্যাধ্যক্ষগণকে ও তাঁহার সহায় স্থানীয় সামন্ত রাজা ও প্রাদেশিক শাসকবর্গকে আপ্যায়িত করিবার অভিপ্রায়ে, তিনি বর্দ্ধমান নগরে একটি প্রকাণ্ড দরবার ঘোষণা করিলেন। বর্দ্ধমান রাজপ্রাসাদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে একটি সুপরিসর মণ্ডপ নির্ম্মিত হইল। তাহা রাজোচিত গৌরবে পত্রপুষ্প-পতাকায় সজ্জিত হইল। রাজ্য-মধ্যে ডঙ্কা বাজাইয়া ঘোষণা করা হইল যে, দিনত্রয় মোগলসম্রাটের কোষাগারের দ্বার উন্মুক্ত রহিবে। রাজসিংহাসনতলে অর্থী প্রার্থী যে জন যে কামনা করিয়া উপস্থিত হইবে, সুসঙ্গত হইলে তাহার সেই কামনা তখনই পূর্ণ করা হইবে।

পলায়িত পাঠান-সর্দ্দারকে যে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় দরবার-মণ্ডপে উপস্থাপিত করিতে পারিবে, সে লক্ষমুদ্রা পারিতোষিক পাইবে, এইরূপ ঘোষণাও করা হইল।

সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ বৃদ্ধ ও অপটু হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে সুবাদারের মসনদ হইতে নামাইয়া দিয়া, তাঁহার পুত্র জবরদস্ত খাঁকে সুবাদারী দেওয়া হইল।

কুমার অজিতসিংহের সহিত বর্দ্ধমান-রাজদুহিতাকে পরিণয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া দুইটি প্রাচীন হিন্দুবংশের মধ্যে যৌন-সম্বন্ধ স্থাপিত করা হইল।

সম্রাট্-পুত্র আজিমুখান সুবাদার-পুত্রী জুলিখার রূপে ও গুণে তাহার প্রতি সাতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া আগরাতে ফিরিবেন, এই অভিপ্রায়ে তিনি সেই প্রকাশ্য দরবারমণ্ডপে জুলিখাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, "নবাবপুত্রি! আজ এই শুভ দিনে সকলেই তাহার ঈপ্সিত বস্তু লাভ কর্ছে। আমি নিজেই বা কেন বাদ যাবো?"

জুলিখা কহিলেন, "দুনিয়ার বাদশা আরংজীব, মহিমায়, প্রভাবে, গৌরবে, বিশ্বস্রষ্টা খোদার সমান। তাঁহার পুত্রের আবার ঈপ্সিত বস্তু লাভের অন্তরায় কি?"

আজিমুখান কহিলেন, "আমার ঈপ্সিত বস্তু মর্ত্ত্যের নহে, যে স্বর্গের অপ্সরা রাজরাজেশ্বরীরূপে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে উৎসবমণ্ডপ আলো কর্ছেন—তিনি।

জুলিখার মুখ লজ্জায় গোলাপফুলের মত লাল হইয়া উঠিল। আবেগকম্পিত কণ্ঠে সে কহিল, "শাহজাদা! আজ আপনার সিংহাসনতলে যে জন যে প্রার্থনা জ্ঞাপন কর্ছেন, আপনি তাহারই মনস্কামনা পূর্ণ কর্ছেন। কিঙ্করীরও একটি ভিক্ষা আছে।"

আজিমুখান কহিলেন, "সুন্দরি! ভিক্ষা নাম মুখেও এনো না। প্রেমবলে তুমি আমার কর হইতে তোমার প্রাপ্য ছিনিয়ে নেবে। অমৃতভাষিণি! তোমার অভিলাষ কি, তা প্রকাশ ক'রে বল।"

জুলিখা কহিল, "শাহজাদা! আপনি ন্যায়ধর্ম্ম-অবতার। দেখ্বেন সম্রাট্পুত্র! সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা কর্বেন। যদি আপনি দাসীকে সত্য সত্য হৃদয়কোণে স্থান দিয়ে থাকেন, তা হ'লে আমি আপনার পদতলে ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে নিজেকে ফিরিয়ে চাইছি?"

শাহাজাদা আজিমুখান কহিলেন, "সুন্দরি! তোমার পায়ে প্রাণ বিকায়েছি। তার কেন এত অনাদর?"

জুলিখা কহিল "না শাহজাদা! আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে কর্বেন না। আপনার দয়া বহুমূল্য উপহারের ন্যায় সর্ব্বদা আমি মাথায় ধ'রে রাখছি। কিন্তু কি কর্বো শাহজাদা। আমি যে অপরের পায় প্রাণ বিকায়েছি।"

আজিমুখান জিজ্ঞাসিলেন, "কে সেই ভাগ্যবান্ আমি তোমায় জিজ্ঞাসা কর্তে পারি কি সুন্দরি!"

জুলিখা কহিল, "এ জন্মে যার সঙ্গে আমার কোন মতে মিলন হবে না, তাহার নাম শুনে লাভ কি কুমার!"

আজিমুখান কহিলেন, "যাহার উপর রমণীর এত ভালবাসা, এত প্রেম, যাহার জন্য নারী এতদূর আত্ম-বিসর্জ্জন কর্তে পারে, যে পরজন্মে মিলনের আশায় এ জন্মে রাজসিংহাসন পায়ে ঠেলতে পারে, সে মানুষ নহে; সে দেবতা, সন্দেহ নাই। দেবি! তুমিও মর্ত্ত্যের নহ। ভালবাস—এমনি ক'রে ভালবাস। আমরা কেবল দেখে তুষ্ট হই। আমি এই প্রকাশ্য দরবারে সত্য সাক্ষ্য ক'রে শপথ কর্ছি যে, যদি এ জীবনে তোমার আকাঙ্ক্ষিত দেবতার সনে মিলনের কোনও আশা থাকে, আমি তার অন্তরায় হব না।"

জুলিখা কহিল, "শপথ গ্রহণ কর্বেন না; যুবরাজ! আমার হৃদয়দেবতা আপনাদের চিরশত্রু। তাহারই ছিন্ন মুণ্ডের জন্য আপনি বহুমূল্য পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।"

আজিমুখান কহিলেন, "বুঝেছি, কে সেই মানব-দেবতা—পাঠান-সর্দ্দার। সুন্দরি! আমিও সসাগরা ধরণীর সম্রাট্ আরংজীবের পুত্র। আমার সত্য অক্ষরে অক্ষরে পালন কর্বো। আমি পাঠান-সর্দ্দারকে রাজদণ্ড হ'তে অব্যাহতি দিলাম। পিতা যদি আমার এই কার্য্যে রুষ্ট হন, তা হ'লে তাঁর সেই রোষবজ্র তোমার এই স্বর্গীয় প্রেমের সংস্পর্শে প্রস্ফুটিত প্রসূনের মত কোমল হয়ে যাবে।"

জুলিখা যুক্তকরে উর্দ্ধমুখে চাহিয়া কহিল, "শাহ-জাদা, ভগবানের কৃপায় আপনি সসাগরা ধরার অধীশ্বর হউন। আপনার বিমল যশে বসুন্ধরা পূর্ণ হ'ক।"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—:•:—

পাঠানের গৌরব-রবি অস্তমিত হইল।

সুতানুটীর নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে একটু পরিস্কৃত স্থানে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষকাণ্ডে দেহ সংন্যস্ত করিয়া যুগ্মাসনে বসিয়া আছে পুরুষবেশী আমিনা, তাহার জানুদেশে মস্তক রাখিয়া পাঠান-সর্দ্দার রহিম শা নিদ্রা যাইতেছিলেন।

নিদ্রোত্থিত হইয়া রহিম শা জিজ্ঞাসিলেন, "আমিন্! রাত্রি কত?"

আমিনা কহিল, "সর্দ্দার, আর রাত্রি নাই। কনকবরণী উষা পুর্ব্বাশার কনক-কবাট খুলে হাস্‌তে হাস্‌তে বেরিয়ে এসে, অর্দ্ধপথে রূপসী তামসী নিশাকে দেখে, উদয়াচলের হৈমদ্বারপথে আছাড়িয়া পড়েছে। তাহার পাণ্ডু গণ্ডে মরণের ম্লান হাসিটুকু ফুটে উঠে, তখনই আবার নিবে গেছে। জ্যোতিষ্মতী সপত্নীকে পতিত দেখে দিগ্‌বধূগণ মহোল্লাসে জেগে উঠেছে।"

রহিম শা কহিলেন, "আমিন্! প্রভাতাগমে সকলেই প্রফুল্ল। শুধু নিরানন্দময় অভাগা রহিম। উহুঃ—জ্ব'লে গেল—নিদারুণ তৃষ্ণা! আমিন্! জল!"

আমিন তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভাগীরথী-তীরের দিকে ছুটিয়া গেল ও করপুটে করিয়া জল আনিয়া কহিল, "সর্দ্দার, জল এনেছি, পান করুন, তৃষ্ণা দূর হবে।"

রহিম শা জল পান করিলেন। সহসা দূরে সৈন্য-কোলাহল শুনিয়া চমকিত হইয়া রহিম শা কহিলেন, "আমিন্! আমিন্! ওই শুন মোগলসৈন্যগণের ঘোর কোলাহল! হতভাগ্য রহিমের একমাত্র স্নেহপর বন্ধু তুমি। আমার একমাত্র করুণ মিনতি শুনবে না সখা? হে চিরবান্ধব, আমার একমাত্র শেষ ভিক্ষা দিতে কৃপণতা করবে?"

আমিনা হস্ত দ্বারা অশ্রু মুছিতে মুছিতে কহিল, "না পাঠানগৌরব! আমাকে কি করতে হবে, আজ্ঞা করুন।"

রহিম শা কহিলেন, "শুন তবে সখা! তোমায় কি করতে হবে। তোমাকে স্থির অচঞ্চল পাষাণের মত হ'তে হবে। তার পরে তোমার ওই শাণিত কৃপাণ উলঙ্গিত ক'রে আমার বুকে বসিয়ে দিতে হবে। পারবে কি আমিন! বল, দেরী ক'র না। ঐ শুন সৈন্য-কোলাহল। আরও কাছে! আরও কাছে! কেন সখা! বাক্যহীন? পারবে না? তা হ'লে কি আমিন্, নিজের চক্ষে দেখতে পারবে, সেই পাঠানগৌরব-রবি—কাল যার মহিমা-সম্পদে, যার গৌরব-বিভায় অর্দ্ধ আর্য্যাবর্ত্ত উদ্ভাসিত ছিল, আজ সে মোগলের জয়দৃপ্ত সিংহাসনের তলে প'ড়ে, হতমান নতশির ধূলিধূসরিত অরাতির পদাঘাতে ভৃশ-নিপীড়িত হবে।"

আমিনা কহিল, "না সর্দ্দার, কখনও না!"

রহিম শা কহিলেন, "তবে সখা! অনর্থক কাল-ক্ষয় ক'র না। বজ্র দিয়ে হৃদয় বাঁধ। দেখুক অরাতি-বৃন্দ, দেখুক জগৎ, জননী জন্মভূমি উদ্ধারের তরে পাঠানের আত্মবলিদান কিরূপ?"

আমিনা কহিল, "পাঠান-সর্দ্দার! আমি কি পাপ করেছি যে, আমার উপর এই গুরুতম দণ্ড-বিধান করছেন?"

রহিম শা কহিলেন, "বিচার ক'রে বুঝে দেখ সখা! দুষ্টক্ষত তিল তিল ক'রে দেহ ক্ষয় করে। ভিষকের তীক্ষ্ণ অস্ত্র-উপচার বিনা তাহার নিরাময় হয় না। তাই বলি, সংশয় ত্যাগ কর। এই কার্য্যে পুণ্য বিনা পাপ হবে না।"

আমিনা কহিল, "হে আমার আজন্ম-সাধন-ধন অন্তরদেবতা, পাপ-পুণ্য যুক্তি-তর্ক, বিচার-বিবেক সব তোমার পদতলে সমর্পণ করেছি। তোমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানি না। তুমি তুষ্ট হ'লে দেবরোষও তুচ্ছ বলিয়া গণি। দাও প্রিয়তম! তোমার পদরজ আমার শিরে দাও! জন্মের মত আমার বোহন্তের দায় মুক্ত ক'রে দাও।"

আরও নিকটে সৈন্য-কোলাহল শুনিয়া রহিম শা কাতরভাবে কহিলেন, "আমিন্, সখা! ওই শুন, সৈন্যগণ একেবারে কাছে এসে পড়েছে! আর বিলম্বের সময় নাই।"

আমিনা যুক্তকরে উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া কহিল,

"অন্তর্যামী হে বিশ্বনিয়ন্তা! একমাত্র তুমি জান—আমার সমস্ত পাপ প্রাণ দিয়ে তাঁরে ভালবাসা। তাঁরই তরে, আমি এত দিন ধ'রে, এই প্রবঞ্চনাজাল রচনা করেছিলাম। কোমল নারীর প্রাণ পাষাণের আবরণে ঢেকে ছায়ার মতন স্বার্থহীন লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যবিহীন তাঁহার পাছে পাছে ঘুরেছি, এই মনে ক'রে যে, পাছে অভাগীর হৃদয়ের ধন, এই অমূল্য রত্ন অন্য কেহ কেড়ে লয়। হে দয়িত! হে জীবিতবল্লভ! তোমার শ্রীপদে শত শত অপরাধ করেছি। ইচ্ছা ছিল, যত দিন না সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, ঐ রাতুল চরণ সেবা করবো। তার পরে এক দিন প্রবঞ্চনাময় এই লাঞ্ছিত জীবন তোমার পায়ে ঢেলে দিব। কিন্তু আমার মনোরথ পূর্ণ না হতেই, উন্মাদ নিয়তি এসে সব শেষ ক'রে দিলে। হে হৃদয়-দেবতা! একবার মুহূর্ত্তের জন্য আশা মিটিয়ে তোমায় দেখতে দাও। এস সখা! তোমার সুমঙ্গল্য প্রেমজ্যোতির পূর্ণবিকাশ ক'রে চিরতরে আমার হৃদয়ের তমঃ দূর ক'রে দাও। অভাগিনী আমিনার প্রতি দিন, প্রতি দণ্ড, প্রতি পল যেমন তোমারই পুণ্য-জ্যোতিতে চির-উদ্ভাসিত, চির-মধুরতাময় ছিল, আজ মরণের তীরে দাঁড়িয়ে দেখ নাথ! সে প্রতিভা যেন তিলমাত্র মলিন না হয়। তোমারই সেবার জন্য এত দিন ছার দেহ রেখেছিলাম, আজ তোমারই প্রীতির জন্য তাহা তোমার পদে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম।"

আমিনা তাহার শাণিত কৃপাণ নিজের বক্ষে আমূল বসাইয়া দিয়া ছুটিয়া গিয়া রহিমের পদতলে পতিত হইল

রহিম শা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট বিভ্রান্তের ন্যায় মূকভাবে থাকিয়া একটি বুকভাঙ্গা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া আমিনার দেহ দুই হস্তে আঁকড়িয়া বুকে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "আমিনা! আমিনা! আমার হৃদয়াকাশ আলো-করা পূর্ণিমার চন্দ্রমা, হাস্যময়ী প্রেমময়ী অনন্ত-সুষমাময়ী, তুমি আমার এত কাছে ছিলে, তবু আমি এক মুহূর্ত্তের জন্য তোমায় চিনতে পারি নি! আমি দিগ্‌ভ্রান্ত পান্থের মত লক্ষ্যহীন বিশ্বমরুমাঝে ছায়াময়ী মিথ্যাময়ী মৃগ তৃষ্ণিকার পাছে নিরাশা-তাড়নে শুষ্ককণ্ঠে রুদ্ধশ্বাসে ঘুরে বেড়িয়েছি! আর আমার এত কাছে পিপাসার জল, স্ফটিকের মত স্বচ্ছ বিমল শীতল। মন্দভাগ্য আমি দেখেও তাহা দেখতে পাইনি। অকিঞ্চন যেমন অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাসে অমূল্য রত্ন পেয়ে মূল্যহীন কাচখণ্ড মনে ক'রে হাতে পেয়ে পায়ে ঠেলে দেয়, আমি তাই করেছি।

"যাক্! রাজরাজেশ্বরী আমিনা আমার হৃদয়-সিংহাসন জন্মের মত শূন্য ক'রে চ'লে গিয়েছে। আর কেন, আরে দগ্ধ হৃদয় আমার! আর কেন পশ্চাতে চেয়ে দেখছো? ওই দেখ, কিরণমণ্ডলমধ্যে ঊষার মতন রত্ন-সিংহাসনে সমাসীনা আমিনা আমার! যাই—যাই প্রিয়তমে! যেয়ো না—রহিমেরে একা ফেলে চ'লে যেয়ো না আমিনা।

রহিম শা আমিনার বক্ষ হইতে কৃপাণ উৎপাটিত করিয়া লইয়া নিজের বুকে বসাইয়া দিলেন!"

মুহূর্ত্তে সব শেষ হইয়া গেল। বঙ্গে পাঠানের প্রভাত-রবি চিরকালের জন্য অস্তমিত হইল!

সমাপ্ত